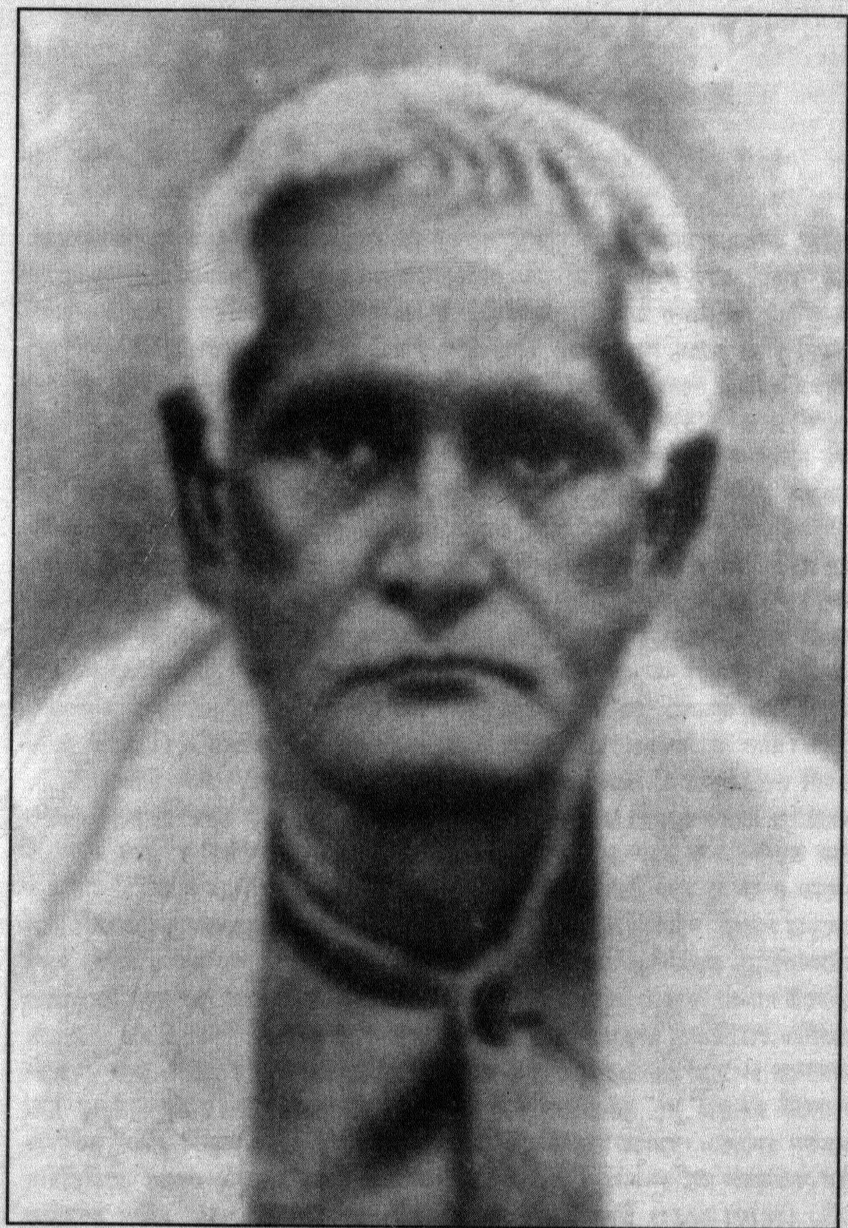
রামেন্দ্রসুন্দর
সেরা রচনা সম্ভার

ডি এম লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি এম লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি
কলিকাতা ৬

মুদ্রাকর
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা ৬



রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

জন্ম ৫ ভাদ্র ১২৭১

মৃত্যু ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

সম্পাদকীয় নিবেদন

আমাদের আত্মবিস্মরণের ঝোঁক আছে। এই ঝোঁকে আমরা অনেক সময় আমাদের অতীত সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পদ থেকে নিজেদের, এমনকী, বঞ্চিতও করে থাকি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যকে, বিশেষত শল্যচিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নত চর্চার উল্লেখ করা যায়। ওয়াকিবহাল মহলে সেটি নিতান্ত অসংগত দাবি বলে উপেক্ষিত হবে না। এই ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের অন্তত অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এর শিকড় যে তত ঠুনকো নয়, এটুকু জানতে। যদিও ঐতিহাসিক কার্যকারণে সেই চর্চার পরম্পরা উন্নততর স্তরে পৌঁছতে পারেনি, বরং তা কোনও এক সময়ে রুদ্ধ হয়ে যায়। সেই সুযোগে এদেশে অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, দৈবানুগ্রহে আত্মসমর্পণের অন্ধকার জাঁকিয়ে বসে। যার ভয়ংকর মূল্য এদেশকে আজও দিতে হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ যে চর্চা শুরু হয়, তা অনতিকালের মধ্যেই যথেষ্ট সুফল দিয়েছে, এমন সিদ্ধান্তে আশা যায়। কেন না এদেশে বহু মেধাবী মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের কীর্তি দেশের সীমানায় আবদ্ধ নেই, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু, সি ভি রমন, শ্রীনিবাস রামানুজন, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, এস চন্দ্রশেখর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, হোমি ভাবা, জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার প্রমুখের নাম নিয়ে আমরা অহংকার করতে পারি।

সম্প্রতিকালে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শিক্ষার আগ্রহ বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখনও এদেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। যাঁরা শিক্ষার আলো পেয়েছেন তাঁদের মধ্যেও যে বিজ্ঞানচেতনা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় হয়েছে, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ফলে ব্যাপক অংশের মানুষকে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা ও তাদের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের সমূহ প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দুরূহ জটিল বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ উদ্যোগ শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিকদের পক্ষেও যে গ্রহণ করা সম্ভব, তাঁর দৃষ্টান্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'বিশ্ব পরিচয়' রচনার উদ্দেশ্য, প্রয়োগ ও শ্রম উত্তরসূরীদের অনুপ্রেরণা হতে পারে। এ ছাড়া আমাদের বিজ্ঞানীরাও এবিষয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছেন। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের রচনাবলি তার মূল্যবান দৃষ্টান্ত। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সতেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও একজন মনস্বী বিজ্ঞানী—যাঁর জীবন, বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিক চর্চা আমাদের গভীর মনোযোগ দাবি করে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (1864-1918)।

বস্তুত আশৈশব মেধাবী রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, সেই সঙ্গে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও সাহিত্যরচনায় অপ্রতিহত উদ্যমের প্রতীক। বিজ্ঞানচর্চায় তিনি যেমন ছিলেন কঠোরভাবে পাশ্চাত্যপন্থী, মনে প্রাণে তেমনি ছিলেন নিরঙ্কুশ স্বদেশি। চরিত্রে তিনি

একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক এবং দেশাত্মবোধে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে এদেশে শিক্ষার একটি স্বাধীন ক্ষেত্র সৃষ্টিতে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নেন। উপরন্তু 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' হয়ে উঠেছিল তাঁর কীর্তিস্তম্ভ। বাংলার পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাবস্তু, সাহিত্য চর্চায় এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে তিনি ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ।

আজ প্রবল বাণিজ্যিক বিশ্বায়নের প্লাবনে বিশ্বের সব দেশের আত্মপরিচয় ভেসে যাবাব উপক্রম হয়েছে। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবাইকেই আজ শিকড়ের সন্ধানে নতুনভাবে উদ্যোগী হতে হচ্ছে। উপরন্তু এদেশের বহু প্রতিভাবান, প্রতিশ্রুতিময় বিজ্ঞানগবেষক ও প্রযুক্তিবিদ তরুণ যুবক পশ্চিমে পাড়ি দিচ্ছেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে পাশ্চাত্য অনেক এগিয়ে আছে, সেখানে শিক্ষা গবেষণাকর্মে কোন অন্যায় নেই। অন্যায় যদি কিছু থাকে, তা স্বজাতি স্বদেশকে বিস্মরণের মধ্যে আছে। শিকড়ের পুনরুজ্জীবনের দায়, এদেশের শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির কার্যক্রমে তাঁদের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর বেশ কিছু উন্নয়নশীল দেশে মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ববোধের প্রেরণায় প্রবাসীদের অবদান সে দেশকে উন্নয়নের পথে বহু পথ এগিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে দেশাত্মবোধের কোনও বিরোধ নেই। এই শিক্ষা, এই আদর্শ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন, তাঁর রচনা তুলে ধরা বিশেষ জরুরি; সেই সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞান সাহিত্য, যার সহজ সরল সরস ভাষা ও রচনানৈপুণ্য তুলনারহিত। কারোর পক্ষেই এর অনিবার্য প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের উন্নত উৎকর্ষের জন্য তাঁর রচনাবলি অপরিহার্য।

এরকম দৃষ্টিকোণ থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের ছড়িয়ে থাকা, অনাদরে পড়ে থাকা, লুপ্ত হবার পথ থেকে বহু রচনা সংগ্রহের চেষ্টা করেছি আমরা। বর্তমান প্রয়োজনের কথা মনে রেখে নির্বাচিত করা হয় যে রচনাগুলো, তাই নিয়েই এই গ্রন্থটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। বলাই বাহুল্য ইতিমধ্যে বানানরীতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা সেকালের বানানবিধি পরিবর্তন করেছি।

এই গ্রন্থের আরও একটি আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে বাংলার পাঁচজন অত্যন্ত কৃতী বিদগ্ধ মানুষের মূল্যায়ন, যা আমরা পুস্তকের প্রথমেই সন্নিবিষ্ট করেছি। এই নিবন্ধগুলি বহুদিক থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের ওপর আলোকপাত করেছে। ফলে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাঁর সার্বিক পরিচয় উদ্ভাসিত হবে, আশা করি। এই সংকলন গ্রন্থ রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে অন্তত কিছু মানুষকেও যদি আগ্রহী করে তুলতে পারে তবে আমাদের শ্রম অন্তত কিছুটা সার্থক হবে বলে মনে করি।

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশে পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় যে সাগ্রহ উদ্যোগ নিয়েছেন, গ্রন্থের আঙ্গিকগত বিষয়ে যে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। রচনা সংগ্রহে, মুদ্রণে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সূ চি প ত্র

প্রসঙ্গ রামেন্দ্রসুন্দর

রচনা রামেন্দ্রসুন্দর

বিজ্ঞান ভাবনা

প্রসঙ্গ রামেন্দ্রসুন্দর

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মনীষী, মনস্বী, যশস্বী রামেন্দ্রসুন্দর

গত ২৩ জ্যৈষ্ঠ[১] শুক্রবার রাত্রি দশটার সময় মনীষী, মনস্বী, যশস্বী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মার মন্দিরের ঘৃত-প্রদীপ সহসা নিবিয়া গেল। দেশবাসীর মনে শোকের অন্ধকার; সাহিত্যের তপোবনে বিষাদের ছায়া। সাহিত্য-দেবতার পবিত্র মন্দিরে যে কয়টি দীপে পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আমরা মায়ের আরতি করিতাম, সেই পঞ্চপ্রদীপের উজ্জ্বল মধ্য-দীপ রামেন্দ্রসুন্দর বাংলার সারস্বত মন্দির অন্ধকার করিয়া অকালে আলোর সাগরে অস্তমিত হইলেন। বাংলার দুর্ভাগ্য শোচনীয়। আমাদের দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর সমগ্র বাংলার ও সমগ্র বাঙালির আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে কয়জন ভাগ্যবানের মধ্যে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম। আমার প্রথম পরিচয়ের প্রীতি ভক্তিতে, এবং সেই ভক্তি শ্রদ্ধায় পরিণত হইয়াছিল। জীবনপ্রভাতে যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম, জীবন-মধ্যাহ্নে তিনি আমার অগ্রজের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জীবন-সন্ধ্যায় তাঁহাকে হারাইয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য আরও শোচনীয়।

রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা দেশের কর্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। কর্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙালির হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।

রামেন্দ্রসুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশি, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশি। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

আমার মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'আহেলে বিলাতি' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে বাঙালির সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটী বাঙালি থাকিবার সৌভাগ্য

১. ১৩২৫ সাল।

লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাংলা ও বাঙালি রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মতো বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মতো রক্ষা করিয়াছিল। ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণে'র কল্যাণ-কামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনো অসংযম, কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোন সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙালির আদর্শ। ভবিষ্যতের বাঙালি মধুকরের মতো বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাঁহার নিজত্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম-সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙালির অগ্রদূত। নিজত্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্মে ও সাহিত্যে 'গোঁড়ামি'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙালির উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাংলার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষা-বিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যে। সংক্ষেপে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী, ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গম বহুদিন বাঙালির তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাঙালি ভাষা, বাঙালির সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরল ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙালি লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মতো বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, তদভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন; তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না; তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সকল কর্মের মূল—দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকাতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশি ভাষা, পুরে কি আশা'-ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বাংলার সাহিত্য-পরিষদ রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে

পরিষদ-মন্দিরের ইটের পর ইট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাঁহার দেশাত্মবোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,—'তোমরাই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!' তিনি তাঁহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং মন্দিরে-মন্দিরে তাঁহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙালির ভাগ্যেও নিষ্ফল হইতে পারে?

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য, বাংলার পুরাতত্ত্ব, বাংলার ইতিহাস, বাংলার পুরাবস্তু, বাংলার অবদান,—এক কথায় বাঙালির প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গা জলে', রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনই বাংলার উপকরণে বাংলার পূজা করিতেন, বাংলার ভাবে বাংলার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালির পরিচ্ছদ ধুতি, চাদর পরিয়া রিপন কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাংলা দেশের বাঙালির বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙালি শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন,—'ইংরেজি রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাংলা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙালির কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্বে বাংলা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্তের পূর্বে বাংলা ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাঁহার সূচনা করিয়া বাংলা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বীতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিষ্ক্রয়ে বাঙালিকে তাঁহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'যজ্ঞ' শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরস্মরণীয় নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতার জয়স্তম্ভ বটে। রামেন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি,—'নিচখান জয়স্তম্ভান্‌ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য, হৃদয়ের ঔদার্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কর্মী ছিলেন; এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কর্মিদিগকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রস্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাংলার পূজায় মজিয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি অনেক শক্তিশালী লেখককে বাংলা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ

পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তর-জীবনে দর্শন, উপনিষদ, বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ে আমি তাঁহাকে সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে—

'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ।'

লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে 'এশিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এশিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য ছিল। স্বদেশি যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্ত-লোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েক দিন পূর্বে 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্রবাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাঁহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রাম্রেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্মে ও নিষ্কাম কর্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্বাদ করো—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙালির উত্তরপুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক।

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর : বৈজ্ঞানিক ও বৈদান্তিক

যখন কলেজে পড়িতাম, তখন হইতেই মাসিক পত্রিকাদিতে রামেন্দ্রবাবুর লেখা পড়িয়া এমন একটা অপূর্ব মনীষার পরিচয় পাইয়াছি, যে মনীষা ঠিক সে ভাবে অন্য কোনো বাঙালির লেখায় ফুটিয়া উঠে নাই এবং অন্যক্ষেত্রে যাহার তুলনা শুধু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই পাওয়া যায়। পড়িবার সময় হইতেই সেই মনীষার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তি আমার অন্তরে বিরাজ করিতেছিল। তারপর নিজের সামান্য অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য লইয়া যেদিন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মন্দিরে পূজা করিতে আসিলাম, সেদিন মন্দিরাভ্যন্তরে যজ্ঞবেদী ঘেরিয়া যে সব প্রধান ঋত্বিকগণকে দেখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে আমাব এতদিনের কল্পনায় নির্মিত, ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রদ্ধায় অর্চিত সেই মনীষার শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তিটিকেও সত্য সত্যই চোখে দেখিলাম—আমার মানস-পূজা এতদিনে সাক্ষাৎকারের সিদ্ধিতে পৌঁছিয়া সুস্থির ও ধন্য হইল। তারপর জাতীয় শিক্ষামন্দিরের পবিত্র হোমাগ্নির চারিধারে যে সমস্ত কণ্ঠ মিলিয়া আমাদের দেশমাতৃকার পূজায় দেবীসূক্তমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্বরগাম্ভীর্য ও ছন্দোবৈভবে রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠই বোধহয় সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়াছিল—দেশমাতৃকার আবাহনে এমন দ্বিধাহীন, সংকোচহীন, অবিকৃত সুর ও ছন্দ আর কাহারও কণ্ঠে শুনিয়াছি বলিয়া তো আমার মনে হয় না। শুধু কি তাহাই? সে হোমবহ্নিতে অনেককেই অঞ্জলি পূরিয়া আহুতি দিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের অঞ্জলি যেমন ধারা হৃদয়ের সকল মমতা, সকল শ্রদ্ধা ও সকল আশা দিয়া ভরিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার অনুষ্ঠান যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, তেমনটি হইতে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তারপর আবার নানা গোলযোগে ও উপদ্রবে যখন জাতীয় শিক্ষার যজ্ঞশালার পুরোহিতেরাও ক্রমশ স্বাধ্যায়-মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ প্রভৃতি ভুলিতে বসিলেন, পূজার্থীর দলও যখন ক্রমশ ভিতরের গোলযোগ ও বাহিরের দুর্যোগ দেখিয়া মন্দিরদ্বার হইতে অর্ঘ নৈবেদ্য ফিরাইয়া লইয়া চলিল, তখন দেশমাতৃকার মহাপূজা পণ্ড হইতে বসিল ভাবিয়া, যে ঋষিকল্প পুরোহিতের প্রসন্নোজ্জ্বল ললাট সকলের চেয়ে বেশি মর্মান্তিক বেদনায় ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি আর কেহ নহেন—রামেন্দ্রসুন্দর। এই আর্যভূমির বাস্তুদেবতাটিকে রামেন্দ্রসুন্দর যেমন খাঁটিভাবে ভালোবাসিয়া গিয়াছেন; এবং সেই ভালোবাসা প্রধানত জাতীয় শিক্ষাপরিষদৎ ও সাহিত্য-পরিষৎ এই দুইটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া যেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তেমন খাঁটি ভালোবাসা ও তাহার তেমন সুন্দর পরিচয়, আমাদের অনেক বড় বড় অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মধ্যেও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই, আমরা না চিনিয়া, না জানিয়াই 'দেশকে ভালোবাসি' একথা বলিয়া থাকি; যেখানে ভালোবাসার পশ্চাতে কতকটা সত্যকার পরিচয়ও-বা আছে,

সেখানে সে ভালোবাসাকে ভাব-সাধনা কর্ম-সাধনার মধ্য দিয়া সুন্দর ও সফল করিয়া লইবার অধিকার অনেকে সাব্যস্ত করিয়া লইতে পারেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের দেশাত্মবোধের পশ্চাতে দেশাত্মার সম্যক বোধ ছিল, এবং দেশটা যাহাতে দেশাত্মার স্বরাজ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সে পক্ষে ভাবিবার মাথা, লিখিবার কলম এবং খাটিবার ঝোঁক রামেন্দ্রসুন্দরে একাধারে যেমন ছিল, তেমন অপর কাহারও দেখি নাই।

এ সবকথা আমি আর বিস্তারিত করিয়া বলিতে যাইব না। রামেন্দ্রসুন্দর ভাবিয়া গিয়াছেন কী, তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করিব। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের যজ্ঞশালায় যেদিন মন্ত্রবিস্মৃতি ও অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়া পড়িয়া আমাদের মতো দীন সেবকের কর্মসংকোচ করিয়া দিল, সেদিন রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার নিজের অপূর্ব ভাবসাধনার পুণ্যক্ষেত্রের একপ্রান্তে টানিয়া লইলেন—আমাকে রিপন কলেজ ব্রতী করিয়া নিলেন। কলেজের চাকুরি উপলক্ষ মাত্র—রামেন্দ্রসুন্দরবাবু তাঁহার নিজের শুভ্রোজ্জ্বল মূর্তির চারিধারে যে নির্মল, শান্ত, পবিত্র বায়ুমণ্ডল রচিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বায়ুরাশি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে বক্ষ ভরিয়া বহিয়া আনিবার সুযোগ তিনি আমায় দিলেন। বহু অপরাহ্নে কলেজের কক্ষে সে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমার ভাবদেহের ও চিন্তাদেহের অনেক দূষিত, তরল রক্ত ক্রমশ নির্মল ও সতেজ হইয়া উঠিতেছে। লেখা পড়িয়া যাহার অঙ্কুর মাত্র হইয়াছিল, সেই মধুবর্ষী স্নিগ্ধ বায়ুমণ্ডলে থাকিয়া তাহাই পরিপুষ্ট, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রামেন্দ্রবাবু আমার সঙ্গে তাঁহার গভীরতম চিন্তাগুলি মাপাজোকা লইতে ভালোবাসিতেন। তাঁহার এই চিন্তাগুলির বিষয় 'জিজ্ঞাসা' প্রভৃতি লেখার মধ্যে আছে, কিন্তু তাদের বিশদ পরিচয় আমরা পাই শেষ প্রবন্ধগুলিতে—যেগুলি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া সম্প্রতি 'জগৎকথা' নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তাঁহার আসল কথাটি এই প্রবন্ধমালার ভিতর দিয়াই বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে কথাটি তিনি বলিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে যেটুকু বলিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যেই সিদ্ধান্তের একটা সূত্র, তত্ত্বের একটা ইঙ্গিত, তিনি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বিশেষত তাঁহার 'মুক্তি' 'যজ্ঞ' প্রভৃতি লেখা পড়া থাকিলে সে সূত্র বা ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়া পথ হারাইবার আশঙ্কা নাই। আমি কলেজের ম্যাগাজিনে রামেন্দ্রবাবুর 'জগৎকথা'-র উপর টীকা-টিপ্পনী লিখিতাম—সেগুলি লিখিতে স্বয়ং রামেন্দ্রবাবুই আমায় সাহস দিয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্তা স্পষ্ট করিয়াই নানা জায়গায় বলা হইয়াছে। আমি তাঁহার মাত্র দুটি একটি কথা শুনাইব।

রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তেমন পরিষ্কার মাথা ও অসাধারণ মনীষা লইয়া পশ্চিম দেশের বিজ্ঞানক্ষেত্রে কেহ দেখা দিলে, তিনি একজন ম্যাকসওয়েল বা কেলভিন না হইয়া যান না। কিন্তু বর্তমানে এ দেশের ভাবের মাটি যেরূপ অসার ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে রামেন্দ্রবাবুর মতো প্রতিভাও যে তেমন বিশাল পরিপুষ্টিতে পৌঁছিয়া আশানুরূপ ফলবান বিজ্ঞানকল্পতরু হইতে পারে নাই, ইহাতে আপশোশের কারণ থাকিলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। রামেন্দ্রবাবু যেমন বিজ্ঞান বুঝিতেন ও বুঝাইতেন, তেমন আর কেহ এ দেশে পরিয়াছেন কি না জানি না; তবে তাঁহার যেমন মাথা ছিল, তাহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানের

সৃষ্টি-ব্যাপারে তাঁর একজন প্রজাপতি হওয়াটাই উচিত ছিল। নিউটন, ডারউইন, ম্যাক্‌সওয়েল প্রভৃতি এইরূপ এক-একজন প্রজাপতি। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করিলেও, বিজ্ঞানের বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানের ঋষি; আর যাঁহারা শিষ্য যজমানের কল্যাণ কামনায় সেই মন্ত্রগুলির যথাযথ বিনিযোগ করিতে পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের আচার্য ও পুরোহিত। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ঋষি ছিলেন, কেন না, তাঁহার ধ্যানে বিজ্ঞান যেমন স্বরূপে ধরা দিয়াছিল, তেমন ধরা বিজ্ঞানে সচরাচর দেয় না। আচার্য এবং পুরোহিত হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি অতুলনীয়—তিনি যেমনভাবে তাঁহার লেখায় ও অধ্যাপনায় বিজ্ঞান বুঝাইয়া দিয়াছেন; তেমনভাবে বুঝাইতে আর কাহাকেও শুনি নাই। এ ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের আর এক প্রমাণ—তিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্রগুলি সাদা বাংলায় আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন, সেগুলি পশ্চিমদেশের সাধা বুলিতেই কেবল বিবৃত হইতে পারে, ইহাই অনেকের বদ্ধমূল সংস্কার। যাহা হউক, রামেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানের ঋষি ও পুরোহিত হইয়াও যে প্রজাপতি হইয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দেশের পরম দুর্ভাগ্য।

কিন্তু এক হিসেবে বিজ্ঞানকে পরখ করিয়া লইবার, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করিয়া লইবার, একটি নতুন দিব্যচক্ষু তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এই হিসেবে তাঁহাকে প্রজাপতি ভাবিলেও অসঙ্গত হইবে না। সেই দিব্যচক্ষু প্রাসাদাৎ আমরা দেখিতে পাই যে, বিজ্ঞানের বিরাট পুরী মর্মরনির্মিত হইলেও সত্যসত্যই উহা মায়াপুরী। উপনিষদের শ্বেতকেতু প্রভৃতির যে বিজ্ঞান তাহার কথা বলিতেছি না, তবে পশ্চিমদেশের যে বিজ্ঞান, তাহার বিশাল আয়তনটা যে গড়িয়াছে সে ময়দানব! সত্যসত্যই হাওয়ার উপরে সেই বিশাল সৌধটা গড়িয়া উঠিয়া আমাদের ভাববিশ্বাসকে তাহারই ক্ষুধিত পাষাণের চারিধারে মায়া-ডোরে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, এবং আমাদিগকে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া গোলাম বানাইয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানের দুয়ারে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাস বাঁধা, বিজ্ঞানের নামে আমাদের বিচারশক্তি একেবারে পঙ্গু। এই কুহকের ঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া বিজ্ঞানের আসল চেহারাখানি দেখাইয়া দিয়াছেন—আমাদের রাম্রেন্দ্রসুন্দর। ভারতবর্ষে বেদপন্থী-সমাজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করার সার্থকতা তাঁহার এইখানে। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও বৈদান্তিকের দৃষ্টি না পাইলে কেহ বিজ্ঞানের ভেল্কি ধরিয়া ফেলিতে পারে না। তেমন বুদ্ধি ও দৃষ্টি রামেন্দ্রবাবুর মতো আর কাহার ছিল?

বিজ্ঞানের গোড়ার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা পশ্চিমদেশেও একটু-আধটু যে না হইয়াছে এমন নয়। বিজ্ঞান দেশ, কাল, জড় ও শক্তি লইয়া প্রধানত কারবার করে। দুইজন ইঞ্জিনিয়ার পরামর্শ করিয়া এই কয়টা আসল মশলা লইয়া বিজ্ঞানের মায়াপুরী গড়িতেছেন—ইহাদের এক জনের নাম পর্যবেক্ষণ, অপরের নাম গণিত। পরীক্ষা ও গণিতবিদ্যা মিলিয়া মায়াপুরী গড়িতেছেন বটে কিন্তু ইঁহারা একদেশের লোক নহেন। গণিতবিদ্যা এক অবাস্তব ধ্রুবলোক অচলায়তন গড়িয়া বাস করেন, ইহলোকের ধূলাকাদা লইয়া ঘাঁটা তিনি ইতরের কাজ মনে করেন। কল্পিত বিন্দু, রেখা, তল, বৃত্তাভাস প্রভৃতি তাঁহার সম্পত্তি। ইনি খাঁটি গণিত। সময়ে-সময়ে ইহলোকের জড় পদার্থ, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি লইয়াও গণিত কারবার করেন বটে; কিন্তু কারবার করিবার পূর্বে তাঁহার বনমানুষের হাড় ছোঁয়াইয়া সেগুলিকে অতীন্দ্রিয়, আজগুবি জিনিস বানাইয়া লন। তখন ইনি মিশ্রগণিত। ইনি যে লাটিম ঘুরাইয়া

থাকেন, যে দোলক দুলাইয়া দেন, যে তার কাঁপাইয়া থাকেন, সে লাটিমের ধ্রুবলোকের শিশুরাই বোধহয় ঘুরাইতে পান; সে দোলকের দোল খাইয়াছেন বোধহয় নারায়ণের নাভি-কমলোপরি আসীন একমাত্র লোক-পিতামহ; আর সে তার শুধু বাগ্‌দেবী বা দেবর্ষি নারদের বীণাযন্ত্রেই বিন্যস্ত রহিয়াছে। আমাদের পরিচিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থগুলি ঠিক স্ব-ভাবে থাকিয়া গণিতবিদ্যার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। গণিতবিদ্যা যে মন্ত্র আওড়াইয়া আমাদের অনুভবের জগৎটাকে শুধু একটা কল্পিত, বাঙময় জগৎ করিয়া দেন, সে মন্ত্রগুলিকে বলে ফরমিউলা। এই ফরমিউলা-রাক্ষসীর দন্তপংক্তির যেরূপ তীক্ষ্ণতা ও বহর, তাহাতে আমাদের কোনো সত্যকার অনুভবই ইহার কাছে অক্ষত-দেহ ও অবিকৃত মূর্তি থাকিয়া পালাইতে পারে না। যে জিনিসটা তাঁর ফরমিউলার পেষণ যন্ত্রে ফেলিয়াছেন, সে গণিত জিনিসটা আর স্বরূপে বাহাল থাকিতে পারে না। পশ্চিম দেশের ম্যাক, পোঁয়াকারে, কার্ল, পিয়ার্সন প্রমুখ পণ্ডিতের এ রহস্য ক্রমশ ধরিয়া ফেলিতেছেন; সম্প্রতি আবার আইনস্টাইনের দল যে ভাবে দেশ কাল লইয়া ঢালা-ওপর করিতেছেন, তাহাতে গণিতের একেবারে গোড়াতে গিয়াও ভরসা নাই। আমাদের অপরা-বিদ্যার আগাগোড়াই আপেক্ষিক—নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য সম্ভবত ইহার কোনখানেই নাই। ইহাই হালের টাটকা খবর—রামেন্দ্রবাবু তাঁহার সরল ও অপূর্ব ভাষায় বৈদান্তিকভাবে এ খবর আমাদের পূর্বেই শুনাইয়াছেন। গণিতের গোড়ার কথাগুলি লইয়া রামেন্দ্রবাবু যে সবকথা বলিয়াছেন, সেসব কথা পশ্চিমের বিচারকেরাও ভয়ে-সঙ্কোচে কতকটা অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন; কিন্তু রামেন্দ্রবাবুর বৈদান্তিক দৃষ্টি স্বচ্ছ ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। তাঁহার পাদনিম্নে একটা ভূমি সুস্থির ছিল—সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি একটা কিছু গড়িতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পশ্চিমে প্রায়ই দেখিতে পাই, বিজ্ঞানের জ্ঞানবিশ্বাস ও মতবাদগুলি পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া চুরমার হইতেছে; পাকা বনিয়াদের উপর কোনও একটা কিছু কায়েমিভাবে গড়িয়া উঠিতেছে না। ইহার হেতু—পশ্চিমের জড়-বিদ্যা এখনও ব্রহ্মবিদ্যার তল্লাস পায় নাই; অপরা-বিদ্যা নানা স্রোতে নানা দিকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এখনও পরা-বিদ্যার সুস্থির মাটিতে নিজের শিকড় চালাইয়া দিয়া বসিতে পারে নাই।

পদার্থ-বিদ্যার অপর একজন ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা। আমরা মনে ভাবি, পরীক্ষা করিয়া বুঝি আমরা ইহলোকের খাঁটি খবর পাইব। বৈজ্ঞানিক তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া ইহলোককে যেভাবে দেখেন, তাহাই ইহলোকের আসল চেহারা। রামেন্দ্রবাবু এ ভুলও ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক নিজের অনুভব, নিজের যন্ত্রপাতিতে প্রত্যয় যান না; তিনি কল্পিত 'মাঝারি মানুষ'-কে ডাকিয়া 'আদর্শ' যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখিবার ব্যবস্থা দেন। কিন্তু মাঝারি মানুষ কোথায় বিচরণ করে, আদর্শ যন্ত্রপাতি কোন বিশ্বকর্মার কারখানায় তৈয়ারি হয়, তাহা কে বলিবে? অতএব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সত্য গড়কষা সত্য—আমাদের নিজের নিজের সাক্ষাৎ উপলব্ধি নহে। সুতরাং পাইতেছি যে, পদার্থ-বিদ্যার দুই কারিগরই হাত সাফাই দেখাইতে মজবুত। মালমশলাগুলাও নিরপেক্ষ, অসন্দিগ্ধ নহে। ফলে পাইতেছি, বিজ্ঞানের মায়াপুরী—যাহা রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিনাইয়া গিয়াছেন। কল্পিত সর্পের একটা আশ্রয় তো চাই, রজ্জুকে আশ্রয় করিয়াই তো সর্পভ্রান্তি। মায়ারও একটা অধিষ্ঠান চাই। যে সত্যকার অধিষ্ঠানের উপর বিজ্ঞান তার মায়াপুরী তুলিয়াছে, সেটা এমন একটা বস্তু, যেখানে সন্দেহ অবকাশ পায় না, যেখানে দাঁড়াইয়া 'অপর' কিছুর আর অপেক্ষা নাই। সেই নিরপেক্ষ বস্তুটিকে

রামেন্দ্রসুন্দর ডাকিয়াছেন, 'আমি' বলিয়া—বেদান্ত বলিবেন, আত্মা। আমি নিজে যা কিছু ঠিক যেমনভাবে অনুভব করিতেছি, সেইসব জড়াইয়া আমার আমিত্ব—আমার 'প্রাতিভাসিক জগৎ।' বেদান্তের এই পারিভাষিক কথাটাকে রামেন্দ্রবাবু একটু বিশেষ অর্থে লইয়াছেন। যাহা হউক আমার নিজের অনুভবের মধ্যেই সব—তুমি সে, নিখিল জগৎ—এই নিজস্ব অনুভবের মধ্যেই রহিয়াছে। আমি যে ভাবিতেছি—তোমরা আমার পর এবং বাহিরে রহিয়াছে, সে ভাবনা আমার ভিতরেই হইতেছে; কাজেই 'আমার' বাহিরে আর জগৎ নাই। তারপর এই 'আমি'-র কি জানি কেন খেয়াল হইল—আমার একটা ভিতর-বাহির থাকিবে। এই খেয়ালের বশে তিনি নিজেরই খানিকটা 'বাহির-বাড়ি' করিয়া দিলেন। এই যে একটা বাহির ভাবিয়া লইয়া সেখানে নিজেরই খানিকটা বিসর্জন করা, ছুড়িয়া ফেলা, বলি দেওয়া, এই ব্যাপারটার নামই যজ্ঞ। 'আমি' যজ্ঞ করিয়া এই জগৎ ও আমার মতো সব জীব সৃষ্টি করিয়াছি। এই যজ্ঞের ফলে 'তুমি' ও 'সে' আমা হইতে স্বতন্ত্র। আমি স্বতন্ত্র ভাবিব, এইরূপ খেয়াল করিয়াছি বলিয়াই স্বতন্ত্র, নইলে আমার বাহিরে আলাহিদা কেহ বা কিছুই নাই। যাহা হউক, 'তুমি' ও 'সে' দেখা দিবার পর, তোমাদের সঙ্গে কারবার করার আমার বাসনা হইল। তুমি ও আমি কারবার করিতে বসিয়া আমার নিজের অনুভব জগৎ ঠিক হুবহু মিলিয়া যায় না। আমি যে কালে মাথাধরার কষ্ট পাইতেছি, তুমি সে কালে হয় তো সুস্থচিত্তে কেশবিন্যাস করিতেছ। আমার মনে এক রকম, তোমার মনে আর একরকম। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে অমিল থাকিলেও, মিলও যথেষ্ট আছে। এই কাগজখানা তুমিও যেভাবে দেখিতেছ, আমিও প্রায় সেইভাবে দেখিতেছি, মেঘ ডাকিলে দু-জনেই শুনিব। আমাদের অন্দর-বাড়িতে পরস্পরেব প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু যে বাহির-বাড়িতে বসিয়া আমরা পরস্পরের সঙ্গে কারবার করি, সেই বৈঠকখানা, সেই মেলামেশার জায়গা হইতেছে 'ব্যবহারিক জগৎ'। আমরা এই ব্যবহারিক জগতে থাকিয়া পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার করি, এবং আমাদের সকল কর্ম ও সকল বিদ্যা এই ব্যবহারকে আশ্রয় করিয়া। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার লেখায় এই কথাটা খুব খোলসা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এমন খাঁটি বেদান্তের কথা অকুতোভয়ে আর কেহ এমনভাবে আমাদের সামনে ধরিয়াছেন কি? পাশ্চাত্য দর্শনের বিজ্ঞানবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ রামেন্দ্রবাবুর অনেক লেখার উপরে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মাথার খুলির ভিতর হাজার-হাজার বছরের পুরোনো রক্ত যে চিন্তাটিকে বিশেষভাবে জোগাইয়াছে, সে চিন্তার মূল আমাদের বেদের মধ্যেই খুঁজিয়া পাই, পশ্চিমে নহে। তিনি সে চিন্তার এত গোঁড়া ছিলেন যে, তার সঙ্গে অসমঞ্জস বুঝিলে কোনও ব্যবস্থাকেই তিনি আমল দিতেন না—যথা দলবদ্ধভাবে বৈরাগীর ধর্ম।

শিশিরকুমার মৈত্র

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রবাবু যে সত্য-সত্যই আমাদের ছাড়িয়া অন্য লোকে চলিয়া গিয়াছেন, ইহা এখনও বিশ্বাস হয় না। এই সে দিন রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও তিনি কতরকম বিষয়ের আলোচনা করিলেন। এখনও সর্বদা মনে হয়, যেন সেই শান্ত সৌম্য মূর্তির সম্মুখে বসিয়া গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সরল ব্যাখ্যা শুনিতেছি। বাস্তবিক, কতকগুলি লোকের এমন একটা অমরতা, এমন একটা অবিনশ্বরতা থাকে যে, মৃত্যু যে তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপ লোক ছিলেন। অথচ তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল ছিল। আমি তো তাঁহাকে গত এগারো বৎসরের মধ্যে কখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে দেখি নাই। তাঁহার চোখের দীপ্তিতে ও হাসিতে এমন একটা অজর অমর ভাব ছিল যাহা দেহের সহস্র দুর্বলতা ভেদ করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিত। রামেন্দ্রবাবুর সমস্তটাই দেহী ছিল, দেহের অংশটা দেহীর মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিল। এই জন্যই বোধহয়, তাঁহার দেহ শীঘ্রই কাজে ইস্তফা দিল।

তাঁহার হাসির কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ হাসি আমার জীবনে আর কাহারও কখনও দেখি নাই। সকল প্রকার বৈষম্য, সকল প্রকার সন্দেহ, তাঁহার হাসির সামনে পলাইয়া যাইত। একবার মনে পড়ে, কতক জন নবীন সাহিত্যিক 'হিতবাদী' পত্রে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় ত্রিবেদী মহাশয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। আমি ত্রিবেদী মহাশয়কে এ সমালোচনা দেখাইলে, তিনি কেবলই হাসিতে লাগিলেন। সে হাসিতে যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, বাক্যের দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। সে হাসি সমালোচকের তীব্র প্রতিবাদকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া দিয়াছিল। সে হাসি স্পষ্টই সকলকে অনুভব করাইয়া দিয়াছিল যে, তুচ্ছ জগতের প্রশংসা বা নিন্দার কত ঊর্ধ্বে তাঁহার চিত্ত ভ্রমণ করিত। সে রাজ্যে পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই, সে রাজ্যে বিশুদ্ধ মৈত্রীভাব, সার্বজনীন প্রীতি ভিন্ন আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। কেবল হাসিতে নহে, ত্রিবেদী মহাশয়ের সকল ক্রিয়াকলাপে এইরূপ একটি অশরীরী লোকের আভাস পাওয়া যাইত। আমার বেশ মনে পড়ে, আজ দুই বৎসর হইবে, সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে ভীষণ বাকবিতণ্ডা হইবার পর এক দল লোক সক্রোধে পরিষৎ মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ত্রিবেদী মহাশয় কিন্তু ইহাতে একটুও বিচলিত হন নাই। তিনি যে নিত্য-বুদ্ধ শুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্যের উপাসক ছিলেন, সেই চৈতন্যের ন্যায় তিনিও নির্বিকার নির্বিকল্পভাবে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে কিছু যে সে দিন ঘটিয়াছে, তাহা একেবারেই বোধ হইতেছিল না।

তাঁহার দেহ অত্যন্ত দুর্বল হইলেও, মনের জোর খুব বেশি ছিল। তাঁহার মত তিনি

হঠাৎ ব্যক্ত করিতেন না, কিন্তু যখন করিতেন, তখন খুব দৃঢ়তার সহিত করিতেন এবং খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মতকে পোষণ করিতেন। কিন্তু ইহা দ্বারা আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একগুঁয়েভাবে তিনি কোনো মতকে ধরিয়া থাকিতেন। বয়সের ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার মতেরও ক্রমিক পরিবর্তন ও পুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। দেহ যতদিন সজীব থাকে, ততদিন যেমন বাহিরের পরিবর্তনের সহিত নিজের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে, সেইরূপ মানুষের বুদ্ধিও যত দিন সজীব থাকে, ততদিন তাহাও বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের সহিত নিজের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ত্রিবেদী মহাশয়ের মন নূতন সত্য গ্রহণ ও তাহাকে আয়ত্ত করিতে অসাধারণ পটু ছিল। আমার নিকট তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন যে, ফরাসি দার্শনিক বের্গসঁর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ কয় বৎসর অসাধারণ যত্নের সহিত বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নের ফল আমরা তাঁহার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ কর্মকথা, বিচিত্র-প্রসঙ্গ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত প্রবন্ধাবলিতে দেখিতে পাই।

রামেন্দ্রবাবু সম্পূর্ণরূপে নিরহংকার ছিলেন। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া থাকিতেন। কখনও তাঁহার মুখে তাঁহার নিজের কীর্তির সম্বন্ধে কোনও কথা শুনিতে পাই নাই। পরের যদি কোনও গুণ দেখিতেন, অথবা কোনও সৎকার্যের খবর পাইতেন, তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহা সাধারণের গোচর করিতেন। নিজের বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত করিতেন। তিনি যে কখনও কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের মনেই হইত না, অন্যের নিকট তাহা বলা তো দূরের কথা। আমার এই সংস্রবে একটি ঘটনা পড়িয়া গেল। আজ নয় বৎসর হইল, আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া জার্মানির কোনও দার্শনিক পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করি। প্রেরণ করিবার পূর্বে ত্রিবেদী মহাশয়কে অনুবাদটি একবার দেখাই, এবং তাঁহার মত লই। তিনি তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে দুই এক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম ঃ

'আমার প্রবন্ধ যে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই...স্বদেশের ও বিদেশের আচার্যগণের নিকট যাহা শিখিয়াছি, তাহাই কথঞ্চিৎ সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আমার আর কোনও দুরাকাঙ্ক্ষা কখনও ছিল না। রচনাগুলির মধ্যে আমার বিশেষ কৃতিত্ব আছে বলিয়া কখনও কোনও স্পর্দ্ধা আমার মনে উপস্থিত হয় নাই; কোনও নূতন কথা কখনও বলিয়াছি বলিয়াও ধারণা জন্মে নাই।'

ইহা অপেক্ষা অহংকারশূন্যতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আর কী হইতে পারে? অহংকারকে তিনি যেমন দমন করিয়াছিলেন অন্যান্য রিপুগুলিকেও তিনি সেইরূপ নাশ করিয়াছিলেন। ক্রোধ তাঁহার একেবারেই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যতই বিরক্তিকর ব্যাপার তাঁহার ঘাড়ে পড়ুক না কেন, তিনি কখনও ধৈর্যচ্যুত হইতেন না। এ বিষয়ে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল—তাঁহার হাসি। তাঁহার সহাস্য বদনের সম্মুখে বিরক্তি যেন আসিতেই সাহস পাইত না।

এই সকল কারণে মনে হয় যে, তিনি গীতার আদর্শ পুরুষ ছিলেন—

'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মহো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।'

কিন্তু গীতার এই আদর্শ মনে করিলে আমাদের যেরূপ কর্কশ কঠোর লোকের চিত্র মানসচক্ষুতে উদিত হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের অন্তরে সেরূপ কর্কশতা, সেরূপ নির্ম্মমতা আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। রামেন্দ্রবাবুর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল। পরের দুঃখ তিনি একেবারেই সহিতে পারিতেন না। বঙ্গসাহিত্যের অক্লান্ত সেবক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা ব্যোমকেশ মুস্তফীর মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে শোকে বিহ্বল হইতে দেখিয়াছি। ত্রিবেদী মহাশয়ের ভিতরে কঠোরতার লেশমাত্র ছিল না।

বাস্তবিক ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাব একেবারে মধু-ঢালা ছিল। এই জন্যই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সংবর্ধনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন,—'তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, তোমার সকলই সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে অভিবাদন করি।' সেকালের আর্য-ঋষিগণ সমস্ত পৃথিবীকে মধুময় দেখিতেন। 'ইয়ং পৃথিবী সর্বেবসাং ভূতানাং মধু। অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।' ত্রিবেদী মহাশয় আর্যদিগের উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। তিনি নিজে মধু ছিলেন, এবং সমস্ত জগৎটাকে মধুময় দেখিতেন। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়া থাকিত।

এইবার ত্রিবেদী মহাশয়ের বাল্যজীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ১২৭১ সালের ৫ ভাদ্র জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ-বংশে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী চরিত্রগুণে ও পাণ্ডিত্যে সে অঞ্চলের একজন শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-পাঠশালায় ভরতি হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রবত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে তিনি কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভরতি হন। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কয়েক মাস পূর্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ২৫ টাকা বৃত্তি পান। পরে তাঁহার খুল্লতাতের সহিত কলকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হন। ১৮৮৬ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে প্রথম শ্রেণির অনার্স পান, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক পেডলার সাহেব এই পরীক্ষায় রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি রামেন্দ্রবাবুর কাগজ সম্বন্ধে বলেন, 'আমি এ পর্যন্ত রসায়নের যত কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে উহাই 'out and out the best'। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদার্থবিদ্যায় এম-এ পরীক্ষা দেন, এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে কিছু দিন প্রেসিডেন্সি কলেজ ল্যাবরেটারিতে বিজ্ঞানচর্চা করিবার পর রিপন কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপকতা গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহা কর্মজীবনের আরম্ভ।

রামেন্দ্রবাবুর কর্মজীবনের কথা বলিলেই, সর্বাগ্রে সাহিত্য-পরিষদের নাম মনে পড়ে। সাহিত্য-পরিষদটি ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে-গড়া জিনিস। ইহার জন্য তিনি চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং ইহার ফল আমরা সাহিত্য-পরিষদের সুন্দর ভবনে ও বহুবিস্তৃত কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ করিতেছি। অবশ্য আমার বলা উদ্দেশ্য নহে যে, একমাত্র ত্রিবেদী মহাশয়ই সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টিকর্তা। এ কথা বলিলে যে সকল মহাত্মা তাঁহাদের অর্থ, বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা সাহিত্য-পরিষদকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তবে ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগ ও অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ কিছুতেই তাহার বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তিনি সাত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তাহা

ছাড়া, কয়েক বৎসর উহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সাত দিন পূর্বে তিনি উহার সভাপতি মনোনীত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম দুর্ভাগ্য যে, প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের যে বিশেষ উন্নতি হইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রিপন কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্রিবেদী মহাশয়ের কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইবার অল্পদিন পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত বরাবর চলিয়াছিল। প্রথমে তিনি অধ্যাপকভাবে এবং পরে অধ্যক্ষ হিসাবে রিপন কলেজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। এরূপ এক কলেজে জীবনের সমস্তটা যাপনের উদাহরণ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপন কলেজে ঢুকিবার পূর্বে তাঁহার গবর্মেন্টের চাকরি পাইবার একবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। কেন তিনি গবর্মেন্টের চাকরি লন নাই, সে সম্বন্ধে তিনি একদিন আমার নিকট বড় মজার গল্প করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাইবার অব্যবহিত পরেই ত্রিবেদী মহাশয় গবর্মেন্টের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরির জন্য ডিরেকটারের নিকট আবেদন করেন। তাহার ফলে ডিরেক্টার তাঁহাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বলেন। নিয়মিত সময়ে ত্রিবেদী মহাশয় ডিরেক্টরের অফিসে উপস্থিত হন এবং চাপরাশির দ্বারা কার্ড পাঠাইয়া দেন। কার্ডটি ডিরেক্টারের নিকট লইয়া যাইবার সময় চাপরাশিটি তাঁহার নিকট বকশিশ চাহে। ইহাতে ত্রিবেদী মহাশয় এত বিরক্ত হইয়া যান যে, তিনি ভাবেন, 'দূর ছাই, গবর্মেন্টের চাকরি, যাহার গোড়াতেই এই রকম, তাহার পরে না জানি কতরকম গোলমাল।' এই ভাবিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিলেন, আর ডিরেক্টারের সহিত দেখা করিলেন না। এই ঘটনা হইতে ত্রিবেদী মহাশয়ের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও প্রকার বক্র মার্গ দ্বারা কোনওরকম সুবিধা পাইবার চেষ্টা করা, তিনি যে মতে জীবন গড়িয়াছিলেন, সে মতের বিরুদ্ধ ছিল। সরল সহজ পথে চলিয়া যতটা সাংসারিক উন্নতি সম্ভব তাহার বাহিরে অন্য কোনও প্রকার সুবিধার চেষ্টা করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি নিজে যেমন কোনও প্রকার কুটিল মার্গ পছন্দ করিতেন না, অন্যকেও তিনি তেমনই কোনও প্রকার কুটিলতা অবলম্বন করিতেও প্রশ্রয় দিতেন না। কোনও প্রকার তোষামোদ বা অনুরোধ-উপরোধ তিনি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার অধ্যক্ষতায় রিপন কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই নিজ নিজ কার্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপ্যালকে খোশামোদ বা তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।

কেহ তাঁহার বাড়িতে গিয়া কোনও অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন, 'এ কথা তো আমাকে কলেজেই বলিতে পারিতেন, এত কষ্ট করিয়া বাড়িতে আসার কী দরকার ছিল?' তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন, এবং সর্বদা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের ও চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের মধ্যে এরূপ মধুর সম্বন্ধ বড় কম দেখিতে পাওয়া যায়। রিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রামেন্দ্রবাবু 'বাগর্থাবিবসম্পৃক্ত' ছিলেন। ক্ষেত্রবাবু এক দিন আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে, রামেন্দ্রবাবুর উৎসাহ ব্যতীত তিনি কখনও কিছু লিখিতে পারিতেন না। তাঁহার অকালমৃত্যুতে ত্রিবেদী মহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের কর্মজীবনের কথা বলিতে গেলে, তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রে কর্মের কথা না বলিয়া পারা যায় না। কেন না, সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ-সাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ—একথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোন-কোন বিষয়ে বঙ্গসাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়? ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিংককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমান্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউস্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাংলা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস-বিভাগে রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাংলায় যে কীরূপ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ বাংলাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্বে অনেক রচিত হইয়াছে; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি বলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মতো নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটেন! Aristotle এই জন্য দর্শন শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics, অর্থাৎ—যাহা Physics-এর মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জার্মান ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে Nachdenken বলে (অর্থাৎ Denken বা বস্তু-চিন্তার পর যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই Nachdenken' অর্থাৎ—এ চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্যগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থাকেন, 'কীরূপ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্তব্য?' 'প্রকৃতি' শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পুরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই জায়গায় যেন ভাটার টানের আভাস পাওয়া যায়৷ 'জ্ঞানের সীমানা' ও 'প্রকৃতির মূর্তি' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খটকা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি-বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম; বুঝি-বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাশ্যের বিরাট শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। এই খটকা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপত্তি। যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত্যকে খুঁজিতে হইবে? জিজ্ঞাসার প্রথম প্রবন্ধ 'সত্য'তে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শন মাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরর সহিত তুলনায়, সর্বের তুলনায়, ভূয়ঃ ও বহু নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্তমান নিয়ম কাল ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটি বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক

সত্য, জীবনযাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ, এবং রিপন কলেজে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যেসকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখানো হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোনও সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন,—

'আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোনও সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমাদের অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।'

ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যবহারিক বা Pragmatic সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য Absolute Truth।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি', ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কী? আমি কখনও পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্ধ্বে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত স্তব্ধভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনো হাসিতেছি, কখনো কাঁদিতেছি, সর্বদাই বিচলিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্বিকার শান্ত শুদ্ধস্বভাব। প্রথম 'আমি'-কে জীবাত্মা বা Phenomenal self এবং দ্বিতীয় 'আমি'-কে পরমাত্মা বা Transcendental self বলা যায়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলত একই। যে আমি পরমাত্মা, সেই আমি আবার জীবাত্মা; ইহা Kant-ও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্বে আর্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক Technicalities লইয়া বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'আমি' থাকিলেই তো হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর ঋগ্বেদে আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ' আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ—ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতেই তাহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া নিজেকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই আমার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধ।

এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজেকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে।

'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ'; 'যজ্ঞেন যজ্ঞমজয়ন্ত দেবাঃ'— সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সম্বন্ধ।

এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—

'এই বিশ্ব ব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—

যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ তখন সে যে কর্ম-ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।'

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য বস্তুই যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই সকল ভোগ্যবস্তুরই—যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভোগের কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার কর্মকথার 'যজ্ঞ'-শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।'

পৃথিবীর যাবতীয় কর্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ—ত্যাগাত্মক—ইহা দেখানো ও বোঝানোই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কৰ্ম্মকথা' গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কী, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্মই ত্যাগ, অর্থাৎ—তাহা Ethical, আবার কর্মমাত্রই ঋত, অর্থাৎ—Cosmic process. কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারেই নৈতিক (Ethical), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলত এক। 'ধর্ম্মের জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটি ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

'যে নিয়মিত সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাস্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎকর্মে ও অসৎকর্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যিশুকে ক্রুশে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।'

এইখানে একটু খটকা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি Morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে, এই সাংসারিক বা ব্যবহারিক জীবনের Morals-এর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম এই প্রাতিভাসিক বা Intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতিদিনের মেশামেশি, প্রতিদিনের মাখামাখির সম্বন্ধ। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয় প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কাররূপে নির্দেশ করিবার পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

ত্রিবেদী মহাশয়ের দার্শনিক মত লইয়া এত কথা বলিলাম বলিয়া মনে করিবেন না যে, তিনি কেবল দর্শন লইয়াই থাকিতেন। বিজ্ঞানে তাঁহার কত দূর প্রবেশ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বেই দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক পু৺ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ পর্যন্ত লেখা হয় নাই। কীরূপে যে হিন্দুর আচার-ব্যবহার কালের সহিত ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাকদেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা তাহার সহিত গ্রিক ও খ্রিস্টীয় Doctrine of Logos-এর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটি রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং তাহা হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রিকরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল, এবং পরে তাহা প্যালেস্টাইনের খ্রিস্টানদিগকে দেয়। এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা খ্রিস্টানরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল, তাহা এবং খ্রিস্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। কৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। আবার এদিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে গাভী রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে গো-শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা—ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক, ভারতী প্রভৃতি এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতির্বাঙ্‌নামানি।' এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক=গো=ব্রহ্ম, এই জন্যই হিন্দুধর্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। সময়াভাবে সেগুলির উল্লেখ করিতে পারিলাম না। যে দুইটির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কীরূপ গভীর ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না, সন্দেহ। কোনও-কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlain-এর Foundation of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlain-এর পুস্তকে ইউরোপের Culture history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশি Dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু Dogmatic ভাবের লেশমাত্র নেই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাংলার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বনি-বিচার' নামক

প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাংলা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার, কেহ কখনও এ পর্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টার মূলেও ত্রিবেদী মহাশয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানত রামেন্দ্রবাবুরই চেষ্টা।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। ত্রিবেদী মহাশয় অসাধারণ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাঁহার স্বদেশপ্রেম কখনও ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্যে বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তিনি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় কখনও চিঠিপত্র লিখিতেন না; ধুতি-চাদরও কখনও ছাড়িতেন না। শুনিয়াছি, প্রথম জীবনে কলেজে চোগা চাপকান পরিয়া যাইতেন, কিন্তু পরে ধুতি-চাদর ভিন্ন অন্য কোনও বেশ তাঁহার দেখা যাইত না। বাহিরেও যেরূপ ভিতরেও সেইরূপ, তিনি খাঁটি স্বদেশি ছিলেন। তিনি বিদেশির যাহা ভালো, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু কখনও চোখ বুজিয়া বিদেশির অনুকরণ করিতেন না। সে দিন অপর একটি স্মৃতিসভায় একজন বক্তা বলিয়াছিলেন, —ত্রিবেদী মহাশয় কখনও বিশ্বাস করিতেন না যে ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সম্মুখে 'Intellectual Orpahan' হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই বক্তার ভাষায় বলিতে হয়, আমরা 'Intellectual Orpahan' নহি। আমাদের নিজের বুদ্ধি, নিজের ভাষা আছে। আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও সমগ্র জগতকে জ্ঞান বিতরণ করিতে পারে, আমাদের ভক্তিসিন্ধু এখনো জগতের সমগ্র ভক্তবৃন্দকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিতে পারে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

উত্তররাঢ়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয় সন ১২৭১, ৫ ভাদ্র শনিবার। সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত রামেন্দ্র রচনাবলির ষষ্ঠ খণ্ডে যে আত্মকথার বিবৃতি আছে তাতে পড়ি, এই ত্রিবেদী-পরিবার হয়তো দুশো বছরের কিছু আগে বাংলায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের সঙ্গে কয়েকজন যুদ্ধজীবী ঝিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। পাঠান বিদ্রোহের সময় তাদের দলপতি ও জেমো রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ সবিতা রায় যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে মানসিংহের প্রশংসা এবং শেষে বাদসাশি সনদ ও জায়গির জোগাড় করে বাংলা দেশেই রয়ে গেলেন। ত্রিবেদীর পূর্বপুরুষ এই পরিবারে বিবাহ করেন এবং সেই সময় থেকেই নানা ঘটনা ও অঘটনের মধ্যে এই দুই পরিবারের নিকট সম্পর্ক বজায় আছে। পরিবারের ইতিহাস, পুরোনো পুঁথি ও কাগজপত্র থেকে উদ্ধার করেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর নিজে। ত্রিবেদী পরিবারে লেখাপড়ার আদর ছিল। একশো বছর আগেই এঁরা হয়ে গিয়েছিলেন মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি। অবশ্য আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পার্থক্য এঁরা বরাবরই রেখে এসেছেন। তবে আমরা জানি, রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা নিজে বাংলায় উপন্যাস রচনা করেছিলেন— যাত্রাগান ভালোবাসতেন ও গ্রামের নানা কাজে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত হত। সংস্কৃত শাস্ত্রেরও অনুশীলন ছিল এই বংশে। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাপড়া শুরু হল গ্রামের পাঠশালায়। পিতা গোবিন্দসুন্দর চাইতেন ছেলে যেন সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে পারে। শেষ অবধি স্বচক্ষে না দেখে গেলেও পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। ছাত্রবৃত্তি থেকে শুরু করে প্রায় সব পরীক্ষায় প্রথম হতেন রামেন্দ্রসুন্দর। কান্দি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হলেন। পিতা তখন দেহরক্ষা করেছেন। পিতৃব্যের সঙ্গে এসে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হলেন (১৮৮১)। স্কুল থেকেই পড়তে শুরু করেছেন নানা বই—সাহিত্য ও ইতিহাসে ঝোঁক বেশি—কলকাতায় প্রথম দুই বছর মন ঠিক বাঁধা গণ্ডির ভিতর থাকতে চাইল না। সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চা একটু বেশি করেই হল, ফলে পাঠ্যপুস্তকে অবহেলার দরুণ ফাস্ট আর্টস (১৮৮৩) পরীক্ষায় এক প্লেস নেমে গেলেন। কিন্তু বিএ-তে অনার্স নিলেন বিজ্ঞানে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন পেডলার সাহেবের রাজত্ব। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেলেন তাঁর কাছে রামেন্দ্রসুন্দর। এ দেশে দীর্ঘ অধ্যাপনার কালে রামেন্দ্রের মতো তীক্ষ্ণধী ছাত্র তিনি কখন পাননি।

সাহেব খুব উৎসাহ দিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর সম্মানের সঙ্গে উতরে গেলেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষাই—বিএ (১৮৮৬), এমএ (১৮৮৭), প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৮৮৮)। ছেলেবেলা থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বাস্থ্য খারাপ চলছিল—অজীর্ণ রোগই প্রবল। আবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় অন্য প্রতিভাধর ছাত্রদের (তাঁদের মধ্যে রায়বাহাদুর অবিনাশ বসু ছিলেন) সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের স্থান বজায় রাখতে পরিশ্রম করে ফেললেন প্রচুর—ফল শিরঃপীড়া। শেষ জীবনে এটি তাঁর অনেক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেবার (রায়বাহাদুর) অবিনাশ বসু ছিলেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। শেষ অবধি দুই জনই পেলেন বৃত্তি আর পুরা ৮০০০ হাজার টাকা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বরাবরই ভাব—যে দিন খবর বের হল, সে দিন দুই বন্ধুতে বাঘবন্দি খেলছিলেন (ধীরেন্দ্রনারায়ণের সাক্ষ্য)। এর পরে দুই বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিনা বেতনে বিজ্ঞান-চর্চা করবার সুযোগ পান। আবার শ্বশুর ও গুরুজনের বিশেষ ইচ্ছা, তিনি আইন পাশ করে স্বাধীন ব্যবসায় ওকালতিতে যোগ দেন। কিছুদিন আইনের বই উলটেপালটে দেখে রামেন্দ্রসুন্দর কিছুতেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন না। তখনও কি বাংলায়, কি ভারতে, কোথাও বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা শুরু হয়নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্য ১৮৮৯ সালেই প্রেসিডেন্সিতে রসায়ন বিভাগে যোগ দিয়েছেন। এই লাজুক লোকটিকে কেউ তখন আমল দিত না। ব্যাবসা-বাণিজ্যে বিজ্ঞানকে ফলবতী করা যায় কি না, তারই চেষ্টা করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র। অবশ্য Mercurous Nitrite-এর গবেষণা হয়তো তখনই হত কলেজে, তবে সেসব কথা প্রকাশ হল ১৮৯৬ সালে। (J. R. A. S.) পদার্থবিদ্যা বিভাগেও জগদীশচন্দ্র কাজ করেছেন—তবে ১৮৯৪ সালে যশস্বী হলেন ও কাগজে নাম বের হল। সকলের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরও খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। পেডলার সাহেব নাকি তার আগে বাঙালির মস্তিষ্কে বিজ্ঞানের চাষ ফলল না বলে দুঃখ করেছিলেন (এশিয়াটিক সোসাইটির সভায়)। কাজেই ১৮৮৮ সালে বিজ্ঞানের ঝোঁক জীববিদ্যা অনুশীলন করে মেটাতেন রামেন্দ্রসুন্দর। কৌটার মধ্যে সঞ্চিত থাকত গুটিপোকা, শুঁয়োপোকা। এরা দেহকে আবরণীতে বেষ্টন করে গুটি বাঁধে, শেষে খোলস কেটে কীরূপে সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়—আবার কী করে প্রজাপতিরা অণ্ড প্রসব করে—সেসব বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিজে দেখেছেন ও সঙ্গীদের দেখাচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় হাতে কলমে কাজ হয়তো রামেন্দ্রসুন্দরের প্রিয় ছিল না। এদিকে পিতা ও পিতৃব্য-বিয়োগ তাঁর ছাত্রাবস্থায়ই ঘটেছিল। বিষয়কর্মের পরিচালনায় অনেক বিশৃঙ্খলা এসেছিল। তাই দেখি, রামেন্দ্রসুন্দর জেমোতে রয়েছেন। বিষয়কর্মের জন্যে পরিশ্রম করে যে সব কর্তব্য বাকি পড়েছিল, তা সম্পন্ন করে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন এবং সে জন্যে মাঝে-মাঝে কলকাতায় এসে কিছু দিন (?) কাটিয়ে যান। বাংলার বাইরে বিদেশে যাবার এই সময় ডাক এসেছিল। অন্য কাজ-পাগল বিজ্ঞানীর কাছে তার আহ্বান ফিরিয়ে দেওয়া শক্ত হত। মহীশূর কলেজের অধ্যক্ষ ও তথাকার মানমন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের পদ খালি হয়েছিল। পেডলার সাহেব প্রিয় ছাত্রকে এই কাজ নিতে পরামর্শ দিলেন—অনেক বুঝালেন। দেশে থেকে দূরে যেতে রামেন্দ্র নারাজ। কাজেই সাহেবের নানা নির্বন্ধ কাটিয়ে দেশের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। এমনকি, প্রেসিডেন্সি

কলেজের সরকারি চাকরিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলে শোনা যায়। (আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর')। কারণ তাহলে সরকারি নিয়মে তাঁকে দূরে কলকাতার বাইরে যেতে হতে পারত।

ডাঃ শিশির মৈত্রেয় (দার্শনিক) অন্য এক কারণের অবশ্য উল্লেখ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের নাকি ডাক পড়েছিল ডি. পি. আই-এর সঙ্গে দেখা করবার। সেখানকার খাস পেয়াদা নাকি দেখা করবার আগেই বকশিশের জন্যে হাত পাতে। তাই এই পঙ্কিল পথে নামতে তাঁর প্রবৃত্তি হল না। তাই মাঝে-মাঝে কলকাতায় আসতেন ও বেশির ভাগ সময় নিজের তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পড়া শুরু করলেন বিভিন্ন পুস্তক—ইতিহাস, দেশ-বিদেশের কথা, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, জেমসের মরমি দর্শন, ব্যার্গস, আবার সংস্কৃত শাস্ত্রের কাব্য, দর্শন, অন্বয়বাদ, বৌদ্ধসাহিত্য ও শেষ অবধি বেদপন্থীদের আচারের নির্দেশক নিকষ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করবার ঝোঁক প্রথম থেকেই ছিল। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি' অক্ষয় সরকারের 'নবজীবনে' ছাপা হয় (১৮৮৩)। রামেন্দ্রসুন্দর তখনই দেখছেন "বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য —যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানব মনের বিকাশে, সমাজ শরীরের বিবর্তনে—যেখানে যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই গতি ও সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় উৎপন্ন।"

শেষ অবধি রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন। বিবাহ হয়েছিল ১৪ বছরে—১২৮৫, ২২।২৩ বৈশাখ। বি. এ. পরীক্ষার সময় প্রথম সন্তান হল কন্যা চঞ্চলা। রিপন কলেজে এলেন (১৮৯২)। এর কিছু আগে শ্বশুর নরেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে ১২৯৮ সালের ভাদ্রমাসে চিরশান্তি লাভ করেন। রাজবাটীর বিষয়কর্ম রাজার দুই ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসলেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর দুর্গাদাস এল ও কলকাতায় হেয়ার স্কুলে পড়া শুরু করল। দাদার সংসারের প্রায় অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। এখানে রামেন্দ্র প্রথমেই পেলেন ৩-৪ জন নিকট বন্ধু, যাঁরা তাঁর সাহিত্য সেবায় প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত, বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহাসিক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ললিতবাবু প্রথমে রিপন কলেজেই অধ্যাপনা করিতেন ও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিবেশী ছিলেন অখিল মিস্ত্রি লেনে। বাড়িতে-বাড়িতে সাহিত্যালোচনার বৈঠক বসত। ললিতবাবু অনেক সময় নিজের নতুন লেখা পড়ে রামেন্দ্রকে শোনাতেন।

সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ১৮৯৪ সালের ২৯ জুলাই রামেন্দ্রসুন্দর সর্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্বাচিত হন। এটি তাঁর জীবনে একটি মুখ্য ঘটনা—তাঁর সাধনার দিক নির্ণয় হয়ে গেল। এতদিন নানা সাময়িকীতে প্রবন্ধ লিখে শিক্ষানবিশি চলছিল। এখন থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায়। ১৩০১ সালে শাখা সমিতির সভ্য হয়েছেন ও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও প্রণয়নের কাজ শুরু

করেছেন। পরিভাষা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপা হতে লাগল। তারপর পরিষদের নানা কাজে তাঁকে ব্যাপৃত থাকতে দেখি। কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হলেন, সম্পাদনাও করেছেন কয়েক বছর। প্রথমে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়িতেই সাহিত্যসভা বসত—তার পরে অনেকে ভাবলেন পরিষদের স্বতন্ত্র আড্ডা থাকা উচিত—এঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন। তাই ১৩৭।১ কর্নয়ালিশ স্ট্রিটে ভাড়াটিয়া বাড়িতে উঠে এল পরিষদের অফিস। তখন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদে সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে বদ্ধ-পরিকর হলেন। এখানে ব্যোমকেশ মুস্তফী তাঁর প্রধান সহায়। কলেজে থেকে প্রত্যহ বিকেলে চলে আসেন সাহিত্য পরিষদে। সংসার দেখছে ছোট ভাই। পত্নী ও নাতি। তাঁর এই সাধনা নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছে—এ যেন ঘরের বাইরে অপর পক্ষ! পরিষদের নিজের বাড়ি হবার কল্পনা রামেন্দ্রকে পেয়ে বসল। (১৩০৫) কাশিম-বাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী জমি দিলেন। চাঁদা সংগ্রহের আবেদন বের হল। শেষ অবধি ১৩১৫ সালের ২৯ অগ্রহায়ণ, রবিবার পরিষদের নিজের বাড়িতে প্রথম সভা বসল। তারপর ধীরহস্তে পরিষদকে নানা গঠনমূলক কাজে নিয়ে গেলেন। অনেক সময় বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূল মতামতের সামনে রামেন্দ্রসুন্দরকে পড়তে হত। তবু সে সময়ে বহু শুভকার্যের পত্তন হয়েছিল। দেখছি—পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন—প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি। সন ১৩২১, ৫ ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। তাঁর সংবর্ধনার জন্যে পরিষদ সভার আয়োজন করলেন। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অভিনন্দন পাঠ করলেন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে লিখলেন, 'যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধনসম্পদ ও যশঃ উপার্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যমণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।" তারপর রবীন্দ্রনাথও একটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তাতে লিখলেন, "তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।***

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দুর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।" শেষের দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "রামেন্দ্রকে আমি ভালোবাসি তাহার স্বভাবগুণে, তাহার রচনানৈপুণ্যে, তাহার আদর্শ চরিত্রগুণে। সাহিত্য পবিষদের কেরানিগিরিতে ঢুকিয়া সে নিজের সর্বনাশ করিয়াছে, সে যদি পরিষদের কাজে এত সময় না দিত তাহা হইলে তাহার "জিজ্ঞাসা"-র মতো, "প্রকৃতি"-র মতো, "কর্মকথা"-র মতো, বিচিত্র প্রসঙ্গে'র মতো তাহার আরও কত বিচিত্র রচনা যে আমাদের মাতৃভাষার

দেহ অলংকৃত করিতে পারিত তাহাতে আর ভুল নাই! তবে সে না থাকিলে হয়তো পরিষদই হইত না।" দুঃখের কথা, এই জনসংবর্ধনার পর রামেন্দ্রসুন্দর বেশি দিন এই গঠনমূলক কার্য চালাতে পারেননি। ১৩২৬ সালে ১৮ জ্যৈষ্ঠ সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সর্বজনমান্য সভাপতির পদে নির্বাচন করল। কিন্তু তার ছয় দিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পরলোক গমন করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর স্বেচ্ছায় রিপন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন ১৮৯২ সালে। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি ওইখানেই থেকে গেলেন। জিজ্ঞাসু মন বুঝতে চায়—দিনের পর দিন এই আত্মাহুতি থেকে তিনি চিত্তসন্তুষ্টির কী পাথেয় সংগ্রহ করতেন! অথবা সত্যই কি তাঁর এই নির্বাচনের দ্বারা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যই সূচিত হচ্ছে—যেখানে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যকে আমরা কোনও যোগ্যতর পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না। রামেন্দ্রসুন্দর যখন রিপন কলেজে ঢুকলেন—তখন কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪৫০।৫০০ মাত্র এবং অধ্যাপকের সংখ্যা দশ-বারো জনের অধিক নয়।

অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ; যেমন—অধ্যক্ষ কৃষ্ণকমলবাবু, জানকীবাবু, ক্ষেত্রমোহনবাবু, ললিতবাবু প্রভৃতি। তবে বিজ্ঞানের কোনও উচ্চাঙ্গের শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল না এই কলেজে। ১৯০৪-০৫ সালে একবার বিএসসি শ্রেণি খোলবার চেষ্টা হল। পরিদর্শকরূপে এলেন ভাইস-চ্যান্সেলার পেডলার সাহেব। রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্রাবস্থায় তাঁকে বিজ্ঞান পড়তে অনেক উৎসাহ দিতেন তিনিই। এসে কলেজের কারুশাল (Laboratory) ও পুস্তাকাগারের দৈন্য দেখে দুঃখ প্রকাশ করাতে কলেজের কর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—'রামেন্দ্রনাথের বাড়িতে বিজ্ঞানের বহু পুস্তক আছে, তাহা হইতে কলেজ সাহায্য পায়'; এ কথাটি সাহেবের মনঃপূত হল না। তিনি উত্তর করলেন—রামেন্দ্রবাবু তো রিপন কলেজ নন। পেডলার সাহেব রাজি হলেন না, ফলে সেবার বিএসসি ক্লাসও খোলা হল না। আবার ১৯০৫ সালের আগে এই কলেজের কোনো পরিচালক সমিতি ছিল না—সুরেন্দ্রনাথই সর্বেসর্বা। পরে ১৯০৫ সালে অবশ্য হল। ১৯০৭ সালে নতুন নিয়মের আইএসসি শ্রেণি খুলতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে, কারুশালা তৈরি ও অন্যান্য বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক পরিচালনা করতে হয়। ইতিমধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য পদত্যাগ করেছেন ও রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষতা করেছেন। সায়েন্সেও যেমন, আইন বিভাগেও প্রায় তাই। সার আশুতোষ বললেন—এই বিভাগ তুলে দিন, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর রাজি নন। ১৯০৮ সালে ডিরেক্টর কুকলার বলছেন—'সিন্ডিকেট কলেজ উঠাইতে চায়—আমি কলেজ পরিদর্শন করিয়া খুশি হইলাম। কলেজের সবই ভালো, কিন্তু লাইব্রেরির অবস্থা অতি হীন। লাইব্রেরিতে কেন Law Reports গ্রহণ করা হয় না।' অবশ্য তবুও আইন বিভাগ টিকে গেল। দয়ালু লাটসাহেব Law Reports-এর বন্দোবস্ত করে দিলেন। এদিকে স্বদেশি যুগ এসে পড়ল। কলকাতার বেসরকারি কলেজে ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। সরকারি আনুকূল্যে রিপন কলেজের নতুন নতুন বাড়ি উঠল। ছাত্র-সংখ্যা বেড়ে ৫০০ থেকে হল ১২০০। ১৯০৫

সালে কলেজ বিএসসি শ্রেণি খোলবার অনুমতি পায়নি। অধ্যক্ষ ত্রিবেদী তখন বিএ ক্লাসে রসায়ন পড়াতেন। শেষে যখন ১৯১৫ সালে বিএসসি শ্রেণি খোলবার অনুমতি মিলল—তখন রসায়নের অধ্যাপনা অন্যের হস্তে অর্পণ করে স্বয়ং পদার্থবিদ্যা পড়াতে আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর (তখন বোধহয় এই বিষয়ে অনার্স পড়াবার অনুমতি ছিল না) এবং জীবনের শেষ দিন (১৯১৯) পর্যন্ত এটিই তাঁর অধ্যাপনার বিষয় ছিল। সত্যসত্যই রিপন কলেজের অধ্যাপনার মঞ্চই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের পক্ষে প্রধান পরীক্ষাগার। কারুশালে হাতেকলমে করে দেখাতে বোধহয় তাঁর বেশি উৎসাহ ছিল না। তবে বহুদিন থেকে তিনি বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদে পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

নিজে সংগ্রহ ও উদ্ভাবন করে ছাপিয়েছিলেন ভৌগোলিক পরিভাষা (১৩০৬)। শারীরবিজ্ঞানের পরিভাষা সংগ্রহ করেছিলেন ব্রাহ্মণ সংহিতা, শ্রৌতসূত্র ইত্যাদি থেকে। বৈদ্যক পরিভাষা ও রাসায়নিক পরিভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ 'শব্দ-কথা' (রচনাবলিতে) দেখতে পাই। নিজে যে কঠোর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিষয় সরল বাংলায় ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন, তার খবর পাই তাঁর অভিভাষণে কলিকাতায় টাউন হলে। ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র বিজ্ঞান সভার সভাপতিরূপে তিনি বলেছেন—''অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাংলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন, তাহা হইলে আমার মতো অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না। হয়তো ইংরেজি ভাষায় অজ্ঞতা আমার এই দুষ্প্রবৃত্তির মূল কারণ।*** কারণ যাহাই হউক আমি এই পাপের বোঝা, চিরজীবন মাথায় বহিতেছি। কিন্তু সে জন্য অধ্যাপনা কার্যে যে ব্যাঘাত অনুভব করিয়াছি তাহা সহজে স্বীকার করিব না। পদার্থবিদ্যায় বাংলা পারিভাষিক শব্দের একান্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি (তবে) অধ্যাপনার সময়ে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের বাংলা অনুবাদ যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাও বোধ করি না। পারিভাষিক শব্দগুলি ইংরেজি রাখিয়া ও সাংকেতিক চিহ্নগুলি ইংরাজি রাখিয়াই আর সমস্ত কথা বাংলায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। কোন স্থানে ঠেকিতে বা ঠকিতে হয় না। এই ধারণা আমার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।*** পদার্থবিদ্যায় যে সকল তত্ত্ব ছাত্রদের নিকট নিতান্ত দুরূহ বলিয়া বোধহয়, আমার এই অপরূপ ভাষার আশ্রয়েও তাহা ছাত্রদের বোধগম্য করিতে কখনও কষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পদার্থবিদ্যার অঙ্কগুলির বিকট মূর্তি ছাত্রদিগের মনে কীরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী ছাত্র মাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি সহজ বাংলায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রদের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায়; এমনকী তাদের মনের ভিতর যে একটা আনন্দের সঞ্চার হয় তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি।*** রসায়ন শাস্ত্রের বিবিধ মৌলিক ও যৌগিক দ্রব্যের পারিভাষিক নামগুলা এবং তাদের গঠন-বিজ্ঞাপন সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলা ইংরেজি রাখিব, কি বাংলায় ভাষান্তরিত করিব, তাহা লইয়া একটা বিবাদ বহুকাল হইতে চলিত আছে। সেই বিবাদটা মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু সেই বিবাদের নিষ্পত্তি পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা—ইংরেজি ভাষায় যাহাদের দখল নাই, তাহারা রসায়নের

রসাস্বাদনে যে একেবারে বঞ্চিত থাকিবে ইহা উচিত নয়।" রামেন্দ্রসুন্দর এভাবে একরকম সারাজীবন অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা দ্বিধাহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এজন্যে বাংলার চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরা সকলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। এই অভিভাষণের অন্য স্থানে তিনি বলেছেন—"বাংলা সাহিত্যের বিজ্ঞান বিভাগের দারিদ্র্যমোচন আপনারাই করিতে পারেন। ইহা আপনাদের কর্তব্য মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া উচিত। পারিভাষিক শব্দের অভাব এই বিষয়ে অন্তরায় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। যিনি শ্রদ্ধার সহিত মাতৃভাষার সেবাকার্যে নিযুক্ত হইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার মনের ভাব আপনা হইতে শব্দরূপে লেখনীমুখে আবির্ভূত হইবে, সর্বদেশে সর্বজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা। পরিভাষা সংকলনের অপেক্ষায় কোনও দেশেই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকে নাই।*** পূর্বেই বলিয়াছি বঙ্গের জনসাধারণ জ্ঞানার্থী হইয়া ঊর্ধ্বমুখে আপনাদের অভিমুখে চাহিয়া রহিয়াছে। আপনারা তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করুন। ইহা আপনাদিগের কর্ম, ইহা আপনাদিগের ধর্ম। সাধ্য সত্ত্বেও এই বিষয়ে কুণ্ঠিত হইলে আপনাদের প্রত্যবায় হইবে।" রামেন্দ্রসুন্দরের এই আবেদন বিজ্ঞান পরিষদ মাথায় করে রেখেছে। তবে সব বৈজ্ঞানিকের মনে এই কথাগুলি যে সন্তোষজনক অনুরণন তুলতে পেরেছে, একথা ভাবতে দ্বিধা হয়।

রিপন কলেজের ছাত্রদের ক্লাসের বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর একটি সহৃদয় অধ্যাপকগোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন। সকলেই বাংলা ভাষার সাধক ছিলেন। শিক্ষকদের সভায় ধারাবাহিকভাবে 'জগৎ কথা'-র যে বিবরণী দিয়ে গেছেন—শেষের দিকে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুন মৃত্যুর প্রায় চার বছর বাদে পুস্তকাকারে সেই সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল; এখনও হয়তো আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রচনাবলির মধ্যে এগুলি রয়েছে (৪-২০৯-৪৯৯)। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। দ্বিধায় দোলায়িত শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি জ্যামিতিক প্রমাণের মতো কাজ করবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা যে অবশ্য কর্তব্য, তা সর্বজন-গ্রাহ্য স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে মেনে নিলেও উপযুক্ত সম্পাদনায় অনেকের সন্দেহ আছে। আমি দেখেছি, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে আজও ভাবেন—যে ভাষায় তাঁরা নিজে শিখেছেন, সে ভাষা ছাড়া বিজ্ঞান বোঝানো সম্ভব নয়। রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায় তাঁদের চোখ ফুটতে পারে।

দীর্ঘ কয়েক বছর (১৩৫৬-৬৩) অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্র রচনাবলী ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবনা-বিকাশের একটা নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের কথা প্রথমে তাঁর রচনার বিষয়। তবে বিশেষ করে তার তাত্ত্বিক দিকেই রামেন্দ্রসুন্দরের ঝোঁক বেশি। 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' স্বদেশি যুগের আগের লেখা। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলে অধ্যয়ন করেছি (১৯০৮-১৯১৩)। ইতিমধ্যে সাহিত্য পরিষদে নানা মনীষীর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পর্ক ঘটছে। স্বদেশি যুগের উদ্দীপনা তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। যন্ত্রশিক্ষার ব্যর্থতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। দেশের পরাধীনতা, সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকারের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। রাখিবন্ধনকে তিনি দেশের নিত্যকৃত্যের মধ্যে স্থান দেওয়ার জন্যে

লিখলেন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। আবার রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে 'শব্দ কথায়' তিনি করলেন বাংলা ভাষার ধ্বনিবিচার। নিজের গ্রামের চারপাশে যে ধর্মঠাকুরের পূজা চলছিল, তার তথ্য সংগ্রহ করে ধর্মঠাকুর বলে যে বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা আজও অবধি চলেছে, তার সন্তোষজনক প্রমাণ দিয়েছেন তিনি।

মন ক্রমশ দেশের পুরাতনী বিদ্যার দিকে ঝুঁকতে চলল। স্বদেশি যুগে দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে বিজ্ঞান পড়াতে-পড়াতে নানা কথারও আলোচনা হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মনে হচ্ছে—"দেশের পুরাতন কথা যে আমরা জানি না জানিবার যত্নও করি না—ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।"

সাহিত্য পরিষদে যখন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলির অনুবাদ হঠাৎ কোন কারণে স্থগিত হল, তখন তিনি নিজেই সেই অনুবাদ কার্যের ভার নিলেন। তাঁর চিত্তমানস ভাবছে—"বেদপন্থী সমাজে জন্মিয়া পুরাতনী বিদ্যার অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্যহীনতার লক্ষণ বলিয়া আমি বোধ করিতাম—সেই মহতী বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব"—এই প্রলোভনে তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। তার ফলে পাওয়া গেল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সুন্দর বাংলা অনুবাদ—যা পড়ে শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছেন শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"ব্রাহ্মণটির শরীরের আয়তন দেখিয়া আমার মনে হইল "ব্রাহ্মণভোজন" বৈদিক যাগযজ্ঞের মুখ্যতম উদ্দেশ্য ছিল—দ্যুদেবদের তুষ্টিসাধনের সঙ্গে ভূদেবদের পুষ্টিসাধন অবিচ্ছেদ্য সৌহার্দ-সূত্রে বাঁধা ছিল। ব্রহ্মবাদীরা মাঝে মাঝে detective officer-এর ন্যায় আসিয়া খানাতল্লাশি করিতেছেন—আর ব্রাহ্মণটি চটপট তাহার একটি সদুত্তর দিয়া আপনাকে সাফাই করিতেছেন—ইহার ন্যায় সরস সামগ্রী কোথায় আমি দেখি নাই—অতি চমৎকার ব্যাপার।"

এইসব করতে গিয়ে সাফাই গাইবার প্রবৃত্তিটি বোধহয় বেদপন্থী ত্রিবেদী সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করল। তার নিদর্শন পাই তাঁর 'নানা কথা'-র মধ্যে। এসব কথার যথাযথ সমালোচনা করা এখানে অসম্ভব—তবে তাঁর চিন্তামানসের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে এই প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে। যেমন—"অদৃষ্ট দোষেই হউক আব শিক্ষা প্রণালীর দোষেই হউক ইংরাজি শিক্ষা ষাট বৎসরে আমাদের দেশে ফলে নাই। বৎসর বৎসর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান কালে প্রতিনিধি চ্যান্সেলরের মুখে এই আক্ষেপই শোনা যায়। আমাদের জ্ঞানার্জনে মতিরতি হইল না। জ্ঞানরসের প্রতি আমাদের তৃষ্ণা জন্মিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হাজারে-হাজারে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করিতেছেন, কিন্তু একজনও একখানা লাঙ্গল আনিয়া জ্ঞানরাজ্যের এক ছটাক জমিতে চাষ দিল না। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ততোধিক দুঃখের বিষয় আর একটি আছে। সরস্বতী যত্নের সহিত কোলে লইয়া তাঁহার বীণা-পুস্তক তাঁহার সন্তানদের হাতে দেন। কিন্তু কৃতী সন্তানেরা মায়ের কোল হইতে নামিবামাত্র বীণাটি ভাঙিয়া ও পুস্তকখানি বেচিয়া মায়ের সপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দাসত্বে নিযুক্ত হয়েন। সত্য বলো দেখি, ইংরেজি কি আমাদের সমাজে অর্থোপার্জন ও জীবিকার্জনের সুগম উপায় মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সেই অবধি আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষায় হাকিম, উকিল ও কেরানিতে দেশটা প্লাবিত হইয়া গেল।" এ তো আমাদের

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সখেদ উক্তি। তিনি তো ল' কলেজ ভূমিসাৎ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রিপন কলেজের আইন বিভাগ অধ্যক্ষ ত্রিবেদী সযত্নে রক্ষা করে গেলেন। আবার অন্য স্থানে পড়ি—"অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ভারতের ব্রাহ্মণের জীবনের ব্রত ছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মাত্র ব্রত করিয়া সে জীবনের সমুদয় ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়াছিল।" এ তো স্বর্ণ যুগের কথা! অবশ্য শোনা যায়, রাজসভায় জয়ী হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র ধেনু তাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় বাধা পেয়েছিলেন। শিক্ষা সে কালেও সম্পদের কারণ হত।

অবশ্য সকলেই তখন যাজ্ঞবল্কের মতো সৌভাগ্যবান ছিলেন না। আবার পড়ি—"চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানে দণ্ডায়মান আছেন। এখনো সেই প্রাচীন কালের পদ্ধতির বিশুদ্ধ ধারা ক্ষীণস্রোতে এই দেশে বহিয়া আসিতেছে। এখনো নাকি সিন্ধুতীর ও কৃষ্ণাতীর হইতে নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীতে ভক্তিমাত্র দক্ষিণা ও উপহার লইয়া ছাত্রেরা শিক্ষক সমীপে উপস্থিত হয়। (তবে) তাহারা কি শেখে না শেখে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ—বিলাতি শিক্ষা সহকারে বিলাতি সভ্যতার নিয়ম এই দেশে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের খরচের মাত্রাটা অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছে। সেটাও বিবেচনা করা উচিত।" শেষে—"আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে দোষ বর্তমান আছে। এই মূলস্থ দোষের সংস্কার সাধন না ইহলে কোনরূপ ফল লাভের আশা নাই।*** বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাতে বিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (১৩০২) এখনো অবশ্য স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয় নাই।"

দেশের পুরাতনী সমাজনীতির উপর রামেন্দ্রসুন্দরের মনোভাব জানতে পারি—তাঁর 'সামাজিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার' প্রবন্ধে পড়ি—"যদি আমাদের সামাজিক ব্যাধির কোন ফলপ্রদ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়, তাহা এই আত্মসমাজেব প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি।" * * * আবার "যদি আমরা কখনও রঙ্গমঞ্চের অস্বাভাবিক প্রহসনের অভিনয় ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কর্মক্ষেত্রে-বিচরণ করিতে চাই, আমাদের প্রাচীন সমাজের প্রতি অপকট শ্রদ্ধা হইতেই সেই ক্ষমতা উৎপন্ন হইবে।" * * * পুনশ্চ—"যাহারা এই পুরাতন সমাজকে অদ্য হীনবল অধঃপতিত ও শাসন-বিষয়ে অসমর্থ দেখিয়া ইহার প্রতি নির্মম বিদ্রূপবাণীর প্রয়োগ করেন তাহার কাপুরুষত্ব অবজ্ঞেয়। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় আমাদের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের সমাজের প্রতি এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই।"

"ভারতবর্ষের পুরাকালের ও বর্তমানকালের সমাজ-তত্ত্বের শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ উদাহরণ নিতান্তই বিরল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বৈদেশিক সমাজের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁহারা স্বদেশের ইতিবৃত্ত ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার বোধ হয় বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীই তাঁহাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য ও অবজ্ঞার জন্য দায়ী। যে প্রণালী জাতীয় ভাবের ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে, তাহাতে প্রকৃত স্বজাতি-অনুরাগ ও স্বদেশ অনুরাগ

আনিতে পারে না, কেবল স্বজাতির প্রতি একটা কৃত্রিম, অন্তঃসারশূন্য মৌখিক আসক্তির ছদ্মনাম উৎপাদন করে মাত্র।'' এই যুক্তির উপর ভিত্তি করলে বর্তমানে পাকিস্তানের ইসলামিয় রাজ্য স্থাপন বা জনসংঘের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনাকে সমালোচনা করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীতে কলকাতা কলেজে বিদ্যালাভের ব্যবস্থার একটি হাস্যকর ছবি আছে, যা উদ্ধৃত করবার লোভ সামলানো গেল না—''প্রবেশান্তে বিদ্যালাভের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, কোন শাস্ত্র সম্পর্কে কয়খানি বই পড়িতে হইবে, কোন বহির কোন পাতাটা বর্জন করিতে হইবে, কোন শাস্ত্র সম্পর্কে কয়ঘণ্টা লেকচার হইবে—ঘণ্টার অর্থ ষাট মিনিট কি ছত্রিশ মিনিট—কতগুলি লেকচার শুনিতে হইবে এবং কতকগুলি ফাঁকি দেওয়া চলিবে—লেকচার শুনিতে-শুনিতে কত মিনিট কাল ঘুমাইয়া পড়িলে সেই শ্রবণক্রিয়া অগ্রাহ্য হইবে ইত্যাদি। অতএব এসব বিষয়ে শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী কাহারও কোনও দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু লেকচার এক সময়ে এ কানে ঢুকিয়া ও কান দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং কোনও শিক্ষকই ইহা নিবারণ করিতে পারেন না, কাজেই মাঝে-মাঝে শিক্ষার্থীকে পরখ করিয়া, বাজাইয়া লওয়া দরকার।

সপ্তাহে পরীক্ষা, মাসান্তে পরীক্ষা, বৎসরান্তে পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত পরীক্ষা, এই পরীক্ষা পরম্পরায় যে বিদ্যার বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা নির্ধারিত হয়, তাহার নগদ মূল্য প্রতিমাসে চারি মুদ্রা (এখন আক্রার দিনে বাড়িয়াছে) এবং মাসের পনেরোই জমা না দিতে পারিলে অতিরিক্ত দেয় জমা চারি আনা। বিদ্যাদানের এই যন্ত্রের মধ্যে নানাবিধ মহার্ঘ সামগ্রী আছে—দ্বারোয়ান, চাপরাশি, সেক্রেটারি, দপ্তরী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেঞ্চি, টেবিল, লাইব্রেরি, হস্টেল, ডিপ্লোমা, উপাধি, জরিমানা, রসিদ, ডাকটিকিট এবং অনেক চামড়াবাঁধা খাতা—কিন্তু কোনও হৃদয় নাই। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কোন নাড়ির টান নাই, কোনওরূপ প্রীতিসম্পর্ক নাই। শিক্ষক ছাত্রের নাম জানেন না, মুখ চেনেন না। ঘণ্টা বাজিলে আপন কর্তব্য সারিয়া মাসান্তে বেতন গ্রহণ করেন; চুক্তিমতো আঠারোর জায়াগায় উনিশ ঘণ্টা কোন সপ্তাহে কাজ করিতে বলিলে কপালে চোখে তোলেন, আর অধ্যক্ষ বসিয়া দারিদ্র্যাপরাধী ছাত্র বেতন দিতে দেরি করিলে তাহার জলখাবারের পয়সা হইতে জরিমানা করেন* * *। আবার ছাত্রদের কথা—''ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া লেবরেটরিতে দাঁড়াইয়া তাহারা কস্টিক লোশনের মধ্যে রূপার আবিষ্কার করিতেছে—কিন্তু রূপা না থাকিয়া যদি সিসা থাকিত তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে চুম্বক আছে কি না এই লইয়া তাহারা অনেক বিচার বিতর্ক মুখস্থ করিতেছে; কিন্তু ভূকেন্দ্রে চুম্বক না থাকিয়া একটা ভল্লুক থাকিলেও তাহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইত না। তাহারা চায় কেবল একখানা ডিপ্লোমা যাহার ফলে ভবিষ্যতে মুনসেফি বা কেরানিত্ব জুটিবে, সেখানে চুম্বক বা ভল্লুক উভয়েরই সমান মর্যাদা। নিতান্তই দায়ে পাড়িয়া তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহিত পলিটিক্যাল ইকনমির লেকচার শোনার অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অথচ এই শূন্যগর্ভ ফক্কিকারি এবং হৃদয়হীন দোকানদারির আশ্রয় করিয়া আমাদের শিক্ষাযন্ত্র বিকট শব্দ করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। এই আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর

আলোচনা করা যাইতে পারে—শিক্ষার বিষয়ের তুলনা করার আবশ্যক নাই।" হায় রামমোহন! তোমার আমহার্স্টের প্রতি লেখা চিঠিতে একটা মূলগত দোষ রয়ে গেছে। তুমি শিক্ষার বিষয়ের কথা পেড়েছিল। এই ভাবে প্রাচীন ভারতের নীতির উৎকর্ষের দৃষ্টান্তে প্রবন্ধটি পূর্ণ।

"ভারতবর্ষ এই দোকানদারিতে চিরকাল কুণ্ঠিত, ভারতবর্ষের ইহাই স্বভাব... ভারতবর্ষ এই বণিকবৃত্তির প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে সংকুচিত। এ দেশে ধনীর গৃহে কোনো উৎসব সমারোহের অনুষ্ঠান হইলে, সেখানে ইতর সাধারণের জন্য দ্বার অবারিত থাকে। কাহাকেও দ্বারদেশে টিকিট দেখাইতে হয় না। এদেশে মেলা বসিলে দর্শনী দিয়া তা দেখিতে হয় না। গৃহস্থের বাড়ি ভোজ হইলে অনাহূত ও রবাহূত সমান আদরে আহূতগণের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করে। এদেশে যে বস্তু যত আদরের সেই বস্তুর দানে ততই গৌরব এবং সেই বস্তুর জন্য মূল্য প্রার্থনা ততই অগৌরবের বিষয়।" আবার দৃষ্টান্ত শুনুন—"মনুষ্যের প্রাণদানকে যিনি ব্যবসায় করিয়াছেন তিনি জীবিকার জন্য প্রাণদানের বিনিময়ে তুচ্ছ অর্থ গ্রহণে বাধ্য হন। ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ইহা সম্পূর্ণ মেলে না। রামেন্দ্রসুন্দরের মতে তাই ভিষক সামাজিক সম্মানে ব্রাহ্মণের নীচে (মানসী, ১৩১৭)।"

এইবার স্বদেশির যুগে এসে পড়েছি। রামেন্দ্রসুন্দরের সমাজরক্ষণশীলতা শেষ অবধি পুরাতনী মনোভাবে পরিণত হয়েছে। গান্ধিবাদী ও হিন্দুসঙ্ঘওয়ালা বা স্বতন্ত্রবাদীদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রবল। রিপন কলেজে শিক্ষকমহলে তখনকার দিনে এই মনোভাবের বিকাশই প্রশংসিত হত। আজও এইভাবে স্বদেশিয়ানা আমরা তাঁর রিপন কলেজের পুরাতন সহকর্মীদের কাছে কখনও-কখনও শুনছি। এসব ব্যাপারের বিস্তারিত সমালোচনার এখানে আবশ্যক দেখি না, পাঠক আমার বক্তব্য বোধহয় বুঝতে পারবেন। বর্তমান বিজ্ঞানের আবশ্যিকতা রামেন্দ্রসুন্দর স্বীকার করতেন না। তবে বৈজ্ঞানিক বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি—বঙ্গমাতাকে যে সুন্দর অলংকার উপহার দিয়াছেন—স্বচ্ছ গতিশীল ভাষা যা বিজ্ঞানের দুর্জ্ঞেয় রাজত্ব থেকে অবলীলাক্রমে ঘরের কোণে পরিচিত বস্তুর বর্ণনায় চলে আসতে পারে, তার জন্যেই দেশ তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। এদেশে রক্ষণশীল, সনাতনী মনোভাব চিরকাল থাকবেই এবং সঙ্গে হয়তো ভৌগোলিক কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে। মাঝে-মাঝে মনে হয় ত্রিবেদী মশায়ের মতো তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিক্ষক যদি রিপন কলেজের মতো স্থানে কাল না কাটিয়ে এমন কোন স্থানে অধ্যাপনা করতেন—দেশের নবীন মনের সঙ্গে যেখানে সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব ছিল তাহলে এই সাময়িক একদেশদর্শী তর্করাশির পরিবর্তে হয়তো চিরস্থায়ী মৌলিক অবদান আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতে পারতাম!

আমাদের দুঃখ হয় "বিদ্যার এত বড় জাহাজ" থেকে কোনও চিরস্থায়ী সম্পদ নামানো সম্ভব হল না। তাঁর রচনাবলি বেশিরভাগ সাময়িকীতে প্রকাশিত জনপ্রিয় ও মুখরোচক প্রবন্ধে ভরা। খুব কম প্রবন্ধ পড়ি, যাতে তাঁর গভীর সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য দেয়। কে জানে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের মনেও এইরূপ

কোনো মৌলিক নিদর্শন রাখবার ইচ্ছা ছিল কি না! এমন কিছু মৌলিক দর্শনতত্ত্ব লেখা, যার মধ্যে প্রতীচ্যের বিজ্ঞান, দর্শন, বিবর্তনবাদের সঙ্গে এদেশের অদ্বয়বাদ ও বৌদ্ধ হেতুবাদের সমন্বয় থাকবে। হয়তো বিচিত্র প্রসঙ্গের মধ্যে সেইরূপ চেষ্টা দেখা যায়। 'অধিকারীরা' এই বিষয়ে বিচার করবেন। শেষ অবধি বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি বাংলার শিক্ষিত সমাজের অবিচলিত ভক্তি ছিল। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে হচ্ছে—দেশের নবীন যুবারা যখন কলকাতা সায়েন্স কলেজে নিজেরাই পদার্থবিদ্যার স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলতে চেয়েছিল, তখন সার আশুতোষ চেয়েছিলেন ত্রিবেদীর মতো একজন বিচক্ষণ প্রবীণ বিজ্ঞানীকে তাদের নেতা হিসাবে। আশুতোষের বাণী নিয়ে আমরা ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। সব কথা শুনে তিনি বলেছিলেন যে যথাস্থানে এই আর্জির উত্তর জানাবেন। অবশ্য তিনি শেষ অবধি সায়েন্স কলেজে যোগ দেননি। কারণ কী দিয়েছিলেন, তার সম্বন্ধে কনাঘুষাই শুনেছিলাম। তা অব্যক্ত রহস্যই রয়ে গেছে।

তার কিছু পরে কলকাতায় স্যাডলার কমিশন বসল। ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর কমিশন রিপন কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। স্যাডলার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পেয়ে একান্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি বিস্ময়ে বিদগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে এরূপ লোক নিযুক্ত না করে কতকগুলি ছোকরা নিযুক্ত করা হয়েছে কেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন—"This is the fate of our Country. এটাই আমাদের দেশের ভাগ্য!" (বাজপেয়ীর রামেন্দ্রসুন্দর ১২১ পাতা)। বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী তখন হয়তো সার আশুতোষের নির্বাচনে বিশেষ রুষ্ট হয়নি। তখন এই যুবকদের দলে ছিলেন—ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ (পরে সার) জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ সুধাংশু ব্যানার্জি, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন প্রভৃতি।

শেষ বয়সে নানা শোক-তাপে রামেন্দ্রসুন্দরের শরীর ভেঙে যায়। পুরোনো শিরঃপীড়া আবার আত্মপ্রকাশ করে। মাঝে-মাঝে তিনি সংজ্ঞা হারাতেন। ১৩২৫ সালে আবার পড়লেন ম্যালেরিয়া জ্বরে। তাঁর মা'রও স্বাস্থ্যভঙ্গ হল, তিনি তীর্থযাত্রা করতে চাইলেন এবং দুর্গাদাস ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের কন্যা গিরিজা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতায় আসা হল, যত্ন ও চিকিৎসা সত্ত্বেও ১৭ পৌষ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। তারপর তাঁর বৃদ্ধা মাতা দেশে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন অনন্তধামে চলে গেলেন। ১৩২৫ সালের ফাল্গুনে রামেন্দ্রসুন্দরের ভগ্নদেহে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেল। মায়ের মহাপ্রয়াণের পর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ল। তাঁর ইচ্ছামতো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলত। মাঝে একবার ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এসেছিলেন, বললেন—Brights' disease জীবনের আশা নেই। তারপর কোনওক্রমেই রোগ বা যন্ত্রণার উপশম দেখা গেল না। এই সময় একদিন কাগজে বের হল কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংশ অত্যাচারের পর নাইট উপাধি বর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার ইচ্ছা প্রবল হল—তাঁর সেই বিখ্যাত ইংরেজি পত্র, তাঁর নিজমুখে শোনবার ইচ্ছাও তিনি তাঁর ভ্রাতা দুর্গাদাসের মুখে কবিকে

জানালেন। ১৯ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মশায়কে দেখতে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে এবার শুনতে চাই। তিনিও একখানা নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল ত্রিবেদী তাপসের মুখে। শারীরিক অসুস্থতাব তীব্রতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। * * নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা বুঝি এমনি করেই জ্বলে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি আর উঠতে পারি না—দয়া করে আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন। * * * কবিগুরু বিদায় নিলেন—এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙল না (ধীরেন্দ্রনারায়ণ, ২৪৮ পাতা, 'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর')

২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময় অকালে মহাপ্রয়াণ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তিমকালে মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন—তিনি বড় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন—"আমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যার একটা জাহাজ ডুবিয়া গেল" (বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর', ৮২ পাতা)।

তাঁর চিরদিনের সাধনা ও প্রিয় সাহিত্য পরিষদে স্মৃতিরক্ষাকল্পে অনেক প্রস্তাবই হয়েছিল। (৮) দফায় দেখি (বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর')

"শেষ পর্যন্ত স্মৃতিসংরক্ষণ বিষয়ে সাহিত্য পরিষদ তৈলচিত্র ও রচনাবলি ব্যতীত কোন কাজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ও রামেন্দ্রসুন্দর

প্রাচীন ভারতে উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা সর্বজনবিদিত। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা বিজ্ঞান-সাহিত্য সংগঠনে সেকালের ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, সে কথাও আজ অবিদিত নয়! কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়—'ফুরাল দিন কখন নাহি জানি'—প্রাচীন ভারতে কেবল বিজ্ঞান নয়—সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ধারা হঠাৎ যেন কোথায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। বহু শতাব্দীর পরে বিজ্ঞানের সূত্রপাত ভারতবর্ষে আবার দেখা যায় উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে। একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতবাসী আবার নতুন করে বিজ্ঞানের মূল্যায়নে সচেতন হয়েছিলেন। ইংরেজি ১৮১৩ সনে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বপ্রথম অর্থব্যয়ের অনুমোদন করেন। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার পক্ষে এই অর্থের পরিমাণ অতি সামান্যই ছিল। এর দশ বছর পরে রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি লেখেন, তাতে তিনি ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রবর্তনের কথা বলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই বিজ্ঞান-শিক্ষা ভারতে আবার নতুন করে আরম্ভ হয়। ইংরেজি ১৮১৭ সনে রামমোহন, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহীদের চেষ্টায় কলিকাতা শহরে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলি পড়ানো হত। এই সময়ে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকেরাও ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাংলা দেশে কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের নাম কে না জানেন? এই খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণের উদ্যোগে ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, কলেজে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ইংরেজি ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হত—পাঠশালায় বা নিম্নস্তরের বিদ্যালয়গুলিতে অবশ্য মাতৃভাষাই ছিল শিক্ষার মাধ্যম। খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ মাতৃভাষা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন—কারণ, জনসাধারণের মধ্যে খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রচার মাতৃভাষাতেই সহজ, স্বাভাবিক ও বিশেষ ফলপ্রদ।

কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয় বিদ্যোৎসাহীর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় স্কুল-বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। বাংলা দেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা এই সোসাইটি কর্তৃক পুস্তক প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে যে সব বই স্কুল-বুক সোসাইটি প্রকাশ করেন—তার মধ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বইগুলি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, বিজ্ঞানচর্চার প্রথম পর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রায় সব বই-ই লিখেছিলেন ইংরেজ শিক্ষাবিদ্গণ। রবার্ট মে রচিত

ও স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত গণিতের বই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সর্বপ্রথম নিদর্শন বলা যেতে পারে। এরপর প্রকাশিত হয় হার্লে-সংকলিত 'গণিতাঙ্ক', হপকিন্স পিয়ার্সের 'ভূগোল বৃত্তান্ত', জন পিয়ার্সন রচিত 'ভূগোল এবং জ্যোতিষ' ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন এবং লসন রচিত বইয়ের অনুবাদ—'পশ্বাবলী'। স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক উলিয়াম ইয়েটস কয়েক বছর পরেই 'পদার্থ বিদ্যাসার' ও 'জ্যোতির্বিদ্যা' নামে বাংলা ভাষায় দুখানা বই লেখেন। এই সময় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়—মার্শম্যান রচিত 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়', ম্যাক রচিত 'কিমিয়াবিদ্যার সার'। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে এর বহু পূর্বেই বাংলায় 'দিগদর্শন' নামে যে সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তাতে বিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিত হয়। উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিকস কেরি এই সময়ে বাংলা ভাষায় 'এনসাইক্লোপিডিয়া' সঙ্কলনের সঙ্কল্প করেন। এর নাম দেওয়া হয়—'বিদ্যাহারাবলী'। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা'। অনুবাদ হলেও এই বইখানা বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। এই সময়েই রামকমল সেন বাংলাভাষায় 'ঔষধ সার সংগ্রহ' প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় বিদেশিরাই প্রথম পথ দেখিয়েছিলেন সত্য—কিন্তু প্রকৃত বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই প্রসঙ্গে ইংরেজি ১৯৩৯ সনে স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভার উদ্বোধন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইংরেজি ১৮৩০ সনে যখন রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছিলেন তার সম্পাদক। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল—সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এই সভায় যোগ দেন, তখন থেকে বাংলার গণমান্য সকলেই এই সভার অন্তর্ভুক্ত হন। সভ্যদের মধ্যে চন্দ্রশেখর দেব, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী সভা যে সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী ছিলেন, শুধু দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব নয়, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানও তার অন্তর্গত ছিল। এই তত্ত্ববোধিনী সভার সক্রিয় সাহায্যে অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে বাংলায় যে সব বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি সাহিত্যগুণসম্পন্ন ভাষায় তিনি বিবৃত করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক স্থাপিত 'তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা'-য় অক্ষয়কুমার দত্ত অতি সামান্য বেতনের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত 'ভূগোল', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'পদার্থবিদ্যা' তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। তাঁর লিখিত 'চারুপাঠে'-ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। বারো বছর তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ে বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ। তবুও ভাষার শালীনতা ও সুসংবদ্ধ রচনাকৌশলে তিনি বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর শিশুপাঠ্য পুস্তকে সরল ভাষায় বিজ্ঞানের অতি সাধারণ ও পরিচিত প্রসঙ্গগুলি লিখে গিয়েছেন। তাঁর প্রণীত 'বোধোদয়' গ্রন্থে কাচ সম্বন্ধে তাঁর লেখা

শিশুদের উপযোগী এক আশ্চর্য রচনা। তাঁর এরূপ আরও অনেক লেখা আছে।

এই সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' নামে যে গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের বই ছিল—'ভূগোল-বৃত্তান্ত' ও 'ক্ষেত্র-তত্ত্ব'। এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'প্রাকৃত ভূগোল' প্রণয়ন করেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর পদার্থবিদ্যায় বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত 'প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান' নামক পুস্তকে যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাষ্পীয় যন্ত্রের বিষয় আলোচিত হয়েছিল। কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'পদার্থ দর্শন' ও 'রসায়ন' নামে দুখানা বই সে সময়ে প্রকাশ করেন। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক কানাইলাল দে কর্তৃক রচিত 'পদার্থবিজ্ঞান' প্রাঞ্জল ভাষা ও সরল রচনাভঙ্গির জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূর্যকুমার অধিকারী 'প্রকৃত-বিজ্ঞান' ও বীরেশ্বর পাঁড়ের 'সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা'—এই দুখানা পুস্তকেরও তখন আদর হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' ও যাদবচন্দ্র বসুর 'রসায়ন', বই দুখানাও উল্লেখযোগ্য। প্রভাতচন্দ্র সেনের 'চন্দ্রতত্ত্ব', নবীনচন্দ্রের দত্তের 'খগোল বিবরণ', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী', গিরিশচন্দ্র বসুর 'ভূতত্ত্ব' প্রভৃতি বইগুলি যে সময়ে খ্যাতি লাভ করে। ভূগোল সম্বন্ধে বহু বই এই সময়ে ছাপা হয়েছিল। উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর বিজ্ঞান ও অস্থিবিজ্ঞান—এমনকি মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বইও এই সময়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বালকশিক্ষার্থ উদ্ভিদবিদ্যা' বাংলা ভাষায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম বই। বইখানি ইংরেজির অনুবাদ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন', গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'জীবতত্ত্ব', জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর 'মীনতত্ত্ব', 'গোতত্ত্ব', 'সারমেয়তত্ত্ব', 'মার্জারতত্ত্ব' ও 'অশ্বতত্ত্ব', ডাঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষের 'শারীরবিধান তত্ত্ব', রাধাবল্লভ দাসের 'মনস্তত্ত্বসার সংগ্রহ', রাধাপ্রসাদ রায়ের মনোবিজ্ঞানের বই 'বিধানকল্প লতিকা' প্রভৃতি পুস্তক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ে যে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিনে, তার নাম 'বিজ্ঞানরহস্য'। এই গ্রন্থে নয়টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ইংরেজি লেখা থেকে সংকলিত হলেও রচনাসৌকর্যে ও ভাষার লালিত্যে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই পুস্তকটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর পরেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে অবতীর্ণ হন—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বৈজ্ঞানিক। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কৃতী ও বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। আজ থেকে একশত বছর পূর্বে যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশে অনেকে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পিতৃবংশের সাহিত্যিক ও দার্শনিক কৃষ্ণ মিশ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা গোবিন্দসুন্দরও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। 'বঙ্গ বালা' নামে একখানা উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন—আবার জ্যোতিষশাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের পিতৃব্য উপেন্দ্রসুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পিতার তত্ত্বাবধানে তাঁর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অনুরাগী হলেও রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্র (ন্যাচারাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স) অধ্যয়ন করেন। ইংরেজি ১৮৮৬ সনে বিএ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের

অনার্স কোর্সে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পরের বছর বিজ্ঞানশাস্ত্রে এমএ পরীক্ষায় প্রথম হন। ইংরেজি ১৮৮৮ সনে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ইংরেজি ১৮৯০ সনে তিনি রিপন কলেজে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রিপন কলেজের অধ্যক্ষের পদ তিনি অলংকৃত করেছিলেন।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের কৃতবিদ্য ছাত্র ও অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যসাধনাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের নিকট যে সাহিত্যিক প্রতিভা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তা তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল। বংশানুক্রমে দার্শনিক মনোভাব এবং চিন্তাও তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একাধারে তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও দার্শনিক। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সেজন্যে বলেছিলেন—"দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রি-ধারা রামেন্দ্রসঙ্গমে যুক্ত-বেণীতে পরিণত হয়েছিল।" উচ্চাঙ্গ বিজ্ঞানে রামেন্দ্রসুন্দরের গভীর জ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে যেমন একদিকে সম্পূর্ণতা ও যাথার্থ্য এনেছিল, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তেমনি বিজ্ঞানের সমস্যাগুলিকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার সামর্থ্য দিয়েছিল। অধিকন্তু তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা তাঁর রচনায় এক আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গিমা এনে দিয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও রচনাবলি সেজন্যে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যেব অপূর্ব সম্পদ।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাঞ্জল ও যথাযথ ভাষার নমুনা তাঁর 'প্রকৃতি' পুস্তকের 'আকাশ তরঙ্গ' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করা গেল। এই প্রবন্ধটি প্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"আলোকের ধর্ম বুঝিবার জন্য ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা 'আকাশ নামে একটা সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন; পদার্থটা তাঁহাদের মতে বিশ্বব্যাপীও ছিল। সুতরাং ঈথর শব্দের অনুবাদে আমরা আকাশ বসাইতে পারি।...জল নাড়িয়া দিলে যেমন জলাশয়ের পৃষ্ঠে উঠিয়া প্রসারিত হয়, বীণা যন্ত্রের তন্ত্রী নাড়িয়া দিলে যেমন চারিদিকের বায়ুমধ্যে ঢেউ প্রসারিত হয়, তেমনি এই আকাশকে কোন রকমে নাড়িয়া দিলে ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠিয়া সুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। তার বেগই বা আবার কত! এখানে ঢেউ আরম্ভ হইলে সেকেন্ডের মধ্যে প্রায় লক্ষ ক্রোশ দূরে যাইয়া সেই ঢেউগুলির ধাক্কা লাগিবে। সূর্যমণ্ডল যে এতদূরে আছে, প্রায় সাড়ে চার কোটি ক্রোশ দূরে আছে, সেখানে ঢেউ উঠিবামাত্র আট মিনিটের মধ্যে আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা লাগে। চোখে ধাক্কা লাগিয়া আমাদের মস্তিষ্কে নাড়া দেয়; তাহাতেই আমরা জানিতে পারি যে, ওখানে একটা কী বস্তু আছে এবং সেই বস্তুটার নাম দিই সূর্য। ঈথর বা আকাশ আছে বলিয়াই আমরা অত বড় বস্তু যে সূর্য, তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান পাইতেছি।...আকাশের যে ঢেউগুলি আমাদের আলোকজ্ঞান জন্মায়, তাহার এক-একটির দৈর্ঘ্য এত ছোট যে, জলের ঢেউয়ের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিতে গেলে ইঞ্চিতে আর চলে না। ইঞ্চিকে কোটি ভাগ করিতে হয়।...যে ঢেউগুলি একটু লম্বা, তাহাতেই লাল আলো দেয়; তার চেয়ে আর একটু লম্বা হইলে আর আমাদের চোখ ধরিতে পারে না। মাঝারি রকমের ঢেউগুলির মধ্যে কোনটা হলদে, কোনটা সবুজ, কোনটা নীল আলো

দেয়। আরও ছোট হইলে আমরা বেগুনি রং দেখি। তার ছোট হইলে আমরা চোখে অনুভব করিতে পারি না।...এই সকল আলোক-বিজ্ঞানের পুরাতন কথা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞান রহস্য' গ্রন্থ থেকে, তুলনা করবার সুবিধার জন্য, আলোক সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্র নিম্নে দেওয়া গেল।

"ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়।...এই আন্দোলন-ক্রিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কারণ কী? ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা তাহা স্বীকার করিবার বিশেষ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এ স্থলে বর্ণনীয় নহে।"

উভয়ের লিখিত প্রবন্ধে দেখা যায়, পরিভাষা খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে—প্রকাশ ভঙ্গিমাও সহজ। কিন্তু লেখা পড়ে স্পষ্টই বোঝা যায়, রামেন্দ্রসুন্দর একজন পদার্থবিজ্ঞানবিদ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত রামেন্দ্র রচনাবলির ষষ্ঠ খণ্ডে 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার' নামক প্রবন্ধটি থেকে কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাক। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও জটিল বিষয়ের সহজ বিবৃতির এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে বাস্তবিকই খুব বিরল। তড়িৎ-তরঙ্গের গ্রাহকযন্ত্র প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"হার্ৎজের পরবর্তীকালে এই উর্মিনির্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশতরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কী জানি কীরূপে উহার তড়িৎপ্রবাহ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তড়িৎ প্রবাহ চলিতে পারে। এই তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পারো বা আলো জ্বালিতে পারো বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পারো বা গাড়ি টানিতে পারো। এই লোহাচুরে উর্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরেজিতে Coherer বলে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক।...আকাশতরঙ্গের প্রভাবে কোনওমতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তড়িৎপ্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগসাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer..যাহা হউক জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত উর্মিনির্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।...সোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে...অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে—আকাশ-বাহিত তড়িৎ তরঙ্গে ও আকাশ-বাহিত আলোক তরঙ্গ কোনও মৌলিক প্রভেদ নাই।

আলোক তরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে। ধাতুপদার্থের মধ্যে আলোক তরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ধাতুপদার্থ অস্বচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিয়ে আলোক তরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া প্রতিফলিত বা পবিবর্তিত হয়।

স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া অর্থাৎ আলোক-রশ্মি তির্যগগামী হইয়া তিরোবর্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশ তরঙ্গেও ঠিক এই ধর্ম বর্তমান।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জগৎ-কথা' পুস্তকের 'কম্পগতি' নামে লেখাটি থেকে এবার কিছু তুলে দিই। বিষয়টি আজকাল স্কুলের পাঠ্যসূচির অন্তর্গত।

"কম্প-গতির সর্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ ঘড়ির পেণ্ডুলাম বা পরিদোলক। দোলে বলিয়াই উহার নাম পরিদোলক। একখণ্ড সূতা বা তারের এক প্রান্তে একটা লোষ্ট্রখণ্ড বাঁধিয়া অন্য প্রান্ত ধরিয়া দোলাইয়া দিলেও উহা ঠিক পেণ্ডুলামের মতো দোলে, অথবা উহাই পেণ্ডুলাম।...পরিদোলকে কম্পের পর কম্প...নির্দিষ্টকাল পরে-পরে ঘটে।...যে কালে এক পূর্ণ কম্প সমাপ্ত হয়, উহার নাম দেওয়া যাউক কম্পকাল...কম্পকাল যত অধিক হইবে, সেকেন্ডে কম্পসংখ্যা তত কম হইবে। সেকেন্ডে যতবার কম্প ঘটে, সেই সংখ্যাকে কম্প-দ্রুতি বলিব।...গ্যালিলিও পরিদোলকের কম্প-ঘটিত একটি অদ্ভুত নিয়ম আবিষ্কার করেন। তাহা এই—কম্পের পরিসর যাহাই হউক, উহার কম্পকালের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। পরিদোলক স্বস্থান ছাড়িয়া ডাহিনে যতদূর পর্যন্ত যায়, সেই দূরত্বকে উহার পরিসর বলিয়াছি।... কম্পটা এক ইঞ্চি, দশ ইঞ্চির পরিবর্তে দুই হাত পাঁচ হাত ভ্রষ্ট করিয়া দোলাইয়া দিলে কম্পকালের প্রভেদ বুঝা যায়, কিন্তু সেও কিঞ্চিৎ মাত্র। ইঞ্চিতে হাতে যত তফাত, কম্পকালের তেমন তফাত ঘটে না।...কম্পকালের পরিসর নিরপেক্ষতাতে একটা বড় উপকার হইয়াছে।... এই গুণেই পরিদোলক এত আদরের জিনিস হইয়াছে। উহাতেই আমাদের সময় মাপিবার যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে।"

এই উদ্ধৃতি থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যবহৃত পরিভাষার নমুনা পাওয়া যায়। যে সব কথাগুলির নীচে দাগ দেওয়া গেল—সেইসব পরিভাষা সহজবোধ্য অথচ শ্রুতিকটু নয়। এই পরিভাষা অবশ্য এখন আর ব্যবহৃত হয় না। 'পরিদোলক'-কে এখন শুধু 'দোলক' বলা হয়। 'কম্প' না বলে আজকাল আমরা 'কম্পন' বা 'দোলন' বলি। 'কম্পকাল'-কে 'পর্যায়' বলা হয়। 'পরিসরে'-র পরিবর্তে আমরা এখন 'বিস্তার' বলি।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'শব্দ-কথা' পুস্তকে নিজস্ব মন্তব্য অনেক স্থলে করেছেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন—"বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠনের সময় এই কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে শব্দটি প্রয়োগ করিবে, তাহার যেন একটি সুনির্দিষ্ট, বাঁধাবাধি, সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট তাৎপর্য থাকে। প্রত্যেক শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করিবে। সেই শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না এবং সেই অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল সূত্র।" আর এক স্থানে আছে ঃ

"আধুনিক বাংলা ভাষাতে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ অজস্র পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল বিদেশি শব্দ এখন নিতান্ত আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। উহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নেই; ত্যাগ করিলে ভাষারই অঙ্গহানি ও শ্রীহানি হইবে মাত্র।... বাংলা ভাষার কোশগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে ফরাসি, পোর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষার নিকটে প্রচুর ঋণ গ্রহণ আবিষ্কৃত হইবে। প্রচলিত ভাষার পুষ্টির জন্য এইরূপ ঋণ গ্রহণ আবশ্যক; বৈজ্ঞানিক ভাষার পুষ্টির জন্য ইহা অবশ্যম্ভাবী।...তবে সর্বত্র ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন নাই।...আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্ন-গর্ভা।...আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাহীন হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের

পাশে খাঁটি প্রচলিত বাংলা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাংলার দাবি কতক পরিমাণে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে।"

পরিভাষা সম্বন্ধে সব দিক বিবেচনা করে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষার সংকলন অথবা সৃজন করে তিনি সুধিজনের নিকট উপস্থাপিত করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তিনি আবশ্যক বলেছিলেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন—"রসায়ন-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান হইতে ইংরেজি শব্দ অকাতরে অবিকল গহণ করিতে হইবে। রসায়ন-শাস্ত্রোক্ত সত্তরটা মূল পদার্থের জন্য সত্তরটা খাঁটি বাংলা শব্দ সংকলনের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।" রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের কোনও-কোনও স্থলে ইংরেজি শব্দের অনুবাদের কোনও চেষ্টা করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ তাঁর রচিত 'বিচিত্র জগৎ' পুস্তকের 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ' প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃত করি। স্থলবিশেষে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তাঁর অনেক প্রবন্ধে দেখা যায়।

"ফারাডে কারবার করিতেন তাড়িত ও চুম্বক লইয়া। তাড়িতযুক্ত দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়াও টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। চুম্বকের কাঁটাও পরস্পর দূরে থাকিয়া টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়। ইহা Action at a distance। এই Actio at a distance ফারাডের মনঃপূত হয় নাই। তিনি মাঝে একটা medium খুঁজিতেছিলেন। কোনও স্থূল medium তিনি পান নাই বটে, কোনওরূপ দড়ি-দড়া খুঁজিয়া পান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মনশ্চক্ষু কতকগুলি শরীরহীন বস্তুহীন conceptual রজ্জুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইগুলির নাম দিয়াছিলেন তিনি 'Lines of force।'

রামেন্দ্রসুন্দরের 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখিত হয়েছে। 'মায়া-পুরী' প্রবন্ধ থেকে যে কয়টি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল, তা থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের সাবলীল সহজ ভাষা ও ভাব প্রকাশের অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পাই।

"প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানলব্ধ ও কল্পিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত মূর্তি যে কি, তাহা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার যে কয়টা ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্বারা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য বা কল্পনাগম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক থাকিত, অথবা এই ইন্দ্রিয়গুলিই অন্যরূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে জগতের মূর্তিও তাঁহার নিকট অন্যরপ হইত। কেমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতেও আসে না।"

'বিজ্ঞানের পুতুলপূজা' প্রবন্ধটিতেও এই ধরনের উক্তি দেখিতে পাই; যথা—"যে সকল জাগতিক সত্য লইয়া আমরা স্পর্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্বত্রই মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপ পরম দেবতা কোথায় কীভাবে আছেন আমরা জানি না; আমরা কেবল 'উপাসনাকানাং সিদ্ধ্যর্থং' কতকগুলি মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ঢাকঢোল বাজাইয়া তাহাদের পূজা করিতেছি।"

বাংলা ভাষা-প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের মজ্জাগত ছিল বলেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে তাঁর

অবদানের তুলনা হয় না। 'বঙ্গদর্শনে'-র পত্র-সূচনায় তিনি লিখেছেন—'ইংরেজি লেখক, ইংরেজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরেজ ভিন্ন খাঁটি বাঙালির সম্ভবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালিরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির কোনও সম্ভাবনা নাই।' সেই জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর নিজেদের গবেষণার ফল মাতৃভাষায় প্রকাশ করবার জন্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের বারবার অনুরোধ করেছিলেন—সে অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুই প্রথম বাংলা উচ্চাঙ্গ-বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলি 'অব্যক্ত' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর 'নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' নামক পুস্তকে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকের একটি অধ্যায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহকারী বিধুভূষণ দত্ত লেখেন। এই অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদদের কথা ও তাঁদের আবিষ্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। লক্ষ করবার বিষয় এই যে, পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রাচীন যুগে হিন্দুরসায়ন সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত আছে। পরিভাষা সম্পর্কে তিনি সংস্কৃত পুস্তকাদি থেকে আহরিত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরই নির্দেশে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দু-রসায়নশাস্ত্র থেকে যে পরিভাষা সঙ্কলন করেন, তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ছাপা হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি গবেষণামূলক বাংলা পুস্তকের নাম—'দেশী রং'। দেশীয় রঞ্জন শিল্পের পুনরুদ্ধারই এই পুস্তক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে চুনীলাল বসুর বিজ্ঞানের বইগুলি স্থান পাবার যোগ্য। তিনি ছিলেন অস্ত্রচিকিৎসক। ইংরেজি ও বাংলায় তিনি রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। তাঁর রচিত 'ফলিত রসায়ন' ইংরেজি ১৮৯৫ সনে ও দুই খণ্ডে 'রসায়নসূত্র' তার দু-বছর পরে প্রকাশিত হয়। চুনীলাল বসুর 'জল', 'বায়ু', 'কাগজ', 'আলোক', 'খাদ্য' প্রভৃতি বইগুলির যথেষ্ট আদর হয়েছিল।

এর পরেই বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে যাঁর অবদান বিশিষ্টতা এনেছিল—তিনি হলেন জগদানন্দ রায়। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি গুরু বলে স্বীকার করতেন। তিনি এক স্থানে লিখেছিলেন—'ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান করি। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি।' জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক লেখাগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনিই ইংরেজি ১৯০১ সনে জগদানন্দ রায়কে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে আনয়ন করেন। জগনানন্দ রায় 'প্রকৃতি পরিচয়', 'প্রাকৃতিকী' এবং 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' পরিণত বয়স্কদের জন্য প্রণয়ন করেন। ছোটদের জন্য তিনি বহু বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'গ্রহ-নক্ষত্র', 'পোড়া-মাকড়', 'বিজ্ঞানের গল্প', 'গাছ-পালা', 'মাছ, ব্যাং, সাপ', 'শব্দ', 'বাংলার পাখী', 'আলো', 'চুম্বক', 'স্থির-বিদ্যুৎ', 'চল-বিদ্যুৎ' প্রভৃতি নাম করা যেতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের শিষ্য হলেও জগদানন্দ রায়ের রচনায় পরিভাষা নিয়ে কোনও বাঁধাবাঁধি ছিল না। একই বৈজ্ঞানিক শব্দকে বোঝাতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন সহজ ও চলতি কথার ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞানের দুরুহ বিষয়গুলি সহজভাবে বোঝানোই তাঁর লেখার প্রধান

বিশেষত্ব ছিল। তিনি লিখেছিলেন—"সংস্কৃত ভাষামূলক কটমটো দেশি পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করি।"

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তবুও এ-কথা স্বীকার করতেই হয় যে, বিজ্ঞান-সাহিত্যেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 'প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি।' 'বালক', 'সাধনা' প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা প্রথম আরম্ভ করেন। 'সাধনা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-শিক্ষা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন—'পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাড়ে।...সন্ধ্যাবেলায় তিনি চৌকি আনিয়ে আঙ্গিনায় বসতেন...তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে গ্রহের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় ও অন্যান্য বিষয় আমায় শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন, তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি।...জীবনে এই আমার ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিজ্ঞানের সাধারণ পরীক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। কবির জীবনের প্রথম থেকেই সে জন্য বিজ্ঞানের গভীরতম প্রভাব তাঁর মধ্যে দেখা যায়। 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অবশ্য কর্তব্য।' এই বিশ্বাসের বলেই তিনি জগদানন্দ রায়কে শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরই অনুপ্রেরণায় এবং জগদানন্দের জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের ফলে বিজ্ঞান-শিক্ষার কাজ ও বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা যে কতখানি সার্থক হয়েছিল, তা আমরা সকলেই জানি।

রবীন্দ্রনাথের অনেক বৈজ্ঞানিক রচনা তাঁর রচিত 'পাঠ-প্রচয়' পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। 'সূর্যের কথা', 'একটি অপূর্ব বাড়ি', 'বৃষ্টি', 'রোগশত্রু', 'ছায়াপথ' প্রভৃতি লেখাগুলি তাঁর অপূর্ব লেখনীস্পর্শে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত। তাঁর শেষ বয়সের লেখা 'বিশ্বপরিচয়' বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রথমনাথ সেনগুপ্ত এই বইয়ের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই খসড়াই শেষে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে ছাপা হয়। এই পুস্তক রচনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন গবেষক ডঃ বংশী সেন কিছু সাহায্য করেছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এই পুস্তকটি উৎসর্গ করা হয়। 'বিশ্বপরিচয়ে'-র ভূমিকাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গভীর বিজ্ঞান-প্রীতির পরিচায়ক।

'বিশ্বপরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কোনো বিশেষ নিয়ম রক্ষা করে চলেননি। পরিভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানের বিষয়। 'বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্বজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।' পরিভাষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ

Asteroids—গ্রহিকা, Corona—কিরীটিকা, Troposphere—ক্ষুব্ধস্তর, Stratosphere—স্তব্ধস্তর, Electricity—বৈদ্যুৎ।

বিদেশি বৈজ্ঞানিক শব্দ অনেক ক্ষেত্রে তিনি বর্জন করেননি! যেমন—পজিটিভ,

নেগেটিভ, আম্রা, পেনাম্রা, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়ে'-র পরিভাষা আধুনিক বিজ্ঞান-সাহিত্যে হয়তো গ্রহণযোগ্য মনে হবে না। কেবল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তৃপ্তি নয়, সেইসঙ্গে সাহিত্য রসসৃষ্টিই 'বিশ্বপরিচয়ে'র প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লোকশিক্ষার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী থেকে যেসব গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থও অনেক ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বর্গতঃ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তাঁর রচিত 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত। চারুচন্দ্রের 'নব্য বিজ্ঞান' 'তড়িতের অভ্যুত্থান' 'বিজ্ঞান প্রবেশ', 'পদার্থবিদ্যার নবযুগ', 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী', প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে।

আধুনিক যুগের প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র, চারুচন্দ্র সিংহ, সরসীলাল সরকার ও গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ লেখকগণ। খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের 'মনের বিবর্তন', চারু সিংহের 'মনোবিজ্ঞান', সরসী সরকারের 'মনের কথা', গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' প্রভৃতি বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পদার্থবিদ্যায় যাঁরা বাংলা ভাষায় লিখে নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত মেঘনাদ সাহা, স্বর্গত শিশিরকুমার মিত্র, স্বর্গত নিখিলরঞ্জন সেন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাণীবিজ্ঞানে বাংলা ভাষায় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বহু প্রবন্ধ লিখে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর অনেক প্রবন্ধ তাঁর নিজস্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভর করে লেখা। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের লেখাও উল্লেখযোগ্য। রসায়নশাস্ত্রে স্বর্গত রাজশেখর বসুর নাম স্মরণীয়। নব্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রিয়দারঞ্জন রায়ের 'বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ' পুস্তকটি প্রশংসার যোগ্য।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের উন্নতি সাধনে বিজ্ঞান-বিষয়ে মাসিক পত্রিকার অবদান খুবই মূল্যবান। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পত্রিকাগুলির কথা জানা যায় তার নামগুলি নিম্নে দেওয়া গেল---

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলী' (১২৯২), বিহারীলাল ঘোষ সম্পাদিত 'বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান-রহস্য' (১২৯৩), কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা' (১২৯৬), প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (১২৯৮), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিজ্ঞান' (১৩০১)।

বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি বিজ্ঞান-পত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হয়। কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করা গেল ঃ—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান দর্পণ', ডাঃ অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত 'বিজ্ঞান' (ইংরেজি ১৯১২), সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' (ত্রৈমাসিক বাংলা—১৩৩১), ডাঃ সর্বাণীসহায় গুহসরকার সম্পাদিত 'বিজ্ঞান পরিচয়' (দ্বৈমাসিক—১৯৪১), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮), শাহ্ ফজলুর রহমান সম্পাদিত 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' (১৯৪৭)।

'বিজ্ঞান-দর্পণ' বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। 'বিজ্ঞান' পত্রিকায় যাঁরা প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, মন্মথলাল সরকার, নির্মলকুমার সেন,

আশুতোষ দে প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' বাংলা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। যেসব বিজ্ঞানীর লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ, তাঁদের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সহায়রাম বসু, হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, স্নেহময় দত্ত, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঢাকা থেকে ইংরেজি ১৯৪১ সন থেকে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি দ্বৈমাসিক বিজ্ঞান-পত্র সাত বছর প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সর্বাণীসহায় গুহসরকার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ বসু, সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কামদারঞ্জন কর প্রভৃতি লেখকগণ নিয়মিতভাবে এই পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দেশ বিভাগের পর থেকে 'বিজ্ঞান-পরিচায়ের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজি ১৯৪৮ সন থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাটি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পরিষদ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

পরিশেষে বক্তব্য—বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রতিভা যে অসামান্য দ্যুতি এনে দিয়েছিল, তারই আলোক আজও দীপ্যমান হয়ে রয়েছে। এই কথা স্মরণ করে আমরা রামেন্দ্রসুন্দরের শততম জন্মদিনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।*

---

* এই প্রবন্ধ বচনায় 'রামেন্দ্র রচনাবলী', ডাঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেব 'বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান এবং শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রবন্ধ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ভাবনা

পৃথিবীর বয়স

জননী বসুন্ধরার বয়স নিরূপণ করিতে গিয়া মোটের উপর আন্দাজে নির্ভর করিতে হয়। কেন না, জননী ভূমিষ্ঠ (?) হইবার সময় তাঁহার পুত্রকন্যার মধ্যে কাহারও উপস্থিতির সম্ভাবনা ছিল না, সেই জন্য জন্মকালনির্ণয়োপযোগী কোষ্ঠীর একান্ত অভাব। তথাপি যে জন্মকালনির্ধারণ একেবারে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করিয়া আপন অক্ষমতাপ্রদর্শনে বড়ই লজ্জাবোধ হয়। পক্ক কেশের প্রাচুর্য ও লোল চর্মের পরিমাণের সহিত ভগ্নাবশিষ্ট দন্তের সংখ্যা মিলাইলে অতি বড় প্রাচীনেরও বয়ঃক্রম অনেক সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। অতএব এই প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রাচীনা জননীর বয়স নিরুপণ করিতে গেলে নিতান্ত বাতুলতা না হইতে পারে।

তবে এরূপ প্রাজ্ঞের অস্তিত্বও বিরল নহে, যাঁহারা কররেখা বা ললাট-রেখামাত্র দেখিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিয়া জন্মকালের রাশি-নক্ষত্রের নির্দেশ করিয়া থাকেন। বোধহয় এই পদ্ধতিরই কোনওরূপ বিচারের দ্বারা এককালে স্থির হইয়াছিল, বসুন্ধরার বয়ঃক্রম ছয় হাজার বৎসরমাত্র। আমরা এই সকল কোষ্ঠী-উদ্ধারকের ক্ষমতার প্রশংসা করি; কিন্তু তাঁহাদের অবলম্বিত বিচারপ্রণালীর মাহাত্ম্য আমাদের মস্তিষ্কে আসে না। সুতরাং তাঁহাদের গণনার সত্যতাবিচারে আমাদিগের অধিকারও নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

অগত্যা প্রথমোক্ত আন্দাজনামক বিচারপ্রণালী অবলম্বনে যাহা ধার্য হইয়াছে, তাহারই উল্লেখে আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দুঃখের বিষয়, যাঁহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড মতভেদ দেখা যায়। মোটের উপরে ইঁহারা দুই দলে বিভক্ত। এক দল বলেন, মাতাঠাকুরাণির বয়সে গাছপাথর নাই: আর এক দল বলেন, জননীর জন্মগ্রহণ, সে তো কালিকার কথা। প্রথম দল চর্মের লোলতা ও ভগ্নদন্তের সংখ্যা দেখিয়া বিচার করেন। দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন, এই তো সে দিন জননীর জন্য সূতিকাগৃহ নির্মিত হইতেছিল, সূতিকাগৃহের দেওয়ালে তাহার তারিখ লেখা দেখিতে পাইতেছি।

আন্দাজ ব্যাপারকে যদি যুক্তি অভিধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত যুক্তি কতকটা এইরূপে দেখানো যাইতে পারে।

ভূবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা প্রথম সম্প্রদায়ের অবলম্বন। আমাদের বর্তুলাকারা জননীর দেহের অভ্যন্তরে অস্থিকঙ্কালের বিন্যাস কীরূপ আছে, তাহা ঠিক জানি না; তবে ভিতরটা বড় গরম; এবং সময়ে-সময়ে অন্তরিন্দ্রিয় চঞ্চল হইলে যেরূপ হৃৎস্পন্দন ও ক্রোধবহ্নির উদ্গিরণ ঘটে, তাহা হতভাগ্য পুত্র-কন্যার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, উপরের চর্মখানা অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়াতে অপোগণ্ডগুলি কোন রকমে কোলে পিঠে চাপিয়া দিন কাটাইতেছে।

উপরের সেই চর্মখানি স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত দেখা যায়;—কতকটা পেঁয়াজের খোলার মতো। কিন্তু, হায় সেই স্তরগুলি অনুসন্ধান করিলে আমাদের কত ভাই-ভগিনীর অস্থিকঙ্কালের

অবশেষ সেই স্তরমধ্যে প্রোথিত ও নিহিত দেখিয়া আমাদের নিজ পরিণামের জন্য দীর্ঘশ্বাস আপনা হইতে ফেলিতে হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই, সেই স্তরমধ্যে যাহাদের দেহাবশেষ দেখা যায়, তাহারাও এককালে আমাদেরই মতো দর্পের সহিত পা ফেলিয়া বিচরণ করিত, কিন্তু আকারপ্রকারে তাহাদের সহিত আমাদের কত প্রভেদ! তাহারাও আমাদের মতো জীবধর্মা ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কেমন জীব!

স্তরগুলি সর্ব্বত্র যথাবিন্যস্ত নহে, ভাঙিয়া চুরিয়া বাঁকিয়া জননীর পৃষ্ঠদেশের ভীষণ বন্ধুরতা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু তথাপি মোটের উপর স্তরগুলির বিন্যাসে একটা ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল পুরাতন জীবের অবশেষ স্তরে-স্তরে নিহিত দেখি, তাহাদেরও আকারে প্রকারে গঠনে একটা কালানুক্রমিক ও ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্নতি বা অভিব্যক্তির নিদর্শন দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, অদ্যাপি অসংখ্য স্রোতস্বতী জলধারা ধীরভাবে ও অলক্ষিতভাবে অথচ অবিরামে পাহাড়পর্বত ভাঙিয়া গুঁড়াইয়া ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা অপনয়নের চেষ্টায় আছে ও সাগরগর্ভে প্রাচীন স্তরাবলির উপরে আরও একটা স্তর গড়িয়া তুলিতেছে। অদ্যাপি পুরাতনী সুরধুনীর সহস্রধাবা "গতপ্রাণী মৃতকায়া" সহস্রজীবের কাকশৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্যে সমাহিত করিয়া রাখিতেছে।

অদ্য বঙ্গদেশে গঙ্গামুখে বা মিশরদেশে নীলমুখে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত নদনদী ভূপৃষ্ঠের সেই বন্ধুরতাপনোদনকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অদ্যাপি যে প্রণালীতে অলক্ষিতভাবে এই স্তরবিন্যাস ব্যাপার চলিয়াছে অতি প্রাচীন কালেও যে সেই প্রণালীক্রমেই অলক্ষিতভাবে স্তরবিন্যাস ব্যাপার ঘটিত, তাহাতে সংশয় করিবার সম্যক কারণ দেখা যায় না। সেই প্রণালীক্রমেই স্তরের উপরে স্তর জমিয়া প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল আবরণখানি ধরণির পৃষ্ঠোপরি জমিয়া গিয়াছে। গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি প্রভৃতি বড়-বড় স্রোতস্বতী বৎসরে কত মাটি বহিয়া থাকে, মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়া পৃথিবীর এই ত্বগাবরণ কত কালে নির্মিত হইয়াছে, কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একটা উদাহরণ দিতে পারি। উদাহরণটি মৃত আচার্য হক্সলির নিকট গৃহীত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল, যখন বড়-বড় ভূখণ্ড মহাবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ভূপৃষ্ঠের উপরে সেই আরণ্য উদ্ভিদের অবশেষ জমিয়া গিয়া একটা বিস্তীর্ণ আস্তরণস্বরূপ হইত। কালক্রমে ভূগর্ভের সঙ্কোচনে সেই ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে পরিণত হইলে চতুর্দিক হইতে অসংখ্য নদনদী মৃত্তিকা আনিয়া সেই উদ্ভিজ্জ আস্তরণের উপরে বিন্যাস করিত। এইরূপে সমুদ্রগর্ভের পূরণ হইলে উহা আবার স্থলে ও মহারণ্যে পরিণত হইত। আবার তাহার উপর উদ্ভিজ্জ আস্তরণ। আবার তদুপরি মৃৎস্তব। এইরূপে কত কাল ধরিয়া উদ্ভিজ্জ স্তরের উপর মৃন্ময় স্তর, তদুপরি আবার উদ্ভিজ্জ স্তর, জমাট বাঁধিয়া পৃথিবীর ত্বক নির্মাণ করিয়াছে। আমরা সেই ত্বকের আবরণ স্থানে-স্থানে ভেদ করিয়া পাথরকয়লা তুলিয়া স্বকার্য সাধন করি। ত্রিশ চল্লিশ হাত স্থূল এক একটা পাথরকয়লার স্তর দেখা যায়, এবং স্থানে-স্থানে এইরূপ দুই শত আড়াই শত স্তর উপর্য্যুপরি থাকে-থাকে সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মনে করো, পঞ্চাশ পুরুষ উদ্ভিদের দেহাবশেষ জমিয়া পাথরকয়লার একফুট স্তর জন্মে; মনে করো, এক-এক পুরুষ উদ্ভিদের জীবনকাল গড়ে দশ বৎসর। তাহা হইলে এক ফুট স্তর জমিতে

পাঁচশো বৎসর লাগিবে। পঞ্চাশ ফুট স্থূল স্তরের আড়াইশটা উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইতে ষাটি লাখ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে।

মনে রাখিও, পাথরকয়লার স্তরোৎপত্তির কাল পৃথিবীর বয়সেব এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র। বুঝিয়া দ্যাখো পৃথিবীর বয়স কত!

ভূতত্ত্ববিদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কালের আদি কল্পনা করিতে পারি না। অনাদি কালের নিকট কোটি-কোটি বৎসর নিমেষের মতো। তাই ভূতত্ত্ববিৎ নিঃসংকোচে পৃথিবীর পঞ্জরস্থ এক-একটা স্তরনির্মাণে দশ-বিশ কোটি বৎসরের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রায় একই পথে চলেন। জীববিদ্যা বলেন, মানুষের নিকট-জ্ঞাতি মর্কট। মর্কট রূপান্তরিত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে। অন্তত মানুষের উৎপত্তির অন্য কোনও বিচারসঙ্গত বিধি কাহারও মাথায় আসে নাই। কিন্তু মনুষ্য যে কত সহস্র বৎসর মনুষ্যাকারে ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান, তাহার নির্ণয় দুরূহ। অন্তত গত লক্ষ বৎসরের মধ্যে মনুষ্যশরীরে বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। মর্কটদেহের মনুষ্যত্বে পরিণতিতে যে কত লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার অতি সামান্য জীবাণু হইতে মর্কটমহাশয়ের অভিব্যক্তিব্যাপারে যে কত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে!

অতএব নিঃসংশয়ে সাব্যস্ত হইল যে, বিগত কোটি-কোটি বৎসর ধরিয়া ভূপঞ্জরে স্তরনির্মাণ ব্যাপার আজিকার মতোই ধীরভাবে চলিতেছে; এবং বিগত কোটি-কোটি বৎসরমধ্যে অঙ্গহীন অচেতন জীবাণু হইতে অভিব্যক্তির ধারাক্রমে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে! অর্থাৎ কিনা, প্রাচীনা বসুন্ধরার বয়সের কূলকিনারা নাই।

ভূতত্ত্ববিদ ও জীবতত্ত্ববিৎ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন সময়ে জগদ্বিখ্যাত সার উইলিয়ম টমসন (লর্ড কেলবিন) একটা বিষম খটকা উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্বে,—সে বড় বেশি দিনের কথা নয়,—পৃথিবীর অবস্থা বর্তমান অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তখন বসুন্ধরার জন্য সূতিকাগৃহ নির্মিত হইতেছিল মাত্র। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা সেই সূতিকাগৃহের প্রাচীরে নির্মাণের তারিখ অঙ্কিত দেখিতেছে। আজ যেভাবে নদনদী স্তরনির্মাণ করিতেছে, তখনও যে সেই ভাবে স্তরনির্মাণ করিত, তাহা বলা অনুচিত। তখন যে পৃথিবী জীবাধিবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই সন্দেহের কারণ প্রধানত তিনটি।

প্রথম,—সম্প্রতি পৃথিবী এক দিনে এক পাক আবর্তিত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব মুখে ঘুরিতেছে; আর চন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জলরাশিকে আপনার দিকে টানিয়া রাখিয়াছে। তাই পৃথিবীর আবর্তনে বাধা পড়িতেছে। এই জলরাশির বিপরীতক্রমে বিরুদ্ধমুখে পৃথিবীকে ঘুরিতে হইতেছে। যেন একখানি চাকা বেগে ঘুরিতেছে; আর তাহার পরিধিতে এক খণ্ড কাঠ সংলগ্ন থাকিয়া সেই আবর্তনে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ব্যাঘাতের ফলে আবর্তনের বেগ ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। গত দুই হাজার বৎসরেই আবর্তনের বেগ একটু কমিয়া গিয়াছে, এক পাক আবর্তনের কাল একটু বাড়িয়া গিয়াছে, অর্থাৎ অহোরাত্রের পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য এই কারণে বহুদিন হইতে

পৃথিবীর আবর্তনের বেগ মন্দীভূত হইতেছে। সহস্রকোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বেগ বর্তমান বেগের দ্বিগুণ ছিল, গণনায় কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। আজকাল যে ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টায় অহোরাত্র হয়, তখন সেই ঘণ্টার বারো ঘণ্টায় আহারাত্র হইত। সুতরাং তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত আজিকার অবস্থার কোনও তুলনা হইতে পারে না; ভূতত্ত্ববিদেরা যে এক নিশ্বাসে লক্ষকোটি বৎসরের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবে তাহার কোনও মূল্য নাই। একালের স্তরনির্মাণ ব্যাপার দেখিয়া সেকালের স্তরনির্মাণ ব্যাপারের সহিত তাহার কোনও তুলনা আনিতে পারা যায় না।

দ্বিতীয়,—সূর্য পৃথিবীকে সম্প্রতি যে পরিমাণে তাপ দিতেছে, তাহার মোটামুটি পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এই তাপের কিয়দংশমাত্র লইয়া নদনদীর সৃষ্টি ও গতি ও জীবের উৎপত্তি ও লীলাখেলা চলিতেছে। সূর্য কিছু চিরকাল ধরিয়া এই পরিমাণে তাপ দিয়া আসিতেছে না। বোধহয় পাঁচশো কোটি বৎসর পূর্বে সূর্য একবারেই তাপ দিত না। তখন সূর্যের তাপবিকিরণশক্তি ছিল না। সুতরাং তখন পৃথিবীতে মেঘবৃষ্টিও ছিল না, নদনদীও ছিল না; জীবের অস্তিত্বের কথাই নাই।

তৃতীয়,—পৃথিবী একটা তপ্ত পিণ্ডমাত্র। কেবল উহার উপরের চামড়াটা অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে মাত্র। বৎসর-বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাপ পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ কি না, পৃথিবী ক্রমেই শীতল হইতেছে। আজ পৃথিবীর অবস্থা কেমন, ও বৎসর-বৎসর কত তাপ খরচ হইয়া যাইতেছে, জানিলে ভবিষ্যতে কোনওদিন পৃথিবীর অবস্থা কীরূপ হইবে, গণিয়া বলা যাইতে পারে। সেইরূপ অতীত কালে, অন্তত কয়েক কোটি বৎসর পূর্বে, পৃথিবীর কখন কী অবস্থা ছিল, তাহাও গণিয়া বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পৃথিবী আরও গরম ছিল, সন্দেহ নাই। লর্ড কেলবিনের গণনায় দশ কোটি কি জোর বিশ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ এত গরম ছিল যে, তখন ভূপৃষ্ঠে শীতল কোটি চর্মের উৎপত্তি হয় নাই। তখন ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ ও তরল ছিল। সুতরাং তখন পৃথিবীতে জীবের উদ্ভব হয় নাই। টেট সাহেবের গণনায় এই কাল দশ-বিশ কোটি বৎসর পর্যন্তও উঠে না। তিনি দুই-এক কোটি বৎসরের ঊর্ধ্বে উঠিতে চাহেন না।

দাঁড়ায় এই। পৃথিবীর বয়ঃক্রম বড় বেশি নহে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বয়সের ইয়ত্তা করিতে চাহেন না, সেটা বিষম ভুল। কয়েক কোটি বৎসর মাত্র, হয়তো এক কোটি বৎসরও নহে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে স্তরবিন্যাস, জীবের উদ্ভব, জীবপর্যায়ে উন্নতি, এই সমুদয় ব্যাপার হয়তো কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্রেই ঘটিয়াছে।

উভয় পক্ষের বিবাদের ফল এইরূপ দাঁড়াইল। ভূপৃষ্ঠের কাঠিন্য প্রাপ্তির পর হইতে যদি পৃথিবীর বয়ঃক্রম হিসাব করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর বয়স কয়েক কোটি অথবা কয়েক লক্ষ বৎসরমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তৎপূর্বে পৃথিবী এত গরম ছিল যে, তখন জীবনিবাস সম্ভবপর হয় নাই। হয়তো সূর্য হইতে সম্যক পরিমাণ তাপও তখন আসিত না। হয়তো পৃথিবীর আবর্তনবেগ তখন এত প্রবল ছিল যে, এ কালের দিবারাত্রি ঋতুপরিবর্তনাদির সহিত সে কালের তত্তৎ ঘটনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ভূবিদ্যা যে অম্লানভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের একখানি সূক্ষ্ম পরদা গাঁথিতে দশ-বিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, এবং জীববিদ্যা যে কেবল মর্কটকে মানুষ বানাইতে বহু লক্ষ বৎসর চাহেন, তাঁহাদের সেরূপ দাবি অগ্রাহ্য।

আচার্য হক্সলি ভূবিদ্যাবিদের ও জীববিদ্যাবিদের তরফ হইতে জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কেলবিন ভূবিদ্যাকে কোটি দশেক বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রথমে রাজি ছিলেন। ভূপৃষ্ঠে প্রায় লক্ষ ফুট স্থূল স্তরের পর্দা জমিয়াছে। তাহা হইলে গড়ে হাজার বৎসরে এক ফুট করিয়া স্তর জমিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে; এবং হক্সলির মতে ভূবিদ্যার পক্ষেও এই পরিমিত কালের অধিক দাবি করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই দশ কোটি বৎসর মধ্যেই লক্ষ ফুট স্তর জমিয়াছে ও এই বিচিত্র জীবজগতে প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবিধ প্রাণী ও বিবিধ উদ্ভিদের অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, ইহা কোনওক্রমেই অসম্ভব নহে।

আর একটা কথা; কেলবিনের বিচারপ্রণালীতে কোনও ভুলের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যে সকল সংখ্যা লইয়া তিনি হিসাবে বসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কবুল মতেই আন্দাজি। ভূপৃষ্ঠে জলস্থলের সমাবেশের একটু ব্যবস্থাভেদ ঘটিলেই, সমুদ্রের জল খানিকটা জমাট বাঁধিয়া বরফস্তূপের আকারে মেরুপ্রদেশ দিয়া সরিয়া গেলেই, পৃথিবীর আবর্তনবেগে এক আধটু ব্যতিক্রম হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন সময়ে জলস্থলের বা জলবরফের সমাবেশ কীরূপ ছিল, না জানিলে আবর্তনের বেগ সম্বন্ধে কোনও একটা সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা কঠিন। লর্ড কেলবিন এই সকল কথা স্বয়ং তুলিয়াছিলেন। তারপর সূর্যের অবস্থাসম্বন্ধে এবং সূর্যকর্তৃক বিকীর্ণ তাপের পরিমাণসম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বড়ই কম; কেলবিন স্বয়ংই এই বিষয়ে স্বকীয় সিদ্ধান্ত কয়েক বার পরিবর্তিত করিয়াছেন। সুতরাং ঠিক এত বৎসর পূর্বে সূর্য তাপ বিকিরণ করিত না, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুঃসাহসিক ব্যাপার। তার পর পৃথিবীর নিজের তাপের কথা। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশটা আমাদের পরিচিত; কিন্তু উহার আভ্যন্তরিক অবস্থাবিষয়ে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভূগর্ভে যে সকল পদার্থ আছে, তাহাদের তাপপরিচালনক্ষমতা কীরূপ, এবং উষ্ণতাসহকারে তাহাদের তাপপরিচালনক্ষমতা বাড়ে কি কমে, এই সকল গণনায় না ধরিলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করিতে গেলে প্রচুর ভ্রান্তিরই সম্ভাবনা। সম্প্রতি লড কেলবিনের জনৈক শিষ্যই গুরুপ্রদত্ত গণনার বিশুদ্ধিপক্ষে সন্দিহান হইয়াছেন। বস্তুত এই সকল বিষয়ে আমাদের আরও ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। আজ কেলবিন যেখানে দশ কোটি বৎসর মঞ্জুর করিতে প্রস্তুত আছেন, আর একটু অভিজ্ঞতা বাড়িলেই হয়তো সে স্থলে পঞ্চাশ কোটি দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ভূবিদ্যবিদের ও প্রাণীতত্ত্ববিদের পরাজয় স্বীকার করিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

আশা করা যায়, অচিরকালে ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। আমরাও তখন জননী বসুন্ধরার বয়সের তথ্য কতকটা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইব।*

* অধুনা রেডিয়ম নামক অদ্ভুত ধাতুর আবিষ্কারের ফলে লর্ড কেলবিনের হিসাব উলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

প্রাণময় জগৎ

পুরাণে না কি গল্প আছে, প্রজাপতির প্রাণী সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল, এবং তিনি কয়েকটি প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। উহারা জন্মিবা মাত্র খাইখাই করিয়া উঠিল, এবং আর কিছু না পাইয়া, অবশেষে সৃষ্টিকর্তাকেই খাইতে উদ্যত হইল। সৃষ্টিকর্তা বিপদ দেখিয়া বহুতর প্রাণী সৃষ্টি করিলেন, এবং বলিয়া দিলেন,—'তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ করো।" তদবধি প্রাণীরা পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, কেহ কাহাকেও খাতির করে না।

এবার প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করিব, এইরূপ আপনাদের নিকট প্রতিশ্রুত আছি। গণ্ডগোল পরিহারের জন্য গোড়ায় বলিয়া রাখি,—প্রাণী আর জীব, এই দুইটি শব্দ আমি একটু ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিব। ইংরেজিতে যাহাকে living being বা living organism বলে, প্রাণী বলিতে আমি তাহাই বুঝিব। উদ্ভিদ এবং জন্তু, vegetable and animal, সমস্তই প্রাণীর পর্যায়ে পড়িবে। আর জীব শব্দটি আমি কেবল চেতন জন্তু, conscious animal, এই সঙ্কীর্ণ অর্থে বাঁধিয়া রাখিব। উদ্ভিদের অথবা নিম্নশ্রেণির জন্তুর চেতনা আছে কি না, এই উৎকট প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা না পাইয়াও মোটামুটি আমরা চেতন এবং অচেতন, এই দুই শ্রেণিতে যাবতীয় প্রাণীকে ফেলিয়া থাকি; চেতন ও অচেতন বলিলে কী বুঝিব, তাহার স্থূল ধারণাও আমাদের একটা আছে। সেই স্থূল ধারণা লইয়াই এখন আমাদের কাজ চলিবে। ধরিয়া লইলাম,—প্রাণ এবং চেতনা, এই দুইটা স্বতন্ত্র concept। বহু প্রাণীর চেতনা আছে বটে, কিন্তু প্রাণী মাত্রেরই চেতনা না থাকিতে পারে। ইংরেজিতে প্রাণের তর্জমায় life এবং চেতনার তর্জমায় consciousness রাখা যাইতে পারে।

জড় জগৎ লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষত উহা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক। তদ্ব্যতীত জড়ের সহিত কারবারে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত একটা বিরোধের বা resistance-এর প্রত্যক্ষ অনুভূতি আমরা পাইয়া থাকি। এই resistance-এর অনুভূতিকেই পণ্ডিতেরা জড় পদার্থের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া থাকেন। কেন না, যে ব্যক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়বঞ্চিত—যে দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না, যাহার আস্বাদনের বা ঘ্রাণের ক্ষমতা নাই, যে শীতোষ্ণতা বুঝিতে পারে না, তাহারও muscular sensation থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা সে জড় পদার্থকে একটা resisting something প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। এই অনুভবের ক্ষমতাটুকু হারাইলে তাহার পক্ষে জড় পদার্থের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। ফলে আমাদের মতো সাধারণ চেতন জীবের পক্ষে রূপ-রসাদির অতিরিক্ত এই প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতিই বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অতিক্রম করিয়া, extension এবং motion, এই দুই মন-গড়া concept-এর সাহায্যে জড় পদার্থের বিবরণ দিয়া থাকেন। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের আর দরকার নাই। প্রত্যক্ষ perception-এর দিক দিয়া, আর কল্পিত conception-এর দিক দিয়া জড় পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার আমি চেষ্টা করিয়াছি; এবং আমার চেষ্টা যদি নিতান্তই ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনাদেরও সে বিষয়ে

কতকটা ধারণা জন্মিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে বাগবাহুল্য করিয়া আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিব না। আপনারা জানেন, প্রাণী মাত্রেই একটা দেহ ধারণ করে, এবং প্রাণীদের সেই দেহ জড় দ্রব্যেই নির্মিত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাবতীয় প্রাণীর দেহকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, চিরিয়া পোড়াইয়া নানারূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু পরিচিত জড় দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের সন্ধান পান নাই। জড় জগৎ হইতেই মশলা সংগ্রহ করিয়া প্রাণীদেহ নির্মিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে প্রাণী আছে কি না, জানি না; থাকিলেও তাহাদের কথা কিছুই বলতে পারিব না। কিন্তু পৃথিবীতে যে সকল প্রাণী আছে, তাহারা দেহ গড়িবার সময় জড় জগৎ হইতেই মশলা লয়; তবে একটু বাছাই করিয়া লয়। এ-বিষয়ে তাহাদের একটু বিশিষ্ট রুচি আছে। আপনারা জানেন, যাবতীয় জড় দ্রব্যের মধ্যে তাহারা Carbon বা কয়লা, আর হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এই চারিটি দ্রব্যকেই বাছিয়া লয়, এবং এই চারিটার সহিত যৎকিঞ্চিৎ গন্ধক বা ফসফরস বা আর কিছু যোগ করিয়া আপনাদের দেহ-নির্মাণের উপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া লয়। অন্য কোনও সামগ্রী গ্রহণ করে না; অথবা উপস্থিতি হইলে, অন্য সামগ্রী বর্জন করিবার চেষ্টা করে। এই কয়টা জিনিসে যে মশলা প্রস্তুত হয়, পণ্ডিতেরা তাহার নাম দিয়াছেন প্রোটোপ্লাজম। এই প্রোটোপ্লাজমই প্রাণীদেহ গড়িবার মশলা, ইহাকেই প্রাণী-পদার্থ বলিব। এই জিনিসটা ইট, কাঠ, লোহার মতো শক্তও নয়, আবার তেল জলের মতো নিতান্ত তরলও নয়। উহা না কঠিন, না তরল, পরন্তু কোমল, নমনীয়, flexible। আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাঁহাদের laboratory-তে বসিয়া নানা রকমের সামগ্রী তৈয়ার করিতেছেন, কিন্তু কয়লার সহিত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন মিশাইয়া এই প্রোটোপ্লাজম এ পর্যন্ত তৈয়ার করিতে পারেন নাই। চেষ্টার অন্ত নাই; কিন্তু যাবতীয় চেষ্টা এ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। কেহ বা এখনও আশা রাখেন, কেহ-কেহ বা হাল ছাড়িয়া বলিতেছেন যে, laboratory-তে আমরা প্রোটোপ্লাজম কখনোই প্রস্তুত করিতে পারিব না। প্রাণীরা কিন্তু স্বভাবত প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং প্রাণীদের মধ্যে যেগুলাকে vegetable বা উদ্ভিদ বলা যায়, তাহাদেরই আবার এই ক্ষমতা অত্যন্ত পরিস্ফুট। উদ্ভিদেরা জড় জগৎ হইতে কয়লা, আর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন টানিয়া লয়, এবং তাহাদিগকে মিলাইয়া আপনাদের দেহ-নির্মাণের উপযোগী মশলা,—ওই যে প্রোটোপ্লাজম,—তাহা প্রস্তুত করে। এই কাজের জন্য উদ্ভিদগুলাকে বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। সূর্যদেব নয় কোটি মাইল দূরে থাকিয়া যে রাশি-রাশি উত্তাপ এবং আলো প্রায় সম্পূর্ণ অকারণে চারি দিকে ফেলা-ছড়া করিতেছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় করিয়া উদ্ভিদেরা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা আপনাদের দেহ গড়িয়া, দেহের মধ্যে উহা সঞ্চিত রাখে। জন্তুগুলা চতুর; তাহারা উদ্ভিদের নিকট ওই প্রোটোপ্লাজম ধার করিয়া লয় অথবা কাড়িয়া লয়, সেই তৈয়ারি মশলাকেই একটু ঘাঁটিয়া লইয়া আপনাদের দেহ নির্মাণ করে। ফলে আপনারা জানিয়া রাখুন যে, প্রাণী মাত্রেরই—উদ্ভিদ ও জন্তু, এই উভয়বিধ প্রাণীরই দেহ প্রোসোপ্লাজমে নির্মিত। এই প্রোটোপ্লাজম জড় পদার্থ বটে, কিন্তু ইহা একটু বিশিষ্ট রকমের জড় পদার্থ। অন্যান্য দ্রব্যকে বর্জন করিয়া কয়েকটা বিশিষ্ট দ্রব্যে এই প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত হইয়াছে। ওই কয়টা দ্রব্যই কেন বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার উত্তর দেওয়া কঠিন। হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেন যে, ওই কয়টা বিশিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে কার্বন বা কয়লা অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য; উহার তরলতাপাদন

দুঃসাধ্য। আর হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন—এই তিনটা দ্রব্যের কাঠিন্য সম্পাদন, এমনকী, তরলতাপাদনও অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সে দিন পর্যন্ত উহারা permanent gas নামেই পরিচিত ছিল; সম্প্রতি অতি কষ্টে উহাদিগাকে জমাট বাঁধানো গিয়াছে। এই অতি কঠিন কয়লার সহিত এই অতি চঞ্চল গ্যাস কয়টিকে কোনওরূপে মিলাইয়া যে না-কঠিন না-তরল প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত নয়, তাহাই প্রাণীদিগের কোমল কমনীয় দেহ নির্মাণের জন্য সর্বদা উপযোগী। স্পেন্সারের এই কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত না হইতে পারে।

মানুষ বুদ্ধিজীবী জীব; বুদ্ধিবলে কত অঘটন ঘটাইতেছে; এখনও কিন্তু এই প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারে নাই। বুদ্ধিবলে ইহা ঘটাইতে পারা যায় নাই বটে, কিন্তু গাছপালার মতো একেবারে বুদ্ধিহীন অচেতন প্রাণী কীরূপে সূর্যের আলোককে খাটাইয়া লইয়া এই প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞান-বিদ্যার এখনও কল্পনায় আসে নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা কোনওরূপ conceptual formula-য় উহার কোনওরূপ বিবরণ বা description দিতে সমর্থ হন নাই। এই ঘটনা এখনও একটা রহস্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। মানুষের Reason বা প্রজ্ঞা এখানে অদ্যাপি প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। যাঁহারা প্রজ্ঞাদেবীর পরম ভক্ত, প্রজ্ঞার ক্ষমতার সীমানা টানিতে যাঁহারা কুণ্ঠিত, তাঁহারা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, একদিন-না-একদিন এ রহস্যের ভেদ হইবেই। ক্রমাগত experiment করিতে-করিতে এক দিন আমরা বাহির করিতে পারিবই যে, কীরূপ ঘটনাচক্রে, কীরূপ ঘটনার পরিবেশ, কীরূপ circumstances, কীরূপ conditions উপস্থিত করিতে পারিলে কয়লা, হাইড্রোজেন প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রোটোপ্লাজমের উৎপাদন করিবে। সেই ঘটনাচক্র কৌশলক্রমে উপস্থাপিত করিবামাত্র ওই দ্রব্যগুলা পরস্পর মিলিত হইয়া যাইবে। বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ হইতেছে, সেই ঘটনাচক্রের আবিষ্কার। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্রে মিশ্রিত করিয়া আগুন দিবা মাত্র উহা জলে পরিণত হয়। লোহাকে সোঁতা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে, উহা মরিচায় পরিণত হয়। সেইরূপ সেই ঘটনাচক্র আবিষ্কার করিতে পারিলেই, উত্তাপ বা আলো বা তড়িৎ বা X-ray বা আর কিছুর প্রয়োগ দ্বারা আমরা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারিব। কোন পথে চলিলে সেই ঘটনাচক্রে আবিষ্কার হইবে, এখন খোঁজো সে পথ। এখন সম্পূর্ণ আঁধার দেখিতেছি; কিন্তু একদিন-না-একদিন পথ আবিষ্কৃত হইবেই। প্রজ্ঞা তখন আপনার দীপশিখা জ্বালিয়া সেই পথে চলিতে-চলিতে প্রাণী-পদার্থ নির্মাণের formula গড়িয়া লইবে এবং তৎসাহায্যে design করিয়া প্রাণী-দেহের মশলা বানাইবে এবং হয়তো সেই মশলা হইতে প্রাণীদেহ গঠনেরও উপায় উদ্ভাবন করিবে। অতএব হতাশ না হইয়া খোঁজো সেই পথ। ভূবিদ্যাবিদ পণ্ডিতেরা ভূপৃষ্ঠের স্তর অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতীত কালে এমন এক দিন ছিল, যখন ভূপৃষ্ঠে কোনও প্রাণী বিদ্যমান ছিল না। হয়তো ভূপৃষ্ঠ তখন এত তপ্ত ছিল যে, সেই তপ্ত অবস্থায় কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয় নাই। অথবা তখন বায়ুমণ্ডলের বা অন্তরীক্ষের এমন অবস্থা ছিল, যাহাতে কয়লার সহিত অক্সিজেন, হাইড্রোজন প্রভৃতির সংযোগ-সাধন সম্ভবপর হয় নাই। অবশেষে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের ক্রমশ হ্রাস হইয়া, অথবা অন্তরীক্ষের অবস্থা-বিকৃতি ঘটিয়া এক দিন এরূপ ঘটনাচক্র উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে আপনা হইতেই কয়লার সহিত অক্সিজেন প্রভৃতির যোগ ঘটিয়া গেল এবং প্রাণীদেহের মশলা প্রস্তুত হইল। নতুবা ভূস্তর অন্বেষণ কবিয়া এরূপ দেখা যায় কেন,

যে পৃথিবীতে প্রাণী এক কালে ছিল না, সহসা এক দিন প্রাণীর আবির্ভাব হইল, এবং সেই আবির্ভাবের পর হইতে প্রাণের ধারা অক্ষুণ্নভাবে প্রবাহিত হইতে থাকিল? তখন যে ঘটনাচক্রে উপস্থিত হইয়াছিল, আমরা যদি laboratory-তে বসিয়া যন্ত্রযোগে, বুদ্ধিবলে সেইরূপ ঘটনাচক্র ঘটাইতে পারি, তাহা হইলে এখনই বা সেই প্রাণী-পদার্থ প্রস্তুত হইবে না কেন? অতএব খোঁজো, খোঁজো, কেবলই পথ খোঁজো। হতাশ হইও না।

অপর পক্ষের লোক, যাঁহারা laboratory-তে প্রাণী-পদার্থ এ পর্যন্ত প্রস্তুত করিতে না পারিয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা বলিতে চাহেন, আমাদের যন্ত্র-তন্ত্রের যতই উন্নতি হউক, আমরা কৌশলে ও বুদ্ধিবলে কখনই প্রাণী-পদার্থ বা প্রোটোপ্লাজম প্রস্তুত করিতে পারিব না। এই প্রাণ বা life একটা কিম্ভূতকিমাকার অপরূপ পদার্থ—যাহা কখনও প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বীকার করিবে না। কখনই আমরা বুদ্ধিবলে উহাকে আয়ত্ত করিতে পারিব না। যে প্রাণী, যাহার প্রাণ আছে, সেই প্রাণী,—প্রাণহীন জড় পদার্থকে, non-living dead matter-কে, প্রাণী-পদার্থে—living matter-এ পরিণত করিবার স্বভাবত ক্ষমতা রাখে। অতি সামান্য অচেতন উদ্ভিদকণিকার পক্ষে যাহা সাধ্য—স্বভাবত সাধ্য, বুদ্ধিজীবী মানুষের বুদ্ধিকৌশলে তাহা সাধ্য নহে। আমাদের চোখের সামনে ছোট-বড় গাছগুলা—তৃণ হইতে বটবৃক্ষ পর্যন্ত গাছগুলা আকাশের অভিমুখে সবুজ পাতা বিছাইয়া দিয়া, সূর্যের আলোকে খাটাইয়া লইয়া, বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করিয়া লইতেছে; এবং সোঁতা মাটির ভিতর শিকড় চালাইয়া লোনা জল সঞ্চয় করিতেছে; এবং সেই লোনা জলের সহিত কয়লা সংযোগ করিয়া প্রাণী-পদার্থ স্বভাবত প্রস্তুত করিতেছে; এবং সেই মশলায় আপনাদের দেহ নির্মাণ করিয়া লইতেছে। ওই গাছগুলার যে ক্ষমতা আছে, এত চতুর জন্তুগুলার সে ক্ষমতা নাই। এমনকী, এত বড় বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিক মানুষের সে ক্ষমতা নাই। শুধু নাই নহে; সে ক্ষমতা তাহাদের পাইবারও কোন আশা দেখি না। তাহাদিগকে চিরকালই সেই গাছপালার নিকট হইতে খাদ্য সামগ্রী ধার করিয়া লইয়া, অথবা বলপূর্বক আত্মসাৎ করিয়া লইয়া আপনাদের দেহ নির্মাণ এবং দেহ রক্ষা করিতে হইবে। গাছপালার এই প্রাণ আছে বলিয়াই সে dead matterকে living matter-এ পরিণত করিতে পারে। এই প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ভূপৃষ্ঠে এক দিন এই প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, এ বিষয়ে ভূবিদ্যার সাক্ষ্য মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। এক দিন সহসা কী জানি কী রূপে ধরাতলে এই প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং তদবধি ইহার স্রোত চলিতেছে, তহাও দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু প্রাণের আকস্মিক আবির্ভাব কী রূপে হইল, কীরূপ ঘটনাচক্রে হইল, তাহা এখন জানি না। জানিয়াও বিশেষ লাভ হইবে না। আমরা laboratory-তে যন্ত্র-তন্ত্র যোগে সেই ঘটনাচক্রে ঘটাইতে পারিলেও, প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে পারিব না। উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ, একটা অপরূপ অদ্ভুত পদার্থ, যাহা কিছুতেই আমাদের formula-র মধ্যে ধরা দিবে না, কিছুতেই আমাদের হুকুম মানিবে না। এই প্রাণের আবির্ভাব, ইহা হয়তো বিধাতা পুরুষের একটা খেয়াল, ইহা তাঁহার special creation। এক দিন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল যে, জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হউক, অমনই জড় পদার্থে প্রাণের সঞ্চার হইল। অমনই খানিকটা প্রাণহীন জড় দ্রব্য প্রাণময় প্রোটোপ্লাজম পদার্থের উৎপত্তি ঘটাইল। তদবধি সেই প্রোটোপ্লাজমই জড় জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তাহাকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ করিয়া নূতন প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতেছে; তাহাতে প্রাণের ধারা অবিচ্ছেদে চলিয়া

আসিতেছে। বিধাতা পুরুষ নিরুদ্বেগ হইয়া আপনার কেরামতি দেখিতেছেন, অথবা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, সেই creation কার্য এখনও চলিতেছে। বিধাতা পুরুষ ঘুমান নাই, এখনও তিনি আমাদের অজ্ঞাত দেশে, অজ্ঞাত উপায়ে প্রাণী-পদার্থের সৃষ্টি করিতেছেন, আমরা তাহার কোনও সন্ধান রাখি না।

Creationt-বাদীরা এইরূপে বিজ্ঞান-বিদ্যাকে নিরস্ত করিতে চাহেন। বিজ্ঞান-বিদ্যা যত দিন প্রাণ-পদার্থকে আয়ত্ত করিতে না পারিবেন, যত দিন laboratory-তে বসিয়া প্রাণহীন জড়ে প্রাণের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তত দিন প্রতিপক্ষকে একবারে নিরুত্তর করিতে পারিবেন না। তবে বিজ্ঞান-বিদ্যা আশা করিয়া বসিয়া আছেন যে, আমরা এত কাল খেজুরের রস এবং আখের রস হইতে চিনি পাইতাম, এখন যখন laboratory-তে বসিয়া চিনি তৈয়ার করিতে পারিতেছি, তখন এক দিন খেজুরের গাছ এবং আখের গাছ গড়িয়া তুলিতে পারিব না কেন? পরাজয় স্বীকার বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাব নহে।

আপনারা Vitalist বা প্রাণীবাদী এবং Mechanist বা জড়বাদী বা যন্ত্রবাদী, এই দুই দলের দ্বন্দ্বের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। এই দ্বন্দ্ব বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং শীঘ্র মিটিবারও কোনও সম্ভাবনা নাই। British Association সভায় এক বৎসরের প্রেসিডেন্ট Mechanistic থিয়োরির জয় গান করেন। পর বৎসরের সভাপতি vitalism-এর ধ্বজা তোলেন। উভয় পক্ষের বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার মূল কোথায়, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে। Mechanistরা বলেন, প্রাণী-দেহ একটা যন্ত্র মাত্র। ক্লক ঘড়ি বা স্টিম এঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন একটা যন্ত্র, সেইরূপ একটা যন্ত্র মাত্র। ইহার জটিলতার অন্ত নাই বটে, কিন্তু তথাপি ইহা একটা যন্ত্র মাত্র। ঘড়ির কিংম্বা এঞ্জিনের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব কী কাজ করে এবং কী রূপে কাজ করে, তাহা আমরা জানি। প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক অবয়ব আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারি এবং যথাস্থানে স্থাপন ও সন্নিবেশ করিয়া যন্ত্রকে কর্মক্ষম করিয়া তুলিতে পারি। কিন্তু দেহ-যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গগুলি কোনটায় কী কাজ করে, তাহা আমরা সমস্ত বুঝিয়া উঠিতে আজিও পারি নাই। কী রূপে কাজ করে, তাহাও অধিকাংশ স্থলে বুঝিতে পারি নাই। আমাদের রাসায়নিক পণ্ডিতেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এখনো গড়িয়া তুলিতে পারেন না। যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া সাজানো-গোছানো, তাহাও এখন সার্জ্জনদের পক্ষে অসাধ্য। কাজেই ওই দেহ-যন্ত্র আমরা স্বহস্তে গড়িতে পারিতেছি না। কিন্তু Physiology এবং Chemistry বিদ্যা এই সকল তথ্য নির্ণয়ে নিযুক্ত আছেন। ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছি। কালে সমস্তই হয়তো বুঝা যাইবে। তখন এখন যাহা অসাধ্য, তাহা অসাধ্য থাকিবে না। এই যে গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত প্রকাণ্ড সৌর জগৎ, ইহা আমরা স্বহস্তে গড়ি নাই বা কখনো গড়িতে পারিবও না। তথাপি ইহাও তো একটা যন্ত্র মাত্র। এই সৌর জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি formula-র ভিতর ফেলিয়াছি। সেই formula-র প্রয়োগে উহাদের গতিবিধির সূক্ষ্ম গণনা আমাদের সাধ্য হইয়াছে। সেইরূপ দেহ-যন্ত্র কখন আমরা গড়িতে না পারিলেও উহার যাবতীয় গতিবিধি আমাদের formula-র মধ্যে একদিন-না-একদিন নিশ্চয় ধরা দিবে। সৌর জগৎ যেমন Mechanics-বিদ্যার আয়ত্ত হইয়াছে, দেহযন্ত্রও সেইরূপ Mechanic বিদ্যার আয়ত্ত হইবে। খাঁটি Mechanics-এর আয়ত্ত না হউক, Physics এবং Chemistry-বিদ্যার আয়ত্ত হইবে, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনও হেতু

দেখি না। প্রাণহীন জড় জগতেও সর্বত্র আমরা mechanical description দিতে পারি নাই। একটা steam-engine বা একটা dynamo-র আমরা সম্পূর্ণ mechanical description দিতে পারি না;—Physics এবং Chemistryর আশ্রয় লইতে হয়—তাপ-বিদ্যা, তাড়িত-বিদ্যা এবং রসায়ন-বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু ওই সকল বিদ্যাও নূতন-নূতন স্বতন্ত্র formula গড়িয়া steam-engine-কে এবং dynamo যন্ত্রকে আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। Physics এবং Chemistry-র আরও উন্নতি হইলে প্রাণী-দেহের মতো জটিলতর যন্ত্রকেও আয়ত্ত করিতে পারিব কেন? এই কয় বৎসরের মধ্যেই Physiology-বিদ্যা প্রাণী-দেহের অনেক তথ্যকে mechanical, physical এবং chemical forlula-য় ফেলিয়াছে। হতাশ হইও না, হাল ছাড়িও না, কেবল পথ খোঁজো। দেহ-যন্ত্রের জন্য কোনোরূপ mysterious vital force-এর অবতারণা করিতে হইবে না।

গণ্ডগোল হয় এই vital force নামটা লইয়া। এক পক্ষ প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এই vital force-এর অবতারণা করেন; বলেন যে, mechanical, physical বা chemical forces প্রাণের স্বরূপ নির্ণয়ে কুলাইবে না। যেখানে কুলায় না, সেইখানেই তাঁহারা বলেন, 'ওঃ, এটুকু তো vital force-এর কাজ'। এই vital force নামটি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত তৃপ্তি দেয়, তাঁহাদের মনে পরম শান্তি আনয়ন করে। 'এটা vital force-এর কাজ'—এই বলিলেই তাঁহারা যেন নিশ্চিন্ত হন। যেন আর কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহাদের এইরূপ আচরণে ধৈর্য রাখিতে পারেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা vital force নামটা শুনিলেই চটিয়া যান; বলেন,—এ আবার কী উৎপাত? আমি mechanical, chemical, physical force বুঝি; এই কিম্ভূতকিমাকার vital force-এর উৎপাত আমার পক্ষে অসহ্য। প্রকৃতপক্ষে vital force নামটার উপর এরূপ চটিবার সম্যক হেতু দেখি না। জড় জগতের mechanical description দেওয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার চরম লক্ষ বটে। গ্যালিলিও, নিউটন এবং তাঁহাদের অনুবর্তীরা এই পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত বিজ্ঞান-বিদ্যা জড় জগতের যাবতীয় ঘটনাকে mechanical formula-য় ফেলিতে পারেন নাই। যখনই দরকার হইয়াছে, তখনই নূতন-নূতন non-mechanical concept গড়িয়া নূতন-নূতন forceএর আশ্রয় লইয়াছেন। Electric force, magnetic force, chamical force ইত্যাদি নূতন-নূতন non-mechanical concept-এর আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ প্রাণের তথ্য বুঝাইতে গিয়া যদি একটা নূতন concept-এর আশ্রয় লইতে হয় এবং তাহার vital force-ই নাম দেওয়া যায়, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার চটিবার কোনও কারণ নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যা নিজেই তাহা করিয়া আসিতেছেন। আসল বিরোধটা নাম লইয়া নহে; বিরোধ—ভাব লইয়া, তাৎপর্য লইয়া। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা vital force বলিতে এমন একটা কিছু বোঝেন, যাহা কস্মিন কালে formula-র মধ্যে ধরা দিবে না, যাহা গণনার আমলে আসিবে না, যাহা Reason-এর বা প্রজ্ঞার বশীভূত হইবে না, মানুষের Intelligence যাহাকে খাটাইয়া কোনও কাজে লাগাইতে পারিবে না; কোনও কর্মসাধনে প্রয়োগ করিতে পারিবে না। এইখানেই বিজ্ঞান-বিদ্যার আপত্তি। বিজ্ঞান-বিদ্যা vital force নাম প্রয়োগ করিতে স্বচ্ছন্দে পারেন; কিন্তু তিনি জানেন যে, electric force বা magnetic force বা chemical foece-এর মতো এই vital force-কেও এক দিন আমি formula বদ্ধ করিতে পারিব। হয়তো

শেষ পর্যন্ত Matter এবং formula-এর অথবা extension ও intertia-র terms-এ ইহার বিবরণ দিতে পারিব। আজি না পারি, শত বর্ষান্তে পারিব। আজিও আমি electric, magnetic ও chemical force-কে একটা mechanical formula-য় ফেলিতে পারি নাই। কিন্তু উহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন non-mechanical formula-য় আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। সেইরূপ এই vital force একদিন-না-একদিন formula-য় বাঁধা পড়িবে। উহার দ্বারা প্রাণী-দেহরূপ জটিল যন্ত্রের যাবতীয় ঘটনা আমার গণনাসাধ্য হইবে। সৌর জগৎ বা স্টিম ইঞ্জিন বা ডাইনামো যেমন আমার গণনার আমলে আসিয়াছে, দেহ-যন্ত্রেরও যাবতীয় ব্যাপার সেইরূপ আমার গণনার আমলে আসিবে।

এখন আপনারা দেখিতেছেন, Vitalist এবং Mechanist-দের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কোথায়। দ্বন্দ্বের মূল নামে নহে, দ্বন্দ্বের মূল নামের তাৎপর্যে। Vitalist-রা বলেন, এই যে Vital force, ইহা কখনও গণনার বশ হইবে না। Mechanist-রা বলেন, যদি কখন গণনার বশ হয়, তবেই উহাতে আমার কাজ চলিবে, নতুবা এখন উহা আমার অগ্রাহ্য; একটা মিছা নামে আমি লোকের চোখে ধূলা দিতে চাহি না। কথাটা ভালো করিয়া বুঝুন। কোনো ঘটনা গণনাযোগ্য হইলেই যে, সর্বদা আমরা উহা গণিতে পারি, এমন নহে। দৃষ্টান্ত লউন। মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়,—অন্তরীক্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা, atmospheric phenomena,—অন্তরীক্ষ-বিদ্যা বা meteorology-বিদ্যা ইহাদের গণনায় নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক রাজ্যে গভর্নমেন্ট বহুত টাকা খরচ করিয়া এক-একটা meteorological department পুষিতেছেন। বড়-বড় পণ্ডিত গণনা-কার্যে নিযুক্ত আছেন। কত সূক্ষ্ম যন্ত্র লইয়া তাঁহারা দিবারাত্রি অন্তরীক্ষ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। অথচ meteorologist-দের forecast-এ—তাঁহাদের ভবিষ্যৎ গণনায় লোকে কতটুকু শ্রদ্ধা করে? ইহার মানে কী? অন্তরীক্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা জড় জগতের ঘটনা, Physical phenomena। সমস্তই Mechanical এবং Physical Science-এর আলোচ্য। ইহার অধিকাংশ formula-ই আমরা গড়িয়া ফেলিয়াছি। অথচ সেই সকল formula আমরা সূক্ষ্মভাবে প্রয়োগ করিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলে একখানা মেঘোৎপত্তির factor এতগুলা যে, সমুদয় factor-এর হিসাব লইয়া formulaর প্রয়োগ করিয়া আমরা সমস্যার সমাধান করিতে পারি না। সমাধান করিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহা সমাধানযোগ্য—fully determinate—সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ইহার কোনও স্থলে কোনও রহস্য কোন mystery নাই। সমস্ত factor গুলোর সমস্ত data গুলোর হিসাব লইতে পারিলে, অন্তরীক্ষঘটিত প্রশ্নের অঙ্কপাত করিয়া একটা-না-একটা উত্তর মিলিবে; একটা বই দুটা উত্তর হইবে না। সমস্ত factor-এর হিসাব লইতে পারি না বলিয়াই আমরা যে উত্তর পাই, তাহা অত্যন্ত মোটা হয়, অত্যন্ত approximate হয়। এত মোটা হয় যে, গণনা-ফলের সঙ্গে দৃষ্ট ফলের গরমিল দেখিয়া লোকে বিদ্রুপ করে। এটা বিজ্ঞান-বিদ্যার অপূর্ণতার এবং অক্ষমতার পরিচয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অন্তরীক্ষ-বিদ্যাকে কেহ physical science-এর বাহিরে ফেলিতে চাহিবেন না। বস্তুতই গণনা কার্যটা বড় বিষম কার্য। অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনা এত জটিল যে, উহার সমস্ত data-র, সমস্ত factor-এর হিসাব লওয়া কঠিন। formula গুলোও এখনও সর্বত্র পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাহার উপর গণনা-বিদ্যা বা mathematics-বিদ্যা গণকের হাতে এক মাত্র অস্ত্র; উহা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র হইলেও অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের

মীমাংসায় এখনও পরাঙ্মুখ। ধরুন না জ্যোতিষশাস্ত্র। দুইটা জড় দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তাহার formula নিউটন দিয়া গিয়াছেন। সে formula-টিতে কোনও অপূর্ণতা আছে বলিয়াই মনে হয় না। যে-কোনও দুইটা দ্রব্যের মধ্যে উহা অক্লেশে প্রয়োগ করা চলে; এবং গণনাফলে ও দৃষ্ট ফলে কোনও ভেদ হয় না। সূর্যের সম্মুখে পৃথিবীর গতিবিধি বা পৃথিবীর সম্মুখে চন্দ্রের গতিবিধি অক্লেশে গণিতে পারা যায়। যে-কোনও স্কুলের ছেলের পাটিগণিতে একটু জ্ঞান আছে, সে-ই অক্লেশে ইহা গণিয়া দিতে পারে। কিন্তু দুইটার উপরে তিনটা দ্রব্য হইলেই,—সূর্যের পাশে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়কে রাখিয়া হিসেব করিতে গেলেই গণনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তখন পাটীগণিতে কুলায় না, Problem of Three Bodies সমাধান করিতে লাপ্লাসের মাথা আবশ্যক হয়। আর Problem of Four Bodies, চারিটা দ্রব্যের পরস্পরের সম্পর্কে গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে লাপ্লাসের মাথাতেও কুলায় না; তখন approximate solution-এর—মোটা উত্তরেই তৃপ্ত থাকিতে হয়। অথচ formula সেই একটি, নিউটন যাহা বাঁধিয়া দিয়াছেন। ক্রটি নিউটনের formula-র নহে; ক্রটি গণিত-বিদ্যার। এ-কালের গণিত-বিদ্যা অতি প্রচণ্ড অস্ত্র। কিন্তু জটিল জগদযন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিতে গিয়া উহাকেও পরাহত হইয়া আসিতে হয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্তমান অবস্থায়, বর্তমান অস্ত্রশাস্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম গণনা সর্বত্র সাধ্য না হইলেও জড় জগতের ঘটনাবলি যে সম্পূর্ণ নিয়মবদ্ধ, উহার কোনও স্থানে কোনও ফাঁক নাই, উহার সর্ব্বত্র determinism, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ মাত্র করেন না। প্রাণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যাঁহারা Mechanist, তাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন যে. প্রাণের সমুদায় তত্ত্বও fully determinate;—সম্প্রতি আমরা formula-য় ফেলিতে পারি আর না পারি, গণনা করিতে পারি আর না পারি, প্রাণসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা জড় জগতের অন্যান্য ঘটনার ন্যায় সমাধানযোগ্য; উহা স্বভাবত determinate নহে। পক্ষান্তরে যাঁহারা vitalist, তাঁহারা এইটুকু মানিতে চাহেন না। তাঁহারা জোরের সহিত বলিতে চাহেন,—প্রাণী-দেহ যখন জড় পদার্থে নির্ম্মিত, যখন উহাতে সাধারণ জড় ধর্মগুলি বিদ্যমান আছে, তখন উহার কিয়দংশ physical science-এর বা mechanical science-এর আলোচ্য হইতে পারে বটে; এখনও আলোচ্য হইতেছে, এবং পরে আরও হইবে, ইহা স্বীকার করি বটে; কিন্তু প্রাণের যাহা বিশিষ্টতা, যাহাতে প্রাণের প্রাণত্ব, তাহা কখনও physical science-এর আমলে আসিবে না, কখনও formulaয় ধরা দিবে না, কখনই গনণাযোগ্য হইবে না। উহা স্বভাবতই গণনার অযোগ্য, স্বভাবতই ındeterminate এবং incalculable; উহাতে কোনও নিয়মের আবিষ্কার করিতে পারিবে না; উহা চিরকালই খেয়ালের সামগ্রী থাকিবে। উহার স্বাভাবিক ধর্ম freedom। প্রাণবাদীরা এই গণনার অযোগ্য, বিধিবহির্ভূত ব্যাপারেরই নাম দিয়াছেন vital force; তাঁহাদের মতে উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য অন্যান্য force-এর সজাতীয় নহে।

আপনারা creation আর evolution, এই দুইটা কথা শুনিয়াছেন। বাঙ্গালায় evolution-কে অভিব্যক্তি বা পরিণতি বলা যাইতে পারে, এবং creation-কে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। আমি এ পর্যন্ত সৃষ্টি শব্দ পুনঃপুন প্রয়োগ করিয়াছি। সর্বদা অতি সাবধানে প্রয়োগ করিয়াছি। সর্বত্র উহাকে এই creation অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই creation বা সৃষ্টি বস্তুতই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, nothing হইতে

something-এর উৎপত্তি। আপনি হয়তো বলিবেন, এই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি unthinkable, চিন্তার অগম্য। অতএব উহা বাজে কথা। বাজে কথা হোক আর না হোক, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তি, অধিকাংশ মাঝারি মানুষ, আপনি যাহাকে চিন্তার অগম্য বলিতেছেন, তাহা অবলীলাক্রমে মানিয়া আসিতেছে। ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের সমুদয় শাস্ত্রটা এই creation তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুই ছিল না, বিধাতা পুরুষের খেয়ালে এক দিন সবই হইল, ইহাই ইহুদিদের এবং খ্রিস্টানদের সৃষ্টিতত্ত্ব। সূক্ষ্মভাবে সন্ধান করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন, আমাদের ব্রাহ্মণের শাস্ত্রও এই সৃষ্টিতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বা creation-তত্ত্বের পাশাপাশি evolution-তত্ত্ব বা পরিণতি-তত্ত্বও আছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। সৃষ্টিবাদে বলে,—অসৎ হইতে সৎ হইতে পারে; পরিণতিবাদ বলে,—অসৎ হইতে সৎ হয় না; সতেরো বিকারে, সতেরো পরিণতিতে সতেরো মূর্তি বদল হয় মাত্র। যাহা ছিল, তাহাই থাকে; তবে মূর্তি বদল করিয়া রূপান্তরিত হইয়া থাকে। Evolution ব্যাপারটা যাহা ছিল, তাহারই নূতন করিয়া সাজানো-গোছানো ব্যাপার, একটা rearrangemcnt-এর ব্যাপার মাত্র। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই পরিণতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। উহার ধ্রুবত্বে সংশয় করিলে, বিজ্ঞান-বিদ্যা দিশাহারা হইয়া যায়, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যায়। Rearrangement ব্যাপারে নিয়মের আবিষ্কার চলে—creaction কেবলই খেয়ালের ব্যাপার। এই পরিণতিবাদ বুঝাইতে গিয়া বলা হয়, ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনা কার্য-কারণ শৃঙ্খলা দ্বারা, chain of causationt-এর দ্বারা আবদ্ধ। ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে পৌর্ব্বাপর্যের বাঁধা সম্পর্ক দেখা যায়। পূর্বতন কারণ হইতে পরবর্তী কার্যকে উৎপন্ন দেখা যায়। উৎপন্ন হয় না-ই বা বলিলাম। কার্য, কারণকে অনুসরণ করে, এইরূপ দেখা যায়। কোন কারণের পর কোন কার্য উপস্থিত হয়, তাহা পর্যবেক্ষণে পাওয়া যাইবে। ধীরভাবে পর্যবেক্ষণে তাহার সন্ধান মিলিবে। প্রত্যুত দেখা যাইবে, আজি যে কারণের পর যে কার্য উপস্থিত হয়, ভবিষ্যতেও সেই কারণের পর সেই কার্য উপস্থিত হয়। ইহাকেই ইংরেজিতে বলে uniformity of nature। আমাদের দেশে বলে নিয়তি। আর একটি সুন্দর নাম আছে, তাহার নাম ঋত; অর্থাৎ orderly sequence of phenomena in nature। অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য কেন উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞান-বিদ্যা করেন না। তবে কোন কারণের পর কোন কার্য উপস্থিত হয়, তাহা অবধানের সহিত দেখিয়া, সেই কারণ ও কার্যের পরম্পরাকে সূত্রবদ্ধ, formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এ কথাগুলা নূতন কথা নহে। পূর্বেই আমি ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এই নিয়তির শৃঙ্খলা, এই determinism গোড়ায় মানিয়া লইতে বিজ্ঞান-বিদ্যা কেন বাধ্য, ইহা মানিয়া না লইলে ব্যবহারিক বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ কেন অচল হয়, তাহা বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছি। সে সকল কথার পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নাই। প্রাণের সমস্যা বৈজ্ঞানিকের formula-র মধ্যে ফেলিতে হইলে কীরূপ পূর্ববর্তী ঘটনাচক্রে পরবর্তী প্রাণের উৎপত্তি হয়, তাহার সন্ধান করিতে হইবে। পর্যবেক্ষণ দ্বারা সেই ঘটনাচক্রের একবার সন্ধান পাইলে বৈজ্ঞানিক জোরের সহিত বলিতে পারিবেন, আমি বুদ্ধিবলে সেই ঘটনাচক্র উপস্থাপিত করিয়া প্রাণের উৎপাদন করিব। এক কথায় বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিতে চাহেন, একবার আমাকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রাণোৎপাদনের forluma-গুলি গড়িতে দাও, এবং প্রাণ-প্রবাহের formula-গুলি গড়িতে দাও, এবং সমস্ত data সংগ্রহ করিতে দাও, তাহা হইলে কোন তারিখে,

কোথায় প্রথম প্রোটোপ্লাজমের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা তো বলিবই। উপরন্তু কাইসার উইলিয়ম লড়াইয়ে হটিয়া, কোন তারিখে prussic acid খাইয়া আত্মহত্যা করিবেন, তাহাও নিঃসশয়ে বলিয়া দিব।

যাঁহারা creation-বাদী, তাঁহারা বলিবেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব্যবহারিক জগতের কিয়দংশ নিয়মবদ্ধ, সূত্রবদ্ধ করিতে পারিব, কিন্তু সমস্তটা পারিব না। ব্যবহারিক জড় জগতের অভ্যন্তরেও স্থানে-স্থানে খাপছাড়া miracle দেখা যাইবে। উহা কোন formula-য় আবদ্ধ হইবে না। কার্য-কারণ শৃঙ্খলার মাঝে-মাঝে ছাঁট দেখা যাইবেই। আগাপিছার সহিত সেখানটার কোনও স্থায়ী সম্পর্ক আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে না। সমস্ত antecedents দেওয়া থাকিলেও ওই consequent ঘটিবে, কি ঘটিবে না, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। তাঁহাদের মতে বস্তুতই ব্যবহারিক জগতের স্থানে-স্থানে ওইরূপ কাট-ছাঁট আছে। সেইখানেই miracle, সেইখানেই special creation, সেইখানেই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি। কেন না, উহার আবির্ভাব সম্পূর্ণ একটা অভিনব ঘটনা। কোনওরূপ পূর্বতন ঘটনা হইতে গণনা দ্বারা উহার নির্দেশ হয় না। তাঁহাদের মতে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ওইরূপ একটা special creation, বিধাতা পুরুষের সম্পূর্ণ একটা খেয়াল। কেবল আবির্ভাবটাই খেয়াল কেন, প্রাণের যেটুকু বিশিষ্টতা, তাহাও আগাগোড়া খেয়াল। সার অলিভার লজের মতো ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকও একঘরে হইবার ভয় পরিত্যাগ করিয়া ওই রকমের কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন,— হ্যাঁ-হ্যাঁ; প্রাণীর দেহে যাবতীয় জড়-ধর্ম বিদ্যমান বটে। ধরো না কেন, conservation of energy। কোনও দ্রব্য কোনওরূপেই এই energy-র পরিমাণ কণিকা মাত্র বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। প্রাণীরাও এক কণিকা energy উৎপাদন করিতে না ধ্বংস করিতে পারে না। অথচ দেখা যায়, energy-র পরিমাণে তারতম্য না ঘটাইয়াও energy-কে ভিন্ন মুখে পরিচালন করিবার স্বাধীন ক্ষমতা প্রাণীর আছে। এই যে প্রাণ, ইহা স্বাধীনভাবে energy-কে guide করিতে পারে, direct করিতে পারে, উহার গন্তব্যপথ নির্দেশ করিতে পারে। এ বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ free, কোনরূপ বাঁধা নিয়মের বশ নহে।

আপনারা মানুষের free will সম্বন্ধে অনেক বাগবিতণ্ডা শুনিয়াছেন। প্রুসিয়ার বিধাতা পুরুষ ইচ্ছা করিলে প্রুসিক অ্যাসিড খাইতে পারেন, অথবা না-ও পারেন। এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি খাইবেন, কি খাইবেন না, তাহা কেহ কস্মিনকালে কোনওরূপে পূর্বে গণিয়া বলিতে পারিবে না। আপনাদেরও বোধ করি তাঁহার এ বিষয়ে স্বাধীনতায় কোনও সংশয় নাই। কিন্তু খাঁটি বিজ্ঞান-বিদ্যা এই স্বাধীনতা মানিতে চাহেন না। বিজ্ঞান-বিদ্যা বলিবেন, কাইসারের মাথার খুলির ভিতর অণুপরমাণু-ইলেকট্রনগুলা কীরূপ অবস্থায় কীরূপে ছুটাছুটি করিতেছে, তাহা জানিতে পারিলে আমি গণিয়া বলিব, তাঁহার স্নায়ুযন্ত্র তাঁহার মাংসপেশিকে সঞ্চালন করিয়া প্রুসিক অ্যাসিডের শিশি তাঁহার মুখে তোলাইবে কি না। তিনি প্রুসিক অ্যাসিড খাইবেন, কি না খাইবেন, তাহা তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থাসাপেক্ষ, এবং তৎকালে বাহির হইতে মগজে যেরূপ উত্তেজনার ধাক্কা পড়িতেছে, তৎসাপেক্ষ; সে বিষয়ে তাঁহার কোনও স্বাধীনতা নাই। তাঁহার মগজের তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই বলিয়া আমি এখন গণিতে পারিতেছি না। অবস্থা জানিলেও তদুপযোগী formula আজিও গড়িয়া উঠিতে পারি নাই। নতুবা কাইসারের চিত্তে হিরণ্যকশিপু দৈত্যের মতো বিশ্বদ্রোহী বল

থাকিলেও, নিয়তিনির্মিত পাষাণস্তম্ভ হইতে কোন নরসিংহ নির্গত হইয়া তাঁহার কুক্ষি বিদারণ করিবে, তাহা কাগজে-কলমে কষিয়া গণিয়া দিতাম। বিজ্ঞান-বিদ্যার বর্তমান অক্ষমতা সেই অপূর্ণতা-সাপেক্ষ। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে পূর্ণ হইতে দাও, হতাশ হইও না। পথ খোঁজ। কোথাও কোন freedom-এর অস্তিত্ব দেখিবে না।

আপনারা দেখিতেছেন, উভয় পক্ষের বিবাদ শেষ পর্যন্ত freedom এবং determinism লইয়া। প্রাণ-পদার্থ নিয়তির অধীন বটে কি না, তাহা লইয়াই ঝগড়া। যদি প্রাণ-পদার্থ সর্বতোভাবে নিয়তির অধীন না হয়, যদি উহাতে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর আবির্ভাব একটা creation, একটা miracle; এবং ভূপৃষ্ঠে যে প্রাণের প্রবাহ, তাহাও একটা perpetual miracle'। এখন দেখিতে হইবে, প্রাণে এমন কোনও বিশিষ্টতা আছে কি না, যাহাকে জড়-ধর্ম বলা যাইতে পারে না, যাহা স্বভাবত জড়-ধর্ম হইতে ভিন্ন, যাহাকে কখনও কোন formula-তে ফেলিতে পারা যাইবে না। আসুন, একবার সেই পথে চলি।

গোড়াতেই আমি বলিয়াছি, জগতে আবির্ভূত হইয়াই প্রাণীগুলা খাইখাই করিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে প্রশ্ন তুলিয়াছি, যদি তাহার উত্তর সম্ভব হয়, হয়তো এইখানেই উত্তর মিলিবে। এই খাইখাই করাটাই প্রাণের বিশিষ্ট লক্ষণ। বস্তুতই প্রাণ এই ক্ষুধা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষুধা—বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা; কিছুতেই ইহা মেটে না, এবং কোনও কালেই ইহা মিটিবে না। যদি কখনও মেটে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইয়াছে। ধরিয়া লইলাম, প্রাণ একদিন হঠাৎ জড় জগতে আবির্ভূত হইল। আবির্ভূত হইয়াই দেখিল যে, জড় জগৎ আপনার বিশাল প্রাণহীন কায় লইয়া সম্মুখে উপস্থিত আছে। প্রাণ সেই জড় জগৎকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে চায়। জড়েরই কিয়দংশ লইয়া আপনার দেহ নির্মাণ করিয়া, সেই দেহে কতকগুলি বিশিষ্ট শক্তি অর্পণ করিতে চায়। প্রাণ প্রাণহীন জড় পদার্থকে প্রোটোপ্লাজমে পরিণত করে। প্রোটোপ্লাজমের বাংলা প্রতিশব্দ নাই। উহাকে আমি প্রাণী-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। তদ্ভিন্ন জড় পদার্থকে আমি জড় পদার্থই বলিব। প্রাণ দেখিল,—এই জড় পদার্থকেই হজম করিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে, জড় পদার্থকেই প্রাণী-পদার্থে পরিণত করিতে হইবে; সেই ক্ষমতা সে রাখে। ইহাই তাহার বিশিষ্টতা। যদি Miracle-ই বলিতে হয়, ইহাই miracle। প্রাণ সমস্ত জড় জগৎকে হজম করিয়া, আত্মসাৎ কবিয়া এই প্রাণী-পদার্থে পরিণত করিতে চায়; সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া একটা প্রাণময় জগতে পরিণত করিতে চায়;—ইহাই তাহার ক্ষুধা। এই ক্ষুধা মিটিলে তাহার অন্য কোনো কাজই থাকে না। কাজেই এ ক্ষুধা মিটিবে না। সমস্ত জড় জগৎ যতক্ষণ, প্রাণময় না হইবে, ততক্ষণ প্রাণীর এই ক্ষুধা মিটিবে না। আবির্ভূত হইয়াই প্রাণ এই কর্মে প্রবৃত্ত হয়; যেন সুপ্তোত্থিত কুম্ভকর্ণের মতো ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে চায়। কিন্তু প্রবৃত্ত হইয়াই দেখে, একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। সমস্ত জড় পদার্থকে সে হজম করিতে পারে না। জড় পদার্থের কিয়দংশ তাহাকে বাছিয়া লইতে হয়। কয়লা আর অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন আদি তুচ্ছ পদার্থ। হিরা জহরত আপনি কোটি মূল্যে খরিদ করেন। অথচ বদরিদাস মোকিম বাহাদুরও হিবা জহরতকে সিন্ধুকের মধ্যেই রাখিয়াছেন—চুনি-পান্না উদরসাৎ করিতে সাহস করেন নাই। তুচ্ছ কয়লা আর অক্সিজেন পাইবার জন্য তিনি চব্বিশ ঘণ্টা বদন ব্যাদান করিয়া বসিয়া আছেন। পৃথিবীর বাহিরে যদি কোথাও প্রাণ থাকে, তাহার আচরণ কীরূপ, আমি জানি না।

মঙ্গল গ্রহে যদি প্রাণী থাকে, সে হিরা-জহরত হজম করিতে পারে কি না, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে প্রাণের সহিত আমরা পরিচিত, সে প্রাণের ক্ষমতা এখানে ওইরূপে সীমাবদ্ধ। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাণের ক্ষমতা এখানে যে সীমাবদ্ধ, তাহা স্বীকার্য। এই স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা হেতু প্রাণ জড় জগতের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারে। অপর অংশকে বর্জন করিতে বাধ্য হয়। কিয়দংশ গ্রহণ করিতেছে, তাহাই উপাদেয়। অপরাংশ বর্জন করিতেছে, তাহাই হেয়। এই উপাদেয় গ্রহণে এবং হেয় বর্জনে প্রাণের চেষ্টা চলিতেছে। বর্জনীয় অংশ সমীপে উপস্থিত হইলে উহাকে চেষ্টাপূর্বক বর্জন করিতে হয়। এইখানে একটা বিরোধ। কিন্তু ইহার অপেক্ষায় আরও গুরুতর বিরোধ আছে। প্রাণ যেমন জড়কে আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে, জড়ও তেমনই অবিরাম প্রাণী-পদার্থকে জড় পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর একটা যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিকে জড় পদার্থের উপাদেয় অংশ প্রাণের কবলে আসিয়া নূতন প্রাণী-পদার্থ উৎপাদন করিতেছে। অন্য দিকে জড়ের চেষ্টায় প্রাণী-পদার্থ সর্বদা জড় পদার্থে পরিণত হইতেছে। নিরন্তর এই যুদ্ধ চলিতেছে। এই বিরোধের ধারাই প্রাণের প্রবাহ। প্রাণী-পদার্থের জড়ত্বে পরিণতির নামান্তর মৃত্যু; এই মৃত্যুই প্রাণের পরাজয়। প্রাণ পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। জড়ও ছাড়িবার পাত্র নহে; প্রাণকে এক দিন পরাজয় করিবেই। অন্তত এ-কালের বৈজ্ঞানিকরা বলেন, শেষ পর্যন্ত প্রাণের পরাজয় হইবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন ছিল, যখন প্রাণ ছিল না। প্রাণ থাকিলেও তাহা গুপ্তভাবে ছিল। প্রাণের আবির্ভাবের হয়তো চেষ্টা ছিল, কোনরূপ গুপ্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইবার হয়তো চেষ্টা ছিল; কিন্তু জড় তাহাকে আবির্ভূত হইতে দেয় নাই। যেরূপেই হউক, সহসা এক দিন প্রাণের আবির্ভাব হইল; তদবধি উভয়ের যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। জড় উহাকে পিষিয়া মারিয়া লুপ্ত করিবার বা গুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রাণ সর্বদা জাগ্রত থাকিয়া, অবহিত থাকিয়া, সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়া, সহস্র অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লড়াই চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক দিন আসিবে, যখন প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভবপর হইবে। সমুদয় প্রাণী-পদার্থ আবার প্রাণহীন জড়ে পরিণত হইবে। মৃত্যু আসিয়া সমস্ত প্রাণকে লুপ্ত করিবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল-হইতে পারে। পৃথিবীতে প্রাণ এক দিন ছিল না, অথবা থাকিলেও অস্পষ্ট বা গুপ্ত অবস্থায় ছিল,—ইহা যখন নিশ্চয়, তখন ভবিষ্যতে প্রাণ আবার থাকিবে না, অথবা পুনরায় গুপ্ত হইবে, ইহাতে চমকাইবার হেতু নাই। শেষ যাহাই হউক, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন বিলম্বিত করিবার জন্যই প্রাণের যাবতীয় চেষ্টা। এই চেষ্টার ইতিহাসই প্রাণের ইতিহাস। এই ইতিহাসের ব্যাখ্যানই Biology বা প্রাণীবিদ্যা। ব্যাপারটা কী, ভালো করিয়া বুঝুন। প্রাণ চায়—সমস্ত জড়কে আত্মসাৎ করিতে; আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় করিতে। সমস্তকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কতকটা গ্রহণ, বাকিটা বর্জন করিতে হয়। তজ্জন্য একটা প্রয়াস, একটা বিরোধ স্বীকার করিতে হয়। জড় কিন্তু প্রাণকে বিনাশ করিতে চায়। এ বিষয়ে সে একেবারে নিষ্ঠুর, তাহার করুণা মাত্র নাই। আমরা প্রাণী, পদে-পদে এই নিষ্ঠুরতার ভুক্তভোগী। প্রাণ বলে, আমি জড়কে প্রাণময় করিব। জড় বলে, তুমি আমাকে প্রাণময় করিবে কি, আমি তোমাকে পিষিয়া মারিব। প্রাণ বলে,—আচ্ছা, দেখা যাক; আমি থাকিব, আমি কিছুতেই যাইব না। প্রাণের যেন একটা সঙ্কল্প আছে, একটা will

আছে। ইহা তাহার will to live; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। কোনও-না-কোনওরূপে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। আপনাকে রক্ষা করা, আপনাকে বাঁচানো তাহার এক মাত্র স্বার্থ। তদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোনও অর্থ নাই। ইহাতেই তাহার সার্থকতা, ইহাই তাহার এক মাত্র কর্ম। কাজেই প্রাণ ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতাই প্রাণের বিশিষ্টতা—এই কথাটুকু আপনাদিগকে আমি অত্যন্ত জোরের সহিত বলিতে চাহি। এইখানেই ডারউইন-তত্ত্বের ভিত্তি। জড়ের এই অবিরাম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রাণ আজ পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই; প্রত্যুত আপনাকে সর্বত্র বিচিত্ররূপে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

একবার জড়ে নামিয়া আসুন। জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর বিরোধের মতো কতকটা দেখিতে পাইবেন। একটা জড় দ্রব্য অন্যকে ধাক্কা দেয় এবং নিজে ধাক্কা লয়। যেখানে ঘাত, সেইখানে প্রতিঘাত। জড় দ্রব্য নিজে বিকৃত হয়, অন্যকেও বিকৃত করে। গ্রহ উপগ্রহ পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, চুম্বকের কাঁটা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, চুম্বকের কাঁটা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে, অণু পরমাণু electron পরস্পর ঠেলাঠেলি করে। কাজেই জড় দ্রব্যের মধ্যেও পরস্পর একটা বিরোধের মত আছে। তা তো থাকিবেই। গোড়াতেই বলিয়াছি, জড়ের ধর্ম impenetrability; একটা জড় দ্রব্য আর একটা জড় দ্রব্যে অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উভয়ে ষোলো আনা মিশিয়া যাইতে পারে না। মিশিতে পারিলে তাহাদের অস্তিত্বই ব্যর্থ হইত। পূর্বের কথা মনে করিয়া দেখুন। সমাকার আকাশকে বিষমাকারে চিহ্নিত করাতেই যখন উহাদের অস্তিত্বের সার্থকতা, তখন আকাশের এই চিহ্নগুলি পরস্পর মিশিয়া গেলে তাহাদের কোনও চিহ্নত্বই থাকিত না। দুইটা জড় দ্রব্য যখন মিশিবে না, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকিবেই। সেই ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে তাহাদের গতিবিধি। সেই ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পাদনই উহাদের ঠেলাঠেলি, উহাদের বিরোধ। কিন্তু এই যে বিরোধ ইহা formula-য় ফেলা চলে। কোন ক্ষেত্রে বিরোধের মাত্রা, ঠেলাঠেলির মাত্রা কতটুকু হইবে, ইহা গণিয়া বলা চলে। ইহা বাঁধা-ধরা আছে। ইহার মধ্যে অণু মাত্র element of incalculability বা uncertainty নাই। কোনওরূপ chance-এর বা gambling-এর element নাই। আপনারা দুই পালোয়ানের কুস্তি দেখিতে বসিয়াছেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে গোপনে যদি বন্দোবস্ত থাকে যে, আমরা উভয়ে এইরূপে হাত-পা নাড়িব এবং আমাদের এতটুকু হার-জিত হইবে, সে লড়াইয়ে আপনার কোনও কৌতূহল থাকে কি? তাহারা যে লড়াই করে, নিতান্তই উদাসীনের মতো লড়াই করে। বাহিরে একটা লড়াইয়ের অভিনয় হয় বটে, কিন্তু ভিতরে কোনও আন্তরিকতা থাকে না। যে হারে, সে নিতান্ত উদাসীনের মতো হারে। যে জিতে, সে নিতান্ত উদাসীনের মতো জিতে। জড় দ্রব্যের পরস্পর লড়াই সেইরূপ উদাসীনের লড়াই। একবারে ধরা-বাঁধা কাটা-ছাঁটা। ইহাতে কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই। নতুবা ক্রিকেট বলের বা বিলিয়ার্ড বলের অঙ্ক Dynamics-এর বহিতে স্থান পাইত না। হিমাচল যখন ভূগর্ভের ঠেলা পাইয়া গা তুলিয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে উঠিয়াছিলেন। যতটুকু ধাক্কা পাইয়াছিলেন, তাহাতে যতটুকু উঠা উচিত, ঠিক ততটুকুই উঠিয়াছিলেন। যদি বা পালটা ধাক্কা দিয়া থাকেন, তাহাও ঠিক সমুচিত মাত্রামতো। আবার তিনি যে বহু লক্ষ বা বহু কোটি বৎসর ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি তুষারে বুক পাতিয়া বসিয়া আছেন, শত স্রোতস্বিনী বুক চিরিয়া তাঁহাকে খণ্ড-বিখণ্ড কবিতেছে, তাঁহাকে গুঁড়া করিয়া মাটি

করিতেছে, তাহাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিতেছে, তাঁহাকে গুঁড়া করিয়া মাটি করিতেছে, তাঁহাকে তাঁহার দৃকপাত নাই, কোনও দুঃখ নাই, আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা নাই। যদি কিছু বাধা দেন, তাহার পরিমাণ পাটিগণিতের অঙ্কে ধরা পড়িবে। জড় দ্রব্যের মধ্যে যদি কোনও বিরোধ থাকে, সেই বিরোধের মধ্যে এই ঔদাসীন্য। বিরোধটাকে যখন formula-য় ফেলা চলে, তখন এই ঔদাসীন্য না থাকিয়া পারে না। জড় দ্রব্যে আত্মরক্ষার, আপনার বিশিষ্টতা রক্ষার, আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিবার কোনও উদ্যমেরই পরিচয় পাওয়া যায় না। বিকারের হেতু আছে, অথচ বিকৃত হইব না, এরূপ কোনও স্পষ্ট উদ্যম জড় দ্রব্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আপনাদিগকে বলিয়াছি, প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিতে চায় বটে, কিন্তু আত্মসাৎ করিতে গিয়া জড়ের কিয়দংশকে গ্রহণ করে, কিয়দংশকে বর্জন করে। প্রাণের একটা বাছাই করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি আছে; ইহা যেন preferential choice। জড় দ্রব্যেও এইরূপ একটা কিছু দেখা যায়। প্রত্যেক রসায়নবেত্তা পণ্ডিত তাহা জানেন। অক্সিজেন হাইড্রোজেনকে বাছিয়া লইতে চায়, নাইট্রোজেনকে বর্জন করিতে চায়। ইহাও একটা preference-এর ব্যাপার, নির্বাচনের ব্যাপার। এই বাছাই করিবার প্রবৃত্তি আছে বলিয়াই জড়জগতে যৌগিক পদার্থের লক্ষ করিবার রমমের প্রকারভেদ। কিন্তু এখানেও সেই ঔদাসীন্য। এই Choice-এর মাত্রাও সর্বত্র পরিমিত; একবারে কাটা-ছাঁটা, formula-বদ্ধ; একটু এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। কোনওরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির পরিচয় নাই। অক্সিজেন হাইড্রোজেন মিশাইয়া আগুন দিবা মাত্র উহাকে বিকৃত হইয়া জলে পরিণত হইতেই হইবে; কোনওরূপ দ্বিধা করিলে চলিবে না; আট ভাগের সহিত এক ভাগকে মিলিতেই হইবে; দ্বিধা করিলে চলিবে না। এই বিকারে উহা সম্পূর্ণভাবে উদাসীন। জড় দ্রব্য অন্য জড় দ্রব্যকেও এক হিসেবে হজম করে এবং আত্মসাৎ করে। অন্য দ্রব্যকে বিকৃত করে এবং নিজেও বিকৃত হয়। জল চিনিকে একরকম হজম করিয়া ফেলে। সালফিউরিক অ্যাসিড তামা দস্তা হজম করে; আত্মসাৎ করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু অন্যকে বিকৃত করিতে গিয়া আপনাকে অবিকৃত রাখিতে পারে না, আত্মরক্ষা করিতে পারে না, আপনার বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে পারে না। কোনটার কতটুকু বিকার হইবে, প্রত্যেক chemist তাহা জানেন; এবং জানেন বলিয়াই তাহাদের দ্বারা স্বকর্ম সাধন করাইয়া লন। এখানেও formula বাঁধা আছে। জড়ের যে ক্ষুধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উদাসীনের ক্ষুধা। জড় পদার্থ উদাসীন সন্ন্যাসী;—মারো তাহাকে, রাখো তাহাকে, তাহার কোনও চাঞ্চল্য নাই—কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। যদি হাসে, তাহাও বাঁধা হাসি। যদি কাঁদে, তাহাও বাঁধা কাঁদা;—জড় পদার্থ একবারে উদাসীন মহাদেব।

আপনারা আচার্য জগদীশচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া-পরম্পরার কথা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। বাহিরের উত্তেজনায় জন্তুর দেহে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। বাহির হইতে ডাক পড়িলে জন্তুদেহ সাড়া দেয়। উত্তেজনার মাত্রাধিক্যে চাঞ্চল্য অবসাদে পরিণত হয়; অধিক অবসাদে মৃত্যু আনে। আচার্য দেখাইয়াছেন যে, উদ্ভিদের দেহেরও ঠিক এইরূপ সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে। উত্তেজনার ফলে চাঞ্চল্য; মাত্রাধিক্যে অবসাদ, অবশেষে মৃত্যু;— উদ্ভিদেরও এই সকল আছে। হয়তো নিতান্ত প্রাণহীন জড় ধাতু দ্রব্যেরও—তামা-দস্তার মতো ধাতু দ্রব্যেরও এইরূপ চাঞ্চল্য, অবসাদ, মৃত্যু ঘটে। ক্লোরোফর্মে, অ্যালকোহলে, আফিমে যেমন আমাদের মগজের ভিতর কিলবিল করিয়া চাঞ্চল্য আনে বা অবসাদ আনে, উদ্ভিদেরও সেইরূপ ঘটে;

হয়তো ধাতুখণ্ডেও ঘটে। এ সকল নূতন তথ্য আগে কেহ জানিতে না। এখন হয়তো অনেকে বলিয়া উঠিবেন, প্রাণীদেহ যখন জড় পদার্থেই নির্মিত, জড় দ্রব্য মাত্রই যখন আঘাতে প্রতিঘাত দেয়, তখন ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কী আছে? ঠিক কথা; বিস্ময়ের বিষয় নাই বটে, কিন্তু জন্তুদেহে যে চাঞ্চল্য, যে ছটফটি, অতি সামান্য উত্তেজনায় যে ধুকপুকুনি প্রতিনিয়তই আমাদের পরিচিত, দুই চারিটা স্থল ব্যতীত উদ্ভিদের দেহে এরূপ চাঞ্চল্য এ পর্যন্ত কে জানিত? পৃথিবীর যাবতীয় শরীরবিদ্যাবিদ ইহার সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন; কই, কেহ তো এ পর্যন্ত সন্ধান পান নাই। ধাতুদেহেও ওইরূপ উত্তেজনায় যে ওই-জাতীয় চাঞ্চল্য আসিতে পারে, তাহা বোধ করি কল্পনারও অগোচর ছিল,—এখন উহা প্রতিপন্ন না হইলেও অন্তত আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। ওইরূপ চাঞ্চল্য বা অবসাদ দেখিয়া যদি প্রাণের অস্তিত্ব আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেও প্রাণ আছে কি না, তাহা আলোচনাযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি,—আচার্য জগদীশচন্দ্র যাবতীয় জড়দেহে চৈতন্যের আবিষ্কার করিয়াছেন,—লোকমুখে এইরূপ কথা শুনিয়া যাঁহারা নিরুপম তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, পূজনীয় আচার্য সেরূপ কিছুই করেন নাই। কোনও দ্রব্যে চেতনা আছে কি না, বিজ্ঞান-বিদ্যা—Physical Science সে বিষয়ে কোনও কথা বলিতে পারে না; উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার অধিকার-বহির্ভূত ও সাধ্যাতীত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক;—তিনি প্রাণীদেহ ও জড়দেহ, এই দুইয়ের মধ্যে উত্তেজনার সহিত চাঞ্চল্যের ও অবসাদের সম্পর্ককে formula-বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বে যেখানে কেহ formula বাঁধিতে পারে নাই, সেখানে তিনি formula বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাণীদেহের অতিসূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাঙ্গের মতো তাঁহার আদেশ মাত্রে পরিচালিত হইতেছে। তিনি বাজিকর; বন-মানুষের হাড় ঠেকাইয়া তিনি যাহাকে যেরূপে নাচাইতেছেন, সে সেইরূপেই নাচিতেছে। তাঁহার আদেশে প্রাণ তাহার উগ্র স্বাধীনতা সংযত করিয়া জড়তার শিকলে বাঁধা পড়িতেছে; এবং আচার্য সেই শিকল ধরিয়া বসিয়া আছেন। এক দল পণ্ডিতে জন্তুদেহে ও উদ্ভিদের দেহে, প্রাণীদেহে ও জড়দেহের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়া উভয়কে দুই স্বতন্ত্র কোঠার মধ্যে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি সেই দেওয়াল ভাঙিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেরূপ কোনও প্রাচীর তোলা চলিবে না; উভয়কেই শেষ পর্যন্ত এক কোঠায় রাখিতে হইবে। জড় দ্রব্যে চেতনার আবিষ্কার দূরের কথা, জড় দ্রব্যে কোনওরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণের আরোপও তিনি করেন নাই; বরং প্রাণীদেহের সংযমহীন আচরণকে তিনি জড়তার শৃঙ্খলায় বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কাজই তাহাই; যেখানে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না, সেখান শৃঙ্খলা স্থাপন, যেখানে নিয়ম ছিল না, সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা। জড় দ্রব্যে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রাণ আছে কি না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিবেন না; প্রাণের আচরণকে জড়তার শৃঙ্খলে কতটা বাঁধা যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিক তাহাই দেখিবেন। বৈজ্ঞানিকের প্রতিজ্ঞা এই যে, শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণী মাত্রকে automaton বা স্বয়ঞ্চল যন্ত্ররূপে দেখিবেন; ইহার অভ্যন্তরে কোনো mysterious পদার্থের স্থাপন করিতে দিবেন না। যাঁহারা প্রাণবাদী বা vitalist, তাঁহারা এ স্থানে আর একটা গুরুতর প্রশ্ন তুলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, মানিয়া লইলাম যে, এক খণ্ড তামা বা দস্তা একটা জন্তুর মতো বা একটা গাছের পাতার মতো বাহিরের তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিতে পারে; উত্তেজনার আতিশয্যে অবসন্ন হইতে পারে;

মদের নেশায় অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও গূঢ়তর প্রশ্ন এই যে, এইরূপ উত্তেজনা হইতে আত্মরক্ষার কোনও প্রয়াস জড় দ্রব্যের পক্ষে আছে কি না? জন্তু এবং উদ্ভিদ, অর্থাৎ প্রাণী মাত্র বাহিরের ধাক্কায় চঞ্চল হয়ে বটে এবং অবসন্ন হয় বটে, কিন্তু সেই উত্তেজনা এড়াইবার জন্য ভিতর হইতে তাহার একটা চেষ্ট দেখা যায়। সেই উত্তেজনা বা অবসাদ যদি তাহার পক্ষে হানিকর হয়, তাহা হইলে সেই উত্তেজনা বা অবসাদ এড়াইবার জন্য সে আপনাকে প্রস্তুত করে। তদুচিত নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করে। সঙ্গে-সঙ্গে এড়াইতে না পারিলেও ভবিষ্যতে এড়াইবার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রাণী মাত্রেরই এটা সাধারণ ধর্ম। বাহিরের উত্তেজনা যদি তার পক্ষে শুভ হয়, তাহা হইলে সে উত্তেজনা তাহার উপাদেয় হয়। যদি অশুভ হয়, তাহা হইলে তাহা হেয় হয়, সে তাহা এড়াইতে চায়। উত্তেজনা গ্রহণে বা বর্জনে প্রাণী কখনও উদাসীন হয় না। উদাসীন হইলে প্রাণী-জগতে অভিব্যক্তি—evolution সম্ভবপর হইত না। এ প্রবৃত্তি প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। প্রাণীর যেন একটা স্বার্থ আছে। আত্মরক্ষাই সেই স্বার্থ। তাহার যাবতীয় চেষ্টা সেই স্বার্থরক্ষার অনুকূল। প্রাণহীন জড় দ্রব্যে এইরূপ আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি কিছু আছে কি না, তাহাই হইল গুরুতর প্রশ্ন। সহসা ইহার উত্তর দেওয়া চলে না। প্রাণীর একটা স্বার্থ আছে। খাঁটি জড়ে সেরূপ স্বার্থ বলিয়া কিছু আছে কি? প্রাণী আপনাকে বাঁচাইতে চায়। প্রাণহীন জড়ের পক্ষে সেরূপ উক্তি চলে কি? আঘাতে চঞ্চল হওয়া, আঘাতের মাত্রাধিক্যে অবসন্ন হওয়া, এটা খাঁটি জড়ধর্ম, তাহাতে সংশয় নাই। যে-কোনও স্থিতিস্থাপক দ্রব্যে—elastic body-তে ইহা দেখা যায়। ধাক্কা খাইয়া elastic body স্বভাবচ্যুত হয়। উত্তেজনার অপগমে আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। কিন্তু limit of elasticity পার হইলে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহাকেই জড় দ্রব্যের অবসাদ বা মৃত্যু বলা যাইতে পারে। ইহা জড় দ্রব্য মাত্রেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। Dynamics-বিদ্যা তাহা জানেন। জড়ধর্মী প্রাণীদেহে বাহিরের উত্তেজনায় চাঞ্চল্য বা অবসাদ যতই জটিল হোক, তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই। এই চাঞ্চল্যেই হয়তো তাহার প্রাণের স্ফূর্তি এবং এই অবসাদই তাহার ব্যাধি। অবসাদটা স্থায়ী হইলেই তাহার মৃত্যু। প্রাণীদেহ চঞ্চল হয়, অবসন্ন হয়, পরিশেষে অগত্যা মরিয়া যায়, ইহা সত্য বটে। স্বীকার করিলাম, ইহার ষোলো আনাই জড়ধর্ম; চাঞ্চল্য এবং অবসাদ এবং মৃত্যু, সমস্তই নিয়মবদ্ধ জড়ধর্ম। কিন্তু এই মরণকে এড়াইবার, এই মরণকে জয় করিবার যে একটা উৎকট চেষ্টা প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান আছে, তামার কি দস্তার টুকরায়, ইটে কি পাথরে তাহার কোনও পরিচয় আছে কি? তাহার পরিচয় পাইবার আদৌ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? প্রাণী-পদার্থে যে আছে, সে বিষয়ে তো কোনও সংশয় নাই। আছে বলিয়াই তো প্রাণের এই বিচিত্র বিকাশ। এই প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে Biology-বিদ্যার আলোচনাযোগ্য তো বিশেষ কিছু থাকিত না। সমস্ত জড় জগৎ প্রাণকে নষ্ট করিবার জন্য দিবানিশি অবিরাম নিযুক্ত আছে। অসংখ্য প্রাণী দিবানিশি মরিতেছে; কিন্তু প্রাণ তো লুপ্ত হইতেছে না। এ যে রক্তবীজ। এক ফোঁটা রক্তকণিকা হইতে সহস্র কণিকা উদ্গত হইয়া, সহস্র মূর্তি গ্রহণ করিয়া, কত নূতন রকমের অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া, পুনরায় জড় জগতের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রাণী মরিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণ তো এ পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। এই যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, এই যে আত্মবর্ধনের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের প্রবৃত্তি, এই যে বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা, এই যে সমস্ত জড় জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণময় জগতে পরিণত

করিবার চেষ্টা, ইহা তো চোখের উপরে দেখিতেছি। প্রাণের সহিত জড়ের এই যে যুদ্ধ, ইহা তো প্রত্যক্ষ ঘটনা, ইহা তো অস্বীকারের উপায় নাই। উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ তো আছেই। এই বিরোধটাই তো প্রাণের বিশিষ্টতা। জড়ের সহিত জড়ের ঘাত-প্রতিঘাত আছে বটে, কিন্তু সে তো formula-য় বাঁধা ব্যাপার। তাহাতে নিত্য নূতনত্ব কই? দূর অতীতে যাহা ছিল, দূর ভবিষ্যতেও তো ইহা সেইরূপ থাকিবে। ইহা তো সনাতন ব্যাপার। একবার যাহা ঘটিয়াছে, পুনঃপুন তাহা ঘটিতেছে, এবং পুনরায় তাহা ঘটিবে। ইহার History কোথায়? যাবতীয় History-তে যে বৈচিত্র্য আছে, যে নিত্য-নূতনের অবতারণা আছে, যাহা formula-য় বাঁধিতে গেলেও পরক্ষণেই formula অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, জড় জগতে সেই History কোথায়, সেই নিত্য-নূতনত্ব কোথায়? প্রশ্নটা অতি গুরুতর। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যা এখনোই অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সহিত গাঁথিয়া একই সূত্রে, এক formula-য় বাঁধিয়া ফেলেন, তখনই অতীত তাহার পুরাতন ইতিহাস হারাইয়া ফেলে, ভবিষ্যতের অভূতপূর্ব নূতন কাহিনি শুনিবার জন্য কেহ কৌতূহলের সহিত প্রতিক্ষা করে না। সবই formula-র মধ্যে নিবদ্ধ আছে। কাজেই প্রশ্নটা গুরুতর। প্রশ্নটা তুলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইলাম। উত্তর দিতে আমি সক্ষম। প্রাণকে একবারে জড়তার নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিয়া উহার History লোপ করা চলিবে কি না, কোনওরূপ *a priori* যুক্তিতে তাহার উত্তর মিলিবে না। কোনওরূপ *a priori* যুক্তি আশ্রয়ের ধৃষ্টতা আমার নাই। আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্দ্ধা রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতা-জীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য। বিজ্ঞান-বিদ্যা ভবিষ্যতে কী উত্তর দিবেন. তাহার প্রতীক্ষায় আমি বসিয়া থাকিব। যিনি জগতের এতগুলি আঁধার কুঠরির মধ্যে প্রাচীর ভাঙিয়া আলোকিত প্রবেশ-পথ বাহির করিয়াছেন, হয়তো তাঁহার কাছেই ইহার উত্তর পাইব।

প্রাণবাদীদেব মতে প্রাণের যেন একটা স্বার্থ আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা Purpose আছে, একটা will আছে। প্রাণ থাকিতে চায়, টিকিতে চায়, আপনাকে বর্ধন করিতে চায়, আপনাকে প্রসারিত করিতে চায়, বিশ্বমধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে চায়, বিশ্বকে গ্রাস করিতে চায়। এ বিষয়ে সে পদে-পদে বাধা পায়; পদে-পদে বিরোধ পায়। কিন্তু সেই বিরোধকে সে এড়াইতে চায়, অতিক্রম করিতে চায়। বিরোধের মধ্য দিয়া আপনাকে বর্ধিত করিতে চায়। বিরোধকেও আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করিয়া আপনার স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে চায়। এই স্বার্থ কেবল টিকিয়া থাকা। কেবল টিকিয়া থাকা নহে, বিরোধ সত্ত্বেও আপনাকে বর্ধিত করা। বিশ্ব তাহার বিরোধী। কিন্তু বিশ্বগ্রাসে সে উদ্যত। এই বিশ্বগ্রাসের ক্ষুধা তাহার অতৃপ্ত। বোধ করি, কোনও কালে তৃপ্ত হইবে না। হইলে, সে দিন আর প্রাণ বলিয়া কিছু থাকিবে না।

আপনি হয়তো বলিবেন যে, যন্ত্র মাত্রের মধ্যেই তো একটা উদ্দেশ্য আছে। অত্যন্ত প্রাণহীন যন্ত্রেরও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দেখা যায়। একটা প্রচলিত দৃষ্টান্ত—steam engine-এর মধ্যে safety valve। বাষ্পের চাপ মাত্রা ছাড়াইয়া বাষ্পের হাঁড়িকে ফাটাইবার উপক্রম করিবা মাত্র হাঁড়ির কপাটখানা বাষ্পের চাপে আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। খানিকটা বাষ্প বাহির হইয়া গেলে বাষ্পের চাপ কমিয়া যায়। ইঞ্জিনটাও আসন্ন বিপদ হইতেই রক্ষা পায়।

ইহাই তো সেই ইঞ্জিনের আত্মরক্ষা। ব্যাপারটা আপনা হইতেই ঘটিয়া যায়। উহা সম্পূর্ণভাবে automatic। প্রাণীদেহও সেইরূপ automatic যন্ত্র মাত্র। পার্থক্য কেবল জটিলতায়। বাহিরের শক্তির আক্রমণ হইতে প্রাণীদেহ সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিতেছে। তাহার দেহাবয়বে কতকগুলা automatic যন্ত্র আছে বলিয়াই সে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতেছে। কাজেই প্রাণীদেহে এবং যন্ত্রদেহে কোনোরূপ জাতিগত পার্থক্য নাই। কিন্তু এখানেও আব একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া তলাইয়া দেখা আবশ্যক। যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক যন্ত্রাঙ্গেরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রাঙ্গের প্রয়োজনও কতিপয় উদ্দেশ্য সাধন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কোনো যন্ত্র এ পর্যন্ত আপনার প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, আপনাকে রক্ষা করিবার উপযোগী যন্ত্রাঙ্গ আপনা হইতে উদ্ভাবিত করিয়াছে কি? আপনা হইতে গড়িয়া লইতে পরিয়াছে কি? যন্ত্রাঙ্গগুলি যন্ত্রের কর্মসাধনের উপযোগী। কিন্তু সেই উপযোগিতা অনুসারে যন্ত্র আপনার অঙ্গগুলি আপনি নির্মাণ করিয়া লইতে পারে কি? যন্ত্র আপনি আপনাকে মেরামত করিতে পারে কি? কোনও স্টিম ইঞ্জিন তাহার safety valve নিজে গড়িয়া লইতে পারিয়াছে কি? সেই safety valve উদ্ভাবনের জন্য বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিতে হয় নাই কি? একজন intelligent designer এবং একজন intelligent artist ডাকিয়া আনিতে হয় নাই কি? Engine তো নিজের safety valve নিজে গড়িতে পারে না। নিজে মেরামত করিয়া লইতে পারে না। প্রাণীদেহ যন্ত্র বটে, কিন্তু কোনও প্রাণীকে এ জন্য কোনও বাহিরের লোকের সাহায্য তো লইতে হয় নাই। সে নিজের যন্ত্র নিজেই গড়িয়া লইয়াছে। নিজের আপন্নিবারণের উপায় নিজেই উদ্ভাবিত করিয়াছে। শিল্পী তাঁহার উদ্ভাত্তিত যন্ত্রমধ্যে যে কয়টি আপদ নিবারণের উপায় করিয়াছেন, তাঁহার হাতে-গড়া যন্ত্র সেই কয়টি আপদের অতিরিক্ত কোনও নূতন আপদের প্রতিকার করিতে পারে না। তখন আবার শিল্পীকে নূতন যন্ত্রাঙ্গের উদ্ভাবন করিতে হয়। কিন্তু প্রাণীদেহ তাহা তো নিয়তই করিতেছে। নিত্য নূতন আপদের জন্য নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। আপনার ব্যাধির প্রতিকার আপনিই করিতেছে। প্রাণী তো কোনও শিল্পীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। মজার কথা এই, যাঁহারা অবৈজ্ঞানিক, তাঁহারাই প্রাণে এই অদ্ভুত ক্ষমতা অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহারাই দেহযন্ত্র গড়িবার জন্য, দেহযন্ত্রে এই আপন্নিবারণের উপযোগী যন্ত্রাঙ্গ বসাইবার জন্য বাহির হইতে একজন শিল্পীকে ডাকিয়া আনিতে চান। একজন intelligent designer-কে, একজন বিধাতা পুরুষকে এজন্য ডাকিয়া আনিতে চান, কল্পনা করিতে চান। আর যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোনও কাল্পনিক বিধাতা পুরুষের নাম শুনিলেই আঁতকাইয়া উঠেন এবং খাঁটি জড়ে যে ধর্ম দেখিতে পান না, প্রাণময় জড়ে সেই ধর্ম অর্পণ করিয়া প্রাণের এবং জড়ের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য দেওয়াল গাঁথিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

Argument from Design বলিয়া একটা যুক্তি আছে। শিল্প মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য আছে। বিশিষ্ট কর্মে উপযোগিতা আছে। একখানা রূপার চাকতি হয়তো রূপার খনি হইতেই মিলিতে পারে। উহাতে কৃত্রিমতা না থাকিতে পারে। কিন্তু রূপার চাকতির এক পিঠে যদি রাজার মুখ অঙ্কিত দেখা যায়, অন্য পিঠে যদি তাহার মূল্য খোদাই করা থাকে, এবং সেই মূল্য অনুসারে সকলেই উহা গ্রহণ করিতেছে, এইরূপ দেখা যায়, তখন বুঝিতে হয়, উহা কৃত্রিম দ্রব্য। কোনো খনির মধ্যে উহা পাওয়া যায় নাই। উহা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের

জন্য কোনও intelligent designer-এর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং কোনও শিল্পীর দ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইঞ্জিনের মধ্যে safety valve দেখিলে সেইরূপ শিল্পীর কৃতিত্ব মনে করিতে হয়। জন্তুর দেহে নানারূপ কর্মসাধনোপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা দেখিয়াই অবৈজ্ঞানিকেরা একজন বাহিরের designer, বাহিরের artist কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেরূপ কল্পনায় অনিচ্ছুক হইয়া প্রাণ-পদার্থেরই সেই ক্ষমতা অর্পণে বাধ্য হইয়াছেন। আমি কোনও পক্ষ আশ্রয় করিব, সে কথা এখন নাই বা তুলিলাম। প্রাণে যে ক্ষমতা দেখিতে পাই, খাঁটি জড়ে তাহার পরিচয় পাই না, ইহা যেন উভয় পক্ষই মানিয়া লইতেছেন।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা Dynamics-বিদ্যার খোঁজ করেন, তাঁহারা principle of stability নামে একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন। Stability অর্থে স্থিতিশীলতা—স্থানুতা। স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোনও কারণে ভ্রষ্ট হইলেও যাহা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরিয়া আসে, সেই জিনিসটা stable বা স্থিতিশীল। পেনসিলটাকে তাহার ডগার উপর খাড়া করিয়া রাখা যায় না; ওই অবস্থায় উহা স্থিতিশীল নহে। উহাকে শোয়াইয়া রাখিলে স্থিতিশীল হয়। ঘড়ির পেন্ডুলামটা নামাইয়া দিলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। কয়েক বার দুলিয়া আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। অতএব পেণ্ডুলাম স্থিতিশীল। অবস্থাভেদে একই দ্রব্য বা দ্রব্য-সমষ্টি স্থিতিশীল হইতে পারে বা না-পারে। Dynamics-বিদ্যা সেই অবস্থাভেদের, সেই conditions of stability-র নির্ধারণ করিতে চান এবং তাহাকে formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। সৌর জগতের stability সম্বন্ধে লাপ্লাস আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় গ্রহ উপগ্রহ কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া সৌরজগৎ ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবার ভয় নাই। পক্ষান্তরে সার জর্জ ডারউইন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই stability নির্ধারণ দ্বারাই কোন কালে চন্দ্রমণ্ডলটা পৃথিবী হইতে ছটকিয়া পড়িয়াছিল এবং কবে আবার উহা পৃথিবীতে আসিয়া ঢুসা দিবে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। Willarde Gibbs-এর পর হইতে রসায়ন-বিদ্যার ভাঙা-গড়া, বিকৃতি-পরিণতি ওই স্থিতিশীলতার আঁকে গণিত হইতেছে। সার জোসেফ টমসন পরমাণুর ভেতরে electron গুলোর conditions of stability-র আলোচনা করিয়া রেডিয়মে প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া আলোচনা করিতেছেন। রেডিয়ম ধাতুর অস্থায়ী পরমাণুগুলা ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন stable configuration-এ আসিয়া নূতন-নূতন ধাতুর উৎপাদন করিতেছে, ইহা তো আজকাল আমরা চোখের উপরে দেখিতেছি। এই সমস্ত ঘটনা এখন বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রায় আয়ত্ত অর্থাৎ প্রায় formula বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। জীয়ন্ত প্রাণীদেহেরও Stability বা স্থিতিশীলতা সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা চলিতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীকে আপনার environment বা পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিতে হয়। এই পরিবেশ বা environement নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রাণীদেহকেও আপনার stability অনুসারে সেই পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য আপনাকে ভাঙিয়া গড়িয়া নূতন মূর্তি দিয়া, নূতন configuration-এ আনিয়া বদলাইয়া লইতে হয়। প্রাণের এই বিবিধ মূর্তিগ্রহণ জড় পরামাণুগুলির বিবিধ মূর্তিগ্রহণের মতো। সকলরকম মূর্তির স্থায়িত্ব সমান নহে। যেগুলো condititon of stability মানিয়া চলে, সেইগুলাই টিকিয়া যায়। যেগুলা মানে না, সেগুলা হয় লোপ পায়, অথবা ভাঙিয়া গড়িয়া নূতন form, নূতন মূর্তি গ্রহণ করে। পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটায় প্রাচীন কালের

ম্যামথ মাস্টোডন আপনাকে বজায় রাখিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাচীনতর আরশোলা বহুতর পরিবর্তন মধ্যেও আপনাকে জীয়ন্ত রাখিয়াছে। প্রাণ-বিদ্যার আলোচ্য সমস্ত evolution ব্যাপারটা এইরূপে কেবল stability ঘটিত অঙ্কে পরিণত করিতে পারা যাইবে কি না, এ-কালের অনেক বৈজ্ঞানিক তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। যদি পারেন, তাহা হইলে সমস্ত evolution ব্যাপারটা হয়তো Dynamics-এর অঙ্কের মধ্যে আলোচিত হইবে। হয়তো একদিন প্রাণ-পদার্থ stability-ঘটিত formula-য় বাঁধা পড়িবে—পৃথিবীর কোন অবস্থায় কোন প্রাণীর থাকা উচিত, কোন প্রাণীর থাকা উচিত নয়, কাগজে-কলমে আঁক কষিয়া আমরা বলিয়া দিব। কোটি বর্ষান্তে যখন পৃথিবীর অবস্থান্তর ঘটিবে, যখন ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা এতটা কমিবে, অথবা অন্তরীক্ষে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ এতটা বাড়িবে, তখন কোনও নূতন প্রাণীর অবতারণা ঘটিবে, অথবা বর্তমান প্রাণীকে কীরূপে মূর্তি বদল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহাও আমরা কাগজে-কলমে কষিয়া দিব। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, মেন্ডেলের আবিষ্কৃত formula প্রয়োগে কোন পিতামাতার কয়টা সন্তান কীরূপ হইবে, আজকাল কাগজে-কলমে কষিয়া বলিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং তদনুসারে প্রাণীর চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক Eugenics-বিদ্যা বা প্রাণী-উৎপাদন-বিদ্যা formula প্রয়োগে নূতন পরিবেশের অনুযায়ী নূতন প্রাণী উৎপাদনের স্বপ্ন দেখিতেছেন। হয়তো একদিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে;—নূতন পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রাণীদেহের নূতন মূর্তিদানে সমর্থ হইবে—প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামতো পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, যদি কখনো সেই শুভদিন আসে, সেদিন প্রাণের প্রাণত্ব থাকিবে কি না? নিয়তির নিগড়ে প্রাণপদার্থ শৃঙ্খলিত হইলে প্রাণের প্রবাহই রুদ্ধ হইয়া যাইবে কি না? প্রাণ তাহার বিশিষ্টতা হারাইবে কি না? প্রাণ তাহার বিচিত্র ইতিহাস—তাহার history হারাইবে কি না?

ভবিষ্যতে যাহাই হউক, সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রাণের প্রবাহ জড়তার বন্ধনে ধরা দিতে চাহিতেছে না। জড় অবিরাম নিয়মের বাঁধ বাঁধিয়া আপনার পাষাণ তটের মধ্যে প্রাণের স্রোতকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রাণের প্রবাহ বাঁধ ভাঙিয়া, কূল ছাপাইয়া, দুই কূল ভাসাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কখন কোন পথে চলিবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রাণের এই উচ্ছ্বাস বেগবান, তরঙ্গিত, আবর্তসংকুল, ফেনিল। জড়কে ইহা যেন টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ঐরাবতের বিশাল দেহ গঙ্গার স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে। জড়ের সহিত প্রাণের এই বিরোধ—উভয়ের মধ্যে এই টানাটানি ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি মারামারি। আমি পূর্বাপর বলিয়া আসিতেছি, প্রাণের ইতিহাস এই বিরোধেরই ইতিহাস। প্রাণের এই সনাতন ক্ষুধা—এই খাইখাই প্রবৃত্তি—সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই বিরোধের ইতিহাস। আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়া বিশ্ব গ্রাস করিবার যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত এই নিত্য বিরোধের ইতিহাস। সম্প্রতি প্রাণের এই বিচিত্র, নিত্য-নূতন, চমৎকার-জনক ইতিহাস বা history আছে। এই ইতিহাসই প্রাণের বিশিষ্টতা;—এবং এ কালের জীববিদ্যার Biology এই বিরোধেরই কাহিনি।

এই ইতিহাসের মোটা কথাগুলা বলিতে হইবে। আমাকে এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ আওড়াইতে হইবে। আজি এই পর্যন্ত। আপনারা সাহস দিলে বারান্তরে অগ্রসর হইব।

প্রাণের কাহিনি

প্রাণের সহিত জড়ের বিরোধের কথা বলিতেছিলাম। এই বিরোধে নিজের প্রাণ এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহু দিন আপনাদের সম্মুখে আসিতে সাহস করি নাই। আমার কথাগুলি সব আপনাদের স্মরণে আছে কি না জানি না। প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণী-পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। অন্য দিকে জড় প্রাণের বিশিষ্টতা লুপ্ত করিয়া উহাকে জড়ত্বে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাণী-পদার্থে ও জড় পদার্থে এই নিত্য বিরোধ। নানা প্রাণী,—নানা জন্তু ও নানা উদ্ভিদ,—জড় পদার্থকে গ্রাস করিয়া, সেই জড়ে প্রাণের বিশিষ্ট ধর্ম অর্পণ করিয়া আপনাদের দেহ নির্মাণ করিতেছে; জড় কিন্তু প্রাণী-পদার্থের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া পুনরায় জড়ত্বে নামাইতে সর্বদা নিযুক্ত আছে। এই হইল নিত্য বিরোধ। এই বিরোধের কাহিনি লইয়া জীবনযাত্রা; এই বিরোধের যেদিন সমাপ্তি হয়, সেইদিন মৃত্যু। প্রাণীর পক্ষে এই মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী, জড়ের নিকট পরাজয়টাই অবশ্যম্ভাবী। অথচ প্রাণ এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে এড়াইতে গিয়াই নিত্য নূতন বিচিত্র আকৃতিতে, বিচিত্র মূর্তিকে আপনাকে স্ফূর্ত করিয়া, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইয়া আসিতেছে।

'মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং'—ইহা আপনারা জানেন; অথচ আশ্চর্য এই যে, প্রাণী মরিয়া যায়, কিন্তু প্রায় লুপ্ত হয় না। এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রান্ত হইয়া জড়ের সহিত যুদ্ধ চালায়। অন্তত আমাদের এই পৃথিবীতে যেদিন হইতে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইদিন হইতে এই ধারা চলিতেছে। প্রাণী কেবল মরিতেছে, কিন্তু প্রাণ এ পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। কোটি দেহাশ্রয়ে কোটি মূর্তি গ্রহণ করিয়া জড়ের সহিত লড়াই চালাইতেছে। ইংরেজিতে যাহাকে protoplasm বলে, আমি তাহাকে প্রাণী-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। এই protoplasm-এর কণিকা যেদিন ভিতরে একটি সূক্ষ্ম দানা বা nucleus বাঁধিয়া তাহার ক্ষুদ্র দেহ নির্মাণ করিয়া লইয়াছে, অন্তত সেই দিন হইতে প্রাণের এইরূপ আচরণ চলিয়া আসিতেছে। এই দানাওয়ালা প্রাণী-পদার্থ অর্থাৎ nucleus-বিশিষ্ট protoplasm-এর কণিকাকে ইংরেজিতে cell বলা হয়, বাংলায় উহাকে কোশ বলা হইয়া থাকে। এই কোশ নামটা আমি আদৌ পছন্দ করি না; কিন্তু অন্য নামের অভাবে অগত্যা ওই নামই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। এই কোশই এক হিসেবে ক্ষুদ্রতম প্রাণী; অথবা ওই কোশটাই সেই ক্ষুদ্রতম প্রাণীর দেহ। উহার কাজই হইতেছে আশেপাশে জড় পদার্থের সন্ধানে থাকা, এবং গ্রহণযোগ্য পদার্থের সন্ধান পাইলেই তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আপনার দেহের পুষ্টি সাধন করা। এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীটি কেবলই আহারের সন্ধানে আছে, কেবলই খাইতেছে আর বাড়িতেছে। ইহার প্রবৃত্তিটাই হইতেছে আত্মপোষণের অভিমুখে। ইহার বাড়িবার প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু কী জানি কেন, ইহা আপনাকে বড় করিয়া বিশ্বব্যাপী দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। একটু বাড়িয়াই ইহা দুই টুকরা হইয়া যায়; একটা কোশ ভাঙিয়া দুইটা কোশ হইয়া যায়। উহার দেহের ভিতর যে ক্ষুদ্র nucleus বা দানাটুকু থাকে, সেই দানাটাই প্রথমে ছিন্ন হইয়া দুই খণ্ড হয় এবং protoplasm-টুকু ভাগ করিয়া লইয়া দুইটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন কোশের উৎপাদন

করে। ছিল দানাওয়ালা একটা কোশ—একটি প্রাণী; খণ্ডিত হইয়া উৎপাদন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দানাওয়ালা দুইটি কোশ বা দুইটি প্রাণী। এই দুইটি প্রাণীর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে বলিলেই হয়। আবার একটু বড় হইয়াই প্রত্যেকটা আবার দুই টুকরা হইয়া যায়। একটি প্রাণী ভাঙ্গিয়া দুইটি হইয়াছিল, দুইটি ভাঙিয়া চারিটি—এইরূপে চারিটি হইতে আটটি, আটটি হইতে ষোলোটি;—এইরূপে ক্রমে বহু কোটি প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটাই স্বাধীন প্রাণী, কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিয়া আহারের অন্বেষণে বেড়ায়। পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হইতে আজ পর্যন্ত এই ব্যাপার আপনাদের চোখের উপর চলিয়া আসিতেছে, আপনারা তাহা দেখিয়াও দেখেন না, জানিয়াও জানেন না। আপনাদের হাঁচিতে কাশিতে, দাঁতের বেদনায় ও পেট-ফাঁপায়, আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন-ধারণ ব্যাপারে ইহাদের কতটা হাত আছে, তাহা আপনারা জানেন না। যখন কলেরার বা প্লেগের আক্রমণে ও-পারের ডাক পড়ে, তখন এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলার কৃতিত্ব জাহির হয়। এক প্রাণীর বহু হইবার এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল এবং কেন আসিল, প্রাণ-বিদ্যার পক্ষে এ একটা সমস্যা বটে। প্রাণী-পদার্থ একটা একাকার বিশাল বিশ্বব্যাপী দেহ ধারণে প্রবৃত্তি না রাখিয়া, এইরূপ অগণ্য কোটি-কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী ব্যাপিতে চাহে কেন, ইহা একটা সমস্যা বটে। বন্ধুবর অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজের পত্রিকায় আমার পঠিত এই প্রবন্ধগুলির আলোচনা এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমালোচনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতেছেন। এই হেঁয়ালিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। একের এই বহু হইবার প্রবৃত্তি যে কেবল প্রাণী-পদার্থেই দেখা যায়, এমন নহে; খাঁটি জড় পদার্থেও এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। জড় পদার্থও একাকার অবস্থায় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থানে সমর্থ হয় নাই; আপনাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র টুকরায়, কোটি-কোটি-কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং electron, atom, molecule ইত্যাদি নানা মূর্তিতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রমথবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—জড়েরই বা এরূপ খণ্ডিত হইবার প্রবৃত্তি কেন, প্রাণী-পদার্থেরই বা এরূপ খণ্ডিত হইয়া থাকার প্রবৃত্তি কেন? একাকারে বৃহৎভাবে না থাকিয়া অগণ্য ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবার প্রবৃত্তি কেন? এই প্রশ্নটি জগৎতত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন; ইহার উত্তর দিতে পারি, সে সাহস আমার নাই। তবে আমি এই পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি, রাজপথে যেমন milestone, electron, atom, molecule-গুলি, অথবা তারকা, গ্রহ, উপগ্রহগুলি সেইরূপ আকাশমধ্যে milestone-এর কাজ করে। মাইলস্টোন বা তদ্বিধ খণ্ডচিহ্ন না থাকিলে, সরল রাজপথে পথিক যেমন তাহার পর্যটন কাহিনির হিসাব দিতে পারিত না, জড় পদার্থও খণ্ডাকারে আকাশে ছড়াইয়া না থাকিলে, আমরা আমাদের ব্যবহারিক বাহ্য জগতের কোনওরূপ হিসাব দিতে পারিতাম না। সম্ভবত জীবনযাত্রাই আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইত। অন্তত যে প্রণালী মতে আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে, সেই প্রণালী মতে জীবনযাত্রা অসাধ্য হইত। প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তরে জড় পদার্থের খণ্ড ভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে পারিব না। প্রাণী-পদার্থের খণ্ড ভাব সম্বন্ধেও আমি ওইরূপ একটা উত্তর কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাই। জীবনের ইতিহাসটাকে আমি একটা বিরোধের ইতিহাস মাত্র বলিতে চাহি। এই বিরোধ না থাকিলে জীবন থাকিত না; এই বিরোধই জীবন এবং জীবনই এই বিরোধ। প্রাণী-পদার্থ যদি আপনাকে এইরূপ কোটি খণ্ডে ভাগ করিয়া না লইত, তাহা হইলে এই বিরোধই বা চলিত কীরূপে,

জীবনের অর্থ এবং তাৎপর্যই বা কী হইত, তাহা আমি মনে করিতে পারি না। জীবনের অস্তিত্বটা যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে জীবনের সহিত অভিন্ন এই বিরোধটাকেও মানিয়া লইতে হইবে; এবং বিরোধকে মানিতে হইলে পরস্পর বিরুদ্ধমান বা বিরোধে লিপ্ত একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীও মানিতে হইবে। যে সর্বতোভাবে এক, অদ্বয় এবং অখণ্ড, সে আপনার সহিত আপনি বিরোধ করিতে পারে না। বিরোধ কল্পনা করিতে হইলে অন্তত দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী আবশ্যক হয়। দুইয়ের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে বিরোধটা আরও জমকাইয়া উঠে। জীবনের কাহিনিই বিরোধের কাহিনি—খুব জমকালো কাহিনি। প্রাণী যদি বহু না হইয়া এক হইত, তাহা হইলে জীবনের কাহিনি তো থাকিতই না, জীবন বলিয়াই কিছু থাকিত কি না, সে বিষয়েই আমার সংশয় জন্মিতেছে। আপনারা হয়তো ঘাড় নাড়িবেন বা হাসিবেন; কিন্তু আমার মনে হয়, যেন আমাদের মতো চেতন জীবের জীবনযাত্রার খাতিরেই, আদান-প্রদানের খাতিরেই, জড় জগৎ এবং প্রাণময় জগৎ—উভয় জগৎই আপনাকে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, discontinuous করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে চাহি। Continuity শব্দের বাংলায় সন্ততি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। যাহার খণ্ড নাই, কোথাও কোনও বিচ্ছেদ নাই, ফাঁক নাই, যাহা বিচ্ছেদহীন একটানা, তাহাকেই সন্তত বলা যায়। পুত্র-কন্যা জন্ম লইয়া পিতৃ-পিতামহের জীবনের ধারা রক্ষা করে বা অবিচ্ছিন্ন রাখে; সেই জন্য পুত্র-কন্যাকে সন্তান-সন্ততি বলা হয়। এই continuity বা সন্ততির তাৎপর্য সম্বন্ধে আপনাদের একটা মোটা ধারণা আছে। মোটা ধারণা বলিলাম এই জন্য যে, একটু চাপিয়া ধরিলে ইহার তাৎপর্য লইয়া নানা গণ্ডগোল উঠে। গণিততত্ত্ব পণ্ডিতেরা,—সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপনে যাঁহাদের সমকক্ষ কেন নাই,—তাঁহারা এই সন্ততি ব্যাপারের তাৎপর্যের অন্ত পান নাই; অন্তত, যেদিন হইতে তাঁহারা differential calculus নামক অস্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। মনে করুন জ্যামিতি-বিদ্যা,—জ্যামিতি-বিদ্যার কারবার বিচ্ছেদহীন সন্তত পদার্থ হইয়া। কিন্তু যখন জ্যামিতিবিদ পণ্ডিতেরা একটা গোলাকার বাঁটুলের volume বা ঘনফল বাহির করিতে যান, তখনই বাঁটুলটাকে টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলেন, এবং প্রত্যেক টুকরার ঘনফল পৃথকভাবে বাহির করিয়া, তাহাদিগকে সংকলন করিয়া গোটা বাঁটুলের ঘনফল বাহির করিতে বাধ্য হন। বাঁটুল দ্রব্যটা বিচ্ছেদহীন সন্তত দ্রব্য, কিন্তু কারবারের বেলায় এক টানে উহার ঘনফল বাহির হয় না, উহাকে শত কোটি খণ্ডে কাটিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডে ঘনফল বাহির করিতে হয়। ব্যাপারটা কৌতুককর—যেন বালির পাহাড়ে কত বালি আছে, তাহার পরিমাণ করিতে গিয়া বালির কণিকাগুলি গণিতে হইতেছে,—সমুদ্রের জলের পরিমাণ করিতে গিয়া, কত জলবিন্দু আছে, তাহা গণিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, ইহা কারবারের ব্যাপার—হিসেবের ব্যাপার। যেখানে হিসেব করিয়া কারবার চালাইতে হয়, সেইখানেই একটানা জিনিসে কাজ চলে না; টুকরা লইয়া কাজ চালাইতে হয়। মানুষের প্রাণযাত্রাটাই একটা প্রকাণ্ড কারবার,—একটানা, বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন সন্ততিতে প্রাণ পরিত্রাহি রবে কাঁদিতে থাকে। প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ; উহার মাঝে-মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্যক;—গানের মতো পদার্থ; মাঝে-মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক বসাইয়া উহার সুর রক্ষা করিতে হয়। অন্যের সহিত কারবারে আমরা কথা কহি—বাক্যের-পর-বাক্য বসাই, মাঝে ফাঁক থাকে; পদের পর পদ বসাইয়া বাক্য গড়িয়া লই; syllable-এর পর syllable, অক্ষরের

পর অক্ষর উচ্চারণ করিয়া পদ নির্মাণ করি। লিখিবার সময় লিপিমধ্যে হরফের-পর-হরফ বসাই;—টেলিগ্রাফের সিগন্যালে একটানা রেখার পরিবর্তে সারি বাঁধিয়া dot-এর পর dash দিতে হয়। মানুষের প্রজ্ঞা—Reason যেন এইরূপ সংকীর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, একটানা সন্তত পদার্থকে উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, আয়ত্ত করিতে গেলে মাঝে-মাঝে হাঁফ ছাড়িতে হয়; হাঁফের সঙ্গেই বিরামের দরকার হয়। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির খেলা, সেইখানেই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। মনে করুন, ইটের প্রাচীর আর কাদার দেওয়াল। ইটের উপর ইট সাজাইয়া, সহস্র খণ্ড ইটেব সমষ্টিতে ইটের প্রাচীর গাঁথা হয়; দুইখানা ইটের মাঝে ফাঁক থাকিবেই। আপাতত, মনে হয়, কাদার দেওয়াল যেন অন্যরূপ; কাদার পরিমাণ যেন ক্রমশ অবিরামে, অবিচ্ছেদে বাড়াইয়া কাদার দেওয়াল গড়া হইয়াছে; মাঝে ফাঁক বা বিচ্ছেদ রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইটগুলা যদি পাথরের ইট হয়, ভাঙা না চলে, তাহা হইলে প্রাচীর হইতে একখানা ইট খুলিয়া লওয়া চলে; ইটের ভগ্নাংশ, আধখানা বা সিকিখানা খোলা চলে না। কিন্তু মাটির দেওয়াল হইতে যতটুকু ইচ্ছা মাটি খুঁড়িয়া লইতে পারি; আপনি যত অল্প কাদা বাহির করুন, আমি তার চেয়েও অল্প পরিমাণ খুঁটিয়া বাহির করিতে পারি। অতএব আপাতত মনে হইতে পারে, ইটের প্রাচীর নির্মাণ বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরম্পরা, আর কাদার দেওয়াল গাঁথা একটানা বিচ্ছেদহীন ঘটনা। কিন্তু কার্যতও কি তাই? যে মজুর কাদার দেওয়াল গাঁথিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিবেন যে, সে তিল-তিল করিয়া তো কাদা তোলে নাই, তাল-তাল করিয়া কাদা তুলিয়া. তালের উপর তাল চাপাইয়া দেওয়াল গড়িয়াছে; দুই তালের মাঝে তাহাকে হাঁফ লইতে হইয়াছে। পদার্থবিদ্যাবিদ পণ্ডিতেরা যখন তাঁহাদের বাঙ্ময় কাদার মশলা দিয়া জড়জগৎ নির্মাণে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগকে সেই মজুরের মতো হাঁফ ছাড়িতে হইয়াছে; ইটের উপর ইট চাপাইয়া তাঁহাদেব অট্টালিকা নির্মাণ করিতে হইয়াছে। বালুকণার উপর বালুকণা চাপাইয়া তাঁহারা বালির পাহাড় গড়িয়াছেন; জলবিন্দুর উপর জলবিন্দু চাপাইয়া তাঁহারা মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছেন; molecule-এর পাশে molecule বসাইয়া জলবিন্দু গড়িয়াছেন; atom-এর পাশে atom বসাইয়া জলের molecule গড়িয়াছেন; electron-এর পাশে electron বসাইয়া atom গড়িবার চেষ্টায় আছেন। এমনকী, যে সকল পণ্ডিত আকাশব্যাপী সন্তত বিচ্ছেদহীন ঈথরের কল্পনা করিয়া, তদ্বারা আকাশের ফাঁক পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখনই তাঁহারা আকাশব্যাপী ঈথরের সহিত কারবার করিতে গিয়া তাহার dynamical theory দিতে গিয়াছেন, তখনই সেই ঈথরেরও কণিকা বা molecule বা particle কল্পনা করিতে হইয়াছে; সেই ঈথরকে কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিতে হইয়াছে; একটা ঈথর-কণিকার পাশে আর একটা কণিকা বসাইয়া উভয়ের মধ্যে ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার হিসাব দিতে হইয়াছে।

প্রমথনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমি এই জন্যই সেই প্রশ্নটিকে জগতত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন বলিয়াছি। Continuity লইয়া আমাদের কারবার চলে না, discontinuity লইয়াই আমাদিগকে কারবার করিতে হয়। ইহা হয়তো মূলে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তির—আমাদের Reason-এর একটা দুর্বলতার বা সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়। জীবন-যুদ্ধে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তি এরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, আমাদিগকে ওইরূপে জীবনেরই কারবার চালাইতে হয়। ওইরূপেই জগতের অভিমুখে আমাদিগকে তাকাইতে হয়;—দেবতার মতো নির্নিমেষনেত্রে আমরা তাকাইতে পারি না, মাঝে-মাঝে নিমেষ ফেলিয়া আমরা তাকাইতে বাধ্য হই। জাগতিক

রহস্যের উপরতলায় উঠিতে হইলে, আমরা গড়াইয়া-গড়াইয়া উঠিতে পারি না—ধাপে-ধাপে পা ফেলিয়া, সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া থাকি। মানুষের মতো চেতন জীবের পক্ষে বাহ্য জগতের সহিত কারবারে এই প্রজ্ঞা-বৃত্তিকেই মহাস্ত্র বা ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইতর অস্ত্রও আমরা যেরূপে প্রয়োগ করি, এই ব্রহ্মাস্ত্রকেও সেই রীতিতে প্রয়োগ করিতে বাধ্য আছি। আমরা যেন গায়ের পর গা দিয়া মুদগর প্রহার করি, চোটের-পর-চোট দিয়া তলোয়ার চালাই, খোঁচার-পর-খোঁচা দিয়া বল্লম প্রয়োগ করি, তিরের-পর-তির, গুলির-পর-গুলি ছুঁড়িয়া জীবনের লড়াই চালাইতে বাধ্য হই। এক টানে, অবিচ্ছেদে, সন্তুতভাবে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকেও প্রয়োগ করিতে পারি না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যেখান ব্যবহারিক বিদ্যা—practical applied science, সেখানে তাহার সমুদয় হতিয়ারই ওইরূপ—সর্বত্রই এইরূপ discontinuity বিরাম, বিচ্ছেদ। Atom, molecule, particle,—এ সমস্তই বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভাবিত হাতিয়ার—এ সবগুলিই যেন তূণীরমধ্যে অবস্থিত বাণ,—গোটা-গোটা বাণ, চোখা চোখা বাণ; গোটা-গোটা বলিয়াই আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহাদের প্রয়োগে পটু এবং প্রয়োগ দ্বারা জগৎজয়ী।

এই জন্যই বিজ্ঞান-বিদ্যায় atomistic theory-র—কণিকাবাদের জয়জয়কার। ব্যবহারিক জগৎকে আয়ত্ত করিতে হইলেই, তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া, খণ্ডে-খণ্ডে ছিঁড়িয়া লইতে হয়—ইহাই হইল atomistic theory। জড় জগতের পক্ষে যাহা atom—পরমাণু, প্রাণী-জগতে তাহা কোশ—cell; এক-একটা cell-এর একটা খণ্ড গোটা জিনিস; এক-একটা individual; উহার ভগ্নাংশ নাই। আধখানা, সিকিখানা পরমাণু যেমন অর্থশূন্য, আধখানা, সিকিখানা কোশ সেইরূপ অর্থশূন্য। একটি-একটি করিয়া কোশের সংখ্যা গণিতে হয়। বড়-বড় প্রাণীর দেহ এইরূপ বহু কোশে নির্মিত—উহা বহু কোশের সমূহ—বহু ইষ্টকে নির্মিত এক-একখানা বাড়ি। এক-একখানা বাড়ি এক-একটা গোটা জিনিস;—একখানা বাড়ির পাশে আর একখানা থাকে—গ্রামের মধ্যে বাড়ির সংখ্যা পঞ্চাশখানা বা একান্নখানা হয়, সাড়ে পঞ্চাশখানা হয় না। বহু কোশে নির্মিত বড়-বড় প্রাণীও গোটা-গোটা প্রাণী, তাহাদেরও ভগ্নাংশ হয় না। পঞ্চাশটা হাতি বা একান্নটা হাতি হয়, সাড়ে পঞ্চাশটা হাতি হয় না। একটা গোটা হাতি আর একটা গোটা হাতির সহিত কারবার করে—আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদানই হাতির প্রাণযাত্রা—ইহা মূলে বিরোধাত্মক। আদান-প্রদানের নামই প্রতির্দ্বন্দ্বিতা; দ্বন্দ্ব না থাকিলে অর্থাৎ অন্তত দুইটা না থাকিলে একা-একা প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলে না। অতএব প্রাণযাত্রা চালাইতে হইলে একের দ্বারা চলে না, বহুর প্রয়োজন হয়। প্রাণী-পদার্থ একাকারে জগদ্ব্যাপী হইলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিরোধ, এই প্রাণযাত্রা অসম্ভব হইত; অতএব প্রাণযাত্রা যেখানে আছে, সেখানে এই বহুত্বের আবশ্যকতাও আছে। বহুর মধ্যেই বিরোধ, বহু লইয়াই প্রাণযাত্রা, নতুবা প্রাণময় জগতেব প্রাণের স্ফূর্তি, প্রাণের প্রকাশ কীরূপে হইত, তাহা আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির গোচর হইত না। এই জন্য আমি এই প্রশ্নকে জগৎতত্ত্বের একটা গোড়ার কথা বলিয়া প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আপনারা হয়তো ভাবিবেন, আমি চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিলাম। আমি তাহা মনে করি না,—অন্তত ওই প্রশ্নের ওই উত্তর ভিন্ন আমার নিকট এখন অন্য উত্তর নাই।

প্রসঙ্গক্রমে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; সেই বিরোধের কথাতেই আবার ফিরিয়া আসা যাক। প্রাণের সহিত জড়ের চিরন্তন বিরোধের কথাটাই পূর্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু

তদপেক্ষা তীব্রতর ভীষণতর বিরোধের এ পর্যন্ত উল্লেখ করি নাই। এই বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর বিরোধ। গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি, প্রাণের মতো স্বার্থপর আর দ্বিতীয় নাই। একটা প্রাণীকোশ যখনই খণ্ডিত হইয়া দুইটা কোশে বিভক্ত হয়, তখনই ওই দুইটা কোশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া আহার অন্বেষণে নিযুক্ত হয়; কিন্তু একটা অন্যটার কিছু মাত্র অপেক্ষা রাখে না। উভয়েই যে এক সময়ে একই মাতৃকোশের মধ্যে প্রায় অভিন্ন দেহে বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন পরিচয়ই এখন পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে আপন জীবনযাত্রা লইয়া এতটা ব্যস্ত থাকে যে, অন্যটার প্রতি চাহিবার কোনো অবকাশ থাকে না। এই শ্রেণির একটি মাত্র কোশে নির্মিত প্রাণীকে ইংরেজিতে uuicellular organism বলে। প্রাণময় জগতে ইহারা যে কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে,—পঞ্চাশ বৎসর আগে, এমনকী, দশ-বিশ বৎসর আগেও আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি ইহাদের আলোচনার জন্য Bacteriology নামে একটা বিপুলকায় বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল প্রাণী সর্বদা আমাদের নজরে পড়ে, তাহাদের দেহ unicellular নহে, multicellular; একটা মাত্র কোশে নির্মিত নহে, বহু কোশে নির্মিত। ইহাদের দেহ বহু প্রাণীর দেহের সমবায়ে বা সমষ্টিতে নির্মিত মনে করা চলিতে পারে। কীট পতঙ্গ হইতে হাতি, ঘোড়া, মানুষ পর্যন্ত সকল প্রাণীর দেহ বহু কোশের সমষ্টি। অনেকগুলি মানুষে একটা দলভুক্ত হইয়া যেমন একটা সমাজ বাঁধে, কতকটা সেইরূপ। প্রত্যেক জন্তু এক-একটা প্রাণী নহে, এক-একটা প্রাণী-সমাজ। এই সমষ্টিবদ্ধ কোশগুলির মধ্যে আবার কাজের বাটোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে। এক-এক দল কোশের উপর এক-একটা কাজের ভার পড়িয়াছে। হাড়, মাস, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ ধাতু এবং নাক, চোখ, কান প্রভৃতি অবয়বই তাহার পরিচয়। এখানে সমাজ-রক্ষার বা সমষ্টি-রক্ষার অনুরোধে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টি কোশকে তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বার্থপরতা একেবারে ত্যাগ করিয়া সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে। এমনকী, প্রত্যেক অঙ্গকে ও অবয়বকে আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য অঙ্গের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। পেট বসিয়া-বসিয়া খায়, কোনও মেহনত করে না,—পেটের বিরুদ্ধে হাত-পায়ের অভিযোগের প্রাচীন উপাখ্যান স্মরণ করিবেন। এখানে দেহের অন্তর্গত প্রত্যেক কোশকে আমরা প্রাণী বলি না,—কোশের সমষ্টিতে নির্মিত নানা অবয়ববিশিষ্ট যে বৃহৎ দেহ, সেই দেহটাকেই প্রাণী বলি। জড় জগতে অণু-পরমাণুগুলি যেমন জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্যাদির মতো বৃহৎ জড় খণ্ডের উৎপাদন করিয়াছে, ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা গ্রহ উপগ্রহের মধ্যগত অণু-পরমাণুর প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, গোটা-গোটা গ্রহ উপগ্রহের হিসেব রাখেন; প্রত্যেক গ্রহে, প্রত্যেক উপগ্রহে একটা individuality দেন। প্রাণী-বিদ্যাও সেইরূপ দেহের অন্তর্গত কোশগুলির পৃথক খবর না লইয়া, কোশের সমষ্টি যে দেহ, তাহাকেই একটা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়া গণ্য করেন, এবং তাহাকেই একটা individuality দেন। এই হিসাবে আমি, আপনি, তিনি, রাম, হরি, শ্যাম, প্রত্যেকে একটি প্রাণী, একটি individual, একটি ব্যক্তি। প্রমথনাথের প্রশ্ন এখানেও অন্য আকারে উঠিতে পারে। ছোট-ছোট কোশগুলি কেন এরূপে জমাট বাঁধিয়া মোটা-মোটা, বড়-বড় কোশসমষ্টিতে অর্থাৎ multicellular প্রাণীদেহে পরিণত হইল? ইহার পালটায় আমি প্রশ্ন করিব—atom, molecule-গুলিই বা কোন গরজে জমাট বাঁধিয়া মোটা-মোটা গ্রহে উপগ্রহের, চন্দ্র-সূর্য-তারকার উৎপাদন করিল? দার্শনিক তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে যেরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি আগেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা বলিবেন, উহা

চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা; দার্শনিক ফাঁকিতে তুষ্ট হইব না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দার্শনিক তত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতে চাহেন না, দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি বরং একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি সাবধান করিয়া গিয়াছেন, "Physics, Beware of Mataphysics!" বেশ কথা, আমি বৈজ্ঞানিকের সাজে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক আছি। কাজেই দার্শনিকের হেঁয়ালি ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকোচিত ভাষায় আমি বলিব, স্বতন্ত্র কোশগুলি জমাট বাঁধিয়া বড়-বড় প্রাণী-দেহ নির্মাণ করিয়াছে, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—জীবন সংগ্রামের সুবিধা। এই জীবন-সংগ্রামের কথাটা আজ-কালিকার বৈজ্ঞানিক মহলে খুব একটা বড় কথা। প্রাণময় জগতে কোন ঘটনা ঘটিতেছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, এই ঘটনায় জীবন-সংগ্রামের সুবিধা হয়, অতএব এই ঘটনা ঘটিতেছে,—অমনই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিস্তব্ধ হইয়া, মাথা হেঁট করিয়া উত্তরটা মানিয়া লন। আমি যদি বলি, কোশগুলি দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে জমাট বাঁধিয়া বড়-বড় প্রাণীদেহ নির্মাণ করিলে তাহাদের জীবন-যুদ্ধে, জীবনযাত্রায় সুবিধা হয়, জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ধাতের লোকে মাথা হেঁট করিয়া বলিবেন, তাই তো, উত্তরটা সঙ্গত হইতেও পারে। আপনারা জানেন, প্রাণময় জগতে এই জীবন-সংগ্রামের আবিষ্কর্তা Charles Darwin। বাঘে ছাগল খায়, ছাগলে গাছ খায়, এমনকী, গাছের পাতাতেও পোকা ধরিয়া যায়, Darwin-এর আগেও ইহা সকলে জানিত। এই ঘটনাটাই জীবন-সংগ্রাম। কিন্তু এই জীবন-সংগ্রামটা যে কীরূপ ভীষণ, এবং ইহার ফলাফল কীরূপ সূক্ষ্ম এবং কীরূপ দূরব্যাপী, Darwin-এর আগে কেহ তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—সর্বত্র কীরূপ ভীষণ কুরুক্ষেত্র ব্যাপার অহর্নিশি চলিতেছে, তাহা Darwin-এর পর হইতে আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। প্রাণের সহিত জড়ের নিত্য বিরোধের কথা আগেই বলিয়াছি। সে বিরোধ তো ভয়ানক বটেই; কিন্তু প্রাণীর সহিত প্রাণীর এই যে বিরোধ, ডারউইন যাহা পট তুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার উগ্র ভীষণতার বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। ব্যাসের বা হোমারের কলমে বর্ণনা কুলায় কি না সন্দেহ। আপনাদের যদি সখ থাকে, ডারউইন-তন্ত্রীদের পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা মস্ত কৌতুকের কথা আছে। প্রাণ-পদার্থ জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে চায়, protoplasm তাহার ভিতরে দানা বাঁধিয়া প্রাণীকোশে পরিণত হইয়া জড় জগৎ হইতে খাদ্য অন্বেষণ করে। বিশাল জড় জগৎটাকে সহজে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া, আপনাকে ছিন্ন করিয়া, খণ্ডিত করিয়া—শত খণ্ডে, কোটি খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া জড় জগৎমধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার উদ্দেশ্য বোধ করি, আহার অন্বেষণের সুবিধা। একাকী একত্র স্থির না থাকিয়া শত খণ্ডে ছুটিয়া বেড়াইলে জড়কে আত্মসাৎ করিবার, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইবার হয়তো সুবিধা ঘটে। আবার unicellular কোশগুলি জমাট বাঁধিয়া multicellular প্রাণীতে পরিণত হইলেও বোধ করি, জড় জগৎ হইতে আত্মরক্ষার এবং জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা ঘটে। উভয় স্থলেই মূল বিরোধ প্রাণের সহিত জড়ের। কিন্তু প্রাণী যখন প্রাণীর সহিত বিরোধ করিতে আরম্ভ করে, তখন যেন সেই গোড়ার বিরোধটা ভুলিয়া যায়। সাধারণ শত্রু যে জড়, তাহার সহিত বিরোধটা যেন ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ঘরোয়া বিরোধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে সমস্ত প্রাণী যেন দুইটা স্কন্ধাবার আশ্রয় করিয়া পরস্পর যুধ্যমান দুইটা দলের উৎপত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। একটা দলের নাম উদ্ভিদ; আর একটা দলের নাম জন্তু। জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণ-পদার্থে পরিণত করিবার ভারটা মুখ্যত উদ্ভিদের উপরে পড়িয়াছে। আমাদের

এই ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক উদ্ভিদ স্বস্থানে গট করিয়া বসিয়া, অর্বুদ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্যের দিকে পত্রপল্লবরূপী হাজার পেট পাতিয়া দিয়া সূর্যের আলো এবং উত্তাপ হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, বায়ুরাশি হইতে কয়লা আত্মসাৎ করিতেছে এবং ভূমির মধ্যে শিকড়রূপী সরু মুখ চালাইয়া দিয়া মৃত্তিকা হইতে লোনা জল সংগ্রহ করিতেছে; এবং সেই কয়লা ও লোনা জলের সহিত এটা-ওটা-সেটা মিশাইয়া প্রাণী-পদার্থ অর্থাৎ protoplasm তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণী-পদার্থে পরিণত করিবার ভার লইয়াছে উদ্ভিদ। আর একটা দল জন্তু। ইহারা জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদকে আত্মসাৎ করিয়া উদ্ভিদের প্রস্তুত প্রাণী-পদার্থকে হজম করিয়া আপনাদের দেহের পুষ্টি করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, উদ্ভিদ ও জন্তু, উভয়কেই আমি প্রাণীর মধ্যে ফেলিয়াছি। উদ্ভিদেরা ধীর, স্থির, গম্ভীর, সঞ্চয়ী; আর জন্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত। উদ্ভিদেরা আপনার নৈপুণ্যের বলে এবং মিতব্যয়িতার বলে সারাজীবন ধরিয়া যাহা সঞ্চয় করে, জন্তুগুলি অবলীলাক্রমে মুহূর্তমধ্যে তাহা অপহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। প্রাণী-পদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্তুর নাই,—সে পটুতা আছে উদ্ভিদের। জন্তুরা জোর করিয়া পরের দ্রব্য লইয়া স্ফূর্তি করিতেই মজবুত। এই যে স্ফূর্তি, ইহা প্রাণেরই স্ফূর্তি; উদ্ভিদের তুলনায় জন্তুর মধ্যে এই প্রাণের স্ফূর্তি উৎকটভাবে দেখা দেয়। উদ্ভিদেরা স্বস্থানে বসিয়া সঞ্চয় করিয়া যায়, আর স্ফূর্তিমান জন্তুরা ছুটাছুটি করিয়া যেখানে উদ্ভিদের সন্ধান পায়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া সেই সঞ্চিত ধন হরণ করিয়া থাকে। হরণ করিয়াও রাখিতে পারে না; অমিতব্যয়ীর মতো খরচ করিয়া ফেলে, এবং আবার ডাকাতি করিতে বাহির হয়। এইরূপে একটা চিরন্তন বিরোধ, জন্তুর সহিত উদ্ভিদের বিরোধ। জন্তুদের মধ্যে সকলের আবার উদ্ভিদ-ভোজনেও প্রবৃত্তি নাই। ছাগল ঘাস খায় বটে, কিন্তু বাঘ ঘাস হজমের পরিশ্রমটুকু স্বীকারে নারাজ। সে আস্ত ছাগলকেই আত্মস্থ করিয়া স্ফূর্তির সহিত বিচরণ করে। এখানে জন্তুর সহিত বিরোধ জন্তুর। দেখিতে পাইতেছেন, সমস্ত জগৎটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্রে গোড়ায় বিরোধ—প্রাণের সহিত জড়ের; তাহার উপরে বিরোধ—প্রাণীর সহিত প্রাণীর; তাহার মধ্যে বিরোধ—উদ্ভিদের সহিত জন্তুর এবং জন্তুর সহিত জন্তুর। এই যে সকল বিরোধ, ইহাও আবার মোটা বিরোধ; ইহার চেয়েও সূক্ষ্মতর বিরোধ আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। বাঘের সহিত ছাগলের বিরোধ আছে বলিয়া মনে করিবেন না যে, বাঘেদের মধ্যে পরস্পর পরম সম্প্রীতি রহিয়াছে। পৃথিবীতে ছাগলের সংখ্যা এত অধিক নহে, যাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় বাঘ পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে। সকল বাঘের উচিতমতো আহার যোগাইতে হইলে পৃথিবীর ছাগলে কুলায় না, ছাগলের উপর গরু ভেড়া প্রভৃতি যোগ করিলেও কুলায় না। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এই কথাটার উপরে ডারউইন বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। কুলায় না বলিয়াই বাঘের সহিত বাঘের বিরোধ। ছলে বলে কৌশলে যে বাঘ আহার সংগ্রহ করিতে পারে, সে-ই টিকিয়া যায়, জিতিয়া যায় এবং তাহারই বংশ থাকে। অন্যে অকালে মরিয়া যায় এবং বংশ রাখিতে পারে না। প্রত্যেক বাঘ এইরূপে আপন জীবন রক্ষার জন্য অন্য সমুদয় বাঘের সহিত অবিরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে। এই যুদ্ধ সকল সময়ে মারামারি, কামড়াকামড়ি, রক্তারক্তিতে পরিণত না হইতে পারে। রক্তারক্তির সহিত যে লড়াই তাহা মোটা লড়াই, তাহা সহজেই চোখের উপর দিয়া ধরা পড়ে; কিন্তু ছল বল কৌশল প্রভৃতি যাবতীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া এই যে অবিরাম গুপ্ত লড়াই, ইহা তাহার চেয়েও ভীষণ; ইহার ফলাফল

তাহার চেয়েও সূক্ষ্ম এবং দূরগামী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজের সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সহকৃত যে রক্তারক্তি, তাহার ভীষণতার নিকট আটিলার বা জঙ্গিস খাঁয়ের খাঁটি রক্তারক্তি হার মানে। Darwin-এর পর হইতে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের পরাজয় প্রভৃতি নানা কথা আপনারা শুনিয়া আসিতেছেন—তাহা এই জীবনযুদ্ধেরই ফল। বস্তুত এই বিরোধের ফল অতি সূক্ষ্ম এবং অতি দূরগামী। নির্মমতায়, নিষ্ঠুরতায় কোনও বিরোধের সহিত ইহার তুলনা হয় না। এখানে কেহ কাহারও আত্মীয় নাই, কোনোরূপ আত্মীয়-পর বিচার নাই, স্বজাতি-পরজাতি বলিয়া কোনও পক্ষপাত নাই। এমনকী, পিতা-পুত্রের মধ্যেও এখানে কোনওরূপ মমত্ববোধ নাই। পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজের মুখে তুলিতেছেন, তখনই তিনি আপন পুত্রকে বঞ্চিত করিতেছেন। তাহা তো হইবেই। ইহা নিতান্ত সত্য কথা যে, পৃথিবীতে অন্নের মাত্রা পরিমিত। উদ্ভিদ জড় দ্রব্য আত্মসাৎ করে। কিন্তু পৃথিবীব জড় দ্রব্যের কিঞ্চিৎমাত্র গ্রহণযোগ্য; অধিকাংশই বর্জনীয়। জন্তু উদ্ভিদকে আত্মসাৎ করে; কিন্তু যত জন্তু, তত উদ্ভিদ নাই? নতুবা এক জন্তু অন্য জন্তুকে আত্মসাৎ করিতে যাইবে কেন? অন্নের মাত্রা যখন নিতান্তই পরিমিত, তখন পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজ মুখে অর্পণ করিলেন, পুত্রকে তখনই সেই গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিলেন। আজি না হউক, ভবিষ্যতে কোনও একদিন পুত্রকে সেই বঞ্চনার ফল ভোগ করিতে হইবেই। প্রাণী মাত্রেই এই হিসেবে ঘোর স্বার্থপর, এবং প্রাণের মতো স্বার্থপর পদার্থ আর কিছুই নাই। গত বারে প্রাণের এই স্বার্থপরতার কথা আমি খুব ঘনাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; আপনারা হয়তো সে কথাটা তখন সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ-কালের প্রাণ-বিদ্যার পক্ষে এই কথাটাই সব চেয়ে বড় কথা এবং এই কথাটার সত্যতা অতি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া ডারউইনের এত মাহাত্ম্য।

প্রাণীগণের পরস্পরের মধ্যে এই যে বিরোধ, অন্নের জন্য যে বিরোধ, যে বিরোধের কথা ডারউইনই স্পষ্টভাবে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিরোধটা মোটা-মোটা বহু কোশে নির্মিত multicellular প্রাণীর মধ্যেই প্রবল ভাবে এবং তীব্রভাবে দেখা যায়। এক কোশে নির্মিত unicellular প্রাণীরা—যাহারা আমাদের চোখের আড়ালে থাকে, তাহাদের মধ্যে তত স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। ডারউইনও সেই মোটা-মোটা প্রাণীর পরস্পর বিরোধই সম্যক আলোচনা করিযাছেন। ডারউইনের সময়ে Bacteriology-বিদ্যার উৎপত্তি হয় নাই বলিলেই হয়। এই বিরোধের আলোচনা করিতে গেলেই, মৃত্যু তাহার সমস্ত বিভীষিকা লইয়া চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা প্রাণী অতি তুচ্ছ কারণে অপর প্রাণীকে মারিয়া ফেলে,—হয় তাহার দেহটাকেই আত্মস্থ করে, নয় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লয়। পরস্পরকে মারিবার জন্য প্রাণীজগতে যে নিরন্তর চেষ্টা, তাহাই জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে কে কোন সুবিধায় জিতিয়া যায়, তাহা বলা কঠিন। কেহ ছলে, কেহ বলে, কেহ কৌশলে জিতিয়া যায়। অন্যে অতি সামান্য ত্রুটিতে পরাজিত হয়। সংগ্রামটা এত ভীষণ যে, কোনও স্থানে, কোনও মতে, কোনও একটুকু ত্রুটি হইলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, ফল অকালমৃত্যু। প্রাণী কেলবই মরিতেছে, অজস্র ভাবে মরিতেছে;—এত অজস্র ভাবে মরিতেছে যে, একটুকু হিসাব করিয়া দেখিতে গেলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে করুন দেখি, একটা মাছে কত ডিম পাড়ে। প্রত্যেক ডিম যদি বাঁচিয়া থাকিয়া পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হইত, এবং সেই প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ মাছ আবার পূর্বের মতো ডিম পাড়িবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে মৎস্য-বংশের স্থান হইতই বা কোথায়? আহার জুটিতই বা কীরূপে?

লাখটা মাছের মধ্যে একটা মাছও হয়তো পূর্ণাঙ্গ হইবার অবকাশ পায় না—তৎপূর্বে অন্য জন্তুর উদরসাৎ হয়, অথবা জড় জগতের দৌরাত্ম্যে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ভাগ্যে মৃত্যু ছিল, তাই পৃথিবীতে অন্য জন্তুর স্থান হইয়াছে; নতুবা মৎস্যপূর্ণ বসুন্ধরায় অন্য জন্তুর উপস্থিতিব কোনও সুযোগই ঘটিত না। মৎস্য-বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মৃত্যুর সহস্র পথ খুলিতে হইয়াছে, সহস্র শত্রুর উপস্থিতি আবশ্যক হইয়াছে। ফলে মাছের শত্রুসংখ্যা এখন এত বেশি এবং মাছের মৃত্যুর পথ সংখ্যায় এত অধিক যে, এখন মৎস্য বংশ রক্ষা করাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। এখন মৎস্য বংশ রক্ষা করিবার জন্যই যেন মাছের মাকে লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিতে হইতেছে। এ বড় কৌতুকের কথা। মৎস্য বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মাছের বহু শত্রুর আবশ্যক; নতুবা পৃথিবী মাছেই ভরিয়া উঠে। আবার সেই শত্রু হইতে মৎস্য-বংশ রক্ষা করিবার জন্য মাছের জননীকে বহু সন্তানকে প্রসবিনী হওয়া দরকার; নতুবা মৎস্য-বংশ পৃথিবীতে লুপ্ত হয়। এ অত্যন্ত কৌতুকের ব্যবস্থা নয় কি? এক দিকে বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্য মৃত্যুর আবশ্যকতা; অন্য দিকে মৃত্যু হইতে বংশ রক্ষার জন্য অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। ইহাও তো একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। বংশনাশের ব্যবস্থার সহিত বংশরক্ষার ব্যবস্থার বিরোধ—যেন জীবনের সহিত মৃত্যুরই বিরোধ। ব্যাপারটা যেন রক্তবীজের লড়াই। রক্তবীজকে যতই ধ্বংসের চেষ্টা হইতেছে, রক্তবীজ ততই বাড়িয়া যাইতেছে; প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত হইতে কোটি রক্তবীজ জন্মিতেছে। প্রকৃতিদেবী নিষ্ঠুরা—নির্মম খড়্গাঘাতে আপন সন্তানদিগকে বধ করিতেছেন; কিন্তু বধে কুলাইতেছে না: একের স্থানে কোটি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রকৃতি দেবীর যে মূর্তি ডারউইন খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্তই উগ্রচণ্ডা মূর্তি; তাহা সৃকদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফারিতাননা মূর্তি।

মৃত্যু বলিতেছে, আমি জীবনকে নষ্ট করিব; জীবন বলিতেছে, আমি মৃত্যুকে ফাঁকি দিব। এই ফাঁকি দিবার জন্য জীবন যে কত কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি সামান্য ত্রুটিতে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন কোনও-না-কোনওরূপে সেই ত্রুটি সামলানো দরকার। যে অযোগ্যতায় পরাজয়ের আশঙ্কা, সেই অযোগ্যতা কোনও-না-কোনওরূপে পরিহার করিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যোগ্যেরই জয়—অযোগ্যেরই পরাজয়। যেখানে যেটুকু অযোগ্যতা আছে, সেটুকু দূর করিতে হইবে। মেরুদণ্ড শক্ত করিতে হইবে, দাঁত ধারালো করিতে হইবে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, মাথার মধ্যে মগজ জমাইতে হইবে, দুই পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, জলে সাঁতরাইতে অথবা হাওয়ায় উড়িতে হইবে, আঁধারে লুকাইতে হইবে অথবা রং বদলাইয়া অদৃশ্য হইতে হইবে, দল বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, অথবা বুদ্ধি খেলাইয়া জড় দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া,—সেই বুদ্ধিকে আত্মরক্ষার অস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই;—কোনও প্রাণী পাখি হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে, কেহ মাছ হইয়া জলে সাঁতার দিতেছে, কেহ সাপ হইয়া বিষ উদ্গিরণে শত্রু নাশ করিতেছে, কেহ ছুঁচা হইয়া গর্তের ভিতর লুকাইয়া আছে, কেহ পোকা হইয়া গায়ের গন্ধে শত্রুরও অগ্রাহ্য হইতেছে, কেহ বাঘ হইয়া ঘাসের বনে আত্মগোপন কবিয়া অসর্তক শিকারের অপেক্ষায় ধারালো নখ এবং দাঁত লইয়া বসিয়া আছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীই তো ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বা Species। এই নানাজাতি প্রাণীর উৎপত্তি কেবলই তো আত্মরক্ষার জন্য এবং শত্রুবিনাশের জন্য। মানুষও যে তাহার খুলির ভিতরে একরাশি মগজ এবং সেই মগজের অনুযায়ী বুদ্ধিশক্তি সত্ত্বেও দল বাঁধিয়া, সমাজ

বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারও মূল কারণ তো সেইখানে। তাহার যখন বাঘের মতো দাঁত নাই, নখ নাই, বা জলে ডুবিবার বা হাওয়ায় উড়িবার ক্ষমতা নাই, বহুরূপীর মতো রং বদলাইয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার শক্তি নাই, সে যখন সর্বতোভাবে দুর্বল,—তখন এইরূপে সমাজ না বাঁধিলে পৃথিবীতে তাহার স্থান হইত কোথায়? সে আত্মরক্ষা করিত কী রূপে? মনে করিবেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে; মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ রক্ষার জন্য; আপনাকে বাঁচাইবার জন্য; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিদ্যা প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না; প্রাণবিদ্যার এই নিগূঢ় তথ্য খুলিয়া বলিয়াছেন. জার্মানি দেশের Nietzche; তাই জার্মানি আজ সমস্ত পৃথিবীর সহিত লড়াইতে মাতিয়াছে প্রেমের কথা তাহাকে শুনাইতে যাইবেন কি? ফলে যে যেমনে পারে, সে সেইরূপে আত্মরক্ষার এবং শত্রুনাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে; এবং তাহারই ফলে এই প্রাণময় জগতে বিবিধ বিচিত্র প্রাণীজাতিসমূহের উদ্ভব ঘটিয়া গিয়াছে,—ইহাই হইল ডারউইনের Origin of Species।

প্রাণী জানিতেছে, মৃত্যু তো আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, একটু ত্রুটি পাইলেই আমাকে গ্রাস করিবে; কিন্তু মৃত্যুকে তো আমার ফাঁকি দেওয়া চাই। মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে একটা অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহার দেহের কিয়দংশ,—খানিকটা প্রাণী-পদার্থ—দেহের মধ্যে অতি সন্তর্পণে গুপ্ত করিয়া রাখে। নিজের একটু বয়স হইলেই সেই যত্নরক্ষিত প্রাণী-পদার্থকে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই ব্যাপারের নাম অপত্যোৎপাদন। অপত্যরূপী প্রাণ-পদার্থ এইরূপে জন্ম লাভ করিয়া আপনার দেহ আপনি বানাইয়া লয় এবং সেই দেহের মধ্যে আপনাকে গোপনে লুকাইয়া রাখে। এইরূপে একটা নূতন প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সময় উপস্থিত হইলে এই নূতন প্রাণী আপনাকে স্বদেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপত্যের জন্ম দেয়। সে-ও আবার নূতন করিয়া আপনার দেহ ছাড়িয়া লইয়া তৃতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করে। এইরূপে অপত্য-পরম্পরায় প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক প্রাণী মরিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার উৎপাদনের জন্য দেহমধ্যে যে প্রাণী-পদার্থটুকু গুপ্ত থাকে, সেইটুকু বীজ; এবং যে দেহের মধ্যে উহা সযতনে রক্ষিত থাকে, সেইটুকু যেন সেই বীজের খোসা বা আবরণ। সেই বীজকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে, বাহিরের যাবতীয় আপদ হইতে রক্ষা করাই সেই দেহের, সেই আবরণভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণীর যে দেহ আমাদের চোখে পড়ে, সেটা কেবল খোসা মাত্র; এবং সেই দেহের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র কণিকাটুকু লুকানো থাকে, সেই বীজটুকুই আসল প্রাণী। দেহরূপ কৌটার ভিতরে যেন এই অমূল্য রত্নকণা সংগোপনে রক্ষিত থাকে। সেই লুকানো রত্নটির, সেই বীজটির যেন নাশ নাই। সে কেবল এক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় লয়; এবং এইরূপে গুপ্ত থাকিয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। এই আসল প্রাণীটুকু বস্তুত অমর, ইহার ধ্বংস নাই। কিছু দিনের জন্য যে দেহের মধ্যে থাকিয়া সে আত্মরক্ষা করে, সেই দেহটাই ধ্বংসশীল। বাহ্য জগতের আক্রমণ এই দেহের উপর দিয়াই যায়; এবং সেই দেহটাই কিছু কাল ধরিয়া বাহ্য জগতের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দেহের এই ধ্বংসকেই আমরা বলি মৃত্যু। আসল যে মানিকটি, তাহার ধ্বংস হয় না; মাণিকেব কৌটাটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কৌটাটি মাঝে-মাঝে বদলাইতে হয়। যখনই তাহার জীর্ণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা জন্মে, তাহার পূর্বেই তাহা পুরাণ কৌটা ত্যাগ করিয়া নূতন কৌটা আশ্রয়

করে। নূতন কৌটা আশ্রয় করে বলিলে চলিবে না,—আপনার কৌটা আপনি গড়িয়া লয় বলিতে হইবে। ইহাই তো প্রাণের কারিগরি। জড়দ্রব্য কোনওরূপে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না; কিন্তু জড়দ্রব্যে প্রাণের সঞ্চার হইবা মাত্র উহা প্রাণীপদার্থে পরিণত হয়, এবং সেই প্রাণীপদার্থ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবার শক্তি রাখে। প্রাণের ইহাই বিশিষ্ট ধর্ম। প্রাণ আপনাকে যেরূপেই হউক, রক্ষা করিবেই। আমার পূর্বপ্রবন্ধে ইহাই খুব খোলসা করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আসল প্রাণীটার এই নূতন-নূতন দেহ-পরিগ্রহ—এই খোলস ছাড়ার ব্যাপার,—ইহারই নাম বংশানুক্রম; এবং এই বংশানুক্রমের কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বহু কোশে নির্মিত multicellular প্রাণীগণ মৃত্যুকে এড়াইবার কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, প্রাণী নিয়তই মরিতেছে; কিন্তু প্রাণের ধারা লুপ্ত হইতেছে না,—এক দেহ হইতে সহস্র দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ আপনাকে জীবন-সংগ্রামে আজি পর্যন্ত অপরাজিত রাখিয়াছে। Darwin-এর পরবর্তী Weismann-এর নিকট আমরা এই তথ্যটির সন্ধান পাইয়াছি।

ব্যাপারটা ভালো করিয়া বুঝিবার চেষ্ট করুন। আমরা দেহটাকেই প্রাণীর সর্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস ইত্যাদি নানা ঋতুতে এই দেহ নির্মিত। হাত, পা, মাথা, বুক, পেট, প্লিহা, যকৃৎ ইত্যাদি নানা অবয়ব—নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি নানা ইন্দ্রিয় এই দেহের পরিচর্যায় নিযুক্ত। এই দেহটাকেই আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই, এবং ইহাকেই প্রাণীর সর্বস্ব বলিয়া মনে করি। এই প্রকাণ্ড দেহের কোন অভ্যন্তরে আসল প্রাণীটি সংগোপনে চোখের আড়ালে রক্ষিত আছে, তাহার বড়-একটা খোঁজই রাখি না। অথচ এই দেহটা কেবল একটা আবরণ মাত্র, একটা আচ্ছাদন মাত্র, একটা কৌটা মাত্র, একটা ঢাকনা মাত্র, একটা খোলস মাত্র। প্রাণীকে রক্ষা করা এই খোলসের এক মাত্র উদ্দেশ্য; কাজেই জীবন-সংগ্রামে লড়াইয়ের ভারটা এই দেহের উপরেই পড়ে,—বাহ্য জগতের সমস্ত আক্রমণটাই এই দেহের উপর দিয়াই যায়। বাহিরের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত অত্যাচার এই দেহকেই সহিতে হয়; এবং এই সমস্ত উপদ্রব অত্যাচার সহিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় এই দেহকেই ধ্বংস পাইতে হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ আসল প্রাণীটি অবিনাশী থাকে, অবিকৃত থাকে, বাহিরের কোন উপদ্রব তাহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। যত কিছু বিকার, বৈকল্য—তাহা সেই দেহের উপর দিয়া যায়। এই দেহ যেন দুর্গবিশেষ—শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলা-গুলি সেই দুর্গটিকেই ভাঙিয়া চুরিয়া নষ্ট করে। দুর্গের যে মালিক, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দুর্গমধ্যে আপনার কুঠরিতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া অবিকারে নিদ্রা যায়। নিতান্তই যখন দুর্গটি আর টেকে না, তাহার পূর্বেই দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, নূতন দুর্গ গড়িয়া লইয়া, তাহার ভিতরে আবার সুখসুপ্ত হয়। ফলে যাহাকে মৃত্যু বলা যায়, তাহা মৃত্যু নহে, তাহা খোলস ছাড়া ব্যাপার। জীবনযুদ্ধে সামর্থ্য পাইবার জন্য জীর্ণ খোলস ত্যাগ করার ব্যাপার,—ইহা প্রাণ রক্ষারই কৌশল। বস্তুত প্রাণী মরে না। মৃত্যু—প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণী কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌশল মাত্র।

দেখা যায়, পুত্রের দেহ প্রায় সর্বাংশেই পিতৃদেহের সদৃশ হয়। পুত্রের আকৃতি প্রকৃতি প্রায় সর্বাংশেই পিতারই অনুরূপ হয়; অর্থাৎ নূতন খোলসটি প্রায় সর্বাংশেই পুরাতন খোলসটির অনুরূপ হয়। মানুষের বাচ্চা মানুষই হয়, কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়, আমের বীজে কাঁঠালগাছ জন্মে না, ইহাই নিয়ম। ইংরেজিতে ইহাকে বলে heredity; বাংলায় বলিব পিতৃক্রম। ইহাতে তত বিস্ময়ের কারণ নাই। একই প্রাণী যখন অবিকৃত থাকিয়া জন্মপরম্পরায় ভিন্ন-ভিন্ন গড়িয়া লয়, তখন সেই পূর্বজন্মের দেহ আর পরজন্মের দেহ সর্বাংশে সদৃশ হইবে,

ইহাতে বিস্ময় কী? যে বীজ পিতার দেহ গড়িয়াছিল, সেই বীজই যখন পিতৃদেহ হইতে চ্যুত হইয়া আসিয়া এবং বাহিরের আক্রমণ সত্ত্বেও অবিকৃত থাকিয়া পুত্রের দেহ নির্মাণ করে, তখন পুত্র সর্বাংশে পিতার অনুরূপ হইবে, ইহাতে বিস্ময় কী? সর্বাংশে অনুরূপ না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা হইত। আপনারা প্রণিধান করিবেন, আমি একটুকু সাবধানে কথা কহিয়াছি। পুত্র সর্বাংশে পিতার অনুরূপ হয়, ইহা আমি বলি নাই,—একটা "প্রায়" শব্দ বাক্যমধ্যে বসাইয়াছি; বলিয়াছি, "প্রায় সর্বাংশে অনুরূপ হয়"। পুত্র পিতার মতো হয় বটে, কিন্তু সর্বতোভাবে পিতার মতো হয় না; একটু-না-একটু পার্থক্য থাকেই। এমনকী, এক পিতার বহু পুত্র থাকিলে, সেই পুত্রগণের মধ্যেও পরস্পর কিছু-না-কিছু ভিন্নতা থাকে। এই ভিন্নতাটুকুকে ইংরেজিতে বলে Variation—বিকার, ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম। Heredity-তে বিস্ময়ের কথা নাই; কিন্তু এই variation-টাই বিস্ময়কর। বাহ্য জগতের সমস্ত উপদ্রবই দেহের উপর দিয়া যায়। ভিতরের বীজ যদি সর্বতোভাবে অবিকৃতই থাকে, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে উৎপন্ন নূতন দেহের এই ভিন্নতা আসে কীরূপে? এ বড় কঠিন-সমস্যা। একালের অনেক পণ্ডিত জোর করিয়া বলিতে চাহেন, বাহিরের আক্রমণে দেহেরই বিকার ঘটে; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বীজকে সে আক্রমণ একেবারে স্পর্শ করে না, বীজ অবিকৃতই থাকিয়া যায়। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে যে নূতন দেহ অপত্যরূপে নূতন জন্ম গ্রহণ করে, এই নূতন দেহে ভিন্নতা বা বিকার আসে কোথা হইতে? অথচ এ ব্যত্যয় অস্বীকারের উপায় নাই। বেটা বাপের সকল গুণ পায় না; দুই ভাই, এমনকী—দুই যমজ ভাই সর্বাংশে একরূপ হয় না, ইহা তো সত্য কথা। আবার এই ব্যত্যয় না থাকিলে ধরাপৃষ্ঠে এত বৈচিত্র্য ঘটিত না; নূতন জাতি, নূতন species আবির্ভূত হইত না। Drawin গোড়ায় এই variation মানিয়া লইয়াছেন; বলিয়াছেন, একই পিতার বহু পুত্রের মধ্যে সকলে জীবন-সংগ্রামে সমান যোগ্য হয় না। যাহার যোগ্যতা কোনও-না-কোনও কারণে একটু অধিক, তাহারই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনাও অধিক; তাহারই অপত্য রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। আর যাহাব যোগ্যতা অল্প, তাহাবই অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক, তাহার অপত্য রাখিবার অবসর না ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কাজেই যে যোগ্য, তাহারই বংশ টিকিয়া যায়; আর যে অযোগ্য, তাহাব বংশ থাকে না। কিন্তু সকল অপত্যই যদি সর্বাংশে পিতার সদৃশ হইত, তাহা হইলে সকলেরই যোগ্যতা সমান হইত; যোগ্যতার তারতম্য থাকিত না; জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমকে বাছিয়া লইয়া, ক্রমশ যোগ্যতা বৃদ্ধি ঘটাইয়া, নূতন জাতির—নূতন Species-এর উদ্ভাবনা সম্ভব হইত না। ফলে এই যে নানা species-এর উদ্ভব, তাহা সেই varioationt-এর ফলেই। খাঁটি heredity থাকিলে বাঘ বা হরিণ, সাপ বা ব্যাঙ—এইরূপ জাতিভেদ থাকিত না; প্রাণী মাত্রই এক জাতি হইয়া পড়িত।

প্রাণীর দেহকে প্রাণরক্ষা ব্যাপারে কবচস্বরূপ মনে করা গিয়াছে। ভিতরে গোপনে রক্ষিত প্রাণীটি এই কবচ পরিয়া বাহ্য জগতের আক্রমণ প্রতিষেধ করে। কবচটি সেই আক্রমণ প্রতিষেধের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তলওয়ারের আক্রমণ ঢালে ব্যর্থ হইতে পারে, বল্লমের খোঁচার পক্ষে ইস্পাতের সাঁজোয়া প্রশস্ত; কিন্তু গোলাগুলির আবির্ভাবেব সঙ্গে ঢালও গিয়াছে, সাঁজোয়াও গিয়াছে। ধরাপৃষ্ঠ যুগে-যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রাণীর প্রতি বাহ্য জগতের আক্রমণও যুগে-যুগে ভিন্ন রূপ লইতেছে। এখন আমরা ইউরোপকে শীতপ্রধান দেশ বলি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন, দেড় লক্ষ বৎসর পূর্বে ইউরোপ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল; তখন

ইউরোপের মহারণ্যে অতিকায় হাতি, গন্ডার ও সিংহ, শার্দূল বিচরণ করিত। তার পর ইউরোপে হিমের যুগ আসে; সমস্ত মহাদেশ বরফে ঢাকিয়া গিয়া প্রকাণ্ড বরফের ক্ষেত্রে পরিণত হয়; ইংরেজিতে সে যুগকে বলে glacial age—হিমানীযুগ। তখন গন্ডারের বংশ, সিংহের বংশ ইউরোপ ছাড়িয়া দক্ষিণে পলাইয়া আসিল; অতিকায় হাতির বংশ, ম্যামথের বংশ হিমের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া লুপ্ত হইল। এখন আবার ইউরোপ গরম হইতেছে; বরফের ক্ষেত্র গলিয়া গিয়াছে; বরফ কেবল উত্তর মেরুর চারিদিকে খানিকটা দেশে বর্তমান আছে, এবং Alps পর্বতের মাথার উপরে আশ্রয় লইয়াছে। ফলে এই যুগ-বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীকেও আপনার দেহ বদলাইয়া লইতে হইয়াছে। যে দেহ উৎকট, গ্রীষ্মের উপযোগী, তাহা উৎকট হিমের উপযোগী নহে। Environment-এর সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকিলে কোনো দেহই টিকিতে পারে না। এই সামঞ্জস্য লাভের যোগ্যতা না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। খাঁটি heredity বা পিতৃক্রম স্থিতিশীল; উহাতে চলে না। Variation অর্থাৎ পিতৃক্রম হইতে ব্যত্যয় আবশ্যক হয়। প্রাণীর বীজ যদি বাহিরের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত থাকে, সেই আক্রমণ যদি তাহাকে একবারে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহার এই ব্যত্যয় লাভের, এই Variation-এর সম্ভাবনা আসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের আজিও মীমাংসা হয় নাই। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, জীবনযাত্রায় পিতার স্বোপার্জিত ধর্ম পুত্রে সংক্রান্ত হয় না; acquired characters are not inherited। অথচ দেখা যায়, যখন সেই পুরাতন পৈতৃক বীজ হইতে অপত্যের দেহ গড়িয়া উঠে, তখন সেই অপত্যের দেহ সর্বাংশে পিতৃদেহের সদৃশ হয় না; কিছু-না-কিছু ব্যত্যয়, বিকার বা ব্যতিক্রম ঘটেই। ঘটে বলিয়াই অপত্যগণের মধ্যে যোগ্যতা বিষয়ে তারতম্য ঘটে। যে যোগ্যতর, সে-ই টিকিয়া যায়, তাহারই বংশ থাকে; যে যোগ্যতায় হীন, সে টেকে না, তাহার বংশ থাকে না। এককালে পাঁচ আঙুলওয়ালা, চারি আঙুলওয়ালা ঘোড়া বিদ্যমান ছিল। যুগ-বিপ্লবে তাহাদের বংশ টিকে নাই, বংশপরম্পরায় যে ঘোড়া চারিটা আঙুল লুপ্ত করিয়া, বাকি একটা আঙুলকে মোটা ও শক্ত করিয়া খুরে পরিণত করিয়াছে, বর্তমান যুগে তাহারই প্রাদুর্ভাব। বিশ্বাস না হয়, আমেরিকায় গিয়া যাদুঘরে প্রমাণ সাজানো আছে, দেখিয়া আসুন। যে কারণেই হউক, বীজ অবিকৃত থাকে না। অবিকৃত থাকিলে, ধরাপৃষ্ঠে এত নূতন ধরনের উদ্ভিদ, এত নূতন ধরনের জন্তুর আবির্ভাব হইত না। যুগ-বিপ্লবে যেসব জন্তু আপনাকে বিকৃত করিয়া, নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আপনার দেহের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে নাই, তাহারা ভূপঞ্জরের পাষাণস্তরে অস্থি-কঙ্কালের নিদর্শন রাখিয়া লোপ পাইয়াছে। অতএব প্রাণী-পদার্থের এই বিকার-প্রবৃত্তি এই যোগ্যতার্জন-প্রবৃত্তি মানিতেই হইবে। প্রাণী-পদার্থ এবং প্রাণী-পদার্থে নির্মিত প্রাণীদেহ ক্রমশ বিকৃত হয়। সেই বিকৃতি ধীরে-ধীরে, অল্পে-অল্পে বৃদ্ধি পায়, অথবা ধাপের পর ধাপ লাফ দিয়া বাড়ে, তিলে-তিলে বাড়ে,—অথবা তাল-তাল করিয়া বাড়ে,—তাহা লইয়া ডারউইনের শিষ্যেরা এবং De Vries-এর শিষ্যেরা বিতণ্ডা করুন। সে বিতণ্ডায় প্রবেশে আমার এখন দরকার নাই। কিন্তু এই বিকৃতি হিসাবের অঙ্কে ধরা যায় কি না, Formula-য় বাঁধা যায় কি না, ইহা Calculable বটে কি না, সে বিতণ্ডা আরও বড় বিতণ্ডা। তৎসম্বন্ধে দুটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

গোড়ার একটি কথা আপনাদের স্মরণে আছে কি না, জানি না। পদার্থবিদ্যা বা Physical science যাহাকে জড়পদার্থ বলে, তাহার সমস্ত আচরণ formula-য় বাঁধা চলিতে

পারে। দিলীপ রাজার প্রজা মনু নির্দিষ্ট বর্ত্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারিত; কিন্তু যাহা খাঁটি জড়পদার্থ, তাহা বৈজ্ঞানিকের সূত্র-নির্দিষ্ট formula-য় বাঁধা পথ হইতে রেখা মাত্র ভ্রষ্ট হইতে পারে না; তাহার সমস্ত আচরণ একেবারে ধরাবাঁধা—determinate; কোনো স্থানে কোনোরূপ বিচ্যুতির বা Freedom-এর অবসর মাত্র নাই। খাঁটি জড় পদার্থে যে যন্ত্র নির্মিত হয়, সেই যন্ত্রের প্রত্যেক আচরণ সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দেশ্য; হউক তাহা নীরবে গগনচারী বিশাল সৌরজগৎ, অথবা কানের কাছে টিকটিককারী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্র। হ্যালির ধূমকেতু কবে উঠিবে, তাহা সৌর জগতের গতিবিধি-ঘটিত formula মধ্যে বাঁধা আছে; এবং ঘড়ির কাঁটা কখন কোথায় থাকিবে, তাহাও ঘড়ির গতিবিধি-ঘটিত formula মধ্যে নিবদ্ধ আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—প্রাণীদেহ ঘড়ির মত একটা যন্ত্র মাত্র, অথবা যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু প্রাণীদেহে বিদ্যমান আছে? ঘড়ির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রচুর জটিলতা আছে;—উহার কাঠের খোল ও কাচের ঢাকনার ভিতর ছোট-বড় দাঁতাল চাকা, স্প্রিং আর পেণ্ডুলম, ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা, বাজিবার ঘণ্টা আর যথাসময়ে ঘুম ভাঙাইবার আলার্ম,—এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উহার জটিলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জটিলতার তুলনায় ঘটিকাযন্ত্রের জটিলতা ছেলেখেলা মাত্র। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রাণীদেহে জটিলতার চূড়ান্ত থাকিলেও, উহা যন্ত্র মাত্র কি না? একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা ভাষা একটু বদলাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি;—"the living organism is a machine, but it is a self-stoking, self-repairing, self-preservative, self-adjusting, self-increasing, self-reproducing machine!" হ্যাঁ, প্রাণীদেহ একটা যন্ত্র বটে; ঘড়ির মতোই যন্ত্র বটে। তবে এই ঘড়ি নিজের দম নিজে দেয়, নিজের মরিচা-ধরা চাকায় নিজে তেল দেয়, নিজের স্প্রিং ছিঁড়িলে নিজেই বদলাইয়া লয়; নিজের পেন্ডুলাম তুলিয়া নামাইয়া আপনাকে রেগুলেট করিয়া লয়; অপিচ ইহার নিজের কলেবর নিজে বাড়াইয়া ছোট্ট ওয়াচটি বড় ক্লক-ঘড়ির আকৃতি পায়; এবং পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া ইহার কাঠামোটা যখন নিতান্ত জীর্ণ হয়, তখন আর একটি ছোট্ট বাচ্চা ঘড়িকে জন্ম দিয়া আপনারা যন্ত্রলীলা অবসান করে। ইহার উপরেই বলা যাইতে পারে যে, এই অদ্ভুত নবজাত বাচ্চা ঘড়িটি সর্বাংশে পুরানো ঘড়িটার মতো হয় না। পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে গৃহস্থের যে রুচির বদল হইয়াছে, তদনুসারে নূতন ফ্যাশানের অনুবর্তী হইবার জন্য, আপনার কাঠামোটা একটু নূতন রকমের করিয়া লয়। গত তিন শত বৎসরে ঘড়ির কাঠামোতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আগামী তিন শত বৎসরের মধ্যে আরও উন্নতি ঘটিয়া এই রকমের অদ্ভুত ঘটিকাযন্ত্র দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানিয়া লইতে হইবে, প্রাণীর দেহযন্ত্র ওইরূপ যন্ত্র মাত্র; যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু উহাতে বিদ্যমান নাই। প্রাণীদেহের নির্মাণে যে বহু উন্নতি ঘটিয়াছে, ভূপঞ্জর ঘাঁটিলেই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং এই উন্নতি, এই variation যে প্রাণের ধর্মে নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। ঘড়িযন্ত্রের সমস্ত আচরণ mechanical formula-য় বাঁধা যায়, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রাণের আচরণ formula-য় বাঁধিতে পাবা যায় কি না? তাহাই হইল মূলগত সমস্যা।

Heredity বা পিতৃক্রম ব্যাপারটা ধরাবাঁধার ব্যাপার। পিতা যেমন ছিল, পুত্র ঠিক তেমনই হইবে, কোনওরূপ বিচ্যুতি ঘটিবে না, ইহাই হইল খাঁটি heredity। ইহা একরকম ছাঁচে-ঢালা ব্যাপাব, অথবা মুদ্রাঙ্কনের ব্যাপার। এক ছাঁচের পুতুলগুলি ঠিক এই রকমেরই

হয়; ট্যাঁকশালায় একই ছাঁচে একই রকমের মুদ্রা প্রস্তুত হয়; ছাপাখানায় একই ছাপে সকল কেতাবই একইভাবে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। heredity-র ব্যাপারটা কতকটা সেই রকমের। ইহাকে formula-য় ফেলা সহজ বটে, formula-য় ফেলিবার চেষ্টাও হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে ডারউইনের gemmule theory এবং Weismann-এর determinant theory-র উল্লেখ করিতে পারি। এই দুই theory কতকটা atomistic theory-র মতো। আজিকার প্রবন্ধের আরম্ভেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ব্যবহারিক জগতের কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইলেই আমাদিগকে কোনও-না-কোনওরূপ atomistic theory-র আশ্রয় লইতে হয়। পিতা-মাতার দেহধর্ম কতকগুলা গোটা গোটা definite character-এর সমষ্টি মাত্র। এক-একটা chatacter বা গুণ, একটা-একটা গোটা জিনিস; একটা character-এর যেন কোনও ভগ্নাংশ নাই। পিতার দেহের মধ্যে যে বীজকোশ টি অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণের জন্য গোপনে সুরক্ষিত থাকে, সেই বীজকোশের মধ্যে অথবা তাহার অন্তর্গত nucleus বা দানার মধ্যে কতকগুলি গোটা-গোটা কণিকা বিদ্যমান আছে, ইহা সচ্ছন্দে কল্পনা করা যাইতে পারে। ওই কণিকার gemmule বা এরূপ একটা কিছু নাম দেওয়া যাইতে পারে। এক-একটি কণিকার সঙ্গে পিতার এক-একটা Character-এর সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে। পিতৃদেহে যতগুলি character, সেই দেহস্থিত বীজকোশের মধ্যে ততগুলি কণিকা; এক-এক কণিকা এক-এক character-এর প্রতিনিধিস্বরূপ। যেমন এক-একটা হরফ এক-একটা ধ্বনির প্রতিনিধি, সেইরূপ। বীজকোশটি যখন দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসে, তখন তাহার সমস্ত কণিকা লইয়াই বাহিরে আসে, এবং অপত্য যখন সেই কোশ হইতে নূতন দেহ গড়িয়া তোলে, তখন প্রত্যেক কণিকা আপনার নির্দিষ্ট character সেই দেহমধ্যে সংক্রান্ত করে। এইরূপে অপত্যের দেহ সর্বাংশে পিতৃদেহের অনুরূপ হয়। এইরূপ একটা theory খাড়া করিয়া heredity-র ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ডারউইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পিতৃক্রম বুঝাইতে যে সকল থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন, সে সকলই এই রকমের মোটা থিয়োরি। কিন্তু Variation-এর ওইরূপ ব্যাখ্যা বড় কঠিন সমস্যা। চেষ্টা যে না হইয়াছে, তাহা নয়। যাঁহারা গ্যালটন এবং মেনডেল, এই দুইটা নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই variation-তত্ত্ব কিছু শুনিয়া থাকিবেন। বড়-বড় প্রাণীর অপত্য উৎপাদনে দুইটি কোশে সম্মিলনের প্রয়োজন হয়। একটি পিতৃকোশ বা পুংকোশ ও আর একটি মাতৃকোশ বা স্ত্রীকোশ। পিতৃকোশের অন্তর্গত কণিকাগুলি পিতার character বহন করে। উভয় কোশের সম্মিলনে যে অপত্য জন্মে, সে পিতা ও মাতা, উভয়েরই character পাইয়া থাকে। পিতৃকোশ এবং মাতৃকোশের অন্তর্গত কণিকাগুলি নানাবিধ permutation এবং combination-এ অপত্যদেহে কতকটা নূতনত্ব আসিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে। এইখানে রসায়ন-বিদ্যা হইতে তুলনা আনিয়া ব্যাখ্যার সুযোগ ঘটিতে পারে। হাইড্রোজেন-পরমাণুর সহিত অক্সিজেন-পরমাণুর যোগ হইয়া যে জলের অণু উৎপন্ন হয়, তাহাতে হাইড্রোজের ধর্মও থাকে না, অক্সিজেনের ধর্মও থাকে না; নূতন ধর্ম—জলের ধর্ম তাহাতে আবির্ভূত হয়। Marsh gas-এর অন্তর্গত হাইড্রোজেন-পরমাণু সরাইয়া তাহার স্থানে ক্লোরিন-পরমাণু বসাইলে, উহা আর marsh gas থাকে না; উহা একটা নূতন gas হয়। রসায়নবিৎরা যাবতীয় যৌগিক পদার্থকে এইরূপে formula-য় গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন। গোটাকতক মূল পদার্থের কণিকা বা পরমাণু আশ্রয় করিয়া অসংখ্য যৌগিক গঠন-প্রণালীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইরূপ কতকগুলো মূল

character-এর কণিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণীদেহের অসংখ্য বিকৃতির অসংখ্য প্রকারভেদের ব্যাখ্যা চলিতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি, প্রাণীকোশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবার পূর্বে তাহার অন্তর্ভুক্ত nucleus বা দানাটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। দানাটি প্রথমে একগাছি সুতার মতো হয়; সুতাগাছটি ছিঁড়িয়া কয়েকটি টুকরা হয়; টুকরার অর্ধেকগুলি এক পাশে, অর্ধেকগুলি অন্য পাশে লগ্ন হইয়া দুইগাছি নূতন সুতা উৎপন্ন হয়; দুই নূতন সুতার দুইটি নূতন দানা বাঁধে—এক-এক দানাকে কেন্দ্রে লইয়া কোশটি দ্বিখণ্ডিত হয়।

অপত্যোৎপাদন ব্যাপারে পুংবীজের কোশের সহিত স্ত্রীবীজের কোশ মিলিত হয়; তৎপূর্বে উভয় কোশেই এইরূপ ঘটনা ঘটে। দানার সুতাগাছটি ছিঁড়িয়া কতকগুলি টুকরা হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। টুকরাগুলির অর্ধেক মাত্র যুক্ত হইয়া নূতন দানা বাঁধে; অপর অর্ধ সরিয়া পড়ে—দানা বাঁধে না। ফলে পুংকোশের পুরাতন দানার অর্ধাংশ মাত্র থাকে, অপরার্ধ নষ্ট হয়। স্ত্রীকোশেরও পুরাতন দানার অর্ধাংশ থাকে, অপরার্ধ নষ্ট হয়। পুংকোশের এই অর্ধের সহিত স্ত্রীকোশের এই অর্ধের মিলন ঘটিয়া পূর্ণ অপত্যকোশ উৎপন্ন হয়। পুরাতন দানাটি কেনই বা ছিঁড়িয়া খণ্ড-খণ্ড হয়, আর কেনই বা সে খণ্ডগুলির অর্ধেক লুপ্ত হয়, তাহার তাৎপর্য এখনও বুঝা যায় না। হয়তো ইহা হইতে একটা পূর্ণাঙ্গ atomistic theory ভবিষ্যতে খাড়া করা চলিবে। কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের সমস্যা।

কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান সাধ্য হইবে কি? ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ জন্মে। সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের যাবতীয় ধর্ম সেই বীজের মধ্যে নিহিত আছে; উহার প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক character এক-একটি কণিকা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যেন ভবিষ্যতের অশ্বত্থগাছটারই অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি সেই বীজের মধ্যে আবদ্ধ আছে। বীজ যখন বড় হইয়া গাছে পরিণত হয়, তখন নূতন ধর্ম কিছুই আসে না। যাহা ক্ষুদ্র বীজের অন্তরালে গুপ্তভাবে ছিল, প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া, বড় হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। অতএব বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি, ইহাতে নূতনের সৃষ্টি নাই, ইহাতে পুরাতনেরই আবিষ্কারই আছে। শুধু তাহাই কেন। সেই অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে ভবিষ্যতে যত অশ্বত্থবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, সে সকলেরই সমস্ত ধর্ম সেই আদি বীজমধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখে; সেই প্রথম বীজে যে কয়টি কণিকা ছিল, সেই কয়টিকেই সাজাইয়া গোছাইয়া, নানারূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের বংশপরম্পরার উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাকে atomic theory of life বলা যাইতে পারে। রসায়নশাস্ত্রের পরমাণুবাদ আপনারা জানেন। ধরিয়া লওয়া হয়, আদি কালে বিশ্ব ব্যাপিয়া কতকগুলা পরমাণু ছিল; অদ্যাপি সেই পরমাণুগুলি বর্তমান আছে; একটিও নষ্ট হয় নাই, অথবা একটিও নূতন আবির্ভাব হয় নাই। প্রাচীন কালের সেই পরমাণুগুলোই নানারূপে দল বাঁধিয়া, জমাট বাঁধিয়া যাবতীয় যৌগিক দ্রব্যের উৎপাদন করিয়াছে। সেইরূপ আদি কালে কতকগুলি প্রাণ-কণিকা ছিল। সেই প্রাণ-কণিকাগুলি অদ্যাপি বর্তমান আছে, একটিও নষ্ট হয় নাই, একটিরও নূতন সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন প্রাণ-কণিকাগুলি নানারূপে সংহত হইয়া, জমাট বাঁধিয়া বর্তমান প্রাণীগণের নানা মূর্তি উৎপাদন করিয়াছে। সমস্ত প্রাণময় জগতে যদি একটা আদি পিতা অথবা আদি মাতা কল্পনা করা যায়, বর্তমান কালের যাবতীয় বংশধর সেই আদি পিতার বা আদি মাতার মধ্যেই ছিল, গুপ্ত ছিল। কোনদ্র character-এর নূতন সৃষ্টি হয় না; যাহা ছিল গুপ্ত বা অব্যক্ত, এখন

হইয়াছে তাহা ব্যক্ত। এই ব্যাপারকে অভিব্যক্তি বা Evolution বলা যাইতে পারে। একালের পণ্ডিতেরা এই অভিব্যক্তিবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন। আদিতে যাহা ছিল, এখনদ্র তাহাই আছে। নূতন কিছুই হয় নাই। যাহা পুরাতন, তাহাই নূতন-নূতন মূর্তি ধরিয়া আপনাকে প্রকাশ বা আবিষ্কৃত করিতেছে মাত্র। এই আবিষ্কার ঘটনার বা নূতন মূর্তি-গ্রহণ ঘটনার formula নির্ধারণ বিজ্ঞান-বিদ্যার কার্য। formula বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে, প্রাণময় জগতের যাবতীয় ভবিষ্যৎ ঘটনা বৈজ্ঞানিকের গণনার আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। আচার্য হক্সলি এই কথাটা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিটা আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"If the fundamental proposition of evolution is true, namely, that the entire world, animate and inanimate, is the rresult of the mutual interaction according to definite laws of forces possessed by the molecules which made up the primitive nebulosity of the universe, then it is no less certain that the present actual world reposed potentially in the cosmic vapour, and that an intelligence, if great enough, could from his knowledge of the properties of the molecules of that vapour have predicted the state of the fauna in Great Britain in 1888 with as much certitude as we say what will happen to the vapour of our breath on a cold day in winter." একটু ঘুরাইয়া এই উক্তির বাঙ্গালা তর্জমা করিয়া বলা যাইতে পারে—আদি কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুগুলি ছড়াইয়া ছিল। সেই পরমাণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিত। এখনও কোনও বৈজ্ঞানিক সেই সমুদয় আকর্ষণ-বিকর্ষণকে সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই; আশা করি, একদিন পারিবেন। যখন পারিবেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ তাঁহার করতলস্থিত আমলকি ফলের মতো আয়ত্ত হইবে। সেই আদি কালে কোনও পরমাণু কোথায় ছিল এবং কী বেগে ছুটিতেছিল, তাহা বলিলেই তিনিও গণিয়া বলিবেন, কোন বর্ষের কোন মাসের কোন তারিখে 'ভারতবর্ষ' পত্রে আমার এই ভীষণ প্রবন্ধ বাহির হইবে। আচার্য টিণ্ডালও অতি সংক্ষেপে ও অতি স্পষ্ট ভাষায় পরমাণুর জয়গান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "I see in the atom the promise and potency of all terrestrial life."

বিজ্ঞান-বিদ্যার তরফে ইহার অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর হইতে পারে না। প্রাণময় জগতের সমস্ত ব্যাপার যদি গণনাসাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রাণের আর বিশিষ্টতা কিছুই থাকে না। সমস্ত প্রাণময় জগৎটা জড় জগতেরই মূর্তি-ভেদ হইয়া পড়ে, এবং প্রাণীদেহ মাত্রই জড় যন্ত্রে পরিণত হয়। বিজ্ঞানবিদদের এই দর্পের উক্তি নির্বিবাদে গ্রহণ করা যাইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার পূর্বপ্রবন্ধে ইহা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছি এবং আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা কথা তখন আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলিয়াছিলাম, আপনাদের মনে থাকিতে পারে। যাহা খাঁটি জড়, তাহার কোনও history বা কাহিনি নাই। জড়ের গায়ে অতীতের কোনও দাগ বসে না। অতীত তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু আদি কালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে এবং দূর ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকিবে। যে অঙ্গার-কণিকা আজি গাঁজার কলিকায় পোড়াইতেছি, তাহা শঙ্করাচার্যের মগজের ভিতর এক দিন কিলবিল করিত কি না, তাহার কোনও চিহ্ন নাই। একটি মিছরি-দানার গুণাগুণ সম্বন্ধে আজিকার রসায়নের কেতাবে যে

কথা লেখা থাকিবে, হাজার বৎসর পরের কেতাবেও ঠিক সেই কথাই থাকিবে। জড়দ্রব্য চির-পুরাতন। সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ আজি কোথায় কীভাবে আছে, বলিয়া দাও,—কলির শেষে কোথায় কীভাবে থাকিবে, গণিয়া বলিব; অতীত ইতিহাস জানিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন হইবে না। অথবা সত্য যুগের আরম্ভে কে কোথায় কীভাবে ছিল, তাহা বলিয়া দিলে যুগান্তে বা কল্পান্তে কোথায় কীভাবে থাকিবে, তাহা হিসেব করিয়া বলা যাইবে; মাঝের অবস্থা জানিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন হইবে না। কেন না, প্রত্যেক গ্রহের, প্রত্যেক উপগ্রহের পথ সুনির্দিষ্ট formula-বদ্ধ;সেই পথ হইতে তাহার ভ্রষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। জ্যামিতি-শাস্ত্রোক্ত সরল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু কোথায় আছে বলিয়া দিলে, সমস্ত সরল রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। বৃত্ত রেখার তিনটি মাত্র বিন্দুর অবস্থান বলিয়া দিলে সমস্ত বৃত্ত রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। এ-ও কতকটা সেইরূপ। জড় দ্রব্য যে পথে চলে, সেই পথের কিয়দংশ বিজ্ঞানবিৎকে ধরিয়া ফেলিতে দাও, তাহার সমস্ত পথটাই বিজ্ঞানবিদের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। সেই পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইবার কোনও সম্ভাবনাই থাকিবে না। ইহার মানেই হইল এই যে, খাঁটি জড়-দ্রব্যের history নাই। যে দ্রব্যের বর্তমান অবস্থা জানিতে পারিলেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ চোখের উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার history, তাহার পুরাতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহার ভবিষ্যতের কাহিনি জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কেন না, বর্তমানের মধ্যেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়মিত রহিয়াছে। এই জন্যই আমি history-র কথা তুলিয়াছিলাম। যাহা চির-পুরাতন, তাহার ইতিহাস নাই। অচিন্তিতপূর্ব নূতনের আবির্ভাবেই পুরাতনত্বের ব্যত্যয় ঘটায়। জড় জগৎ চির-পুরাতন; উহাতে নূতনের আবির্ভাব সম্ভাব্য নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা একবার উহার গতিবিধি সূত্রবদ্ধ করিয়া ফেলিলে, আর নূতন observation-এর, নূতন পর্যবেক্ষণের আবশ্যকতা থাকে না। কোনওরূপ নূতন experiment বা নূতন পরীক্ষার দরকার হয় না। নিউটন যে দিন Law of Gravitation দ্বারা সৌর জগতের গতিবিধি বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, তদবধি আর নূতন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন থাকে নাই। এখনও যদি জ্যোতিষীরা পর্যবেক্ষণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিউটনের নিয়মসূত্রে তাঁহাদের সন্দেহ আছে; কী জানি, যদি উহার কোথাও সংশোধন দরকার হয়। নেপচুন গ্রহকে আবিষ্কারের জন্য দূরবিন লাগাইবার দরকার হয় নাই; কাগজে-কলমে অংক কষিয়া উহাকে ধরা গিয়াছিল। জড় জগতের কোনও ঘটনা যদি এখনও গণনাসাধ্য হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার দোষ নহে; উহা বৈজ্ঞানিকের দোষ—বৈজ্ঞানিক এখনও সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই গণনা চলিতেছে না; সেই জন্য এখনও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে; কেবল কাগজে-কলমের হিসাবে কুলাইতেছে না।

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন,—reversibility। পদার্থবিদ্যা যে সকল ক্রিয়াকর্মের আলোচনা করে, তাহার কতকগুলো reversion শব্দের অর্থ উলটানো বা পালটানো, সাধু ভাষায় বিপর্যাস। যাহাকে উলটানো যায়, বিপর্যস্ত করা চলে, তাহা reversible, অন্যে irreversible। যে পথে আসিয়াছে, ঠিক সেই পথে যাহাকে ফেরানো যায়, তাহাই reversible; যাহা ফিরিবার সময় অন্য পথ ধরে, তাহা reversible নয়। এক স্থান হইতে চলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্বস্থানে

উপস্থিত হইলে, যদি পথ অতিবাহনের কোন চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে বলা যায় যে, ঘটনাটা reversible; কেন না, চলার উলটা ফেরা; যেমন লাভের উলটা লোকসান। কেন যে, চলিতে যেটুকু লাভ হয়, ফিরিতে সেইটুকু লোকসান ঘটে; স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলে লাভে-লোকসানে কাটাকাটি হইয়া পূর্বাবস্থায় প্রাপ্তি ঘটে; পথ চলার কোনও নিদর্শনই থাকে না। আর যদি প্রত্যাবর্তনের পর কিছু লাভের অংক অথবা ক্ষতির অংক স্থায়ীভাবে দাঁড়াইয়া যায়, সেই লাভের অংক বা ক্ষতির অঙ্ককে আমরা পথ চলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারি; তখন ঘটনাটা হয় irreversible; এই irreversible ঘটনা পথের চিহ্ন বহন করে, যে পথে চলিয়াছে, সেই পথের দাগ তাহার গায়ে কাটিয়া বসে কোন পথে চলিয়াছে, তাহার তথ্য না জানিলে সেই দাগ, কীরূপে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই স্থলেই পথ চলার ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়। যে ঘটনা reversible, তাহাতে পথচিহ্ন কিছুই থাকে না; কাজেই পথ চলার ইতিহাস তাহার পক্ষে অনাবশ্যক। পদার্থবিদ্যামধ্যে এইরূপ reversible এবং irreversible—বিপর্যাসযোগ্য এবং বিপর্যাসের অযোগ্য বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গোটাকতক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনে করুন, ঘড়ির পেন্ডুলম। উহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে এবং প্রত্যেক দোলে ওলট-পালট হইতেছে। যেমন ওলট, তেমনি পালট। ঘড়িতে দম দেওয়ার পর উহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছ এবং এ পর্যন্ত কত দোল খাইয়াছে, উহার গায়ে তাহার কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। আমাদের পৃথিবীটা একটা বৃহৎ পেন্ডুলম। উহা সূর্যের চারিদিকে কেবলই পাক খাইতেছে। এক-এক বৎসরে এক-এক পাক। বৎসরান্তে যথাস্থানে ফিরিয়া আসে; পূর্ববৎসরের কোনও চিহ্ন মাত্র রাখে না। চিহ্ন রাখিলে এত সহজে উহার গতিবিধির বিনির্ণয় জ্যোতির্বিদের পক্ষে সাধ্য হইত না। এইখানে হয়তো আপনারা আমার ভুল ধরিবেন;—ধূমকেতুগুলো পৃথিবীর মতো একই নিয়মে সূর্যের চারিদিকে পাক খাইয়া ঘুরিয়া আসে; কিন্তু দেখা গিয়াছে, কোনও-কোনও ধূমকেতু একটু-না-একটু মূর্তি বদলাইয়া ঘুরিয়া আসে; যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, সেই পথের চিহ্ন লইয়া ফিরিয়া আসে। Encke সাহেবের ধূমকেতুর যে সময়ে ঘুরিয়া আসা উচিত, তার আড়াই ঘণ্টা আগে সে ফিরিয়া আসে; পথিমধ্যে, কীসে তাহাকে ঠেলিয়া দেয়, কে জানে! Biela সাহেবের ধূমকেতু ফিরিবার সময়ে নূতন মূর্তি ধরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রত্যেক পাক ঘুরিয়া উহা শীর্ণ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। উত্তরে আমি বলিব, ধূমকেতুটার গতিবিধি ঠিক reversible ছিল না; যে পথে চলিয়াছে, সে পথে এমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে,—কোনও জ্যোতিষী যাহার হিসাব লইতে পারেন নাই—নিউটনের formula-র মধ্যে তাহার হিসাব ছিল না। হয়তো পথে সে কোনওরকম বিঘ্ন পাইয়াছিল। যে পথে চলিয়াছিল, সেই পথের সমস্ত ইতিহাসটা জানিলে, আমরা সেই বিঘ্ন-বিপত্তির তথ্য নির্ণয় করিতে পারিতাম। পৃথিবীর মতো, চাঁদের মতো বড়-বড় জ্যোতিষ্কের চলাফেরায় সেইরূপ বাধার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদের গতিবিধি গণনায় জ্যোতির্বিদ্যা মজবুত। কিন্তু ধূমকেতুর গণনায় জ্যোতির্বিদ্যাকে হারি মানিতে হয়—তাহার formula-য় কুলায় না। দূরবিন হাতে করিয়া সমস্ত পথটার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পৃথিবীর গতিবিধিতেও যে ওইরূপ বাধাবিপত্তি একেবারে নাই, তাহা কীরূপে বলিব? পৃথিবী ইঞ্জিনের চাকার মতো ঘুরিতে-ঘুরিতে, আবর্তন করিতে-করিতে চলিতেছে বটে, কিন্তু আড়াই লক্ষ মাইল দূর হইতে চাঁদ সেই পৃথিবীরূপ চাকার পিঠে ব্রেক কষিয়া বসিয়া আছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলবিনের পূর্বে কেহ তাহার তথ্য জানিত না। মহাসাগরের জলরাশি সেই ব্রেক। চাঁদ সেই জলরাশিকে আপনার দিকে খেঁচিয়া ধরিয়া জোয়ারের উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর আবর্তনকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে; এ তথ্য লর্ড কেলবিনের আগে কেহ জানিত না। চাঁদ সর্বদাই এই লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে। ছয় মাস ধরিয়া পৃথিবী আগে চলিতেছে, তখনও সেই লাগাম; আর পরবর্তী ছয় মাসে পৃথিবী ঘুরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে, তখনও সেই লাগাম। এই লাগামের টানে পৃথিবীর আবর্তনের ব্যাঘাত বা ক্ষতি ঘটিতেছে; চলিতেও ক্ষতি; ফিরিতেও ক্ষতি; মোটের উপর খানিকটা ক্ষতি লইয়া পৃথিবী স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। এই ক্ষতিটাই তাহার পথশ্রমের চিহ্ন। এই ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর এই ক্ষতির পরিমাণ জমিয়া যাইতেছে। দুই হাজার পাঁচ হাজার বৎসরে এই ক্ষতি নগণ্য হইলেও, দুই কোটি পাঁচ কোটি বৎসরে ইহা নগণ্য থাকিবে না। পৃথিবী এখন যে বেগে আবর্তন করিতেছে, সেই বেগ ক্রমশ মন্দ হইবে। কোটি বৎসর পরে দিন রাত্রির পরিমাণ এখনকার ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টা ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই পৃথিবীর গতিবিধিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যাসযোগ্য বলিতে পারি না। উহার মধ্যে এমন একটু ব্যতিক্রম আছে, নিউটনের formula-য় যাহা ধরা পড়িবে না; যাহার জন্য নূতন formula বাঁধিতে হইবে; যতদিন বাঁধিতে না পারো, ততদিন ঘড়ি ধরিয়া আবর্তনকাল মাপিয়া যাও। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। খানিকটা বাতাসে চাপ দিলে উহা সংকুচিত হয়; চাপ তুলিয়া লইলে উহা পূর্ববৎ প্রসার লাভ করে। বরফে যতটা উত্তাপ দিলে গলিয়া জল হয়, সেই জল হইতে ততটা উত্তাপ বাহির করিলে সেই বরফ ফিরিয়া পাওয়া যায়। চা-খড়িকে গরম করিলে খানিকটা কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বাহির হইয়া যায়; পড়িয়া থাকে খানিকটা চুন; আবার ঠান্ডা করিলে সেই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস চুনের সহিত মিলিত হইয়া চা-খড়ির উৎপাদন করে। এই সমস্ত ঘটনা বিপর্যাসযোগ্য—reversible। বরফে কোনও চিহ্ন থাকে না, যাহাতে বুঝা যায় যে, উহা জলের অবস্থায় ছিল। চক-খড়িতে কোনও চিহ্ন থাকে না যে, এককালে উহা চুনের অবস্থায় ছিল। উহাদের অতীত কাহিনি, উহাদের পথের খবর জানিবাব কোনও প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু অন্য দৃষ্টান্ত লউন। ইস্পাতের তলোয়ার মোচড়ের পর ছাড়িয়া দিলে, উহা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে; উহার স্থিতিস্থাপকতা reversible; কিন্তু লোহার দণ্ড মোচড় দিলে নুইয়া যায়, পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ইস্পাতকে চুম্বকে ঘষিয়া সহজে উহাকে চুম্বকে পরিণত করা চলে, কিন্তু একবার চুম্বকতা পাইলে আর সহজে সেই চুম্বকতা নষ্ট করা যায় না। গরম দ্রব্যের উত্তাপ সহজেই বাহির হইয়া ঠান্ডা দ্রব্যে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু ঠান্ডা দ্রব্য হইতে সেই উত্তাপ ফিরিয়া গরম দ্রব্যে আসিতে চায় না; তাহা সম্ভব হইলে বরফের উত্তাপে আমরা ভাত রাঁধিতে পারিতাম। এই সকল ঘটনা উলটানো চলে না, ইহারা reversible নয়। একখানা তলোয়ারের আচরণ অন্য তলোয়ারের সমান নহে; একখানা চুম্বক সর্বাংশে অন্য চুম্বকের মতো নহে; এমনকী, দুইখানা তাম্রখণ্ডে উত্তাপ এক নিয়মে চলে না। একটা সাধারণ সূত্রে এক শ্রেণির যাবতীয় দ্রব্যকে বাঁধা চলে না। প্রত্যেক দ্রব্যের আচরণ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেই দ্রব্যের জন্য একটি মোটা formula-য় সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; একটা দ্রব্যের আচরণে যে formula খাটে, তদ্রূপ অন্য দ্রব্যের আচরণে সে formula খাটে না। ভিন্ন-ভিন্ন দ্রব্যের আচরণের ভিন্ন-ভিন্ন পথ। প্রত্যেক দ্রব্যেরই যেন একটা গোঁ থাকে; একটা মেজাজ থাকে; সেই গোঁ অনুসারে বা মেজাজ অনুসারে সেই দ্রব্য চলিয়া থাকে;

সেই গোঁ বা মেজাজ আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কোন দ্রব্যের গোঁ কীরূপ, তাহা পর্যবেক্ষণে দেখিতে হয়; প্রত্যেকের আচরণের পৃথক ইতিহাস পৃথকভাবে আলোচনা করিতে হয়। বিশুদ্ধ গণিতবিদ্যায় বা খাঁটি mechanics-এ ইহা কুলায় না; ইহার জন্য Physics-এর দরকার হয়। Observation বা পর্যবেক্ষণ এবং experiment বা পরীক্ষা আবশ্যক হয়। ইহারা যে পথে চলে, সে সমস্ত পথটা দেখিতে হয়; পথের একাংশ দেখিয়া অন্য অংশের নিরূপণ চলে না; এক অংশের বক্রতা দেখিয়া অন্য অংশের বক্রতা নির্ধারণ চলে না।

এই সমুদায় দৃষ্টান্ত জড় জগৎ হইতে লইয়াছি। যে সকল জাগতিক ঘটনা পালটানো চলে, পালটাইলে ঠিক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে, পথেব কোনও চিহ্ন রাখে না, সেই ঘটনাগুলাই গণিত-বিদ্যার অধীন থাকে; একবার formula-য় ফেলিতে পারিলে আর ভাবিতে হয় না; কাগজে কলমে আঁক কষিয়া তাহার গতিবিধি, চালচলন নিরূপিত হয়। কিন্তু সে সকল ঘটনা পালটানো চলে না, যাহা পূর্বাবস্থায় কিছুতেই ফেরে না, যে পথে চলে, সে পথের চিহ্ন গায়ে লইয়া ফেরে, তাহাদের গতিবিধি গণনাযোগ্য হয় না, তাহাদের পথের কাহিনি মন দিয়া আদ্যন্ত শুনিতে হয়, পদে-পদে তাহার দশার বিপর্যয় লক্ষ করিতে হয়। জড় জগতের বহু ঘটনা এখনও এই অবস্থায় রহিয়াছে; এখনও বিজ্ঞানবিদের সম্পূর্ণ বশ হয় নাই; জড় জগতের mechanical description এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এমনকী, লর্ড কেলবিনই একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারই মোটের উপর irreversible; উহা একটা নির্দিষ্ট পরিণতির অভিমুখে একটানে চলিতেছে; সে মুখ হইতে ফিরিয়া আসার কোনও সম্ভাবনাই নাই; সেই চরম পরিণতিকে নিবৃত্তি বলা যাইতে পারে। বিশ্বজগতের বৃহৎ যন্ত্রটা চলিতেছে; বহু কাল হইতে চলিতেছে এবং এখনও বহু কাল ধরিয়া চলিবে; কিন্তু একদিন-না-একদিন এই যন্ত্রকে থামিতে হইবে; নিবৃত্তিতে ইহার সমাপ্তি হইবে; একবার থামিয়া গেলে আর ইহা চলিবে না, আর পালটাইবে না। কেলবিনের এইরূপ সিদ্ধান্তের একটি হেতু ছিল। জাগতিক ব্যাপারের সর্বত্রই শক্তির অপচয় হইতেছে; dissipation হইতেছে। জগতের যাবতীয় শক্তি ক্রমশ উত্তাপে পরিণত হইতেছে; সমস্ত শক্তি একদিন উত্তাপে পরিণত হইবে। সেই উত্তাপ জগতের সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাদিগকে বলিয়াছি, উত্তাপ গরম হইতে ঠান্ডায় যায়; ঠান্ডা হইতে গরমে যায় না; প্রদীপের উত্তাপে বরফ গলে; কিন্তু বরফের উত্তাপে প্রদীপ জ্বলে না। স্টিম ইঞ্জিনের একটি স্থানে গরম জল সঞ্চিত থাকে, আর এক স্থানে থাকে ঠান্ডা জল; ওই গরম জলের উত্তাপ ঠান্ডা জলে সংক্রান্ত হইবার সময় ইঞ্জিন চলে; সেই উত্তাপের কিয়দংশ কাজে লাগে; দুই জল সমান গরম হইলে অথবা সমান ঠান্ডা হইলে ইঞ্জিন চলিত না। জড় জগৎটাও একটা বৃহৎ ইঞ্জিন; উহার কোথাও গরম, কোথাও বা ঠান্ডা; উত্তাপ কোথাও ঘনীভূত হইয়া গরম হইয়া আছে; কোথাও ছড়াইয়া পড়িয়া ঠান্ডা হইয়া আছে। জগতের সমস্ত উত্তাপ যদি সর্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, কোথাও গরম, কোথাও ঠান্ডা না থাকে, তাহা হইলে জগৎযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। জগৎযন্ত্র তখন আর চলিবে না; পরম নিবৃত্তিতে সমাপ্তি পাইবে। সেই চরম দশা হইতে ফিরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। কেলবিন বিশ্বজগতের শেষের সে দিন ভয়ংকর, এই কথা শুনাইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে চকাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইলে জগৎযন্ত্র যখন নিরস্ত হইবে, বৈজ্ঞানিকের কোনও formula-ই তখন আর খাটিবে না। পরম নিবৃত্তির আবার formula কী? উহা তো একাকার নির্বিকার অবস্থা।

কেলবিন কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের প্রচার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কতকটা মূঢ়ের মতো বসিয়া আছেন; কোনো সঙ্গত উত্তর অদ্যাপি দিতে পারেন নাই; তবে তাঁহারা আশা করেন যে, কেলবিনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও একটা প্রমাদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, জড় জগতের কোন ঘটনাই বস্তুত irreversible নহে; এখন যে পালটাইতে পারি না, সে কেবল আমাদের অক্ষমতা মাত্র। আমাদের হাত পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়গুলা মোটা; চোখ-কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় মোটা; আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-তন্ত্র, সমস্তই স্থূল। জড় পদার্থের সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না। সেই জন্যই আমরা ওই সকল ঘটনাকে পালটাইতে পারিতেছি না। আমরা স্থূলদ্রব্য লইয়াই কারবার করি। এমনকী, অণু-পরমাণুগুলোরও গতিবিধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। তাহাদিগকে ধরিয়া ছুঁইয়া তাহাদের সহিত কারবার করা তো দূরের কথা। সে ক্ষমতা থাকিলে, আমরা সমুদায় জাগতিক ঘটনাগুলাকেই পালটাইতে পারিতাম। অণু-পরমাণু বাছিয়া লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে খাটাইতে পারিতাম। অণু-পরমাণুগুলিকে চাপিয়া ধরিতে পারিলে, যদৃচ্ছাক্রমে উলটা পথে প্রেরণ করিতে পারিতাম। বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহা পারি না। কাজেই কতকগুলা ঘটনাকে আমরা irreversible—বিপর্যাসের অযোগ্য মনে করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু বস্তুগত্যা আমাদের পক্ষে যাহা অসাধ্য, অন্য জীবের পক্ষে তাহা সাধ্য হইতে পারে; অন্তত ক্লার্ক ম্যাকসওয়েলের মানসপুত্র demonগুলির পক্ষে তাহা অত্যন্ত সুসাধ্য। এই demon-গুলির কথা আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি; আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে, আমার 'প্রকৃতি' নামক পুস্তকের পাতা উলটাইলে তাহাদের পরিচয় পাইবেন। ফলত জড় জগতে আপাতত যে irreversibility দেখিতে পাই, তাহা জড় পদার্থের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী বা essential নহে। কোনও জাগতিক ঘটনাকে একেবারে পালটানোর অযোগ্য মনে করিবার সম্যক হেতু নাই। বিশ্বজগতের কোথাও-না-কোথাও ক্লার্ক ম্যাকসওয়েলের demonগুলি গুপ্তভাবে বসিয়া আছে, তাহারা সমুদায় ঘটনাকে পালটাইয়া দিতেছে অথবা পালটাইয়া দিবে। তাহারা যে বিজ্ঞান-বিদ্যা রচনা করিবে, তাহার কোথাও কোনও irreveresible ঘটনার উল্লেখ থাকিবে না। কেলবিনের বাণী শুনিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার একেবারে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বজগতের শক্তিরাশির এক দিকে যেমন অপচয় হইতেছে, অন্যত্র সেই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে বিশ্ব-জগতেব পবিণাম ভাবিয়া শঙ্কিত হইবার হেতু নাই। জগৎযন্ত্র এখনও যেমন চলিতেছে, চিরকালই তেমনই চলিবে; জগৎ-প্রবাহ কস্মিন কালে একেবারে বন্ধ হইবে না। ম্যাকসওয়েলের demon-গুলোই এমন formula বাঁধিয়া দিবে, চিরকালের জন্য সেই সূত্র দ্বারা নির্ধারিত পথে জগৎপ্রবাহকে চলিতেই হইবে; কখনও কোথাও বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিবে না; কখনও থামিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে না। লর্ড কেলবিন বর্তমান অবস্থায় জাগতিক শক্তির অপচয় দেখিয়া জগৎপ্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা আশা করেন যে, কোনও-না-কোনও স্থানে এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা আছে; তাহা একদিন আবিষ্কৃত হইবেই। জগৎপ্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইতে হইবে না।

বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষে ইহা এখন আশার বাণী। এই আশা কখনও পূর্ণ হইবে কি না জানি না; তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, এই irreversibility জড় পদার্থের পক্ষে একেবারে essential নহে। জড় জগতের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এখনও আবদ্ধ আছে; জড়জগৎ আবহমানকাল ধরিয়া যে পথে চলিতেছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ

বৈজ্ঞানিকের গোচর হইয়াছে। সেই পথ সরল পথ নহে; পক্ষান্তরে উহা বক্র পথ, কুটিল পথ। সরল রেখায় না চলিয়া উহা হিজিবিজি রেখাক্রমে চলিতেছে। সেই রেখার অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দেখিয়া অপর অংশের নির্ধারণ বর্তমান বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষে অসাধ্য। কলিকাতা হইতে নৌকাপথে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত চলিয়া দিল্লির পথের নিধারণ কখনও সাধ্য হয় না; এও কতকটা সেইরূপ ব্যাপার। জগতের পথ কুটিল পথ বটে; কিন্তু সেই কুটিলতা periodic হইতে পারে; ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় তাহার নিরুপণ হইবে কীরূপে? অতএব আমরা কতকটা সাহসের সহিত বলিত পারি, জড়ধর্মে এমন কিছু নাই, যাহা essentially irreversible; যাহা গণনাযোগ্য নহে বা কস্মিন কালে গণনাযোগ্য হইবে না। মানুষের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা গণনাযোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু ম্যাকসওয়েলের demon-এর মতো অগাধবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা গণনাযোগ্য হইবে। আচার্য হক্সলির যে উক্তি আপনাদিগকে শুনাইয়াছি, তাহা আর একবার স্মরণ করুন। তাঁহার উক্তিমধ্যে আছে, "an intelligence if great enough"; আমাদের intelligency সেরূপ great enough না হইতে পারে; কিন্তু যে জীবের intelligence সেইরূপ great enough, তাহার পক্ষে জড় জগতের সমস্ত ইতিহাস আলোচনার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। সেই ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ মাত্র আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে সমস্ত অতীত পরিচ্ছেদ তিনি আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন এবং সমস্ত ভবিষ্যতের কাহিনি গণিয়া বলিতে পারিবেন। যদি ত্রিকালদর্শী বলিয়া কিছু থাকে, বিজ্ঞান-বিদ্যাই ত্রিকালদর্শী।

আমি বলিতেছিলাম প্রাণময় জগতের কথা। হঠাৎ ফিবিয়া আসিয়া জড় জগতের আলোচনা করিতে বসিলাম; ইহাতে নিশ্চয়ই আপনারা রাগ করিয়াছেন; আপনারা আমার অপরাধ লইবেন না। জীবদেহে জড়ধর্মের অতিরিক্ত কিছু আছে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই প্রশ্ন এত দুরূহ এবং এত বিতণ্ডার বিষয় যে, আমার পূর্বপ্রবন্ধে ইহার আলোচনা থাকিলেও, পুনরায় সেই আলোচনা উত্থাপনে বাধ্য হইয়াছি। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য হয়তো এইখানে একটা উপায়, একটা criterion পাওয়া যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জড়ের একটা লক্ষণ পাইয়াছি, উহা reversibility; যাহার সমস্ত আচরণই পালটানোযোগ্য, অতএব গণনাযোগ্য। তাহা খাঁটি জড় পদার্থ। বর্তমান অবস্থায় জড় পদার্থে যদি কোনও irreversibility দেখা যায়, উহা আমাদের দৃষ্টিহীনতারই পরিচয়; জড় পদার্থের পক্ষে উহা essential নহে। আজিকালি এক দল পণ্ডিত এই essential কথাটায় অত্যন্ত জোর দিতেছেন। আপনারা Bergson-এর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইহাকে আমরা এই দলের একজন অগ্রণী মনে করিতে পারি। তিনি প্রাণময় জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, প্রাণযাত্রা ব্যাপারটা essentially irreversible; জগতের মধ্যে এই এক মাত্র ব্যাপার— যাহাতে কেবল চলিতেই হয়, ফিরিবার কোনো উপায় নাই। প্রাণযাত্রার অর্থই হইতেছে— একমুখে একটানা চলা; ফিরিবার কোনও সম্ভবনাই নাই। মরণের দ্বার যে একবার অতিক্রম করিয়াছে, সে আর ফেরে নাই। বাল্যের পর যৌবন; যৌবনের পর জরা; ইহাতে ইহার পালটানো কেহ দেখে নাই। পুরাণে আপনারা যযাতি রাজার উপাখ্যান শুনিয়া থাকিবেন। জরায় আক্রান্ত হইলে তাঁহার যৌবন ফিরিয়া পাইবার সখ হইল; পুত্রদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার জরার সহিত তোমাদের যৌবন বদল করো। একজন পুত্র সম্মত হইল; তাহার উপর জরাভার চাপাইয়া তাহার যৌবন তিনি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ফলে কী হইল? পুরাণকার

বলিতেছেন যে, যৌবনের ভার তাঁহার পক্ষে জরার ভার অপেক্ষাও দুর্বহ হইয়া পড়িল; কিছু দিন পরেই তিনি পরিত্রাহি স্বরে পুত্রের যৌবন পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। ব্যাপারটা যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক; যযাতি রাজা স্বভাবের স্রোতের উলটা পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাণময় জগতের স্বভাবই এই যে, উহা একমুখেই চলে; কখন মুখ ফিরায় না; মুখ ফিরাইতে পারিলে উহার বিশিষ্টতা হারাইত। প্রাণ কেবলই চলে, এবং যে পথে চলে, সে পথের সমস্ত নিদর্শন কুড়াইতে কুড়াইতে চলে; সমস্ত অতীতের পথ চলিয়া যাহা কিছু কুড়াইয়া পায়, তাহা সমস্ত আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিয়া ঘাড়ে লইয়া চলে; পথ চলিতে-চলিতে যেখানে যে আঘাত পায়, তাহার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন গায়ে লইয়া চলে। ইহাই প্রাণের কাহিনি। প্রাণের ইতিহাস বিরোধের ইতিহাস; প্রাণের বোঝা দুর্বহ বোঝা; কিন্তু এই দুর্বহ বোঝা ঘাড়ে করিয়া প্রাণ চলিতেছে; যতই চলিতেছে, বোঝাও ততই বাড়িতেছে। যে-কোনও প্রাণীর দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করো, উহার দেহের যে-কোনও অংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করো; যদি চোখ থাকে তো দেখিতে পাইবে যে, অতীতের সমস্ত ক্ষতচিহ্ন উহাতে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত ও মুদ্রিত আছে; উহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলিবার নহে। মিছরির দানার গায়ে তাহার অতীতের কোনো চিহ্ন থাকে না; নির্মল জলবিন্দুতেও তাহার অতীত ইতিহাসের কোনও চিহ্ন থাকে না। নদীর ঘোলা জলে অতীতের চিহ্ন থাকিতে পারে বটে; নদী যে পথ বাহিয়া আসিয়াছে, সেই পথের সমস্ত কাদামাটি কুড়াইয়া বহন করিয়া আনিয়াছে বটে; কিন্তু সেই কাদামাটি জল হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলা যায়। কিন্তু প্রাণী-দেহ হইতে তাহার অতীত ইতিহাসের চিহ্ন ধুইয়া মুছিয়া, ছাঁকিয়া ফেলিবার কোনও উপায় নাই। প্রাণী-বিদ্যায় পদে-পদে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যখন বর্ধমান হয়, তখন সেই ভ্রূণদেহে অতীত পুরুষপরম্পরায় ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যালটন দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রাণী-দেহে পিতার ও মাতার চিহ্ন তো বর্তমান আছেই; তদ্ব্যতীত প্রত্যেক পিতৃপুরুষের পিতৃপরম্পরার ও মাতৃপরম্পরার এবং প্রত্যেক মাতার পিতৃপরম্পরার ও মাতৃপরম্পরার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মনে করা যায় বটে, বাহ্য জগতের কোনও উপদ্রব, আক্রমণ দেহরূপী দুর্গকে ভেদ করিয়া দেহস্থিত অপত্যকে স্পর্শ করে না; কিন্তু বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষিত হইয়াও সে অপত্য-কোশ আপনাকে বিকৃত কবিযা লয়; এবং সেই বিকারেব ফলে নূতন জন্মগ্রহণ করিয়া জীবন-যুদ্ধে অধিকতর যোগ্যতা লাভে সমর্থ হয়। ইহাই তো variation; এই variation-এর ফলেই জীবন-যুদ্ধে প্রাণীগণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই variation এখনও কোনও formula-য় ধরা দেয় নাই। মেন্ডেলের formula-র প্রয়োগক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। এই variation-এর ফলে প্রাণী-জগতে কেবলই নূতনের উৎপত্তি হইতেছে; নিত্যই নবমূর্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণ আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছে। প্রাণ যতই অগ্রবর্তি হয়, ততই পুরাতনকে আত্মসাৎ করিয়া চলে এবং ততই নূতনকে উপার্জন করে; পুরাতন সঞ্চয়ের উপর নূতন পাথেয় ক্রমশ সংগ্রহ করিয়া পিছনের দিকে না চাহিয়া, কেবলই সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে। জড় চিরপুরাতন, কিন্তু প্রাণ চিরপুরাতনের উপর নিত্য নূতন। এই নূতনকে কোনওরূপ formula-র বাঁধে আয়ত্ত করিবার উপায় নাই। যেখানেই যেমন বাঁধ দাও, প্রাণের উচ্ছ্বাস সেই বাঁধকে লঙ্ঘন করিয়া চলিবেই। প্রাণের এই উচ্ছ্বাসকে ঠিক Evolution মাত্র বলা চলে না; যাহা খাঁটি Evolution বা অভিব্যক্তি, তাহাতে নূতন কিছুই থাকে না; পুরাতন যাহা ছিল, তাহাই নূতন সাজে ফুটিয়া বাহির হয় মাত্র। প্রাণ কিন্তু পুরাতনকে

ফেলে না বটে; কিন্তু পুরাতনের উপরে নূতনের সংযুক্ত করে; ইহা বিশুদ্ধ evolution নহে, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে epigenesis—অভিব্যক্তির সঙ্গে-সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি। Bergson-এর ভাষায় ইহা creative evolution। প্রাণ চলিতেছে; কেবল একমুখে ঊর্ধ্বমুখে চলিতেছে; চলিবার কালে আপনাকে ফুটাইতেছে, প্রকাশ করিতেছে, বিকাশ করিতেছে; আপনার ভিতরের তথ্য বাহিরে আনিতেছে; কিন্তু কেবল তাহাতেই ক্ষান্ত নাই; সঙ্গে-সঙ্গে ইহা নূতনের সৃষ্টি করিতেছে; যাহা ছিল না, কোথা হইতে তাহার উদ্ভাবনা করিতেছে। এই সৃষ্টি-ক্রিয়ার অন্ত নাই—ইয়ত্তা নাই, সীমা নাই।

পূর্বপ্রবন্ধে আমি mechanistic এবং vitalistic, এই দুই থিয়োরির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছিলাম; mechanistic theory আজিও আস্ফালন করিতেছে; পরাজয় স্বীকার বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বভাবই নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা জড়ধর্ম্মগুলিকে formula-বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেই। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, প্রাণীদেহে জড়ধর্মের অতিরিক্ত কিছু আছে কি না? প্রাণের এমন বিশিষ্টতা কিছু আছে কি না, যাহা জড়ের নিয়মে বাঁধা পড়িতে চায় না; যাঁহারা vitalist, তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এইরূপ অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, তাহাতেই প্রাণের বিশিষ্টতা। প্রাণ জড়কে আশ্রয় করে; উহাকে প্রাণীপদার্থে পরিণত এবং সেই প্রাণীপদার্থকে ভিতর হইতে পরিচালিত করে। কোন পথে চলিতে হইবে, কে যেন ভিতর হইতে তাহা দেখাইয়া দেয়। এমন পথে চলিতে হয়, যাহাতে তাহার জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুযোগ ঘটে; যাহাতে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়, যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য যে বিরোধের প্রয়োজন, সেই বিরোধ চালাইবার সুবিধা হয়। খাঁটি জড়ের পক্ষে এইরূপ আত্মরক্ষা বলিয়া কিছুই নাই। খাঁটি জড়ের আচরণ লক্ষ্যহীন; উদ্দেশ্যহীন; একেবারে উদাসীনের আচরণ। এ কথা আমি আগেই জানাইয়াছি। প্রাণের একটা লক্ষ্য আছে; একটা উদ্দেশ্য আছে; সর্বদা সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, সেই লক্ষ্যের অভিমুখে সে চলিতেছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া প্রাণ একমুখে চলিতেছে; কখনও মুখ ফিরাইবার অবসর পায় না, কখনও পালটা মুখে চলে না। এই জন্য প্রাণের যাত্রা essential irreversible; চলিতে-চলিতে যাহা অর্জন করে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহে না। জড়ের সেরূপ কোনও লক্ষ্য নাই। কেলবিনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কোনওরূপ চরম লক্ষ্যের অভিমুখে চলা জড়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—essential নহে। জড় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে; বাঁধা পথে চলিতেছে, কোনও চিহ্ন রাখিয়া বা কোনও চিহ্ন লইয়া চলিতেছে না। তাহার সমস্ত অতীতটিকে ধুইয়া মুছিয়া, বিস্মৃত হইয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রাণ যখন জড়দেহ আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলে; কিন্তু কোন পথে চলে, তাহা আগে হইতে বলিবার কোনও উপায় নাই। এখানে তাহার স্বাধীনতা বা freedom রহিয়াছে। তাহার লক্ষ্য স্থির আছে বটে, কিন্তু পথের স্থিরতা নাই। পথের নিরূপণে সে একেবারে স্বাধীন। বিজ্ঞান-বিদ্যা সেই পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; সেই পথে কিছু দূর পর্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু পথ দেখাইতে পারে না। গঙ্গা যখন ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন, সাগর তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল; সমস্ত বাধা কাটাইয়া আপনার পথ তিনি আপনি বাছিয়া লইয়াছিলেন; ভগীরথ বোধ করি তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। সেইরূপ কোনও বৈজ্ঞানিক প্রাণের প্রবাহকে কোনও নির্দিষ্ট পথে চালাইতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। প্রাণের প্রবাহের জন্য বৈজ্ঞানিক যে খাতই নির্দিষ্ট করুন, প্রাণের ধারা সেই

খাত ছাড়িয়া কখন অন্য খাত আপনি কাটিয়া লইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। এইরূপে প্রাণ স্বাধীনভাবে আপন পথে চলে, এবং চলিবার সময় অতিক্রান্ত পথের সমস্ত নিদর্শন বহন করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া চলিতে থাকে। অতএব প্রাণের একটা কাহিনি আছে। সেই কাহিনি গণনা দ্বারা আবিষ্কারের বিষয় নহে। কেন না, প্রাণ আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লয়, অপরের নির্দেশের অপেক্ষা করে না। প্রাণের কাহিনি যদি জানিতে চান, তাহা হইলে পরিচ্ছেদের-পর-পরিচ্ছেদ, অধ্যায়ের-পর-অধ্যায়, পর্বের-পর-পর্ব পড়িয়া যান। প্রাণ নিজের ইতিহাস নিজেই লিখিয়া যাইতেছে। কোনো অধ্যায়, কোনো পর্ব হারায় নাই; যদি চোখ থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর গায়ে তাহা লিখিত দেখিবেন। ইতিহাস সেখানে লিখিত আছে; hieroglyphic হরফে খোদাই করা আছে। একালের প্রাণীবিদ্যা ভূপঞ্জরের স্তরাবলি ঘাঁটিয়া, মাতৃকুক্ষিস্থ ভ্রূণের দেহ পর্যবেক্ষণ করিয়া, দেহস্থিত প্রত্যেক কোশে অনুবীক্ষণ লাগাইয়া, সেই অতীত ইতিহাস পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কাহিনি সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখানে কোনও জ্যোতিষের বচন ভবিষ্যৎ গণনায় সফল হইবে না; প্রাণপ্রবাহ কোন পথে চলিবে, ভবিষ্যতে প্রাণ কোন মূর্তি ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এখন তাহার কোনও হিসাব দেওয়া চলিবে না।

প্রাণে কাহিনি আছে এবং সেই কাহিনি বিরোধের কাহিনি,—নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রাম বিরোধের কাহিনি। এই বিরোধেরই নাম জীবন-যুদ্ধ। এই জীবন-যুদ্ধের একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই যুদ্ধ চলিতেছে; সেই লক্ষ্যের নাম প্রাণরক্ষা—প্রাণের বর্ধন। প্রাণ আপনাকে রাখিবার জন্য, আপনাকে বাড়াইবার জন্য এই যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সেই উদ্দেশ্যই এই জীবন-যুদ্ধ চালাইতেছে। সেই যুদ্ধ চালাইবার জন্যই প্রাণ মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণির এক কোশে নির্মিত unicellular প্রাণী মৃত্যু জানিত না, কিন্তু বহু কোশে নির্মিত multicellular প্রাণী মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে; এবং সেই মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য অপত্যোৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনা করিয়াছে। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চাহে, এবং রাখিবার জন্যই আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ যুদ্ধ চালাইতেছে; সেই যুদ্ধে প্রাণ কেবলই আপনাকে নষ্ট কবিতেছে, কেবলই মৃত্যু স্বীকাব করিতেছে; কিন্তু রক্তবীজের মতো মরিয়াও মরিতেছে না; সহস্র নূতন মূর্তি ধরিয়া খড়্গহস্তে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে। প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে নষ্ট করিতেছে, অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অপচয় দেখিলে অবাক হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী যেন বহ্নিমুখবুভুক্ষ পতঙ্গের মতো বিনা কারণে, বিনা বিচারে কেবলই মরিতেছে। মরণ ভিন্ন যেন তাহাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নাই। ইংরেজি ১৮৯১ সালে গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের নানা স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম। একদিন অপরাহ্নে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিলাম। "প্রতাপহোগ্রে ততঃ শব্দঃ"—এখানে কিন্তু আগে শব্দ, তারপর প্রতাপ। আকাশের কোণে যেন একখানা মেঘ দেখা দিল; মেঘখানা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া আকাশ ছাইল; সূর্য ঢাকিয়া গেল, দিনের আলো মন্দ হইল। মেঘখানা নামিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। দেখিলাম পঙ্গপাল-—ফড়িং-এর পাল। অবিলম্বেই এই ফড়িঙে ছাইল সকল ঘাট-বাট। গাছের মাথা, ঘরের চাল, দেওয়াল, উঠান, ময়দান, সমস্ত পঙ্গপালে ঢাকিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। সেই পঙ্গসেনা রাত্রির মতো গ্রামেই বিশ্রাম লইল। ভূমিতে

নামিয়া গাছপালা, খেত আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ঝাঁক বাঁধিয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেল। দেখা গেল, বড়-বড় গাছগুলা পত্রপল্লবশূন্য হইয়াছে, নারিকেল-গাছগুলা ন্যাড়া হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়াইয়া আছে। এই পঙ্গপাল উত্তরমুখে চলিল? কোন দেশে চলিল? শুনিয়াছি, ক্রমাগত তাহারা উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলের তুষারক্ষেত্রে ঠেকিয়া গিয়াছিল। এবং সেইখানে প্রাণযাত্রা শেষ করিয়াছিল। এক-একটা ঝাঁকে কত ফড়িং ছিল, কে গণিবে? কত কোটি ফড়িং একটা ঝাঁকের মধ্যে ছিল, কে তাহার তালিকা দিবে? এই কোটি-কোটি প্রাণী উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলে প্রাণ বিসর্জন করিল, ইহার তাৎপর্য কী? ইহাকে প্রাণের অপচয় ভিন্ন আর কী বলিব? জড় জগতে আপনারা শক্তির অপচয়ের কথা লর্ড কেলবিনের নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু প্রাণের এই যে অপচয়, ইহা সর্বদা চোখের উপরে ঘটিতেছে।

জীবন-যুদ্ধে প্রাণের এই অপচয় দেখিয়া বিস্মিত—ভীত হইতে হয়; কিন্তু এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি আপনাদিগকে জীবন-যুদ্ধের যে কাহিনি শুনাইলাম, তাহার মর্ম যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিতেছেন যে, এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণের এই অপচয়। এ বড় কৌতুকের কথা। যাহা রক্ষণীয়, তাহার অপচয় কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সঞ্চয় আর অপচয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

অপচয়ের দ্বারা সঞ্চয়, ইহা বোধ করি উন্মত্ত প্রলাপ। অথচ প্রাণময় জগতে ইহাই অহরহ চলিতেছে। প্রাণ যাহা সঞ্চয় করিতে চাহে, কল্পতরুর মতো তাহা দুই হাতে বিলাইতেছে; স্থান-অস্থান, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবলই নষ্ট করিতেছে; যেন একটা উৎকট নেশার ঝোঁকে উন্মত্তের মতো আপনাকে রিক্ত করিতেছে। এ বড় আশ্চর্য কথা। প্রাণ চাহে অমরতা; সেই অমরতা লাভের জন্যই প্রাণ কেবলই মরণকে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রকৃতি দেবী প্রকৃতই শিবদূতী? তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের দৌত্যকর্মে নিযুক্ত আছেন; সেই কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি রণরঙ্গিনী সাজিতেছেন; শ্মশানভূমিতে উন্মাদিনীর মত নাচিয়া-নাচিয়া বেড়াইতেছে। এ অতি আশ্চর্য নয় কি?

আজিকার মতো এইখানেই আপনাদিগকে বিরাম দিলাম। ইহার পরে আর এক ধাপ উঠিতে চাহি। প্রাণময় জগতের কাহিনি শুনাইলাম; এইবার মনোময় জগতে যাইতে চাহি। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

মাধ্যাকর্ষণ

গল্পে আছে, নিউটন একদিন আপেল ফল গাছ হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন ও ভাবিতে-ভাবিতে স্থির করিলেন যে, ফল পড়ে, কেন না, পৃথিবী উহাকে টানে। পৃথিবীর এই টানিবার শক্তির নাম দেওয়া হইল মাধ্যাকর্ষণ। এইরূপে ভূপতনের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়াই না কি নিউটনের মহত্ত্ব!

এটা কোন কাজের কথাই নহে। পৃথিবী ফলকে টানে বলাও যা, ফল পৃথিবীর দিকে চলে বলাও তা; উভয়ই আলঙ্কারিক ভাষা; বিজ্ঞানের নিকট উভয়েরই এক অর্থ। আপেল ফল যে ঊর্ধ্বমুখে না চলিয়া পৃথিবীর দিকে চলে, তাহা নিউটনের পূর্বেও সকলেই জানিত; মহামূর্খেও জানিত, পশুতেও জানিত। কাজেই আপেল পৃথিবীমুখে চলে বা পৃথিবী আপেলকে আপনার কাছে টানে, ইহা বলায় কাহারও কোন মহিমা বাড়ে না। আমাদের ভাস্করাচার্যও না কি বলিয়াছেন, মহীর আকর্ষণ-শক্তি আছে, তজ্জন্য আকাশের দ্রব্য ভূপতিত হয়। ভাস্করাচার্যও মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব এই কারণে প্রতিষ্ঠিত নহে। পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে, তাহা মূর্খেও যেমন জানিত, নিউটনও তেমনই জানিতেন। কেন এবং কীরূপে টানে, তাহা কখনও কেহ জানিত না, এখনো কেহ জানে না; নিউটনও তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন নাই। তবে নিউটনের মহত্ত্ব কীসে? নিউটন করিয়াছেন কী?

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, যাহার নামান্তর ভার, প্রাকৃতিক নিয়মে বা প্রকৃতির খেয়ালে তাহা কেবল বস্তুর অপেক্ষা করে,—সেই বস্তু সোনা কি লোহা, জল না বায়ু, তাহা দেখে না,—তাহা নিউটনই স্পষ্টরূপে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করেন।

মাধ্যাকর্ষণের জগদ্ব্যাপ্তিতা

আর করেন কী? নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ যে পৃথিবীর নিকটেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে; উহা বহুদূরব্যাপী; এমনকী, চন্দ্রের নিকটও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর পিঠ ৪০০০ মাইল দূরে, আর চন্দ্র তাহার ষাট গুণ দূরে অর্থাৎ ২,৪০,০০০ মাইল দূরে; এত দূরেও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে।

কীসে জানিলে? মাধ্যাকর্ষণের কাজ কী? উহার কাজ বেগ বাড়ানো,—পৃথিবীর কেন্দ্র অভিমুখে সকল দ্রব্যের পতনবেগ বাড়ানো। বেগ বাড়ে দেখিয়াই আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ বল আছে। বেগ না বাড়িলে মাধ্যাকর্ষণের নামও করিতাম না। নিউটন দেখাইলেন যে, চাঁদমামা পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে চলিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন বলিয়াই তিনি সাতাইশ দিনে পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে বাধ্য আছেন, নতুবা এত দিন পৃথিবী ছাড়িয়া তিনি কোথায় চলিয়া যাইতেন, তাহার স্থিরতা নাই। চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর

দিকে চলিতেছেন,—চলিতেছেন বলিয়াই তাঁহার বক্ররেখায় বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ; নতুবা ঋজুরেখায় তিনি কোথায় যাইতেন কে জানে!

প্রশ্ন উঠিতে পারে, নারিকেল তো বোঁটা খসিলেই সোজা ভূপতিত হয়। চাঁদের তো কখনও আকাশ হইতে খসিয়া কাহারও মাথায় পড়িতে দেখি না; তবে চাঁদের পতনপ্রবৃত্তি আছে, কীরূপে মানিব? মোটামুটি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

একখানা ইট হস্তচ্যুত হইলে নীচে পড়ে, কিন্তু তাহাকে বেগে সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিলে ঠিক নীচে পড়ে না, সম্মুখে কিছু দূর চলিয়া অবশেষে কিছু দূরে ভূপতিত হয়। পতনপ্রবৃত্তি এড়াইতে পারে না বলিয়াই ভূপতিত হয়; তবে যত বেগে সম্মুখে ছুড়িবে, তত অধিক দূরে যাইয়া ভূমি স্পর্শ করিবে। ছাদের জল পয়োনালি দিয়া পড়িবার সময় উহার পথ যেমন বাঁকা হয়, গাড়ুর মুখ হইতে জল যেরূপ বক্র পথে বাহির হইয়া ভূপতিত হয়, সম্মুখে প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের পথও কতকটা সেইরূপ বাঁকা। পিস্তলের গুলি বেগে চলিয়া অনেক দূরে পড়ে, বন্দুকের গুলি আরও বেগে চলিয়া আরও দূরে পড়ে; কামানের গোলা প্রচণ্ড বেগে চলিয়া বহু দূরে, কয়েক মাইল দূরে পড়ে—শেষ পর্যন্ত পড়িতেই হয়। তেমন কামান এখনো তৈয়ার হয় নাই, কিন্তু ইহা মনে করে অসম্ভব নহে যে, কলিকাতায় কামান ছুড়িয়া দিল্লির কেল্লা ভাঙিয়া দিলাম। ফলে ইহা বেশ কল্পনা চলিতে পারে যে, বাংলায় বসিয়া কামান ছুড়িলাম, সেই গোলা প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া দিল্লিতে পড়িল; আরও বেগে ছুড়িলাম, দিল্লি ছাড়িয়া মক্কায় অথবা মক্কা ছাড়িয়া আফ্রিকার সাহারা মরুভূমিতে পড়িল। এখানেই বা থামিবে কেন? সমুচিত বেগে ছুড়িতে পারিলে আফ্রিকা পার হইয়া আটলান্টিক সমুদ্রে, অথবা আটলান্টিক ডিঙাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে গিয়া পড়িল। আরও কিছু বেগে ছুড়িতে পারিলে কামানের গোলা প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া মগের মুলুক অতিক্রম করিয়া পুনরায় বাংলা দেশে স্ব-স্থানে আসিয়া পড়িতে পারে। এইরূপে সেই গোলা পৃথিবীটাকে একচক্র ঘুরিয়া আসিতে পারে। আরও কিছু বেগ দিতে পারিলে গোলাটা বাংলা দেশে আসিয়াও মাটি ছুঁইবার অবকাশ পাইবে না, আবার দিল্লিমুখে বা মক্কামুখে ছুটিয়া আরও একচক্র ঘুরিবে অথবা পুনঃপুন চক্র দিতে থাকিবে। পৃথিবীতে পড়িবেই না, কেবল ঘুরিয়া মরিবে মাত্র। বস্তুতই কত বেগে গোলা ছুড়িলে উহা আর ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করিবার অবকাশ পাইবে না, কেবল পৃথিবীকে চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা কঠিন নহে। পৃথিবী কত বড়, তাহা যখন জানা আছে, উহার ব্যাস যখন ৮০০০ মাইল মাত্র, তখন এই বেগ যে অপরিমেয়, তাহা মনে করিবার দরকার নাই। গোলাটা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু পৃথিবী ছাড়িয়া একেবারে পলাইতে পারে না; কবির ভাষায় বলিতে গেলে গোলাটা যেন ঘানিগাছের বলদের মতো পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। চাঁদও ওইরূপে পৃথিবীর আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া ঘুরিতেছেন।

চন্দ্র ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিতেছেন, বেগে চলিতেছেন, বেগ অর্জন করিতে-করিতে চলিতেছেন, ইহা আপাতত বোধহয় না; কিন্তু নিউটনের হিসাবে চন্দ্রের এই বেগার্জন ব্যাপার ধরা পড়িয়াছিল। চন্দ্রের ভূকেন্দ্রাভিমুখ বেগ সেকেন্ডে কতটুকু বাড়িতেছে, তাহা নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, প্রতি সেকেন্ডে চন্দ্রের বেগবৃদ্ধি অতি অল্প; ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের বেগবৃদ্ধি সেকেন্ডে ৩২ ফুট; চন্দ্রের পৃথিবীমুখে বেগবৃদ্ধি সেকেন্ডে

উহার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ।

ভূকেন্দ্র হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ভূপৃষ্ঠের দূরত্বের ৬০ গুণ, আর চন্দ্রের বেগবৃদ্ধির হার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ। ৩৬০০ = ৬০ × ৬০; কী বিচিত্র ব্যাপার! দূরত্ব যত অধিক, বেগবৃদ্ধির হার তাহার বর্গের অনুপাতে তত অল্প।

দ্রব্যের ভূপতন-চেষ্টার ফলে ভার জন্মে; মাধ্যাকর্ষণের নামান্তরই ভার। চন্দ্রের ভূপতন-চেষ্টা আছে, তখন চন্দ্রে অবস্থিত সকল দ্রব্যে এবং চন্দ্রের নিকটবর্তী সকল দ্রব্যেও ভূপতন-চেষ্টার ফলে কিছু না কিছু ভার থাকিবে। তবে সেই ভার—সেই পৃথিবীমুখে পতনপ্রবৃত্তি—ভূপৃষ্ঠস্থিত দ্রব্যের তুলনায় নিতান্ত অল্প হইবে। ভূপৃষ্ঠে এক সের বস্তুর যে ভার, চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত এক সের বস্তুর পৃথিবীর অভিমুখে পতনপ্রবৃত্তি অর্থাৎ ভার তার ৩৬০০ ভাগের এক ভাগ হইবে। অথবা ভূপৃষ্ঠে এক সেরের যে ভার, চন্দ্রে ৩৬০০ সেরের বা ৯০ মণের সেই ভার। পৃথিবীর অভিমুখে ভার বলিলাম; কেননা, চন্দ্রের অভিমুখেও আবার চন্দ্রস্থ দ্রব্যের ভার আছে, তাহার পরিমাণ স্বতন্ত্র। ৯০ মণ লোহার বস্তুপরিমাণ চন্দ্রেও ৯০ মণ, পৃথিবীতেও ৯০ মণ; কিন্তু পৃথিবীতে এক সেরে যে ভার, চন্দ্রের ৯০ মণের ভার ততটুকু মাত্র। নিউটন এই অজ্ঞাতপূর্ব আবিষ্কর্তা। নিউটন আর কী আবিষ্কার করেন? চন্দ্র যেমন পৃথিবীর চারি দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; চন্দ্র যেমন পৃথিবীর মুখে পতনশীল, পৃথিবীও তেমনই সূর্যের মুখে পতনশীল। কেবল পৃথিবী কেন, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহও ঠিক সেইরূপে সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে। নিউটন দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যের অভিমুখে পতনশীল, বর্ধমান বেগে পতনশীল। সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব নিউটনের জানা ছিল; নিউটন হিসাব করিয়া দেখিলেন, বেগের বৃদ্ধি সর্বত্রই দূরত্বের বর্গের অনুপাতে অল্প। যাহার দূরত্ব তিনগুণ অধিক, তাহার বেগবৃদ্ধি নয় ভাগের এক ভাগ, এইরূপ হিসাব। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া সর্বত্র একই নিয়মের অধীন। জাগতিক ঘটনার বহু অনৈক্যের মধ্যে নিউটন এই ঐক্য খুজিয়া বাহির করিলেন। নিউটনের পূর্বে কেহ এ সন্ধান পান নাই।

প্রকৃতির ইহা আর একটা খেয়াল; কেন এই খেয়াল, তাহা নিউটনও জানিতেন না, তার পরেও এ পর্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারেন নাই; কিন্তু এই সৌরজগদব্যাপী প্রাকৃতিক খেয়ালের আবিষ্কর্তা নিউটন।

কেবল যে পৃথিবীর অভিমুখে চন্দ্রের, আর সূর্যের অভিমুখে গ্রহগণের এই পতনপ্রবৃত্তি; এই বর্ধমান বেগে পতনপ্রবৃত্তি, তাহা নহে; নিউটন দেখিলেন, গ্রহগণের পরস্পরের মধ্যেও এইভাবে একই নিয়মে একই বিধানে পরস্পরের অভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে।

সূর্য হইতে মঙ্গল নিকটে, বৃহস্পতি দূরে; উভয়ই সূর্যকে কেন্দ্রস্থল করিয়া ঘানিগাছের বলদের মতো ঘুরিতেছে। মঙ্গলের ভ্রমণপথ ভিতরে, বৃহস্পতির ভ্রমণপথ বাহিরে। মঙ্গল সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে; কিন্তু বাহিরে বৃহস্পতি থাকায় তাহারও দিকে মঙ্গলের টান আছে; তাই মঙ্গল ঠিক সেই বৃত্তাকার পথে চলিতে পারে না; একটু বৃহস্পতির দিকে হেলিয়া চলে। এখানেও বেগবৃদ্ধির সহিত দূরত্বের সেই অনুপাত। কিঞ্চিৎ মাত্র হেলিয়া চলে; কেন না, সূর্যের বস্তুর কাছে বৃহস্পতির বস্তুপরিমাণ অতি অল্প।

নিউটন দেখাইলেন, সৌরজগতের সর্বত্রই এই একই নিয়মের রাজত্ব;—একবার

কবির ভাষায় লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রত্যেক দ্রব্য অপর দ্রব্যের অভিমুখে চলিতে চাহিতেছে, ওই নিয়মে। নিউটন সৌরজগদব্যাপী এই প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্তা। এই জন্য নিউটনের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের স্পর্দ্ধা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি করিতে পারেন না।

মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম

নিউটন কী আবিষ্কার করিয়াছিলেন? প্রথম, মাধ্যাকর্ষণ বস্তুধর্মের অপেক্ষা করে। যে দ্রব্যের বস্তু যত অধিক, সেই দ্রব্যের মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। এক সের সোনার যে ভার, দুই সের সোনার ভার তাহার দ্বিগুণ, দুই সের লোহার বা তুলারও ভার সেই দ্বিগুণ। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই এই নিয়মে ভূকেন্দ্রমুখে পতনশীল। দ্বিতীয়, চন্দ্র এবং তৎসন্নিহিত দ্রব্য এত অধিক দূরে থাকিয়াও ভূকেন্দ্রপ্রতি পতনশীল, তবে সেখানে দূরত্ব অধিক বলিয়া মাধ্যাকর্ষণ অল্প। দূরত্ব যত অধিক, মাধ্যাকর্ষণ তাহার বর্গানুসারে অল্প। তৃতীয়, নারিকেল যেমন ভূমিমুখে পতনশীল, চন্দ্র যেমন ভূমিমুখে পতনশীল, পৃথিবীও সেইরূপ সূর্যরূপে পতনশীল। পৃথিবী কেন, বুধ, শুক্র হইতে শনি পর্যন্ত সমুদয় গ্রহ সূর্যের মুখে সেইরূপ পতনশীল; পতনশীল বলিয়াই তাহারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; নতুবা সূর্যকে ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত, কে জানে! আবার গ্রহগুলি যে যত দূরে আছে, তাহার পতনপ্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প; যে দ্বিগুণ দূরে, তাহার পতনশীলতা চতুর্থাংশ; যে দশগুণ দূরে, তাহার পতনশীলতা শতাংশ। এইরূপ নিয়ম। চতুর্থ, গ্রহগুলি যেমন সূর্যের অভিমুখে পতনশীল, তাহারা পরস্পরের অভিমুখেও তেমনই পতনশীল। মঙ্গল গ্রহ সূর্যে পড়িতে চায়, বৃহস্পতি সূর্যে পড়িতে চায়; আবার মঙ্গল বৃহস্পতির দিকেও পড়িতে চায়; ফলে মঙ্গল সূর্য প্রদক্ষিণ করে বটে, তবে বৃহস্পতির দিকে ঝোঁক যৎসামান্য—কেন না, এই পতনপ্রবৃত্তি—যাহাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ, সেই পতনপ্রবৃত্তি বস্তুসাপেক্ষ। সূর্য প্রকাণ্ড বস্তু, বৃহস্পতি তাহার নিকট ক্ষুদ্র; পৃথিবীর সহিত তুলনায় দেখা যায়, সূর্যের বস্তু পৃথিবীর তিন লক্ষগুণ; বৃহস্পতির বস্তু পৃথিবীর তিন শতগুণ মাত্র। কাজেই মঙ্গলের ঝোঁক সূর্যের দিকেই অধিক, বৃহস্পতির দিকে অতি অল্প—অল্প বটে, কিন্তু একেবারে নগণ্য নহে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। সকল গ্রহের পক্ষেই এইরূপ; সকলেরই পরস্পরের দিকে এক-আধটু ঝোঁক আছে, সেই ঝোঁক বা পতনপ্রবৃত্তি বা মাধ্যাকর্ষণ সর্বত্রই প্রথমত বস্তুসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার বস্তু যত অধিক, তৎপ্রতি পতনপ্রবৃত্তিও তত অধিক; এবং দ্বিতীয়ত, দূরত্বসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহার দূরত্ব যত অধিক, তাহার পতনপ্রবৃত্তি দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প। নিউটন এতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, এবং দেখিলেন, এই বিশাল সৌর জগতের মধ্যে আম জাম নারিকেল হইতে গ্রহ উপগ্রহ, চন্দ্র সূর্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সকল দ্রব্যের পরস্পর এই পতনোন্মুখতা রহিয়াছে, এই পতনশীলতা প্রত্যেক দ্রব্যের বস্তু অনুসারে বৃদ্ধি পায়, তার দূরত্বের বর্গ অনুসারে হ্রাস পায়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সৌরজগৎ ব্যাপিয়া এই নিয়ম বিদ্যমান; চিরদিন ধরিয়াই এই নিয়ম আছে; কেন আছে, কী উদ্দেশ্যে আছে, নিউটন তাহা জানিতেন না, নিউটনের পরেও কেহ জানেন নাই। কিন্তু এত বড় জগৎ ব্যাপিয়া

এই যে একটা নিয়ম—এই যে একটা শৃঙ্খলা—এত অনৈক্যের মধ্যে এই ঐক্য—ইহা যে রহিয়াছে, তাহা নিউটনের পূর্বে কেহ জানিত না। নিউটন দিব্য নেত্রে তাহা দেখিয়াছিলেন এবং অন্যকে দেখাইয়াছিলেন। এই নিয়ম হয়তো অনাদি—অর্থাৎ কত কাল হইতে ইহা বিদ্যমান, তাহা কেন জানে না। কিন্তু অন্যের চোখে ইহা পড়ে নাই। নিউটনের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। নিউটন ইহার দ্রষ্টা—নিউটন ইহার ঋষি।

আগে বলিয়াছি, যাহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আড়াই শত বৎসরও এখনও হয় নাই, নিউটন পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন, মাধ্যাকর্ষণের সহিত কেবল বস্তুর সম্পর্ক; অন্য ধর্মের সম্পর্ক নাই। যাহার বস্তু যত অধিক, তাহার ভার তত অধিক, তৎপ্রতি প্রযুক্ত মাধ্যাকর্ষণ তত অধিক। নিউটন সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি অন্বেষণ করিয়া পর্যবেক্ষণ দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের সহিত দূরত্বের সম্পর্ক বাহির করেন। এখানে পরীক্ষা চলে না; কেন না, গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধি ইচ্ছামতো নিয়মিত করা যায় না।

কিন্তু এইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার নূতন জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে; ইহাতে পথ দেখাইয়া দেয়; কোন দিকে চলিলে নূতন তথ্যের সংবাদ জানিব, সেই পথ দেখায়। কেবল অন্ধের মতো হাতড়াইতে থাকিলে দৈবক্রমে জ্ঞান অর্জিত হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার দ্বারা দীপশিখা জ্বালিয়া নূতন জ্ঞান লাভের পন্থা দেখাইয়া দেন। মানুষ তখন জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়।

একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। নিউটনের শতবর্ষ পরে ইংল্যান্ডে হর্শেল নামে জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি স্বহস্তনির্মিত বৃহৎ দূরবিন দ্বারা একটি নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন; উহার ভ্রমণপথ শনিরও বাহিরে। উহার ইংরেজি নাম উরেনস। আমরা বলি বরুণগ্রহ। আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যে দেবতাকে বরুণ বলিতেন, গ্রিকেরা না কি এক কালে সেই দেবতাকেই উরেনস বলিতেন; এই জন্যই বরুণ নাম সঙ্গত হইবে। উহার গতিবিধি আলোচনা করিয়া দেখা গেল, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের সমীপে যে পথে চলা উচিত ছিল, সে পথে না চলিয়া ওই গ্রহ একটু বাহির ঘেঁষিয়া চলিতেছে। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে এইরূপে বাহির ঘেঁষিয়া চলার কারণ অনুমিত হয়। অনুমান হয় যে, বরুণেরও বাহিরে আর একটি গ্রহ আছে, যাহার টানে—যাহার দিকে পতনপ্রবৃত্তির ফলে বরুণের পথ ওই দিকে হেলিয়াছে। কোথায় কত দূরে একটা গ্রহ থাকিলে ভ্রমণপথের ঠিক সেই ব্যতিক্রমটুকু ঘটিবে, তাহার হিসাব করিতে পাকা গণিতজ্ঞ আবশ্যক। কিছুদিন পরে আডামস নামে ইংরেজ গণিতবিদ হিসাব করিয়া বলিলেন, আকাশের অমুক স্থানে সেই গ্রহ থাকা উচিত। আডামস তাঁহার কাগজপত্র রাজকীয় মানমন্দিরের অধ্যক্ষ জ্যোতির্বিদ এয়ারির নিকট পাঠাইলেন। এয়ারি তাহা বাক্সতে ফেলিয়া রাখিলেন। এ দিকে ফরাসি জ্যোতিষী লেবেরিয়ে হিসাব করিয়া ঠিক সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ফেলিলেন। এক জন জার্মান জ্যোতিষী লেবেরিয়ের নির্দিষ্ট নভস্থলের অভিমুখে দূরবিন ধরিয়া নূতন গ্রহটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আডামসের কাগজপত্র তখনও এয়ারি সাহেবের বাক্সে। এই নবাবিষ্কৃত গ্রহের ইংরেজি নাম দেওয়া হইল নেপচুন। আমরা কী নাম দিব? একজন বড় দেবতার নাম দিতে হইবে। বরুণের সহচর ছিলেন মিত্র। 'মিত্রাবরুণৌ' এই যুগল দেবতা প্রসিদ্ধ।

আমরা নেপচুনের নাম দিলাম মিত্র।

নেপচুনের বাহিরে আর কোন নূতন গ্রহ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নেপচুনের ভ্রমণপথই এখন সৌর জগতের সীমা বলিয়া গৃহীত হয়। উহার বাহিরে তারাজগৎ; কত কোটি তারকা বিশ্বজগতে ছড়াইয়া আছে; এক-একটা তারকা এক-একটা সূর্য। অনেকে সূর্যের চেয়েও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান; হয়তো তাহাদেরও গ্রহ উপগ্রহ আছে। প্রশ্ন উঠে, এই সকল তারকাসমূহের মধ্যেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুযায়ী পরস্পরের অভিমুখে গতিবিধির প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন। উহাদের পরস্পরের দূরত্ব এত অধিক যে, তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাদের গোচরই হয় না। অধিকাংশ তাহার দূরত্ব আমরা জানি না। গোটাকয়েকের মোটামুটি জানা গিয়াছে; তাহার মধ্যে যেটা সব চেয়ে নিকটে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, আমরা তাহার আলো পাইতে সাড়ে চার বৎসর অতীত হয়। আলো সেকেন্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। সূর্য পৃথিবী হইতে প্রায় সাড়ে চার কোটি ক্রোশ দূরে থাকে; উহার আলো পৃথিবীতে আসিতে আট মিনিট মাত্র লাগে। যাহার আলো আসিতে সাড়ে চারি বৎসর লাগে, তাহার দূরত্ব কি ভীষণ! সেই তারার গতিবিধির সহিত সূর্যের কোনো সম্পর্ক থাকিলেও সে সম্পর্ক এত ক্ষীণ যে, তাহা সম্প্রতি যন্ত্রযোগে মাপিয়া ধরিবার আশা নাই। এইরূপ তারায়-তারায় সম্পর্ক।

তবে গোটাকতক উদাহরণ আছে; গোটাকতক জোড়া তারকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; জোড়ার মধ্যে একটা অন্যটার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, পরস্পরের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। উহাদের ভ্রমণপথ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায় যে, নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত উহাদের গতিবিধির সামঞ্জস্য আছে। ইহাই দেখিয়া বলিতে সাহস হয়, সৌর জগতের বাহিরেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বর্তমান।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে প্রায় দেখা যায়,—মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী। এতবড় কথাটা বলিবার পূর্বে একটু থামা উচিত; প্রথমেই ভাবা উচিত, বিশ্বজগৎ কী?

সহজ চোখে নির্মল আকাশে হাজার পাঁচ-ছয় তারা দেখা যায়।

উৎকৃষ্ট দূরবিনের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর বহু লক্ষ তারকা দেখা যায়; অধিক দূরের তারা হইতে আলো আসিতে হয়তো কত সহস্র বা কত লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। আরও দূরে হয়তো আরও তারা রহিয়াছে, তাহারা এখনও দূরবিনেও ধরা পড়ে নাই। এই তারকাজগতের সীমা কোথায়, তাহা আমরা ঠিক জানি না; সীমা আছে কি নাই, তাহাও নিশ্চিত বলিতে পারি না।

বিশ্বজগতের যে অংশের সহিত আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়, তাহার মধ্যে সৌর জগতে ও সৌর জগতের বহিস্থিত গোটাকতক তারকার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া দেখিতে পাই; ইহা লইয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বব্যাপী, এত বড় কথা এক নিশ্বাসে বলিবার পূর্বে একটু থামা উচিত। হয়তো মাধ্যাকর্ষণ বিশ্বব্যাপী, হয়তো নহে। বিজ্ঞানের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর এই পর্যন্ত।

পৃথিবীর মতো একটা বৃহৎ জড়পিণ্ডের সমীপে আম জাম আকৃষ্ট হয় বা অতিদূরবর্তী চন্দ্র পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়। আবার অতি বৃহৎ জড়পিণ্ড যে সূর্য, যাহার আয়তন বারো লক্ষ

পৃথিবীর সমান ও যাহার বস্তু তিন লক্ষ পৃথিবীর বস্তুর সমান, সেই প্রকাণ্ড সূর্যের অভিমুখে অতি দূরবর্তী মিত্র গ্রহ পর্যন্ত আকৃষ্ট হয়, ইহাও দেখা গেল। কিন্তু একটা নারিকেল ফল আর একটা নারিকেল ফলকে আকৃষ্ট করে কি না? নিউটন বলিয়াছিলেন, যাহার বস্তুপরিমাণ যত, তাহার আকর্ষণ তত। সূর্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহের তুলনায় নারিকেল ফলের বস্তু এত অল্প যে, একটা নারিকেলের অতি নিকটেও আর একটা নারিকেল রাখিয়া উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর করা সাধ্য বলিয়া মনে না হইতে পারে। কিন্তু এক সময়ে যাহা অসাধ্য থাকে, অন্য সময়ে তাহা সাধ্য হয়। নিউটনের বহু দিন পরে ক্যাবেন্ডিশ সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবন করিয়া দেখাইলেন, একটা সীসার গোলা আর একটা সীসার গোলার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুইটা গোলার মধ্যে কোনটা আকৃষ্ট হয়? এটা ওটার দিকে, ওটা এটার দিকে আকৃষ্ট হয়। উপরে যুগল তারার কথা বলিয়াছি; এও কতকটা সেইরূপ। দুইটা তারার মধ্যে এটা ওটার দিকে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণটা পরস্পর। তবে দুইটার মধ্যে একটা তারা সেকেন্ডে যে বেগ অর্জন করে, অন্যটা সেকেন্ডে ঠিক সেই বেগ অর্জন না করিতে পারে। কোন তারার কতটা বস্তু, এই বেগবৃদ্ধির মাত্রা দেখিয়া তাহা সহজেই নির্ধারিত হয়। বস্তু শব্দের আমরা যে পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদানুসারে সমান ধাক্কায় যাহার বেগবৃদ্ধি অধিক, তাহার বস্তু অল্প,—যত অধিক, তত অল্প। মনে করো, ১নং তারা সেকেন্ড যে বেগ অর্জন করে, ২নং তারা সেকেন্ডে তাহার দশগুণ বেগ অর্জন করিতেছে। ঘড়ি ধরিয়া দূরত্ব মাপিয়া হিসাব করিয়া ইহাই দেখা গেল। এখন পূর্বদত্ত পারিভাষিক অর্থ অনুসারে ২নং তারার বস্তু অল্প, ১নং তারার বস্তু অধিক। কত অধিক? দশগুণ অধিক। ২নং তারার বস্তু যদি এক সের হয়, ১নং তারার বস্তু দশ সের। ২নং তারার বস্তু যদি হয় কোটি মণ, ১নং তারার বস্তু দশ কোটি মণ।

ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, ১নং তারার বেগবৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তুর পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়, ২নং তারার বেগবৃদ্ধির পরিমাণকে উহার বস্তুপরিমাণ দিয়া গুণ করিলেও সেই গুণফল পাওয়া যাইবে। প্রথমের গুণফলের নাম দাও ক্রিয়া, উহা দ্বিতীয়ের অভিমুখে; দ্বিতীয়ের গুণফলের নাম দাও প্রতিক্রিয়া, উহা প্রথমের অভিমুখে। ফল হইল, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সমান ও পরস্পর বিপরীতমুখ।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার পূর্বোক্ত সমানতা নিউটনের প্রণীত অন্যতম গতির নিয়ম নামে পরিচিত। নিউটন বলিয়াছেন,—যেখানে ক্রিয়া, সেইখানেই তাহার বিপরীতমুখে প্রতিক্রিয়া এবং ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া উভয়ের মাত্রা সমান।

এই নিয়মটিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিব কি না? না, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। দুইটা বস্তু পরস্পরের প্রতি গতিবিধি দেখিয়া কোনটা কত বেগ অর্জন করিল, কোনটার বেগ কত বাড়িল, স্থির করি এবং যাহার বেগবৃদ্ধি যত অধিক, তাহার বস্তু তত অল্প, ইহাই স্থির করি। বস্তু শব্দের তাৎপর্য ইহাই; বস্তু শব্দকে আমরা এই নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থ ইচ্ছাপূর্বক দিয়াছি। যাহার বেগ যত অধিক, তাহার বস্তু যদি তত অল্প বলা যায়, তাহা হইলে অর্জিত বেগ ও বস্তুর পরিমাণ, এই উভয়ের গুণফল তো সমান থাকিবেই। ছেলেদের ডাকিয়া যাহার যত বয়স অধিক, তাহার হাতে যদি তত অল্প সন্দেশ দিই, তাহা হইলে প্রত্যেকের বয়সের বৎসরের সংখ্যাকে তাহার সন্দেশের সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে গুণফল তো সমান হইবেই। ইহাতে প্রকৃতির খেয়াল চলিবে না। ইহা বরং আমার খেয়াল। ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলিবে না। ইহা আবিষ্কারের জন্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা আবশ্যক হইবে না। ঘরে বসিয়া চোখ বুজিয়া আমি ইহা বলিতে পারিব। বস্তু শব্দের যখন পারিভাষিক সংজ্ঞাই এই, তখন বস্তু শব্দটি ওই অর্থে প্রয়োগ না করিয়া অন্য অর্থে প্রয়োগ করা স্বচ্ছন্দে চলিত। তাহা হইলে ক্রিয়ার অনাদি ও অবিভাজ্য, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ এই পরমাণুগুলি যেন ইষ্টক, এই ইষ্টকগুলি গাঁথিয়া বিশ্বজগতের অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে।

গ্রিক দার্শনিকদের মধ্যেও এইরূপ একটা মত প্রচলিত ছিল। পরমাণুর সমবায়ে জগতের উৎপত্তি হয়, তাঁহারাও এই অনুমান করিয়াছিলেন।

ডাল্‌টনের পরমাণুবাদের সহিত এই সকল প্রাচীন পরমাণুবাদের প্রভেদ আছে। ডালটন একটা বিশিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝাইবার জন্য পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন। দুইটা দ্রব্য যখন সম্মিলিত হইয়া তৃতীয় দ্রব্য উৎপন্ন করে, তখন সেই দুই দ্রব্যের ভাগের একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। প্রথমটার যে-কোনও ভাগ দ্বিতীয়টার যে-কোনও ভাগে মিলিত হয় না। হাইড্রোজেনের ভাগ ১ ধরিলে, অক্সিজেনের ভাগ ৮ ও কয়লার ভাগ ৩ হয়, অথবা তাহার কোন গুণফল হয়। ওই ওই মূল পদার্থ যে-কোনও যৌগিক পদার্থেই বিদ্যমান থাকে, উহাদের ভাগ ওইরূপই থাকে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি দেখিয়াই নব্য রসায়নের পরমাণুর কল্পনা। যত রকমের মূল পদার্থ, তত রকমের পরমাণু। অক্সিজেনের পরমাণু ওজনে হাইড্রোজেন পরমাণুর আটগুণ; কয়লার পরমাণু ওজনে হাইড্রোজন পরমাণুর তিনগুণ। নব্য রসায়ন একটা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন ও নানা উপায়ে কোনও জিনিসের পরমাণুর কী ওজন, তাহা নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নহে, উহা নিক্তিতে ওজন করিবার উপায় নাই। কোন পরমাণুর কত ওজন, তাহা বলিতেও রাসায়নিক পণ্ডিতেরা সাহস

করেন না; তবে এই জিনিসের পরমাণু ওই জিনিসের পরমাণু অপেক্ষা এতগুণ ভারী, ইহা বলিয়া তাঁহারা নিরস্ত হন।

প্রাচীন দার্শনিকেরা পরমাণুর কল্পনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব তাঁহারা জানিতেন না। ওই নিয়ম নব্য রাসায়নিক পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত। প্রাচীনেরা তখন নিক্তি লইয়া তৌল করিয়া দেখেন নাই যে, রাসায়নিক সম্মিলনে এইরূপ একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কাজেই নব্য রসায়ন জড়ের যে ধর্ম বুঝাইতে পরমাণু কল্পনা করিয়াছেন, প্রাচীন পণ্ডিতেরা সে ধর্ম বুঝাইতে সে কল্পনা করেন নাই।

প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর যে অনুমান প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গত ব্যাখ্যার জন্য যে অনুমানের উৎপত্তি, তাহারই ভিত্তি দৃঢ় ও সেই অনুমানই সার্থক। নতুবা যাহা বিশুদ্ধ কল্পনামাত্র, প্রত্যক্ষে যাহার ভিত্তি স্থাপিত নহে, পদার্থবিদ্যায় সে অনুমানের কোনো সার্থকতাই নেই।

প্রাচীন দার্শনিকের অনুমান যে অমূলক কল্পনা, উহা কেবল তাঁহাদের গায়ের জোর, ইহা বলা উচিত নহে। জড়ের কোনও-না-কোনও ধর্ম বুঝাইবার জন্যই তাঁহারা ওই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে সেই ধর্ম বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য অন্য প্রকৃষ্টতর অনুমান ছিল না। কাজেই তাঁহাদের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, এরূপ বলা চলে না। তবে প্রাচীন পরমাণুবাদের অপেক্ষা আধুনিক পরমাণুবাদের ভিত্তি দৃঢ়তর, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে।

একালের অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রাচীন দার্শনিকদিগকে গালি দিয়া আনন্দ ভোগ করেন। প্রাচীনেরা প্রত্যেক্ষের সাহায্য লইতেন না, অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা প্রকৃতির ব্যবস্থা কীরূপ, তাহা নির্ণয় করিতে চাহিতেন না; তাঁহাদের ভিত্তিহীন কল্পনাগুলিকে দৈববাণীর মতো প্রচার করিতেন এবং শিষ্যবর্গকে অসংকোচে মানিয়া লইতে বলিতেন; ইত্যাদি কতই অপবাদ শোনা যায়। ফলে, এইরূপ নিন্দাবাদ অবৈজ্ঞানিক। অবেক্ষণ ও পরীক্ষণই সত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায়, তাহা মানবজাতির উৎপত্তি অবধি মানবজাতি মানিয়া চলিতেছে। তদ্দ্বারাই সত্য নির্ণয় করিয়া পরে প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের দ্বারা ও কল্পনার দ্বারা জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সেকালেও যে পদ্ধতি ছিল, একালেও সেই পদ্ধতি। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সেকালের চেয়ে একালের লোকে অধিক সাবধান হইয়াছে, সূক্ষ্ম পরিমাণ কর্মে সমর্থ হইয়াছে; আর পূর্বপুরুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার আনুকূল্য পাইয়া জ্ঞানের উচ্চতর সোপান আশ্রয়ে সুবিধা পাইয়াছে, এই পর্যন্ত প্রভেদ।

পরমাণু ও অণু

রাসায়নিকের মতে পরমাণু মূলপদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ; কেন না, উহা অবিভাজ্য। প্রত্যেক পরমাণুর নির্দিষ্ট বস্তু আছে; সেই বস্তু কত জানি না; তবে এই পরমাণুর বস্তু ওই পরমাণুর বস্তুর কতগুণ, এই পর্যন্ত বলিতে পারি। হাইড্রোজেনের পরমাণুর বস্তু ১ ধরিলে, কয়লার পরমাণু ৩ ও অক্সিজেনের পরমাণু ৮ হয়।

সম্মিলন কালে এক মূল পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণু অন্য মূল পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ প্রযুক্ত করে। যৌগিক পদার্থের এই সূক্ষ্মতম অংশের নাম দেওয়া হয় অণু। মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল পরমাণু, আর যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম খণ্ডের নাম হইল অণু। পরমাণু যেমন অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর, অণুও তেমনি অতীন্দ্রিয় ও কল্পনাগোচর। জলের একটি অণুতে কতিপয় হাইড্রোজেনের পরমাণু ও কতিপয় অক্সিজেনের পরমাণু আছে। এক ফোঁটা জলে কোটি-কোটি জলের অণু আছে; আর জলের প্রত্যেক অণুতে কতকগুলি হাইড্রোজেনের পরমাণু ও কতকগুলি অক্সিজেনের পরমাণু রহিয়াছে। জলের অণু ভাঙিলে উহা আর জল থাকে না; অক্সিজেনের আর হাইড্রোজেনর পরমাণু পৃথক হইয়া পড়ে। রাসায়নিক সম্মিলনের সময় হাইড্রোজেনের পরমাণুতে অক্সিজেনের পরমাণুতে মিলন ঘটিয়া জলের অণু নির্মিত হয়, আর বিশ্লেষণকালে জলের অণুগুলি ভাঙিয়া হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং অক্সিজেনের পরমাণু পৃথক হইয়া পড়ে।

কাজেই দাঁড়াইল যে, যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ অণু, আর মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ পরমাণু।

একটা জলের অণুতে হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের কয়টা পরমাণু আছে, তাহা নিরূপণের কোনও উপায় আছে কি না? এইখানে-একটু সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন।

জল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, উহাতে কেবল দুইটা মূল পদার্থ বিদ্যমান, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। কোনও তৃতীয় পদার্থ নাই। আর দেখা যায় যে, এক ভাগ হাইড্রোজেনের সহিত আট ভাগ অক্সিজেনের যোগে নয় ভাগ জল হয়। এক ছটাকে আট ছটাক, এক সেরে আট সের, এক মণে আট মণ—হাইড্রোজেনের ও অক্সিজেনের মিলনকালে ভাগের অনুপাত এইরূপ। এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বুঝাইবার জন্য অণুর ও পরমাণুর কল্পনা; কল্পনার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। কল্পনা করিতে হয় যে, হাইড্রোজেনের ও অক্সিজেনের সূক্ষ্মতম অংশগুলিতে, অর্থাৎ পরমাণুগুলিতে, ওজনের এই তারতম্য বর্তমান।

এখন আমরা মনে করিতে পারি, হাইড্রোজেনের পরমাণু ওজন ১, আর অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ৮; অপিচ হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু গঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমরা মনে করিতে পারি যে, হাইড্রোজেনের দশটি পরমাণু অক্সিজেনের দশটি পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের একটি অণু

গঠিত হইয়াছে। উভয় অনুমানেরই এক ফল। কেন না, দশটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১০, ও ১০টি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ৮০, অতএব একটি জলের অণুর ওজন ৯০; তাহা হইলেও নয় ভাগ জলের মধ্যে এক ভাগ হাইড্রোজেন ও আট ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যাইবে।

আবার ভিন্নরূপ অনুমান চলিতে পারে। ধরিয়া লও, হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন ১, কিন্তু অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ১৬; আর জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু ও অক্সিজেন একটি মাত্র পরমাণু বিদ্যমান। দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ২, আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ১৬; অতএব জলের প্রত্যেক অণু ওজনে ১৮। অতএব ১৮ ভাগ জলের মধ্যে ২ ভাগ হাইড্রোজেন এবং ১৬ ভাগ অক্সিজেন থাকিল, অর্থাৎ ৯ ভাগ জলের মধ্যে ১ ভাগ হাইড্রোজেন ও ৮ ভাগ অক্সিজেন থাকিল। অতএব এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

এখন নূতন সমস্যা দাঁড়াইল। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ৮ ধরিলেও চলে, ১৬ ধরিলেও চলে। কোনটা ধরিব?

ওইরূপে কয়লার পরমাণুর ওজন ৩ ধরিলেও চলে, ৬ ধরিলেও চলে। কোনটা ধরিব?

ডালটনের পরমাণুবাদ ইহার মীমাংসা করিতে অক্ষম। বস্তুত ডালটন উহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

ডালটনের পরবর্তী পণ্ডিতেরা ডালটনের কল্পনায় আরও কতিপয় নূতন কল্পনার যোগ দিয়াছেন। তবে ইহার মীমাংসা সাধ্য হইয়াছে।

যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে আমরা অণু বলিয়াছি; আর মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু বলিয়াছি। এখন মনে করিতে হইবে যে, মূল পদার্থের অণু আছে। মনে করিতে হইবে যে, মূল পদার্থের পরমাণুও আছে, অণুও আছে; কিন্তু যৌগিক পদার্থের পরমাণু নাই, অণু আছে। সে কীরূপ? হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মূল পদার্থ; উভয়ের মিলনে উৎপন্ন জল যৌগিক পদার্থ। মনে করিতে হইবে, হাইড্রোজেনের কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেনের অণু হয়; আর অক্সিজেনের কতিপয় পরমাণু পরস্পর যুক্ত হইয়া অক্সিজেনের অণু হয়, অপিচ হাইড্রোজনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুতে যুক্ত হইয়া জলের অণু হয়। জল যৌগিক পদার্থ, উহার প্রত্যেক অণুতে অক্সিজেন হাইড্রোজেন উভয় বর্তমান, অতএব জলের পরমাণু হইতে পারে না। পরমাণু কেবল মূল পদার্থেরই সম্ভব; আর অণু মূল ও যৌগিক উভয় পদার্থের সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইল যে, হাইড্রোজনের একটা অণুতে হাইড্রোজেনের কয়টা পরমাণু আছে? অক্সিজেনের একটা অণুতে অক্সিজেনের কয়টা পরমাণু আছে? এবং জলের একটা অণুতে হাইড্রোজেনের পরমাণু কয়টা ও অক্সিজেনের পরমাণুই বা কয়টা আছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ডালটনের কল্পনায় কুলায় না; নূতন কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। আবোগাড্রো নামক ইটালির পণ্ডিত ডালটনের কয়েক বৎসর পরে এই নূতন কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, জড়পদার্থ মাত্রই যখন অনিলাবস্থায় থাকে, তখন এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে সকল পদার্থেরই—মূল বা যৌগিক দ্বিবিধ পদার্থেরই অণুর সংখ্যা সমান থাকে। মনে রাখিও যে, অনিলাবস্থায় থাকা চাই, কঠিন বা তরল অবস্থা হইলে

হইবে না; অনিল অবস্থা হওয়া চাই।

কথাটা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। হাইড্রোজেন মূল পদার্থ; উহা স্বভাবত অনিল অবস্থায় থাকে। কিন্তু জল যৌগিক পদার্থ; উহা স্বভাবত তরল অবস্থায় থাকে। জল গরম করিলে উহা বাষ্প হয়; তখন উহা অনিলাবস্থ হয়। জল তরল, কিন্তু জলীয়বাষ্প অনিল। আবোগাড্রো কল্পনা করিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনে যতগুলি হাইড্রোজেনের অণু আছে, এক ঘন ইঞ্চি জলের বাষ্পে জলের অণুও ততগুলি আছে।

আর একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিতে হইবে। অনিল মাত্রই গরমে প্রসার লাভ করে, আবার চাপে সংকুচিত হয়। হাইড্রোজেনই বলো, আর জলীয়বাষ্পই বলো, এক ঘন ইঞ্চি অনিলকে গরম করিয়া দুই ঘন ইঞ্চি করা চলে, আবার চাপ দিয়া আধ ঘন ইঞ্চি জায়গায় ঠেসিয়া ধরা চলে। আবোগাড্রো বলিলেন যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনে যত অণু আছে, এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পেও তত অণু আছে, কিন্তু কখন? যখন উভয়ে সমান গরম ও উভয়ের সমান চাপ।

তাহা যেন হইল। তাহা হইলে আবোগাড্রোর মতে এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনে অণুর সংখ্যা এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্পের অণুর সংখ্যার সমান।

কীরূপে তিনি জানিলেন যে, উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান? অণু কতগুলি আছে, তাহা কি তিনি গণিয়া দেখিয়াছিলেন? অণু অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় দ্রব্য; তাহা গণা অসম্ভব। তিনি গণিবেন কীরূপে? তিনিও গণেন নাই; তাঁহার পরেও কেহ গণিতে পারে নাই। তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা সমান, তাহা তিনি কীরূপে জানিলেন? উত্তরে বলিব যে, তিনি কল্পনাবলে জানিলেন। উভয় স্থলে অণুর সংখ্যা সমান, ইহা তাঁহার কল্পনা—খাঁটি কল্পনা। এই কল্পনায় তাঁহার অধিকার ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিকেরা এই কল্পনায় অধিকারী। এইরূপ কল্পনা মাঝে-মাঝে না করিলে বিজ্ঞানের আঁধার পথে আলো পাওয়া যায় না।

আচ্ছা, মানিয়া লইলাম যে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনে যত অণু, এক ঘন ইঞ্চি জলীয়বাষ্পে ঠিক ততগুলি অণু। শত কোটি, কি সহস্র কোটি, কি কোটি-কোটি, তাহা জানিবার উপায় নাই; তবে উভয়ত্র অণুর সংখ্যা ঠিক সমান।

মাপিয়া দেখা গিয়াছে, এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেন আধ ঘন ইঞ্চি অক্সিজেনে যুক্ত হইয়া ঠিক এক ঘন ইঞ্চি জলীয় বাষ্প হয়। মাপের কথা, ওজনের কথা নহে। এখন উল্লিখিত কল্পনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কতিপয় জলের অণু প্রস্তুত করিতে ঠিক ততগুলি হাইড্রোজেনের অণু আবশ্যক হইবে, আর অক্সিজেনের অণু তাহার ঠিক অর্ধেকগুলি আবশ্যক হইবে।

অর্থাৎ দুইটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে হইলে দুইটা হাইড্রোজেনের অণুর আর একটি মাত্র অক্সিজেন অণুর প্রয়োজন হইবে।

দুইটা হাইড্রোজেনের অণুতে দুইটা জলের অণু হয়; একটা জলের অণু প্রস্তুত করিতে একটা হাইড্রোজেন অণু আবশ্যক হইবে।

অতএব প্রত্যেক হাইড্রোজেনে যতটি হাইড্রোজেন পরমাণু ছিল, সবগুলিই জলের অণুতে প্রবেশ করিবে।

দাঁড়াইল এই,—উক্ত অনুমান সত্য হইলে এক জলের অণুতে যতগুলি হাইড্রোজেন

পরমাণু আছে, এক হাইড্রোজেন অণুতেও ততগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে। জলের অণুতে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, তাহা জানিবার কোনো উপায় আছে কি? দেখা যাক, আছে কি না।

জলের হাইড্রোজেন আমরা তাড়াইয়া বাহির করিতে পারি। সোডিয়াম পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতু জলে ফেলিলে জলের হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যায়; ধাতু গিয়া হাইড্রোজেনের স্থান গ্রহণ করে ও জলস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু এই হাইড্রোজেন দুই বারে বাহির করা চলে। এক ছটাক জলে যতটা হাইড্রোজেন আছে, তাহার অর্ধেকটা প্রথম বারে তাড়াইলাম; বাকি অর্ধেক থাকিয়া গেল, সেই অর্ধেক আর একবারে তাড়ানো চলে; ইচ্ছা করিলে তাহা রাখাও চলে।

জলের অণুতে যদি একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিত, তাহা হইলে উহার অর্ধেক তাড়ানো অসম্ভব হইত। একটা গরুর যেমন অর্ধেক গোয়ালে রাখিয়া অর্ধেক বাহিরে আনা চলে না, একটা সিকির যেমন অর্ধেক রাখিয়া অর্ধেক খয়রাত করা চলে না, তেমনই একটা পরমাণুর অর্ধেক রাখা ও অর্ধেক বাহির করা চলে না। কেন না, পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরিয়া লইয়াছি। অতএব জলের অণুতে একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু রহিয়াছে। যখন দুই বারে তাড়াইতে পারি, তখন দুইটা আছে। তিন বারে তাড়ানো যায় না; নতুবা তিনটা আছে মনে করিতে হইত।

জলের অণুতে তবে হাইড্রোজেনের পরমাণু দুইটা আছে; একটা নাই, একটামাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু থাকিলে উহাকে হয় রাখিতে হইত, নয় তাড়াইতে হইত; অর্ধেক রাখা, অর্ধেক তাড়ানো কখনই চলিত না।

পূর্বে বলিয়াছি, জলের অণুতে যতটি হাইড্রোজেন পরমাণু, হাইড্রোজেন অণুতেও ততটি হাইড্রোজেন পরমাণু। দেখা গেল, জলের অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে, অতএব স্থির হইল, হাইড্রোজেনের অণুতে অন্তত দুইটি পরমাণু আছে।

এই রকমের বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জলের একটি অণুতে অক্সিজেনের একটি পরমাণু বিদ্যমান আছে। অতএব জলের প্রত্যেক অণু ভাঙিলে হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু ও অক্সিজেনের এক পরমাণু পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, এক ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন যুক্ত হইয়া ৯ ভাগ জল হয়। তাহা হইলে একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজনের আটগুণ হয়। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১ ধরাই প্রথা, দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ২; অতএব একটি অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ২-এর আটগুণ ১৬।

গোড়ায় প্রশ্ন উঠিয়াছিল, অক্সিজেনের পরমাণু ওজনে ৮ ধরিব, না ১৬ ধরিব? ডালটন এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দিতে পারেন নাই। তার পরে বহু পণ্ডিতে তর্কবিতর্কের পর স্থির করিয়াছিল যে, অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন ৮ নহে, ১৬ই বটে। জলের প্রত্যেক অণুতে হাইড্রোজেনের দুইটি আর অক্সিজেনের একটি পরমাণু বর্তমান আছে। আবোগাড্রোর কল্পনার সাহায্যে ওইরূপ স্থির হইয়াছে। স্থির হইয়াছে বলা অনুচিত; ওইরূপ কল্পিত হইয়াছে, বলা উচিত।

পাঠকেরা উক্ত বিচারে প্রীতি লাভ করিয়াছেন কি না, জানি না। সকল কথা বলিতে

পারি নাই; যে কয়টা কথা বলিয়াছি, তাহাই সম্ভবত অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর হইয়াছে। এরূপ বিচারের নমুনা আর দিব না।

এখানে এই জটিল বিতর্কের অবতারণার একটু উদ্দেশ্য আছে। বিজ্ঞানবিদ্যা কীরূপ বিচারে জ্ঞানের পরিধি বাড়াইবার চেষ্টা করেন তাহা দেখানই এ স্থলে উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকা চলে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা খাপছাড়া ঠেকে; পরস্পর সঙ্গতি দেখা যায় না; পরস্পর সম্পর্ক দেখা যায় না। অনুমান ও কল্পনাবলে সঙ্গতি ও সম্পর্ক স্থির করিতে হয়। প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান তাতে আরও স্পষ্ট হয়; যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা উজ্জ্বল হয়; যাহা আঁধারে ছিল, তাহা আলোতে আসে; যেখানে সম্বন্ধ দেখিতাম না, সেখানে সম্বন্ধ দেখিতে পাই; যেখানে অব্যবস্থা ছিল, সেখানে ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সর্ববিধ অনুমানের ও কল্পনার একমাত্র ভিত্তি এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের একমাত্র দ্বার ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় যাহা বুদ্ধির নিকট আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি ইন্দ্রিয়কে যথাস্থানে নিযুক্ত করিতে পারে; স্বকর্মস্থানে অবহিত ও সচেষ্ট করিতে পারে, উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবনা করিয়া ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং জ্ঞান আহরণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় যাহা আনিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহাই গ্রহণ করে। বুদ্ধি তাহাকে সাজাইয়া গোছাইয়া তাহার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া বিভাগ করিয়া, কোথায় ব্যবস্থা, কোথায় অব্যবস্থা, কোথায় নিয়ম, কোথায় অনিয়ম, তাহা নির্ধারণ করে। কিন্তু গোড়ায় বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অধীন।

তারপর বুদ্ধি নিজশক্তি পরিচালনা করিয়া জ্ঞানের সীমা বাড়াইতে চেষ্টা করে; নূতন জ্ঞান—ইন্দ্রিয় যাহার তত্ত্ব আনে না, সেইরূপ জ্ঞানের সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের দুইটা উপায়।

প্রথম—বুদ্ধি জোর করিয়া বলে, প্রত্যক্ষ দর্শনে যখন এই নিয়ম পাইলাম, তখন ওইখানে ওই ঘটনা ঘটিবেই ঘটিবে; ইন্দ্রিয় হয়তো তাহার খবর রাখে না, কিন্তু পাঠাও ইন্দ্রিয়কে সেই সংবাদ আনিতে,—ইন্দ্রিয় সংবাদ আনিতে সমর্থ হউক, আর না হউক, ওইখানে ওই ঘটনা ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিব না। নেপচুন বা মিত্রগ্রহের আবিষ্কার ইহার দৃষ্টান্ত। পূর্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

প্রতিভার আলোক জ্বালিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণঘটিত প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব দেখিলেন। তারপর তাঁহার শিষ্যগণের বুদ্ধি নূতন জ্ঞান আহরণে ধাবিত হইল।

লেবেরিয়ার বুদ্ধি গণনা করিয়া বলিল, নিউটন-দৃষ্ট মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যদি সত্য হয়, তবে বরুণ গ্রহের গতিবিধিতে যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে, উহার হেতু পাইয়াছি। ওইখানে আর একটা গ্রহ আছে; নিশ্চিত তাহার সান্নিধ্যই, তৎপ্রযুক্ত আকর্ষণই এই ব্যতিক্রমের হেতু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইন্দ্রিয় সে গ্রহের খোঁজ পাইতেছে না। উহা চক্ষুর অদৃশ্য। পাঠাও ইন্দ্রিয়কে খোঁজ লইতে। চক্ষু প্রেরিত হইল। মিত্র গ্রহ ধরা পড়িল। নূতন জ্ঞান অর্জিত হইল। মিত্র গ্রহ আবিষ্কৃত হইল। বুদ্ধির এখানে বাহাদুরি; বুদ্ধি এখানে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা করে নাই। নিজের বলে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়াছে।

দ্বিতীয়—জ্ঞানবর্ধনের দ্বিতীয় উপায় অনুমান ও কল্পনা। প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে জানা গেল, এক মূল পদার্থ অন্য মূল পদার্থে মিলিত হইবার সময় নির্দিষ্ট ভাগে মিলিত হয়।

ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যক্ষলব্ধ। ইহার ভিতরে অবশ্য গূঢ় রহস্য আছে। সেই রহস্য প্রত্যক্ষের অতীত; সেই অন্ধকার ভেদ করিবার কোনও উপায় নাই। ডালটন প্রতিভার আলোক জ্বালিলেন। আঁধারে কি আছে, তাহা প্রত্যক্ষগম্য হইল না বটে, তবে চিত্রপটে তাহার একটা ছবি অঙ্কিত হইল। ডালটন কল্পনানেত্রে দেখিলেন, জড়পদার্থ অবিভাজ্য পরমাণুর সমষ্টি; যত মূলপদার্থ, তত শ্রেণির পরমাণু; একের ওজন অন্যের সমান নহে; এক শ্রেণির গোটাকতক পরমাণু অন্য শ্রেণির কতিপয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের অণু নির্মাণ করে। এই অনুমানে এই প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গত তাৎপর্য পাওয়া গেল। কিন্তু সে ছবি ডালটনের চিত্রে কল্পিত হইল, তাহা তত স্পষ্ট নহে। কোন অণুতে কোন পরমাণু কত আছে, তাহা তিনি স্পষ্ট দেখিলেন না। পরবর্তী পণ্ডিতের কল্পনার উপব কল্পনা চড়াইলেন। ক্রমে ছবিটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জলের অণুর ভিতর কোন পবমাণু কয়টা আছে, তাহা কল্পিত হইল। কিন্তু ব্যাপারটা কল্পিতই থাকিয়া গেল। প্রত্যক্ষ বিষয় হইল না, হইবার আশাও থাকিল না। জ্ঞান অর্জিত হইল বটে, কিন্তু সেই জ্ঞান অস্পষ্ট। তাহার উপর পুরা ভর দেওয়া চলে না।

বিজ্ঞানবিদ্যা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সকলগুলির মূল্য সমান নহে, সকলের ভিত্তি সমান দৃঢ় নহে। বিজ্ঞান আলোচনার সময়ে কোনটার ভিত্তি কতটুকু দৃঢ়, তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। নতুবা বৈজ্ঞানিকের হাতের ছাপ দেখিয়াই উহাকে অভ্রান্ত খাঁটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে প্রতারিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

ক্ষার, অম্ল, লবণ

পণ্ডিতেরা যৌগিক পদার্থগুলিকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করিয়াছেন। ধর্মসামান্য দেখিয়া এইরূপ শ্রেণিবিভাগ হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত আছে। একটা দৃষ্টান্ত লইব।

মনে করো চুন। চুন জিনিসটা আমরা পানে খাই, গৃহনির্মাণে লাগাই। চুনের কি গুণ? তাম্বুলভোজী বিলক্ষণ জানেন, গালের পাতলা চামড়ার সহিত চুনের কী সম্বন্ধ; আঙুলের মোটা চামড়াকেও চুনে আক্রমণ করে। চুন হরিদ্রার হলুদে রঙকে রাঙা করিয়া দেয়। চুনের গুণ তীব্র; এইরূপ তীব্র গুণ যে জিনিসে আছে, তাহার সাধারণ নাম ক্ষার।

ক্ষারের সহিত অম্লের কতকটা অহি-নকুল সম্পর্ক। অম্লরোগী চুনের জল পান করে। চুনের জলে অম্লজল মিশাইলে ক্ষারের তীব্রতা নষ্ট হয়। অম্লের আস্বাদন সর্বজনবিদিত। কাগজে জবাফুল ঘসিলে যে নীল রং নয়, অম্লরসে উহা রাঙা হয়।

আর মনে করো লবণ। সামুদ্রিক লবণের আস্বাদনও সর্বজনবিদিত। উহার আস্বাদনও চুনের মতো নহে, অম্লের মতোও নহে।

ক্ষার, অম্ল আর লবণ, এই তিনটি শব্দ রসায়নশাস্ত্রে কিছু ব্যাপকতর অর্থে প্রযুক্ত হয়।

চুন ক্ষার। চুন আমরা প্রস্তুত করি কীরূপে? ঘুটিং, ঝিনুক, শামুক, খড়ি, মার্বেল, পাথর, ভাটির ভিতর প্রখর তাপে গরম করিলে চুন প্রস্তুত হয়। উত্তাপে একটা অনিল বাহির হইয়া যায়। পড়িয়া থাকে চুন।

উত্তাপে যে অনিল বাহির হইয়া যায়, সেই অনিলটা আমাদের পরিচিত অনিল। কয়লা পোড়াইলে যে অনিল হয়, ইহা সেই অনিল। সোডাওয়াটারে যে অনিল থাকে, সেই অনিল।

এই অনিল জলে দ্রব হয়; জলটা অম্লধর্মাক্রান্ত হয়। নির্মল চুনের জলে দিলে নির্মল জল ঘোলাটে হয়। সেই ঘোলা জল দাঁড়াইয়া রাখিলে সাদা রঙের গুঁড়া থিতাইয়া পড়ে।

এই সাদা রঙের গুঁড়া আর কিছুই নহে। উহা চক বা চাখড়ির গুঁড়া।

খড়ি উত্তপ্ত করিলে চুন পড়িয়া থাকে, আর কয়লাপোড়া অনিল বাহির হইয়া যায়। কয়লাপোড়া অনিল চুনের জলে প্রবেশ করিলে উহা চুনে যুক্ত হইয়া আবার খড়ি হয়।

চুন হইল ক্ষার; আর কয়লাপোড়া অনিল যে জলে দ্রব হইয়া আছে, সেই জল হইল অম্ল; আর ওই যে খড়ি, যাহা ক্ষারধর্মী চুন আর অম্লধর্মী জলের মিলনে উৎপন্ন হইল, উহা রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে লবণ।

কয়লা, গন্ধক, ফসফরাস প্রভৃতি অপধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজেনে মিলিত হইয়া যে পদার্থ উৎপাদন করে, তাহা অম্লধর্মী। আর সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা প্রভৃতি ধাতু পোড়াইলে উহারা অক্সিজেনে মিলিত হইয়া যে সকল ভস্মবৎ পদার্থের উৎপাদন করে, তাহারা ক্ষারধর্মী। ব্যাপক অর্থে অক্সিজেনে দগ্ধ ধাতুভস্ম মাত্রকেই ক্ষার বলা যাইতে

পারে। ক্ষারধর্মী পদার্থে অম্লধর্মী পদার্থ যোগ করিলে উহার সম্মিলনে যে পদার্থ জন্মে, তাহা লবণধর্মী।

অম্লধর্মী পদার্থের মধ্যে কতকগুলি তীব্রগুণবিশিষ্ট। গন্ধক, দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি দ্রাবকের নাম বৈদ্যক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে ওই সকল জিনিস খুব সস্তা। উহারা তীব্র অম্লধর্মী। গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক হয়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত সোরা চোঁয়াইয়া মহাদ্রাবক হয়। উহাদের মধ্যে অক্সিজেন প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। উহারা ক্ষার মাত্রকে লবণে পরিণত করে। কেবল তাহাই নহে, ধাতু দ্রব্যকেও আক্রমণ করিয়া লবণে পরিণত করে। ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া রূপান্তরিত করে বলিয়াই এই সকল অম্লদ্রব্যের নাম দ্রাবক হইয়াছে।

রাসায়নিক পরিভাষানুসারে লবণ শব্দটির তাৎপর্য বুঝা উচিত। কাঠ, পাতা পোড়াইলে যে ছাই পড়িয়া থাকে, তাহাতে প্রচুর লবণ আছে। বাজারের সোডা বা সাজিমাটি লবণ; সোডা, ফটকিরি, সোহাগা, হিরাকস, তুঁতে, এই সকলই লবণ; এমনকী, রাসায়নিকের নিকট খড়ি, মাটি, কাচ পর্যন্তও লবণ অথবা বিবিধ লবণবৎ পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন। মোটামুটি বলা চলিতে পারে, ধাতু দ্রব্যকে অক্সিজেন দগ্ধ করিলে উহা অম্লে পরিণত হয়, আর অপধাতু অক্সিজেন যুক্ত করিল উহা ক্ষারে পরিণত হয়, আর ক্ষার ও অম্ল একত্রযোগে লবণ প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে, এস্থলে ক্ষার, অম্ল, লবণ, এই তিনটি শব্দ ব্যাপক পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কয়লা গন্ধক প্রভৃতি দগ্ধ করিল উহারা অক্সিজেনে যুক্ত হইয়া অম্লদ্রব্যে পরিণত হয়, ল্যাবোয়াশিয়া ইহা দেখিয়াই অক্সিজেনের নামকরণ করিয়াছিলেন; ইংরেজি অক্সিজেন অর্থই অম্লজনক।

কিন্তু ওই নামটি ঠিক হয় নাই। কেন না, ধাতুদ্রব্য দগ্ধ হইলে ক্ষার হয়, ওই ক্ষারেও অক্সিজেন বর্তমান থাকে; ক্ষারে অম্লে মিলিত হইয়া লবণ হয়, উহাতেও প্রচুর অক্সিজেন থাকে। কাজেই অক্সিজেনযুক্ত দ্রব্য মাত্রই অম্ল নহে।

আবার এমন তীব্র অম্ল পদার্থ আছে, তাহাতে অক্সিজেনের কণিকা মাত্র নাই। মিউরিয়েটিক অ্যাসিড নামক যে দ্রাবক সুপরিচিত, উহা সামুদ্রিক লবণ হইতে প্রস্তুত হয়। উহাতে অক্সিজেনের কণিকা মাত্র নাই। প্রাসিক অ্যাসিড নামক পদার্থ অম্লমধ্যে গণ্য; উহার মতো মারাত্মক বিষ আর নাই; উহাতেও অক্সিজেন নাই। কাজেই অক্সিজেনের বিদ্যমানতা অম্লত্বের কারণ নহে।

ওই মিউরিয়েটিক অ্যাসিড বা লবণ দ্রাবকও ধাতুদ্রব্যকে আক্রমণ করে। দস্তায় লবণ দ্রাবক দিলে লবণ দ্রাবক হইতে হাইড্রোজেন বাহির হয়, আর দস্তা তাহার স্থানে গিয়া বসে; যে জিনিসটা হয়, তাহা লবণ।

সামুদ্রিক লবণ বা সৈন্ধব লবণ, যাহা আমরা রন্ধনকর্মে ব্যবহার করি, তাহাতেও অক্সিজেন নাই।

অক্সিজেনের অস্তিত্ব অম্লত্বের কারণ নহে, বরং হাইড্রোজেনের অস্তিত্বই অম্লত্বের কারণ বলা যায়। এ পর্যন্ত যত অম্লদ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেতেই হাইড্রোজেন বিদ্যমান আছে। ওই হাইড্রোজেনকে দস্তার মতো ধাতু পদার্থে তাড়াইয়া দিতে পারে; তাড়াইয়া দিয়া

তাহার স্থানে বসিতে পারে। যে সকল যৌগিক পদার্থে হাইড্রোজেন বর্তমান, এবং ওই হাইড্রোজেন ধাতুদ্রব্য কর্তৃক অপসার্য, তাহার নাম অম্ল। ধাতু যখন হাইড্রোজেনকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থানে বসে, তখন অম্লের আর অম্লত্ব থাকে না; উহা তখন লবণে পরিণত হয়।

দুইটি দৃষ্টান্ত দিলে স্পষ্ট হইবে। গন্ধককে পোড়াইলে সাদা রঙের যে ধোঁয়া হয়, তাহা সকলেই জানে। গন্ধক পোড়ার এই ধূমের একটা তীব্র গন্ধ আছে, উহা শ্বাসরোধের উপক্রম করে। এই তীব্রগন্ধী পদার্থে গন্ধকও আছে; অক্সিজেনও আছে; ৩২ ভাগ গন্ধকে ৩২ ভাগ অক্সিজেন আছে। কোনওরূপে উহার সহিত আরও ১৬ ভাগ অক্সিজেন যোগ দিলে যে পদার্থ জন্মে, উহাতে ৩২ ভাগ গন্ধকের সহিত ৪৮ ভাগ অক্সিজেন থাকে। এই পদার্থে জল দিলে উহা ১৬ ভাগ জলের সহিত মিলিত হইয়া ৩২+৪৮+১৮ অর্থাৎ ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবক হয়। ১৮ ভাগ জলে ছিল দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর ১৬ ভাগ অক্সিজেন। ৯৮ ভাগ গন্ধক দ্রাবকে থাকিল ২ ভাগ হাইড্রোজেন, ১৬+৪৮ অর্থাৎ ৬৪ ভাগ অক্সিজেন, আর ৩২ ভাগ গন্ধক।

২ হাইড্রোজেন + ৩২ গন্ধক + ৬৪ অক্সিজেন = ৯৮ গন্ধক দ্রাবক। এই গন্ধক দ্রাবকে তামা তপ্ত করিলে উহার ২ ভাগ হাইড্রোজেন বাহির হইয়া যায়, তাহার স্থানে ৬৩ ভাগ তামা আসিয়া বসে। যে লবণটা প্রস্তুত হয়, তাহা তুতিয়া। উহার ভাগ এইরূপ : ৬৩ তামা + ৩২ গন্ধক + ৬৪ অক্সিজন = ১৫৯ তুতিয়া। এই তুতিয়া অন্যতম লবণ। লবণ শব্দের পারিভাষিক অর্থ এখন বুঝা যাইবে। অম্লদ্রব্যে হাইড্রোজেন থাকে, ওই হাইড্রোজেন ধাতু কর্তৃক অপসারিত হয়। ধাতু যখন হাইড্রোজেনের স্থানে গিয়া বসে, তখন ওই অম্লদ্রব্য রূপান্তরিত হইয়া লবণে পরিণত হয়। অম্লে ছিল হাইড্রোজেন; সেই হাইড্রোজেন গেল; আসিল ধাতু; হইল লবণ। এই হিসাবে আমাদের সামুদ্রিক লবণও লবণ; সোরাও লবণ, হিরাকস লবণ, তুঁতে লবণ খড়ি লবণ, মাটি লবণ; এমনকী, কাঠ পোড়াইয়া যে ছাই থাকে, উহাও নানা লবণের সমষ্টি।

দহনক্রিয়ার ব্যাপারটা এখন ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। দহনের ফল অগ্নি; অগ্নির স্বরূপটাও তাহা হইলে বুঝা যাইবে।

অগ্নির সহিত উত্তাপের ও আলোকের চিরন্তন সম্বন্ধ। আগুনে হাত পোড়ে, আগুনের দীপ্তি আঁধার দূর করে। উত্তাপ আর আলোকের স্বরূপ কী, তাহা পরে আলোচ্য। এখন আগুনের স্বরূপ কী, তাহা বুঝিতে হইবে।

কেবল উত্তাপে আগুন হয় না। গরম জলে, গরম ভাতে, উত্তাপ আছে, কিন্তু আগুন নাই। কেবল আলোকেরও আগুন হয় না। জোনাকি পোকায় আলো দেয়, কিন্তু উহাতে আগুন হয় না। আগুনে উত্তাপ আর আলোক, দুই থাকা চাই।

উত্তাপ আর আলোক দুই থাকিলেও আগুন হয় না। স্বর্ণকারের মুচির ভিতর তরল সোনা টলটল করে; উহা তপ্ত হয়, উহা দীপ্তি দেয়, কিন্তু উহাকে আগুন বলি না।

কিন্তু ওই মুচির বাহিরে যে তপ্ত জ্বলন্ত দীপ্তিমান অঙ্গার আছে, যাহার উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হইয়াছে, সেই অঙ্গারে আগুন আছে। কাজেই উত্তাপ থাকিলেই আগুন হয় না; দীপ্তি থাকিলেই আগুন হয় না। আগুনে আরও কিছু চাই।

তপ্ত দীপ্ত স্বর্ণখণ্ড তপ্ত দীপ্ত অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিতে পারে, উহার ভার কমে না। স্বর্ণকার তাহা জানে, গৃহস্থেও জানেন। ভার যদি কমে, গৃহস্থ যেন বুঝেন যে, স্বর্ণকার সোনা চুরি করিয়াছে। উত্তাপে সোনার ক্ষয় হয় না। কিন্তু অঙ্গার যতক্ষণ ধরিয়া দীপ্ত তপ্ত থাকে, ততই উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহা ক্ষীণ হইয়া বায়ুতে মিলিয়া যায়; উৎপন্ন হয় একটা অনিল। ওই অনিলের কথা পূর্বে কত বার বলিয়াছি।

অঙ্গার যতক্ষণ তপ্ত থাকে ও দীপ্ত থাকে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়। অঙ্গার ক্ষার হইয়া যাহা অবশেষ থাকে, তাহাকে অঙ্গার বলে না। তাহাকে বলে ছাই; উহা অঙ্গারের ধ্বংসাবশেষ।

এই ক্রিয়ার নাম দহন। তপ্ত সোনা দগ্ধ হয় না; উহার ভার কমে না। তপ্ত অঙ্গার দগ্ধ হয়, উহার ভার ক্রমে কমিয়া যায়; শেষে অঙ্গারের অবশেষ কিছুই থাকে না; যাহা থাকে, তাহা ছাই।

বিঘ্ন নাই কোথায়? এ জগৎ তেমন জগৎই নহে। মহাসাগরেরও আন্দোলনে বিঘ্ন আছে।

ভূপিণ্ড একদিনে এক পাক ঘুরিয়া থাকে; চন্দ্র কিন্তু ২৭ দিনে এক পাক ঘুরিয়া আসেন। চন্দ্র যদি আরও দ্রুত চলিয়া একদিনে পৃথিবীর চারিদিকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতেন, তাহার ফল কী হইত? বঙ্গসাগর চাঁদের সম্মুখে থাকিলে উহা চিরকাল চাঁদের সম্মুখেই থাকিত। কিন্তু তাহা তো হয় না। পৃথিবী তাড়াতাড়ি এক পাক ঘুরিয়া আসেন, আর চাঁদ একদিনে এক চক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ মাত্র চলিবেন। কাজেই চাঁদকে পিছনে থাকিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ চাঁদের সম্মুখ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আবার পরদিনে চাঁদের সম্মুখে আসে—দণ্ড দুই পরে আসে; কেন না, সেই সময়ে চাঁদ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। যাক, চাঁদ পিছনে পড়েন, কিন্তু নিজে সম্মুখে সমুদ্রের জলকে ফাঁপাইয়া রাখেন। পৃথিবী বেগে আবর্তন করিতেছে, কিন্তু চাঁদ তাহার পিঠের আবরণ জলরাশিকে নিজেব দিকে টানিয়া ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ওই জল তো পৃথিবীরই আবরণ, পৃথিবীরই পরিচ্ছদ, তারল্যবশেই উহার ওইরূপ সঞ্চরণ সম্ভব। তারল্য না থাকিলে উহাকে পৃথিবীর সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে হইত, চাঁদের দিকে হেলিয়া থাকা চলিত না। ইহার ফল হয় এই যে, জলরূপী পরিচ্ছদকে টানিয়া থাকায় পৃথিবীর আবর্তনে বাধা পড়ে। আমি দৌড়িয়া যাইব, কেন আমার জামা ধরিয়া টানিয়া ধরিলে যেরূপ ব্যাপার হয়, কতকটা সেইরূপ ঘটে। পৃথিবী বলে, আমি বেগে ঘুরিব ও আমার পিঠের জলকে লইয়াই ঘুরিব। চাঁদ বলেন, জলের রাশি আমার সম্মুখে স্তূপাকার হইয়া থাকিবে। কাজেই পৃথিবীর আবর্তনে বিঘ্ন জল, জলের জোয়ারের বিঘ্ন পৃথিবীর আবর্তন। একখানা চাকা বেগে ঘুরিতেছে, সেই চাকার পরিধিতে একখানা কাঠ চাপিয়া ধরিলে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। কাঠে চাকার পরিধিতে ঘর্ষণ ঘটে, চাকার শক্তিক্ষয় ঘটে, উহার যানশক্তি ক্রমে তাপে পরিণত হয়; চাকার পরিধি ও কাঠখানা গরম হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়। পৃথিবীরূপ চাকা বেগে ঘূর্ণ্যমান, চন্দ্রাভিমুখ জলের স্তূপ তাহার উপর ঘর্ষণশীল। ফলে পৃথিবীর আবর্তনের শক্তিক্ষয় ও সেই শক্তির তাপে পরিণতি। শক্তির সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই, এই তথ্যে যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে এটুকু মানিতে হইবে। অতি অল্প মাত্রায় হইলেও পৃথিবীর আবর্তনে যে যানশক্তি সঞ্চিত, তাহা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া তাপে পরিণত হইতেছে। অবশ্য

যন্ত্র দিয়া এই তাপের পরিমাণ ধরিবার আশা নাই। তবে যানশক্তির ক্রমশ ক্ষয় এইরূপ অবশ্যম্ভাবী।

পৃথিবীর আবর্তনবেগ একটু-একটু কমিতেছে; দুই দশ, কি দুই শত দশ শত বৎসরে বেগের হ্রাস ধরা না পড়িতে পারে, কিন্তু দু-লাখ, দশ লাখ বৎসরে উহার পরিমাণ আর নগণ্য থাকিবে না। ফলে লাখখানেক বৎসর আগে পৃথিবী আরও বেগে আবর্তন করিত, তখন দিন ছিল চব্বিশ ঘণ্টার ছোট। লাখখানেক বৎসর পরে পৃথিবী আরও কম বেগে আবর্তন করিবে। তখন দিন হইবে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক। এই ক্রমিক তাপক্ষয়ের শেষ পরিণতিতে বহু লক্ষ বৎসরে এমন দিন আসিতে পারে, তখন পৃথিবীর আবর্তনবেগ এখনকার সাতাইশ ভাগের এক ভাগ হইবে। অর্থাৎ এখনকার প্রায় এক মাসে এক দিনরাত্রি ঘটিবে! সংবৎসরে তেরোটা মাত্র অহোরাত্র ঘটিবে!

সাতাইশ দিনে যখন পৃথিবী ঘুরিবে, বলা বাহুল্য, চন্দ্র তখন পৃথিবীর এক পিঠেরই সম্মুখে থাকিবেন। পৃথিবী ঘুরিবেন এক চক্র সাতাইশ দিনে, চন্দ্রও ঘুরিবেন এক চক্র সাতাইশ দিনে। ফলে চন্দ্র ও পৃথিবী মুখোমুখি করিয়া ঘুরিবেন। বঙ্গসাগর যদি চাঁদের সম্মুখে থাকে, তাহা হইলে উহা বরাবরই চাঁদের সম্মুখে থাকিবে। জলস্তূপ আর বঙ্গসাগর হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইবে না। জোয়ার ভাটার পুনরাবৃত্তি বন্ধ হইবে। পৃথিবীর আর শক্তিক্ষয়ও ঘটিবে না। অতএব অপেক্ষা করো, যদি জোয়ার ভাটার পরিদোলকের গতি লোপ দেখিতে চাও, তবে অপেক্ষা করো সেই সময়ের জন্য, যখন পৃথিবী সাতাইশ দিনে আপন দেহ আবর্তন করিবেন।

না, অতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহার ফলভোগী কেবল পৃথিবী নহেন, চন্দ্রও ইহার ফলভোগী। চন্দ্রেরও শক্তিক্ষয় ঘটিবে, তাঁহার যানশক্তি কমিবে, তাঁহার পৃথিবী হইতে দূরত্ব আরও বাড়িবে।

তরঙ্গ

ক হইতে ম পর্যন্ত অক্ষরগুলি পরপর সাজানো আছে।

অ...আ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

ই... ....উ

প্রত্যেকটি অক্ষরের কম্পগতি কল্পনা করো। কাঁপিবার সময় স্ব-স্থান ছাড়িয়া ৫ সেকেন্ডে উপরে উঠিয়া অ-আ রেখা স্পর্শ করে, আবার ৫ সেকেন্ডে নামিয়া স্ব-স্থানে আইসে আর ৫ সেকেন্ডে নিম্নে ই-উ রেখা স্পর্শ করে ও আবার ৫ সেকেন্ডে উঠিয়া স্বস্থানে পৌঁছে। এইরূপে ২০ সেকেন্ডে উহার একবার কম্পন সম্পাত হয়। তারপর দ্বিতীয় কম্প। ক-এর কম্পনারম্ভের এক সেকেন্ড পরে খ, ২ সেকেন্ড পরে গ, ৩ সেকেন্ড পরে ঘ, এইরূপ যথাক্রমে অক্ষরগুলির কম্পন আরম্ভ হইল। প্রত্যেকেরই কম্পন একবিধ, ৫ সেকেন্ডে স্ব-স্থান হইতে অ-আ রেখা, ৫ সেকেন্ডে অ-আ রেখা হইতে স্ব-স্থান, ৫ সেকেন্ডে স্ব-স্থান হইতে ই-উ রেখা ও ৫ সেকেন্ডে ই-উ রেখা হইতে স্বস্থান। ক-র ৫ সেকেন্ড পরে চ, ১০ সেকেন্ড পরে ট, ১৫ সেকেন্ড পরে ত, ২০ সেকেন্ড পরে প কাঁপিতে আরম্ভ করিবে। প-এর যখন প্রথম কম্পের আরম্ভ, তার ৫ সেকেন্ড পূর্বে ত-র কম্প আরম্ভ হইয়াছে। অতএব ত তখন অ-আ রেখায় (ত-স্থান) কিন্তু থ দ ধ ন ইহারা তখনও অ-আ রেখাতে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ক্রমানুসারে অ-আ রেখার একটু

ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন

(১) ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ

ক খ ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ

(২) ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম

ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ

একটু নীচু আছে। ট-এর কম্প আরও ৫ সেকেন্ড আগে আরম্ভ হইয়াছে; উহা অ-আ রেখা ছাড়িয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছে; কিন্তু ট ড ঢ ণ এখনো স্বস্থানে ফিরিতে পারে

নাই। ক্রমানুসারে এক-একটু উপরেই আছে। চ-এর কম্প আরও ৫ সেকেন্ড পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে, সে আবার স্বস্থান ছাড়িয়া নীচে ই-উ রেখায়; কিন্তু ছ জ ঝ ঞ এখনো ই-উ পর্যন্ত নামিতে পারে নাই; ক্রমানুসারে ই-উ রেখার একটু উপরেই আছে। ক-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেন্ড পূর্বে; সে ই-উ রেখা ত্যাগ করিয়া স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ও দ্বিতীয় কম্পারম্ভের উদ্যোগ করিতেছে। খ, গ, ঘ, ঙ তখনো ফিরিতে পারে নাই; ক্রমানুসারে স্ব-স্থানের একটু নীচেই আছে।

২০ সেকেন্ড পূর্বে ক হইতে প পর্যন্ত সকলেই এক সরল রেখায় সারি বাঁধিয়া অবস্থিত ছিল। যদি সকলের কম্প একসঙ্গে আরম্ভ হইত, তাহা হইলেও উহারা সকলেই অন্য এক সরল রেখায় সারি-সারি বাঁধিয়া থাকিত, কিন্তু একসঙ্গে সকলের কম্প আরম্ভ না হওয়ার ফলে উহারা আর এক সরল রেখায় অবস্থিত নাই; একটা বক্র রেখায় অবস্থিত। এই বক্র রেখাটিকে আমরা একটি উর্মি বা ঢেউ বলিতে পারি। উর্মিটার প্রথমার্ধ ক-প সকল রেখার নীচে, দ্বিতীয়ার্ধ ওই সরল রেখার উপরে; চ-এর অবস্থান নিম্নতম, ওই অবস্থায় ত-এর অবস্থান উর্ধ্বতম। ত স্থানটিকে ঢেউটির মাথা ও চ স্থানকে ঢেউটির কোল বলা যাইতে পারে।

ক-র কম্পারম্ভের ২০ সেকেন্ড পরে পরে কম্পারম্ভ। তখন অপরগুলির অবস্থানে ওই ঢেউটি উৎপন্ন হইয়াছে। তখনও ফ, ব, ভ প্রভৃতির কম্পন আরম্ভ হয় নাই। আর এক সেকেন্ড পরে ফ-এর, দুই সেকেন্ড পরে ব-এর কম্প আরম্ভ হইবে। তখন অন্যান্য অক্ষরগুলি কোথায় দেখা যাউক। ব-এর কম্পের যখন আরম্ভ, ফ তখন একটু উপরে, প আরও উপরে, এইরূপে যথাক্রমে অবস্থিত। ব-এর ৫ সেকেন্ড পূর্বে দ-এর কম্প আরম্ভ, অতএব দ তখন অ-আ রেখায়। ত তখন অ-অ রেখা হইতে নামিয়া আসিয়াছে। ড-এর কম্পারম্ভ ব-এর দশ সেকেন্ড পূর্বে, অতএব ড তখন স্ব-স্থানে, ঢ ণ তখনও স্ব-স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। জ-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেন্ড পূর্বে, সে তখন নামিয়া ই-উ রেখায়। ঝ ঞ ট ঠ তখনও ই-উ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। গ-এর কম্পারম্ভ আরও ৫ সেকেন্ড পূর্বে, সে তখন ই-উ ছাড়িয়া স্ব-স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্বিতীয় কম্পের উদ্যোগ করিয়াছে। ঘ, ঙ, চ, ছ তখনও স্ব-স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। খ ও ফ দ্বিতীয় কম্প আরম্ভ করিয়া স্ব-স্থান ছাড়িয়া ক্রমানুসারে এক একটু উর্ধ্বে উঠিয়াছে। এখন ক হইতে ব পর্যন্ত অক্ষরগুলি যে বক্র রেখায় অবস্থিত, তাহা চিত্রে দেখা যাইতেছে।

বলা বাহুল্য, এবার ঢেউটির মাথা আর ত-এ নাই, এবার মাথা দ-এ। আর ঢেউটির কোল চ-এ নাই, কোল এখন জ-এ। ঢেউটির মাথা ও কোল উভয় স্থানই দুই সেকেন্ড মধ্যে একটু সরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত ঢেউটাই যেন একটু ডানদিকে সরিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ঢেউয়ের মাথা এইরূপে ক্রমেই অগ্রসর হইবে। উহার পিছনে ঢেউয়ের কোলটিও ক্রমে অগ্রসর হইবে।

অক্ষরগুলির একসঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইলে এইরূপ উর্মির সৃষ্টি হইত না। একসঙ্গে কম্পন আরম্ভ না হইয়া পরপর আরম্ভ হইলে উর্মির বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ওই উর্মি এক স্থানে স্থির থাকে না; উহা ক্রমেই অগ্রসর হয়। উর্মির মাথা থাকে, তার পিছনে কোল

থাকে, ঊর্মির মাথা ধীরে-ধীরে সরিয়া যায়, কোলও তার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হয়। এইরূপ গতির নাম তরঙ্গগতি।

জলের মধ্যে একটি কনিকা কাঁপিতে লাগিলে, সেই কম্পন পরপর কণিকায় সংক্রান্ত হইয়া এইরূপ ঊর্মির সৃষ্টি করে। ঊর্মির মাথা জলপৃষ্ঠ ছাড়িয়া উপরে উঠে; কোল নীচে থাকে। কণিকাগুলি স্বস্থানে উঠানামা করে, উহারা অগ্রসর হয় না; কেবল ছটফট করে মাত্র; ছোটে না। সেই ছটফটানির ফলে ঢেউ জন্মে, ঊর্মির উপর ঊর্মি জন্মে। প্রথম ঢেউটি জন্মিয়া অগ্রবর্তী হয়, তাহার পিছনে দ্বিতীয় ঢেউ চলে, তাহার পিছনে তৃতীয় ঢেউ চলে। এইরূপ ঊর্মির-পর-ঊর্মি সারি দিয়া, কাতার দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ গতির নাম তরঙ্গগতি; ইহা কোন জড় পদার্থের গতি নহে, ইহা ঊর্মির গতি। ঊর্মি কোন জড়পদার্থ নহে, উহা জড় পদার্থের একটা অবস্থান ভেদ মাত্র, একটা মূর্তি মাত্র; ওই ঊর্মির গতির নাম তরঙ্গ গতি।

জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে এইরূপ তরঙ্গগতি উৎপন্ন হয়; শস্যক্ষেত্রে হাওয়া দিলে শস্যের শীর্ষগুলি হাওয়াতে উঠানামা করে ও তাহাতে ঢেউ খেলিয়া যায়। তন্ত্রীতে আঙুলের ঘা দিলে পার্শ্বস্থ বায়ুতে এইরূপ ঢেউ খেলিতে আরম্ভ করে।

শব্দতরঙ্গ

একটা তারে ঘা দিলে তারটা পুনঃপুন কাঁপিতে থাকে। তারের প্রত্যেক কম্পে বায়ুতে একটি করিয়া ঊর্মি উৎপাদন করে। প্রত্যেক কম্পে তার একবার আগে আসে, একবার পিছু হটে। আগে আসিবার সময় সম্মুখের বায়ুকে ঠেলিয়া দেয়, বায়ুস্তর সেই চাপে একটু সঙ্কুচিত হয়; আবার তারের পিছু হটিবার সময় সেই চাপ আলগা হয়; বায়ুস্তর তখন প্রসারিত হয়, চাপটা স্তর হইতে স্তরে সংক্রান্ত হয়, আর ঢেউয়ের-পর-ঢেউ চলিতে থাকে। বায়ুস্তরে তরঙ্গগতি উৎপন্ন হয়। ঢেউগুলি বায়ুস্তর আশ্রয় করিয়া যে বেগে অগ্রসর হইতে থাকে, সে বেগ নিতান্ত সামান্য নহে। মাপিয়া দেখা গিয়াছে, উহা সেকেন্ডে প্রায় ১১০০ ফুট। বায়ুর উষ্ণতা অধিক হইলে বেগেরও পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়ে। তবে মোটামুটি ১১০০ ফুট ধরা যাইতে পারে।

একটা তাবে ঘা দিলে উহা কাঁপিতে থাকে; সেকেন্ডে কয়বার কাঁপিবে, তাহা সহসা বলা যায় না। পেন্ডুলমের কম্পসংখ্যা উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; তারের কম্পসংখ্যাও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। লম্বা তারের চেয়ে খাটো তার সেকেন্ডে কাঁপে বেশি। আবার পেন্ডুলমের কম্পসংখ্যার সহিত মাধ্যাকর্ষণের সম্পর্ক আছে। তারের কম্পসংখ্যার সহিত উহাতে যে টান দেওয়া যায়, সে টানের সম্পর্ক আছে। টান বেশি হইলে সেকেন্ডে কম্পসংখ্যাও বাড়ে। কাজেই দীর্ঘতাভেদে ও টানের মাত্রাভেদে সেকেন্ডে কোন তার দশ বারও কাঁপিতে পারে, কোন তার দশ হাজার বারও কাঁপিতে পারে। প্রত্যেক কম্পে কিন্তু পার্শ্বস্থ বায়ুরাশিতে একটি ঊর্মি জন্মে। সেকেন্ডে দশবার কাঁপিলে সেকেন্ডে দশটি ঊর্মি জন্মে, দশ হাজার বার কাঁপিলে দশ হাজার ঊর্মি জন্মে। ঊর্মিগুলি এক স্থানে বসিয়া থাকে না। বায়ুকে আশ্রয় করিয়া ঊর্মির-পর-ঊর্মি সেকেন্ডে ১১০০ ফুট বেগে সারি বাঁধিয়া চলিতে থাকে। বায়ুস্তরের সংকোচের পর প্রসারণ, তারপর আবার সংকোচ, আবার প্রসারণ, এইরূপে ঊর্মিমালার সৃষ্টি হয়। কোন ঊর্মি বড়, কোনটা ছোট, সকলেই কিন্তু সেই সেকেন্ডে ১১০০ ফুট বেগে অগ্রবর্তী হয়। এত মাইল রাস্তা যাইতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগে না।

মনে করো, তার সেকেন্ডে দশবার কাঁপিতেছে; সেকেন্ডে দশটা ঊর্মি উৎপন্ন হইল। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কম্প যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঊর্মির সৃষ্টি করে। প্রথম ঊর্মি চলিল; তার পিছনে দ্বিতীয় চলিল; তার পিছনে তৃতীয় চলিল; এইরূপে এক সেকেন্ড মধ্যে দশটি ঊর্মির সারি চলিল। একাদশ ঊর্মি তার হইতে উৎপন্ন হইবার পূর্বেই প্রথম ঊর্মি তার ছাড়িয়া ১১০০ ফুট দূরে চলিয়া গিয়াছে। তার পশ্চাতে তারের নিকট পর্যন্ত আরও নয়টি ঊর্মি সারি বাঁধিয়া রহিয়াছে। ১১০০ ফুটের ভিতর দশটি ঊর্মি; প্রত্যেক ঊর্মির দৈর্ঘ্য কাজেই ১১০ ফুট; খুব বৃহৎ ঢেউ সন্দেহ নাই।

আবার মনে হয়, তার সেকেন্ডে ১০০ বার কাঁপিতেছে, এবারও প্রত্যেক কম্পে এক-এক ঊর্মির সৃষ্টি হয়। এক সেকেন্ড মধ্যে ১০০ ঊর্মির সৃষ্টি হয়। প্রথম ঊর্মি এক সেকেন্ড

মধ্যে তার ছাড়িয়া ১১০০ ফুট চলিয়া গিয়াছে, তার পশ্চাতে ৯৯টি উর্মি সারি বাঁধিয়া যথাক্রমে থাকে। ১১০০ ফুট পথের মধ্যে ১০০টি উর্মি: কাজেই এবার প্রত্যেক উর্মির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট মাত্র।

প্রতি সেকেণ্ডে তার যত বার কাঁপে, ততগুলি উর্মি উৎপন্ন হয়। আর উর্মির সংখ্যা যত অধিক, উহার দৈর্ঘ্য তত অল্প। তার সেকেন্ডে দশ বার কাঁপিলে উর্মির দৈর্ঘ্য ১১০ ফুট, ১০০ বার কাঁপিলে দৈর্ঘ্য ১১ ফুট, ১০০০ বার কাঁপিলে এক ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক, ১০০০০ বার কাঁপিলে এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ অধিক।

বায়ুতে উর্মি বর্তমান বলিলে কী বুঝিব? বুঝিব এই যে, এক স্থানে বায়ুস্তরটা কিঞ্চিৎ সংকুচিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক। তার পশ্চাতে আর-এক স্থানে বায়ুস্তর কিঞ্চিৎ প্রসারিত, সেখানে চাপের মাত্রা কিঞ্চিৎ অল্প। আবার আর একটু পশ্চাতে বায়ুস্তর আবার কিঞ্চিৎ সংকুচিত ও সেখানে চাপ অধিক। এইরূপ ক্রমান্বয়ে সংকুচিত ও প্রসারিত বায়ুস্তর বায়ুরাশিতে বর্তমান। কিন্তু বায়ু অদৃশ্য পদার্থ; উহা দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর নহে। চাপের যে কিঞ্চিৎ অল্পাধিক্য হয়, তাহাও সহজে বোধগম্য হয় না। তবে এই উর্মির অস্তিত্ব জানিব কীরূপে? ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসে যবদ্বীপের নিকট ক্রাকাটোয়া নামক আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গার হইয়াছিল, ২৭ আগস্ট তারিখে দ্বীপটার একাংশ ভীষণ আঘাতে একবারে উৎক্ষিপ্ত ও লুপ্ত হয়। তাহাতে বায়ুস্তরে যে ভীষণ আঘাত লাগে, সেই আঘাতের ফলে সংকোচ প্রসারণের উৎপত্তি ঘটিয়া বায়ুরাশিতে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড উর্মির সৃষ্টি করে। সেই উর্মি যবদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া সমস্ত ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আসে। সেই উর্মি সঞ্চারণের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র বায়ুরাশির চাপ পর্যায়ক্রমে একবার বৃদ্ধি, একবার হ্রাস পাইয়াছিল। পৃথিবীর যাবতীয় বায়ুমান যন্ত্রে সেই চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ধরা পড়িয়াছিল। অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প হইয়াছে যবদ্বীপের নিকটে, ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় তাহার সংবাদ পর্যন্ত জানে না; অথচ সেখানকার বায়ুমান যন্ত্রে পারদপৃষ্ঠ আন্দোলিত হইতে থাকিল। কিছু দিন পরে প্রকাশ পাইল, সেই আন্দোলন ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের ফল।

ক্রাকাটোয়ার ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বায়ুতে যে ভীমাকার প্রচণ্ড উর্মির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার ফলে চাপের হ্রাস বৃদ্ধি বায়ুমান যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু তানপুরার তারে আঘাত ক্রাকাটোয়ার অগ্ন্যুৎপাতের সহিত তুলনীয় নহে। তদ্যুৎপন্ন উর্মিতে বায়ুরাশিতে চাপের যে কিঞ্চিৎ হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে, তাহা বায়ুমানে ধরিবার আশা নাই; আর বায়ুও দর্শনেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। বজ্রপাতের সময় বায়ুতে যে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, তাহার উর্মির আঘাতে ঘরের শার্সির কাচ কাঁপিয়া উঠে। তানপুরার তারের আঘাতে উৎপন্ন উর্মিতে সে আশাও করা যায় না। তবে এই উর্মির কম্পনগুলি কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে?

তার সেকেন্ডে দশ বারও কাঁপিতে পারে; শত বারও কাঁপিতে পারে। দশ বার কম্পনে সেকেন্ডে দশ উর্মি জন্মে ও বায়ুমধ্যে চালিত হইয়া কর্ণপটহে আঘাত করে। কিন্তু তাহাতে আমাদের চেতনার সঞ্চার হয় না। কিন্তু সেকেন্ডে শত বার কম্পনে শত উর্মির সৃষ্টি করিলে, সেকেন্ডে শতবার কর্ণপটহে আঘাত করে, তখন উহা চেতনার বিষয় হইয়া একটা অনুভূতির জ্ঞান জন্মায়, ওই জ্ঞানের নাম শব্দজ্ঞান। এই শব্দজ্ঞান কেন জন্মায় বলিতে পারি না, কীরূপে জন্মায়, তাহা কতকটা বলিতে পারা যায়।

সেকেন্ডে কতগুলি ঊর্মির আঘাত কানে পড়িলে শব্দজ্ঞান জন্মায়, বলা কঠিন। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা সমান নহে। মোটামুটি বলা যায়, সেকেন্ডে ঊর্মির সংখ্যা ত্রিশের অধিক হইলে শব্দজ্ঞান জন্মে। তার নীচে কাহারও-কাহারও জন্মিতে পারে, অনেকেরই জন্মে না। আবার ঊর্মির সংখ্যা সেকেন্ডে হাজার ত্রিশের অধিক হইলে আর শব্দজ্ঞান জন্মে না। শ্রবণেন্দ্রিয় এখানে বাহ্য বিষয়ের সংবাদ লইতে অসমর্থ হয়।

মোটামুটি সেকেন্ডে ত্রিশ হইতে ত্রিশ হাজার পর্যন্ত ঊর্মি কানে আঘাত দিলে শব্দজ্ঞান জন্মে। সেই শব্দজ্ঞানের আবার ইতরবিশেষ আছে।

শব্দজ্ঞান

শব্দজ্ঞান একটা জ্ঞান। শ্রবণেন্দ্রিয় একটা অনুভবকে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সমীপস্থ করিলে মন উহাকে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির সমীপে পৌঁছাইয়া দেয়, বুদ্ধি তখন উহা দ্বারা হর্ষ ক্লেশ অনুভব করে ও মনের সাহায্যে উহাকে স্বকর্মে নিযুক্ত করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি বুদ্ধির সমীপে আনীত হইলে উহা চেতনার বিষয় হয়, তখন উহাকে বলি জ্ঞান। ঊর্মির আঘাতের ফলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনীত যে জ্ঞান, তাহা শব্দজ্ঞান; উহা চেতনার গোচর; জড় জগতে উহার স্থান নাই।

জড় জগতে আছে ঊর্মি, ঊর্মির অন্তর্গত বায়ুস্তরের সংকোচ, প্রসার; উহা দর্শন স্পর্শের প্রায় অগোচর। এই শব্দজ্ঞানের আবার নানা ভেদ আছে। কোন শব্দ মধুর, কোনটা কর্কশ। যাহা চেতনাকে হর্ষ দেয়, তাহা মধুর, যাহা চেতনাকে ক্লেশ দেয়, তাহা কর্কশ। মধুর শব্দের বিন্যাসে সঙ্গীতের উৎপত্তি। মধুর শব্দের সঙ্গীতশাস্ত্রের আখ্যা সুর। যে শব্দ বেসুরা, তাহা ক্লেশকর বা কর্কশ; তাহা গণ্ডগোল বা কোলাহল মাত্র। সুরের আবার ভেদ আছে। কোন সুর উচ্চ বা দূরশ্রাবী, যেমন শঙ্খশব্দ; কোনটা মৃদু বা নিকট হইতে শোনা যায়, যেমন কণ্ঠশব্দ। কিন্তু এই লক্ষণটা সুরের প্রধান লক্ষণ নহে; ইহা ধরিয়া সুর চিনিয়া লওয়া যায় না; সুর চিনিতে হইলে, আমরা বলি—এই সুরটা চড়া, ওই সুরটা নরম বা ওইটা তার, ওইটা উদার। পুরুষের কণ্ঠস্বর কোমল উদার, নারীর স্বর তীয়র, তার। বয়স্কের অপেক্ষা বালকের স্বর তীয়র। শাঁখের শব্দ কোমল, গম্ভীর; ট্রামগাড়ি-চালকের বাঁশির শব্দ তীয়র, কর্ণভেদী।

ফলে তীয়র-কোমল ভেদেই স্বরের স্বরূপ নির্ণীত হয়। এই ভেদটাকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রেরণায় চেতনা স্বরের প্রধান ভেদ বলিয়া জানে। স্বরগ্রামে এই ভেদ ধরিয়াই ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যমাদি ক্রমে সা রে গা মা ক্রমে সুরের পর্যায় নির্ণীত হয়। গ্রামের মধ্যে যাহা সবচেয়ে কোমল, তাহাই সা, তার উপব রে, তার উপরে গা ইত্যাদি। কোন স্বর দূর হইতে শোনা যায় বা নিকট হইতে শোনা যায়, সঙ্গীতজ্ঞ তাহার বড় খবর লন না। কিন্তু কোনটা কোমল, কোনটা তীয়র, তাহার যথাযথ জ্ঞানই সঙ্গীত-কলার প্রাণ। তীয়র কোমল নানা স্বর পরপর নানা বিধানে বিন্যাস করিয়া সঙ্গীতকলাবিৎ নানা অপরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন, চেতনা তাহাতে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়। কেন হয়, কে জানে?

সঙ্গীতরসজ্ঞ ঊর্মিতত্ত্বের কোনো ধারই ধারেন না; তিনি মধুর সঙ্গীতের মাধুর্য্য উপভোগ করেন। কিন্তু পদার্থবিদের উপভোগ নিযত থাকিলে চলে না। তাঁহাকে তথ্য নির্ণয় করিতে হয়। চেতনার নিকট সুরের এই যে কোমলে তীয়রে ভেদ, বাহ্য জগতে বায়ুমধ্যে ঊর্মিমধ্যে তাহার আনুষঙ্গিক ভেদ কীরূপ?

তারকে কাঁপাইয়া ঊর্মির সৃষ্টি হয়। সেকেন্ডে যত কম্পন, সেকেন্ডে তত ঊর্মি; অদৃশ্য ঊর্মিগুলি গণিতে না পারিলেও কম্পনসংখ্যা যন্ত্রযোগে গণিতে পারা যায়। পদার্থবিৎ গণিয়া দেখিয়াছেন, কম্পনসংখ্যা যত বাড়ে, আনুষঙ্গিক সুরও তত তীব্র বা তীয়র হয়। সেকেন্ডে

দুইশো, চারিশো, পাঁচশো কম্পে সুর গম্ভীর কোমল, দুই হাজার পাঁচ হাজার কম্পনে সুর তীব্র। কম্পনসংখ্যা যতই বাড়িবে, সুর ততই তীব্র হইবে।

সা-এর অপেক্ষা রে তীব্র; তন্ত্রীটা খাটো করিলেই কম্পনসংখ্যা বাড়ে ও স্বরের তীব্রতাও সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ে। ষড়জ ক্রমে চড়িতে-চড়িতে ঋষভে পরিণত হয়। যাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষিত, তিনি তারের পানে না চাহিয়া বলিয়া দিবেন, ঋষভ পর্যন্ত উঠিয়াছে কি না। কতটুকু চড়িলে ষড়জ গিয়া ঋষভে দাঁড়ায়, তাহা সঙ্গীতবেত্তার শ্রবণাগ্রে। পদার্থবিদকে তারের দৈর্ঘ্য মাপিয়া বা কম্পন মাপিয়া বলিতে হইবে, ষড়জ ঋষভে পরিণত হইবার সময় আসিযাছে কি না?

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে, তীব্র-কোমল-ভেদ, যাহা লইয়া স্বরের সুরত্ব, তাহার সহিত আহত তন্ত্রীর কম্পনসংখ্যার সম্পর্ক। অতএব প্রতি সেকেন্ডে শ্রবণেন্দ্রিয়েব আনীত ঊর্মিসংখ্যার সম্পর্ক। আর কিছুরই সম্পর্ক নাই। তবে শব্দের দূরশ্রাবিতার সহিত সম্পর্ক কীসের? আমি যখন বন্ধুর কানে-কানে কথা বলি, তখনই বা ঊর্মিগুলি কি লক্ষণবিশিষ্ট হয়, আর যখন গলা ছাড়িয়া সভাস্থলে বক্তৃতা করি, তখনই বা বায়ুমধ্যে ঊর্মিগুলি কীরূপ হয়? উত্তর সহজ। কামানের গর্জন দূরশ্রাবী; মেঘগর্জন, বজ্রগর্জন দূরশ্রাবী; ঊর্মিগুলো এত জোরে আসিয়া ধাক্কা দেয় যে, ঘরের জানালা কপাট পর্যন্ত কম্পান্বিত হয়। তন্ত্রীকে বহু দূর টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহার শব্দ দূর পর্য্যন্ত যায় ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত শব্দ টিকিয়া থাকে। মৃদু অঙ্গুলির তাড়নায় যে মৃদু শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পক্ষণস্থায়ী, অল্প দূরেও শুনা যায় না। কম্পের পরিসরের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তন্ত্রীকে স্ব-স্থান হইতে চ্যুত করিয়া যত দূরে লইয়া যাইবে, কম্পনের পরিসর ততই অধিক হইবে। স্ব-স্থানে ফিরিবার সময় যত বেগের সহিত ঝোঁকের সহিত ফিরিবে, ততই উহা শক্তিসম্পন্ন হইবে। কম্পশীল দ্রব্য শক্তিসম্পন্ন। যাহাতে শক্তি যত নিহিত থাকে, তাহার সেই শক্তিক্ষয়ে তত অধিক সময় যায়। সেই শক্তি বহু দূর পর্যন্ত চালিত হইলেও উহা ফল দেখায়। কম্পনের এই পরিসরের আধিক্যে, কম্পমান তন্ত্রীতে নিহিত যানশক্তির আধিক্যে এই দূরশ্রাবিতা বৃদ্ধি পায়।

আগেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এই দূরশ্রাবিতা স্বরের প্রধান লক্ষণ নহে। আলোকের যেমন বর্ণ ধরিয়া চেনা যায়—এই আলো লাল, উহা নীল; শব্দ সেইরূপ সুর ধরিয়া চেনা যায়—ইহা কোমল, ইহা তীয়র। একই নীলালোকের ঔজ্জ্বল্যভেদ থাকিতে পারে, একই সুরের দূরশ্রাবিতার ভেদ থাকিতে পারে।

এই দূরশ্রাবিতা যে লক্ষণ, তাহা তুচ্ছ লক্ষণ; স্বরের প্রধান লক্ষণ সুর; যাহার সহিত সম্পর্ক কম্পদ্রুতির। তদ্ব্যতীত আর একটা লক্ষণ আছে, সঙ্গীতশাস্ত্র তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। উহাকে ধ্বনি বা আওয়াজ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই তৃতীয় লক্ষণের আলোচনার পূর্বে এক বার স্বরোৎপাদক বাদ্যযন্ত্রসমূহের আলোচনা আবশ্যক।

বাদ্যযন্ত্র

যাহার কম্পে বায়ুরাশিতে তরঙ্গগতির সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃতিভেদে বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণিভেদ হয়। মূলত চারিটা শ্রেণি—

১। **বীণাযন্ত্র ঃ** এখানে তন্ত্রীর বা তারের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—তানপুরা, একতারা, সেতার প্রভৃতি।

২। **বেণুযন্ত্র ঃ** এখানে যন্ত্রের বিবরগত বায়ুর কম্পে বাহিরের বায়ুতে তরঙ্গোৎপত্তি। উদাহরণ—ভগবানের মুরলী ও পাঞ্চজন্য হইতে অর্গান, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ও শিশুজনপ্রিয় কর্ণবিদারক বাঁশি পর্যন্ত। বিবরবদ্ধ বায়ুর কম্প উত্তেজনার জন্য বিবর-মুখে কোথাও রিডের ব্যবস্থা, কোথাও প্রবেশদ্বারের বায়ুসংঘর্ষের ব্যবস্থা থাকে। কোথাও বা বাদকের ওষ্ঠের চর্ম রিডের কাজ করে।

৩। **পটহ যন্ত্র ঃ** সূক্ষ্ম চর্মের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি; দৃষ্টান্ত—ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গাদি।

৪। **কাংস্য যন্ত্র ঃ** তাড়িত ধাতুফলকের কম্পে বায়ুতে তরঙ্গের উৎপত্তি; দৃষ্টান্ত—কাঁসর, ঘণ্টা, ঘড়ি, করতাল।

বীণাযন্ত্রে তার যত দীর্ঘ হয়, সুর তত তীয়র হয়। সেতারের তন্ত্রীর পরদায় পরদায় আঙ্গুল দিয়া তারকে ইচ্ছামতো বড় ছোট করিয়া কোমল, তীয়র সুর উৎপন্ন করা হয়। তারে টান বাড়াইলে সুর তীয়র হয়। ভারী ওজন ঝুলাইয়া টান বাড়ানো চলে, বা বেহালাতে কান মোচড়াইয়া টান বাড়ানো চলে। তারের সরু মোটা ভেদেও সুরের ভেদ হয়। সরু তারে তীয়র সুর, মোটায় কোমল। তারের দ্রব্যভেদেও সুরভেদ হয়। তন্ত্রীযন্ত্রের সরু তার অধিক পরিমাণে বায়ুকে আহত করিতে পারে না, সেই জন্য যন্ত্র-মধ্যে একটা বিবরে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া সেই বায়ুতে আঘাত সঞ্চারণের ব্যবস্থা থাকে। আবদ্ধ বায়ুর আঘাতে বাহিরের অনেকটা বায়ুতে আঘাত পায়। তানপুরা, বেহালা প্রভৃতির কাঠের খোলের এই তাৎপর্য। পটহযন্ত্রেও 'এইরূপ ব্যবস্থা থাকে। ঢাক, ঢোলের পেটের ভিতর বায়ুরাশি সঞ্চিত থাকে।

বেণুযন্ত্রে বিবরের আকৃতি ও আয়তনভেদে সুরের ভেদ হয়। মূলত বাঁশি যত দীর্ঘ হয়, সুর তত কোমল। যত খাটো হয়, সুর তত তীয়র। বাঁশের বাঁশিতে ও ক্লারিওনেটে রন্ধ্রসমূহ অঙ্গুলিবদ্ধ করিয়া বিবরের দীর্ঘতা কমানো বাড়ানো হয়। ভগবান মুরলীর রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বায়ুনির্গমের ব্যবস্থা করিয়া গোপীদের প্রাণ আকর্ষণ করিতেন।

পটহ যন্ত্রের ও কাংস্যযন্ত্রের স্থূল নিয়ম এই যে, কম্পমান পটহ বা ফলক যত খাটো ও ছোট হইবে, সুরের তীব্রতা ততই বাড়িবে।

এই সকল কম্পমান দ্রব্যের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। একটা তারে আঘাত করিলে সমস্ত তারটা কাঁপিতে থাকে; অথবা উহা আপনাকে দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়া প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতে থাকে। দীর্ঘ ভাগটা কাঁপিলে যে সুর জন্মে, তাহার কোনো ভগ্নাংশ কাঁপিলে অবশ্য তদপেক্ষা তীব্র সুর জন্মিবে। সময়-সময় এমন ঘটে যে,

সেই তারের নিজস্ব কোমল সুর না বাজিয়া তারের ভগ্নাংশের তীব্র সুরটাই বাহির হয়। কেবল যে তারে এইরূপ ঘটে, এমন নহে। বেণুযন্ত্রে, পটহযন্ত্রে, কাংস্যযন্ত্রে, সর্বত্র এই ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায়। দীর্ঘ বাঁশি বাজাইতে চেষ্ট করিতেছি, উহার স্বাভাবিক কোমল সুরের বদলে একটা উচ্চ তীব্র সুর বাহির হইল। বুঝিতে হইবে, আবদ্ধ বায়ুরাশি আপনাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লইয়াছে ও তাহার প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিতেছে।

ইহার ফল এই যে, বীণাই বলো, আর বেণুই বলো, আর পটহই বলো, উহাদের নিজস্ব বিশুদ্ধ সুরটি পাওয়া ভার। তাড়নার পর কম্পন আরম্ভ হয়। সমস্তটা কাঁপে, সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নাংশ খণ্ডগুলিও কাঁপে। স্বাভাবিক কোমল সুরের সঙ্গে-সঙ্গে কতিপয় উচ্চতর তীব্রতর সুর বাহির হয়। যাঁহাদের সাধা কান, তাঁহারা অনেক সময় ওই তীব্রতর আনুষঙ্গিক সুরগুলি অবধান করিলেই শুনিতে পান। সাধা না থাকিলে, কীরূপে যন্ত্রযোগে উহাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তাহা মনীষী হেলমহোলৎজ দেখাইয়াছেন। এই হেলমহোলৎজের নাম আগে বলিয়াছি। ইনিই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে সর্বপ্রধান তত্ত্ব অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব, সেই শক্তিতত্ত্বের প্রথম ব্যাখ্যানকর্তা! তিনি ছিলেন ডাক্তার, ডাক্তারি ছাড়িয়া তিনি শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন; শারীরবিদ্যার অধ্যাপনা ছাড়িয়া পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপনা ধরেন। তিনি যখন তনুত্যাগ করেন, তখন শারীরবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা—এই ত্রিমূর্তি-ধারিণী সরস্বতী আর্তনাদ করিয়া উঠেন। হেলমহোলৎজ স্বর-বিশ্লেষণের উপায় বাহির করিয়া দেখান যে, সাধারণ যন্ত্রোদ্গত সুর প্রায় বিশুদ্ধ সুর হয় না। স্বাভাবিক কোমল সুরের সহকারে তীব্রতর কতিপয় সুর বাহির হয়। আপন সুরের সহকারে এই উপরের সুরগুলি থাকায়, সুরে-সুরে জড়িত হইয়া শব্দজ্ঞানে একটা বিশিষ্টতা দেয়। উহারই নাম দিয়াছি স্বরের আওয়াজ বা ধ্বনি।

স্বরের প্রধান লক্ষণ যে তীব্রতা, তাহা কম্পনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুইটা সুর সমান তীব্র হইলেও উহার ধ্বনির ভেদ থাকে। এই ধ্বনিভেদকে সঙ্গীতশাস্ত্র উপেক্ষা করিতে পারে না। কেন না, ইহার ফলে আনন্দের ভেদ হয়। একই সুর যন্ত্রভেদে বিবিধ ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়। এই ধ্বনিভেদের রহস্যভেদ হেলমহোলৎজের হাতে রইল। যন্ত্রের আপন সুরের সহিত তীব্রতর সুর জড়িত ও মিলিত হইয়া উহার ধ্বনি বা আওয়াজ বদলাইয়া দেয়। খাঁটি সুর বিশুদ্ধ সুর; উহারা উচ্চতর কতিপয় সুরের সহিত মিলিত হইয়া কখন জমকালো হয়, ভরকাল হয়, কখন মিঠা হয়, মোলায়েম হয়, কখনও বা আবার নাকি সুরে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ সুরে কোন-কোন সুর মিলিত হইয়া কীরূপ আওয়াজ হয়, হেলমহোলৎজ তাহা শব্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। আবার বিশ্লেষণ যে-যে সুরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল, সেই-সেই সুর ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র হইতে একসঙ্গে নির্গত ও মিলিত করিয়া আবার সেই-সেই আওয়াজ সৃষ্টি করেন।

একটা উদাহারণ দিয়া এই কথাট স্পষ্ট করা হউক। নরকণ্ঠে বেণু যন্ত্রের স্বর বাহির হইতে পারে 'এ' অথবা 'ও'। যাত্রার জুড়ি আধ ঘণ্টা ধরিয়া কখনো কেবলই 'এ' ভাঁজেন, কখনও কেবলই 'ও' ভাঁজেন। 'এ' অবশ্য 'ও' হইতে ভিন্ন; ভিন্ন না হইলে ভিন্নরূপ শুনায় কেন? এই ভেদ কোন লক্ষণের ভেদ? ইহা সুরের তীব্রতা ভেদ নহে। নরকণ্ঠের 'এ' ও নারীকণ্ঠের 'এ'-তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে; সেইরূপ উভয় কণ্ঠের উভয় 'ও'-তে তীব্রতা ভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু 'এ' এবং 'ও' এই উভয়ে ভেদ সে-ভেদ নহে। আবার এই ভেদ দূরশ্রাবিতা জন্য ভেদ নহে। একই 'এ' আমি তোমার কানে-কানে বলিতে পারি, পাশের

লোকে শুনিবে না, অথবা উচ্চৈস্বরে 'এ' ডাকিয়া অর্ধ ক্রোশ কম্পিত করিতে পারি। তবে এই ভেদ কোন লক্ষণে ভেদ? ইহা ধ্বনিভেদ, আওয়াজের ভেদ। হেলমহোলৎজ দেখাইলেন, 'এ' স্বরে মূল সুরের সহিত যে-যে উপরের সুর মিলিত ও জড়িত আছে, 'ও' স্বরে মূলের সহিত সেই-সেই উপরের সুর মিলিত ও জড়িত নাই। 'এ' স্বরেই বা কোন-কোন সুর আছে, আর 'ও' সুরেই বা কোন-কোন সুর আছে, তাহা হেলমহোলৎজ স্বর-বিশ্লেষর দ্বারা আবিষ্কার করিলেন। আবার যন্ত্রযোগে সেই-সেই সুর একত্র মিলিত করিয়া 'এ' স্বর এবং 'ও' স্বরের উৎপাদন করিলেন। সপ্রমাণ হইল—অ ই উ এ ও প্রভৃতি বর্ণপরিচয়ের চিরপরিচিত স্বরগুলির ধ্বনিভেদ বিভিন্ন সুরের সমবায়ের ভেদে উৎপন্ন।

মুখ ব্যাদান কবিয়া ওই সকল স্বরের নির্গম সাধিত হয়। ব্যাদিত মুখের অন্তর্গত মূল কোটর এই স্থলে বেণুযন্ত্রের কাজ করে। বুকের ভিতর ফুসফুস হইতে বায়ু নির্গত হয়। কণ্ঠনালি দিয়া বেগে বাহির হইবার সময় নালির মাংসপেশি কম্পিত হইয়া কোটরস্থ বায়ুর কম্প উত্তেজিত করে। মুখকোটরের আকৃতি ও আয়তনভেদে ভিন্ন-ভিন্ন স্বর নির্গত হয়। কোটরগত বায়ুর নিজের একটা সুর থাকে, আর উহা খণ্ডশ বিভক্ত হইয়া উপরের সুর কতিপয়ের সৃষ্টি করে। সকল সুরে মিলিত হইয়া নূতন-নূতন আওয়াজের উৎপাদন করে।

অর্গানের পাইপে অথবা বীণার তারেও সেইরূপ ঘটে। পাইপের আবদ্ধ বায়ু বা বীণার তার যখন সমস্তটা কাঁপে, তখন উহার মূল সুব বাহির হয়। কিন্তু এই কম্পের সহিত অন্য কম্প থাকে। পাইপের কোটরবদ্ধ বায়ু অথবা বীণাতন্ত্রী আপনাকে কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত করে। প্রত্যেক ভগ্নাংশ স্বতন্ত্রভাবে কাঁপিয়া উপরের সুরগুলির সৃষ্টি করে। তন্ত্রী দুই তিন চার পাঁচ সমান টুকরায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক টুকরা স্বতন্ত্রভাবে কাঁপে। কম্পনসংখ্যা দুই তিন চার পাঁচ গুণ হয়। সুর ও কম্পনসংখ্যানুসারে তীব্র হইতে তীব্রতর হয়। মূল সুরের সহিত এই তীব্র সুরগুলি জড়িত ও মিলিত হইয়া আওয়াজ বদলায়। সেই আওয়াজে সঙ্গীতরসজ্ঞের রসবোধের তারতম্য হয়।

সুরে-সুরে সম্মিলন সাধন সঙ্গীতশাস্ত্রের একটা কায়দা। ইউরোপের সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার প্রচুর ব্যবহার করে; পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্র এই কায়দার বলে বাহবা লন। দুইটা সুরের সম্মিলনের ফল কখনও প্রীতিকর, কখনও বা অপ্রীতিকর হয়। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যা সমান হইলে দুই সুর বেমালুম মিশিয়া যায়। একের কম্পনসংখ্যা অপরের দুই তিন চার পাঁচ গুণ হইলেও মিশিয়া আওয়াজ বদলায়, তাহাও প্রায় প্রীতিকর। উভয়ত্র কম্পনসংখ্যার অনুপাত যদি ২—৩, ৪—৫, ৫—৬, এইরূপ হয়, তাহা হইলেও ফল প্রীতিকর হয়। কিন্তু অনুপাত ৮—৯, ১০—১১, ১৭—১৮, এইরূপ হইলে তখন আর প্রীতিকর হয় না। তখন সুরে-সুরে মিলিয়া যে স্বর জন্মে, তাহা কানে বাজে, তাহা কর্কশ হয়। এই কর্কশতা সঙ্গীতের বিরোধী। কর্কশতার বাহুল্যেই গণ্ডগোল ও কোলাহল। এই কর্কশতার পরিহার সঙ্গীতের গোড়ার কথা। বাদ্যযন্ত্রে মূল সুরের সহিত যে সকল উপরের সুর বাহির হয়, তাহাদের পরস্পর সম্মিলনে যাহাতে এই কর্কশতা না জন্মায়, তাহারই উদ্ভাবনাতেই বাদ্যযন্ত্র কারিগরি।

পদার্থবিদ অবশ্য রসবোধের ধার ধারেন না। তাঁহার দৃষ্টি কম্পের প্রতি ও ঊর্মির প্রতি। সঙ্গীতরসজ্ঞ দেখেন, সুরে-সুরে মিলিয়া ফল প্রীতিকর হইল কি না; পদার্থবিদ দেখেন, কম্পে কম্পে মিলিত হইয়া তারের মূল কম্পের সহিত তাহার ভগ্নাংশের কম্প জড়িত হইয়া কম্পটার কী পরিবর্তন হইল? কম্পে-কম্পে মিলিয়া কম্পের পরিণাম কী হয়, তাহা পূর্বে

দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো গিয়াছে। পেন্ডুলমের কম্প সরল কম্প; উহার পূর্বার্ধ অপরার্ধের অনুরূপ, উহার প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদের অনুরূপ। কিন্তু ঢেঁকির কম্প জটিল কম্প। উহার পূর্বার্ধ অপরার্ধের অনুরূপ নহে; উহার পাদবিভাগ তো চলেই না! চাঁদের জোয়ার সমুদ্রের কম্প সরল কম্প; সূর্যের জোয়ারে সমুদ্রের কম্পও সরল কম্প। কিন্তু উভয় কম্পের মিলনে যে জটিল কম্প হয়, তাহার মতো অসরল কম্প আর নাই। কেবল চাঁদের জন্য কম্পটুকু থাকিলে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সময়নির্দেশই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু উভয় কম্পের সমবায়ে যে জটিল কম্প হয়, তাহা অত সরল তালিকায় নির্দিষ্ট হইবে না। সঙ্গীত-রসপিপাসু যখন দেখেন, স্বরের আওয়াজের ব্যতিক্রম, পদার্থবিদ তখন দেখেন, কম্পের সরলতা নষ্ট হইয়া জটিলতার বৃদ্ধি। কে অধিক সৌভাগ্যশালী পুরুষ, পাঠক মহাশয় বিবেচনা করিবেন।

বাদ্যযন্ত্র আহত হইলে উহা আপনাকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লয় ও প্রতি খণ্ডের স্বতন্ত্র কম্পে বিভিন্ন সুর জন্মে। এই ভগ্নাংশগুলির কম্পসংখ্যার অনুপাত যতক্ষণ ২—৩, ৪—৫, ৫—৬, এইরূপ থাকে, ততক্ষণ স্বর-সম্মিলনে ফল প্রীতিকর থাকে; কিন্তু তাহা ছাড়িয়া ৮—৯, ১৭—১৮, ২৩—২৫, এইরূপ ঘটিলেই বিপত্তি! তখন মাধুর্য স্থলে কর্কশতা আসে। একটা টেবিলে যখন একটা ঠোকা দিই, তখন টেবিলের বৃহৎ কাষ্ঠ তাহার বৃহৎ অবয়বকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া খণ্ডে-খণ্ডে কাঁপিতে থাকে। ওই সকল খণ্ডের মধ্যে না আছে কোন মিল, না আছে কোন সামঞ্জস্য, উহাদের কম্পন-সমবায়ে উৎপন্ন জটিল কম্পনের ফল যে শব্দ, তাহার নাম ঠোক্কর বা ঠোকর। উহা সঙ্গীতশাস্ত্রের অগ্রাহ্য, উহা কর্কশ, শ্রুতিকটু; উহা সুর নহে, উহা বেসুর; উহা স্বর নহে, উহা ব্যঞ্জন। উহা 'আ' নহে, 'ই' নহে, 'এ ও' নহে, উহা 'ঠক'।

কঠিন পদার্থে, কঠিন পদার্থে বা কঠিনে তরলে সংঘট্টের ফলে এই জটিল কম্প বা আলোড়ন বা বিঘট্টন হইয়া ফলে যে শব্দ হয়, তাহাই কর্কশ শব্দ। উহার ফল বর্ণপরিচয়ের লিপিতে স্বরবর্ণের তালিকায় নিবদ্ধ নাই। ব্যঞ্জনের তালিকায় উহাদিগকে পাওয়া যাইবে। টেবিলের আঘাতে হইল 'ঠক,' আর কেতবাখানা মাটিতে পড়িলে হইল 'ধপ,' হাতের তালিতে হইল 'চট,' জলের আঘাতে হইল 'ছপ'। ওইরূপে কণ্ঠ হইতে বায়ুপ্রবাহ মুখকোটর দিয়া নির্গমের সময় যদি জিহ্বা গিয়া কোথাও-কোথাও আঘাত করিয়া বায়ুপ্রবাহকে ক্ষণেকের জন্য আটকাইয়া দেয়, সেই আঘাতের ফলে কখনো বা 'ক,' এইরূপে যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা চলিত না। তড়িৎপ্রবাহের শক্তি তুঁতেকে বিশ্লেষণ করে।

উদাহরণস্বরূপ তুঁতের কথা বলিলাম। নানাবিধ যৌগিক পদার্থকে এইরূপে তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা বিশ্লেষণ করা চলে। যে সকল যৌগিক লাবণিক পদার্থে সোনা রূপা আছে, তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে সোনা রূপা পৃথক হইয়া পড়ে। স্বর্ণকারেরা আজকাল সোনার রূপার গিলটি করিবার জন্য তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহার করে।

তড়িৎপ্রবাহ তাপ জন্মায়, আর যৌগিক পদার্থের বিশ্লেষণ করে। তদ্ভিন্ন ইহার তৃতীয় কাজ চুম্বককে ধাক্কা দেওয়া। এক হিসেবে এই গুণটা সব চেয়ে প্রধান। ইহার আলোচনার পূর্বে চুম্বক জিনিসটা কী, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

চুম্বক

এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন, লোহা স্থলবিশেষে লোহা টানিবার ক্ষমতা রাখে। যে লোহার ওইরূপ ক্ষমতা আছে, তাহাকে অয়স্কান্ত মণি বলা হইত। খনির মধ্যে ওইরূপ লোহা পাওয়া যায়। উহা লোহা আর ইস্পাত আকর্ষণ করে। লোহা মোটামুটি তিন রকমের; পেটাই লোহাতে এ-দেশের কামারে কাজ করে; উহা কোমল ও ঘাতসহ; পিটিলে ভাঙে না। ঢালাই লোহা অত্যন্ত দৃঢ় ও ভঙ্গপ্রবণ; বিলাতি লোহার অধিকাংশ ঢালাই। উহা তপ্ত করিলে সহজে তরল হয়, তখন ঢালিয়া ছাঁচে ফেলিয়া নানাবিধ দ্রব্য গঠন হয়। আর এক রকমের লোহার নাম ইস্পাত। ইস্পাতের প্রধান গুণ কঠোরতা ও স্থিতিস্থাপকতা।

এই তিন রকমের লোহার কোনটাই খাঁটি লোহা নহে। লোহার সঙ্গে অন্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে; তার মধ্যে কয়লা প্রধান। পেটাই লোহাতে কয়লার ভাগ খুব বেশি, আর ইস্পাতে মাঝামাঝি।

খনিতে যে চুম্বক পাওয়া যায়, তাহা যৌগিক পদার্থ। লোহা অম্লযানে যুক্ত হইয়া উহার সৃষ্টি করে।

কোমল লোহা আর দৃঢ় ইস্পাত, উভয়ই খনিজ চুম্বকের ঘর্ষণে চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোহা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কোমল লোহার ওই চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না, কিন্তু ইস্পাতের চুম্বকত্ব স্থায়ী হয়। ছোট-ছোট ছুঁচ ওইরূপে চুম্বকে ঘষিয়া স্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করে চলে। ইস্পাতের কাঁটা বা ইস্পাতের ছড়িকে চুম্বকে লম্বালম্বি ঘষিলে ওই কাঁটা বা ছড়িও স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়।

ওইরূপ কাঁটা বা ছড়ি সুতা দিয়া ঝুলাইলে দেখা যায়, উহার এক প্রান্ত উত্তর মুখে অন্য প্রান্ত দক্ষিণ মুখে থাকিতে চায়। অন্য মুখে রাখিলেও ঘুরিয়া উত্তর দক্ষিণে ফিরিয়া আসে। চুম্বকের কাঁটার এই গুণ থাকায় উহা বহুকাল হইতে দিকদর্শন-শলাকারূপে নাবিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। জমি জরিপের সময় ওইরূপ কাঁটা দিক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহাকে কম্পাস কাঁটা বলে।

কম্পাসের কাঁটা চুম্বক, উহার এক প্রান্ত উত্তর দিক, অন্য প্রান্ত দক্ষিণ দিক অভিমুখ করিয়া স্থির থাকিতে চায়।

ওই উত্তরমুখী প্রান্তের সহিত দক্ষিণমুখী প্রান্তের বিপরীত সম্বন্ধ। তাহা বুঝাই যাইতেছে। এ-প্রান্ত চলে উত্তর মুখে; ও-প্রান্ত চলে দক্ষিণ মুখে। আবার দুইটা কাঁটা পরস্পর নিকটে রাখিলে দেখা যায়, ইহার উত্তরমুখপ্রান্ত উহার উত্তরমুখপ্রান্তকে দূরে ঠেলে, ইহার দক্ষিণমুখপ্রান্ত উহার দক্ষিণমুখপ্রান্তকে দূরে ঠেলে। কিন্তু ইহার উত্তরমুখপ্রান্ত উহার দক্ষিণমুখপ্রান্তকে দূরে না ঠেলিয়া নিকটে টানে। ওইরূপ কাঁটা ইস্পাতের আর একটা কাঁটায় ঘষিলে ওই ইস্পাতের কাঁটাও চুম্বকত্ব পায়; উহারও এক মুখ উত্তরে, অন্য মুখ দক্ষিণে তাকাইয়া থাকিতে চায়। কোমল পেটাই লোহার কাঁটাতে ঘষিলেও উহা চুম্বকত্ব পায়; কিন্তু

ইস্পাতের মতো লোহার চুম্বকত্ব স্থায়ী হয় না।

ঘর্ষণেরও প্রয়োজন নাই। একটা ইস্পাতের চুম্বকের সমীপে একখানা লৌহ রাখিলেই উহা অস্থায়ীভাবে চুম্বকধর্ম অর্জন করে। যতক্ষণ ওইরূপে সমীপে থাকে, তত ক্ষণের জন্য অর্জন করে। উহারও এক ধার দক্ষিণবর্তী, অন্য ধার উত্তরবর্তী হইতে চেষ্টা করে। তখন সম্মুখস্থ ইস্পাতের চুম্বক উহার এক ধারকে টানে, অন্য ধারকে ঠেলে; কেন না, দুই ধারের ধর্ম বিপরীত। যে ধারটা নিকটে সেই ধারকে টানে, যে ধার দূরে সেই ধারকে ঠেলে। নিকটের টান কিছু বেশি, দূরের ঠেল কিছু অল্প, কাজেই লোহাটা মোটের উপর ইস্পাতের দিকে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বক যে লোহাকে আকর্ষণ করে, তাহার তাৎপর্যই এই। চুম্বকের সম্মুখে আসিয়া লোহা অস্থায়ীভাবে চুম্বকত্ব পায়। তখন উহার এক ধারে টান ও অন্য ধারে ঠেল পড়ে ও মোটের উপর উহা আকৃষ্ট হয়।

একটা চুম্বকের কাঁটা দ্বিখণ্ডে বা শত খণ্ডে ভাঙিলেও দেখা যায় যে, উহার প্রত্যেক খণ্ডে চুম্বকত্ব বর্তমান আছে। প্রত্যেক ভগ্ন খণ্ডের এক মুখ উত্তরবর্তী ও অন্য মুখ দক্ষিণবর্তী হইতে চায়। ইহাতে স্বতই অনুমান হয় যে, চুম্বকের প্রত্যেক কণিকাই বুঝি চুম্বক; সেই কণিকা যত ছোটই হউক না, উহা একটি ক্ষুদ্র চুম্বক।

চুম্বকের এই অদ্ভুত স্বভাব। অতি বড় চুম্বক ও অতি ছোট কণিকা-প্রমাণ চুম্বক, উভয়েরই এই অদ্ভুত স্বভাব যে, উহার এক প্রান্ত উত্তরবর্তী ও অন্য প্রান্ত দক্ষিণবর্তী হইবে। জোর করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দিলেও উহা পূর্ব-পশ্চিমে দাঁড়াইবে না। ছাড়িয়া দিবা মাত্র ঘুরিয়া উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবে। এরকম অদ্ভুত স্বভাব আর কোনও জিনিসের দেখা যায় না। লোহা বা ইস্পাত যতক্ষণ চুম্বকত্ব না পায়, ততক্ষণ উহার এই স্বভাব থাকে না। কিন্তু চুম্বকত্ব পাইবা মাত্র কোথা হইতে কীরূপে এই অদ্ভুত স্বভাব আসিয়া পড়ে।

এইরূপে একটা দিক লক্ষ করিয়া দাঁড়াইবার প্রকৃতি আর কোনও জিনিসের দেখা যায় না, তবে স্থলবিশেষে নানা দ্রব্যকে ওইরূপ ধর্ম উপার্জন করিতে দেখা যায়।

যেমন লাটিম খেলা। লাটিম যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ উহার মাঝের কাঁটা খাড়া হইয়া ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ দাঁড়ায়। বেগ কমিলে তখন ঢলিয়া ভূতলশায়ী হয়।

একটা পয়সাকে উহার কিনারার উপর ভর দিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রাখা চলে না। পয়সাকে ঘুরাইয়া দিলে উহা গাড়ির চাকার মতো ঘুরিতে-ঘুরিতে খাড়া দাঁড়াইয়া চলে। ঘূর্ণনবেগ থামিবা মাত্র ভূতলশায়ী হয়।

একালের দ্বিচক্র গাড়ি—বাই-সাইকেল ওইরূপ জিনিস। চাকা যতক্ষণ বেগে ঘুরে, ততক্ষণ উহা খাড়া থাকিবে, থামিলেই ভূতলশয়ন অনিবার্য।

অধিক কী, এই ভূমণ্ডলটাই একটা প্রকাণ্ড লাটিম। উহা আপন অক্ষরেখার চারিদিকে বেগে ঘুরিতেছে; প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় এক পাক আবর্তন করিতেছে। ওইরূপ ঘুরিতেছে বলিয়াই উহার অক্ষরেখা নিরন্তর খগোলে ধ্রুবনক্ষত্রের অভিমুখে চাহিয়া আছে। চুম্বকের ওইরূপ একটা নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, উহার কণিকাগুলিও ওইরূপ বেগে ঘূর্ণমান। সেই কণিকাগুলি অতি ক্ষুদ্র ও চক্ষুর অগোচর, উহাদের ঘূর্ণিও

অগোচর; কিন্তু প্রত্যেক কণিকা যত ছোট হউক না কেন, উহা যখন একটা দিকে গোঁ ধরিয়া থাকিতে চায়, তখন উহা আপন ক্ষুদ্র অক্ষরেখার চারিদিকে বেগে ঘুরিতেছে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

বেগে ঘূর্ণ্যমান দ্রব্য মাত্রেরই এই জেদ বা গোঁ দেখা যায়। উহা গাড়ির চাকাই হউক, আর কুমারের চাকাই হউক, আর ভগবানের করাবর্তিত সুদর্শন চক্রই হউক। উহা ধাবিত হইবার সময়ও আপনার গোঁ ছাড়ে না। একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া চলিতে থাকে। সেই গোঁ ছাড়ানো কঠিন, আর সেই গোঁর সম্মুখে দাঁড়াইলে বিপদ।

নদীর স্রোতে মাঝে-মাঝে জলের ঘূর্ণি বা ভ্রমি থাকে, উহার ওইরূপ গোঁ। কোনও খড়, পাতা, কাঠ ভাসিতে-ভাসিতে ওই ঘূর্ণিতে পড়িলে ঘূর্ণি উহাকে সাত পাক খাওয়াইয়া ডুবাইয়া দেয়। বড়-বড় নদীর বড়-বড় ঘূর্ণিতে নৌকা পড়িলে নৌকাও সাত পাক খাইয়া ডুবিবার আশঙ্কা থাকে। বাতাসের মতো লঘু দ্রব্যের ঘূর্ণিও ভয়ানক। ঘূর্ণিবাত্যা যে দেশের উপর দিয়া যায়, সে দেশে আপনার ভ্রমণের চিহ্ন রাখিয়া যায়। গাছপালা সমূলে উৎপাটিত হয়, দালান ঘরের ছাদ উপড়াইয়া যায়, রাস্তার জিনিস গাছের মাথায় উঠে, একতলার জিনিস তেতলার ছাতে চড়ে। যে জিনিসটা জলের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে, জল তাহাকে সাত পাক খাওয়ায় ও পরে অধোমুখে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়। যে জিনিসটা বাতাসের ঘূর্ণিতে পড়ে, বাতাস তাহাকে ঘুরাইয়া দেয় ও পরে ঊর্দ্ধমুখে টানিয়া তোলে।

বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন, চুম্বকের অদৃশ্য কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে। প্রত্যেক কণিকা ওইরূপ ঘুরিতেছে বলিয়া গোটা চুম্বকটারই এই গোঁ। চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখে দাঁড়াইবার জেদ। জোর করিয়া সরাইয়া দিলেও উহা ঘুরিয়া আপন জেদে উত্তরমুখ হইবে। শুধু তাহাই নহে। চুম্বকের কাঁটার আশে পাশে চারিদিকে আকাশ নামক পদার্থ আছে। আলোকতত্ত্ব বুঝাইবার সময় আমরা দেখিয়াছি, ওইরূপ একটা প্রত্যক্ষের অগোচর বিশ্বব্যাপী পদার্থ কল্পনা না করিলে আলোকতত্ত্ব বুঝা যায় না। যে স্থানকে আমরা শূন্য স্থান বলি, সেখানেও ওই আকাশ বিদ্যমান। চুম্বকের আশেপাশে চারিদিকে, এমনকী, অভ্যন্তরেও ওই আকাশ আছে। চুম্বকের কণিকাগুলির ঘূর্ণনে ওই আকাশেও ঘূর্ণি উৎপন্ন হয়। চুম্বকের বাহিরে ও চারিপাশে অদৃশ্য আকাশে অদৃশ্য ঘূর্ণিও উৎপন্ন হয়। ওই ঘূর্ণির মধ্যে লোহা আনিবা মাত্র লোহার কণিকাগুলিও সাত পাক খাইতে আরম্ভ করে। উহাও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। আকাশের ঘূর্ণি লোহার কণিকায় ঘূর্ণি জন্মাইয়া উহাদিগকে আপনার গোঁ যে দিকে, সেই দিকে টান দেয়। নদীর স্রোতের ঘূর্ণি যেমন কাঠকে কোলের দিকে টানিয়া ডুবাইয়া দেয়, তেমনই ওই আকাশের ঘূর্ণি লোহার কণিকাগুলিতে ঘূর্ণি উৎপাদন করিয়া গোটা লোহাটাকেই যে দিকে উহার গোঁ, সেই দিকে টানিয়া ঠেসিয়া ধরে। তাহারই ফলে ওই লোহা চুম্বকের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

চুম্বকের পাশে আকাশ, অর্থাৎ যে আকাশমধ্যে চুম্বক নিমগ্ন আছে, সেই আকাশ ঘূর্ণিতে পরিপূর্ণ। সেই জন্য সেই ঘূর্ণিতে পড়িবামাত্র লোহাতে টান পড়ে ও উহার চুম্বকত্বপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ অনুমান দ্বারা চুম্বক কর্তৃক লৌহের আকর্ষণের একটা হেতু নির্দেশ অসঙ্গত নহে।

আপত্তি হইতে পারে—চুম্বক লোহাকেই আকর্ষণ করে, অন্য-অন্য জিনিসকে

আকর্ষণ করে না কেন? চুম্বকের পার্শ্ববর্তী আকাশে ঘূর্ণিই যদি লৌহের ও লৌহজ পদার্থের চুম্বকত্বপ্রাপ্তির কারণ হয়, তবে সেই আকাশে সোনা, রূপা, কাঠ, কাগজ থাকিলে তাহাতে ঘূর্ণি জন্মে না কেন, তাহাতে টান পড়ে না কেন; তাহার চুম্বকত্বপ্রাপ্তি ঘটে না কেন?

ইহার উত্তর মাইকেল ফারাডে দিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে দেখান, চুম্বকত্বপ্রাপ্তি কেবল লোহার ও লৌহজ দ্রব্যেরই "একচেটিয়া" ধর্ম নহে। নিকেল ও কোবাল্ট নামে দুই ধাতু আছে, উহারও চুম্বকসন্নিধানে চুম্বকত্বপ্রাপ্তি সহজেই দেখানো চলে; তবে লোহার চেয়ে অনেক কম—লোহার সহিত উহাদের মাত্রাগত প্রভেদ। ফারাডে দেখান, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট কেন, যাবতীয় পদার্থই চুম্বকের সন্নিধানে চুম্বকত্ব পায়। প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। সোনা, রূপা, কাঠ, কাগজও চুম্বকত্ববর্জিত নহে। তবে উহাদের বেলায় মাত্রা এত সামান্য যে, বিশেষ আয়োজন ব্যতীত, ঘূর্ণির খুব বেশি জোর ব্যতীত উহা টের পাওয়া যায় না। ফারাডে প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখাইয়া গিয়াছেন, কঠিন, তরল, মারুত, যাবতীয় পদার্থই চুম্বক সন্নিধানে ঘূর্ণিপূর্ণ আকাশে আনীত হইলে অল্পবিস্তর টান পায়, কোথাও বা ঠেল পায়। একবারে টান পায় না, বা ঠেল পায় না, এমন জিনিস কিছুই নাই। লোহার কণিকাগুলি আকাশের ঘূর্ণিতে যত সহজে ধরা দেয়, অন্য জিনিসের কণিকা তত সহজে ধরা দেয় না। অবশ্য লোহার সহিত ওই সকল দ্রব্যের কণিকার কোনও প্রভেদ আছে। কিন্তু সেই প্রভেদ কেবল মাত্রাগত প্রভেদ। পৃথিবী নিজেই একটা বৃহৎ চুম্বক। পৃথিবী এই চুম্বকত্ব কোথা হইতে কীরূপে পাইল, তাহা বলা কঠিন। কেহ মনে করেন, উহার গর্ভে কোথাও বড়-বড় জোরালো লোহার চুম্বক আছে। কেহ বা মনে করেন, আস্ত পৃথিবীটাই চুম্বক। যাহাই হউক, উহার পার্শ্ববর্তী আকাশে ঘূর্ণি থাকায় লৌহখণ্ড বা ইস্পাতখণ্ড সেই ঘূর্ণিতে পড়িয়া চুম্বকত্ব পায় ও চুম্বকত্ব পাইয়া পৃথিবীরূপ চুম্বকের গোঁ যে দিকে, সেই দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়।

তড়িৎপ্রবাহের চুম্বকত্ব

ওয়াস্টেড নামক পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, ধাতু দ্রব্যে পরিচালিত তড়িৎ-প্রবাহেরও চুম্বকের কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া একটা নির্দিষ্ট দিকে চাপিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি আছে। চুম্বকের কাঁটার জেদ উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবার জন্য। কিন্তু উহার পাশে যদি উত্তর দক্ষিণে লম্বা করিয়া একগাছি তামার তার ধরা যায়, আর সেই তারে একটা তড়িদ্ভাণ্ড হইতে তড়িৎপ্রবাহ চালানো যায়, তখন সেই কাঁটা ধাক্কা খাইয়া পূর্ব-পশ্চিমের দিকে হেলিয়া দাঁড়ায়। তড়িৎপ্রবাহ যখন ছিল না, তখন কাঁটার জেদ ছিল উত্তর-দক্ষিণে দাঁড়াইবার; তড়িৎ-প্রবাহ চলিবা মাত্র উহার জেদ দাঁড়ায় অন্য মুখে দাঁড়াইবার জন্য। বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে লম্বা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য, অথবা ঈশান হইতে নৈর্ঋতে লম্বা হইতে দাঁড়াইবার জন্য। যতক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততক্ষণ ওই নূতন স্থলে দাঁড়াইবার জেদ থাকে।

ইস্পাতের চুম্বকের কাছে লোহা ধরিলে, ওই লোহার যেমন চুম্বকত্বের আবির্ভাব হয়, তড়িৎপ্রবাহের সন্নিধানে লোহা ধরিলে উহাতেও চুম্বকত্বের আবির্ভাব দেখা যায়।

ইহাতে কী বুঝিতে হইবে? ইস্পাতের চুম্বক যেমন পার্শ্ববর্তী আকাশে ঘূর্ণি জন্মায়, তড়িৎপ্রবাহ ধাতুদ্রব্য দিয়া মাত্র বাহির হইবার সময়ও তেমনই পার্শ্বস্থ আকাশে ওইরূপ ঘূর্ণি জন্মাইয়া থাকে। উভয়েরই ফল সমান।

তড়িৎপ্রবাহের এই ধর্ম থাকায় আমরা উহাকে একটা কাজে লাগাই। কলিকাতায় তড়িদ্ভাণ্ড রাখিয়া, তদুৎপন্ন তড়িৎ তারযোগে দিল্লিতে পাঠানো চলে, দিল্লি হইতে সেই প্রবাহ হয় তারপথে অথবা ভূমিপথে আবার কলিকাতার তড়িদ্ভাণ্ডে ফিরিয়া আসে। দিল্লিতে তারের পাশে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে, ওই তারের প্রবাহিত তড়িৎপ্রবাহ ওই কাঁটাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিবে। ওই তার দিয়া তড়িৎপ্রবাহ পুনঃপুন চালাইতে ও থামাইতে থাকিলে কাঁটাতেও পুনঃপুন ধাক্কা লাগিয়া কাঁটার চাঞ্চল্য উপস্থি হইবে। এখন কলিকাতার লোকে আর দিল্লির লোকে আগে হইতে একটা পরামর্শ আঁটিয়া রাখিতে পারে। কাঁটায় একবার ঠেলা পড়িলে হইবে ক, দুইবার পড়িলে হইলে খ, তিনবারে হইবে শ। এইরূপে সংকেত দ্বারা উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চালানো চলিবে। এইরূপে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, তদ্বারা দূরের চুম্বকের কাঁটায় নাড়া দিয়া সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের নাম তারে খবর দেওয়া বা টেলিগ্রাম। দূরে খবর দেওয়া কেন, এই উপায়ে আমরা চঞ্চল কাঁটার আঘাতে দূরে ঘণ্টা পর্যন্ত বাজাইতে পারি, পিস্তল ছুড়িতে পারি বা আগুন জ্বালিতে পারি।

ওসকল কাজের কথা। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির গুপ্ত তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করেন, আর কাজের লোকে সেই আবিষ্কৃত তত্ত্বের সহায়তায় নিজের সুবিধা করে ও পরের সুবিধা করিয়া নিজে পয়সা উপার্জন করে। উহা বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অতএব ওসকল কাজের কথার অধিক আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

একটা তারকে যদি আংটির মতো চক্রাকারে জড়াইয়া উহাতে তড়িতপ্রবাহ চালানো যায়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতই চুম্বকের মতো কাজ করে। উহার সম্মুখে একটা চুম্বকের কাঁটা রাখিলে, সেই কাঁটাকে টানিয়া আপনার কেন্দ্রবর্তী করিতে চাহে। কাঁটাটা যেন ওই তড়িৎপ্রবাহ কর্তৃক উৎপাদিত হইয়া আবর্ত মধ্যে পড়িয়া আবর্তের টানে তারের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই আকর্ষণটা পরস্পরের প্রতি। আকর্ষণ মাত্রই পরস্পরের প্রতি। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী যেমন নারিকেলকে টানে, নারিকেলও তেমনই পৃথিবীকে টানে। তারের তড়িত প্রবাহ যেমন চুম্বকের কাঁটাকে টানে, চুম্বকের কাঁটাও সেইরূপ তড়িতপ্রবাহ সমেত তারকে টানে। কাঁটাটা যদি চাপিয়া ধরা যায়, আর তারটা স্বাধীনভাবে বিচরণক্ষম হয়, তাহা হইলে তারটাই কাঁটার অভিমুখে গিয়া কাঁটাকে আপনার কেন্দ্রে স্থাপন করিতে চাহে।

ফলে একটা চুম্বক যেমন আর একটা চুম্বককে আকর্ষণ করে, ওই তড়িৎপ্রবাহও তেমনই চুম্বককে ও চুম্বক তড়িৎপ্রবাহকে আকর্ষণ করে। ইহা তো হইবেই। চুম্বকের যে ধর্ম, তড়িৎপ্রবাহেরও সেই ধর্ম। একটা চুম্বক যেমন পার্শ্বস্থ আকাশে আবর্ত উৎপাদন করে, ওই তড়িৎপ্রবাহও তেমনই আবর্ত উৎপাদন করে। চুম্বকের ক্ষুদ্র কণিকাগুলিও ছোট চুম্বক, হয়তো উহার প্রত্যেক অণুটাই এক-একটি ছোট চুম্বক। এই জন্য আম্পেয়ার নামক পণ্ডিত মনে করিয়াছেন যে, চুম্বকের লোহার প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া তড়িৎপ্রবাহ বহিতেছে। প্রত্যেক অণুকে বেষ্টন করিয়া যেন একটা তড়িৎপ্রবাহের ছোট আংটি পরানো আছে। ওইরূপ

অনুমান অসঙ্গত নহে। দুইটা তারের আংটি পরস্পর সমান্তরালভাবে রাখিয়া ওই তারে তড়িৎপ্রবাহ চালাইলেও ওইরূপ ঘটনা দেখা যায়। দুইটা প্রবাহ যেন দুইটা চুম্বক। তড়িৎপ্রবাহ দুই তারে একমুখে চলিলে এ-তারটা ও-তারকে আকর্ষণ করে। উভয়ের আকর্ষণে পরস্পর সন্নিকর্ষে আসিবার চেষ্টা করে। তড়িৎপ্রবাহ দুই তারে একমুখে না চলিয়া ভিন্নমুখে চলিলে পরস্পর আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ ঘটে; পরস্পর দূরে যাইবার চেষ্টা করে। একটা চুম্বকের কাঁটার উত্তর মুখ যেমন অন্য কাঁটার উত্তর মুখকে ঠেলিয়া দূরে পাঠাইবার চেষ্টা করে, সেইরূপ।

একটা তারের তড়িৎপ্রবাহ অন্য তারের তড়িৎপ্রবাহকে এইরূপে টানিয়া আনে বা ঠেলিয়া দেয়। তড়িৎপ্রবাহের এই ক্ষমতাকেও কাজের লোকে কাজে লাগাইয়াছে। এই আকর্ষণের ও বিকর্ষণের সাহায্য লইয়াই আজকাল তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ টানিয়া বা ঠেলিয়া পাখা টানা হইতে গাড়ি চালানো পর্যন্ত সাধ্য হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় ট্রামগাড়ি তড়িৎপ্রবাহের বলে চলিতেছে; ভদ্রলোকের বাড়িতে উহারই বলে পাখা টানা হইতেছে। ইহার মূল এইখানে। এসকল কাজের লোকের কাজের কথা। ইহার আলোচনায় অধিক সময় দিব না।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা আসল কথা আছে। একটা তারের তড়িৎপ্রবাহ অন্য তারের তড়িৎপ্রবাহকে টানে; তার সমেত টানে; আবার একটা চুম্বকও তার সমেত তড়িৎপ্রবাহকে টানে। কখনও টানে, কখনও বা ঠেলে। টানুকই আর ঠেলুকই, উহার ফলে গতি উৎপন্ন হয়। যাহা ছিল স্থির, তাহা হয় অস্থির। যাহা ছিল নিশ্চল, তাহা হয় গতিশীল। গতি উৎপাদনের ফল শক্তি উৎপাদন। তামার তার গতিশীল হইলেই উহা খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জন করে। ওই শক্তি অবশ্য সৃষ্ট হইতে পারে না। শক্তির সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই। বুঝিতে হইবে, গুপ্ত শক্তি রূপান্তরিত হইয়া ব্যক্ত শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। কোন শক্তির পরিণামে এই ব্যক্ত শক্তির উৎপত্তি? খুঁজিলেই সন্ধান মিলিবে। দেখা যাইবে, যে তারে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে, সে তারটা যতটা গরম হওয়া উচিত ছিল, ততটা গরম হয় নাই। পরিচালক ধাতু দ্রব্যে তড়িৎপ্রবাহ চলিতে থাকিলে উহা গরম হয়। উহাতে খানিকটা তাপ জন্মে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইবে, তাপের পরিমাণটা কমিয়া গিয়াছে। তাপের পরিমাণের সঙ্গে-সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মাত্রাও কমিয়া গিয়াছে। আচ্ছা, যে সময়ে যতটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছিল, এখন সে সময়ে ততটা তড়িৎ প্রবাহিত হইতেছে না। মনে করা যাইতে পারে, আগে কেবল ধনতড়িতেরই প্রবাহ তার দিয়া যাইতেছিল, এখন খানিকটা ঋণতড়িতের প্রবাহও উৎপন্ন হইয়া ধনতড়িতের প্রবাহকে কমাইয়া দিয়াছে। অথবা ঋণতড়িতের প্রবাহ চলিতেছিল; এখন খানিকটা ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া উহাকে কমাইয়া দিয়াছে।

চুম্বকের কাছেই হউক, আর তড়িৎপ্রবাহের কাছেই হউক, অন্য একটা তড়িৎপ্রবাহ রাখিলে—জোর করিয়া চাপিয়া স্থিরভাবে রাখিলে, ওই তড়িৎপ্রবাহের শক্তি কেবলই তাপে পরিণত হয়। তড়িৎ ভাণ্ডের মধ্যে দস্তার সহিত গন্ধকদ্রাবকের যোগে যে শক্তির উৎপত্তি হইতেছিল, তাহার সমস্তটাই তারের মধ্যে তাপে পরিণত হয়। কিন্তু ওই তড়িৎপ্রবাহকে চাপিয়া না ধরিলে উহা তার সমেত গতিশীল হইবে। খানিকটা ব্যক্ত শক্তি উপার্জন করিবে। সঙ্গে-সঙ্গে উহাতে তাপের উৎপত্তি কমিয়া যাইবে, তড়িৎপ্রবাহও ক্ষীণ হইয়া পড়িবে।

ধনতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ঋণতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, আর ঋণতড়িতের প্রবাহ থাকিলে ধনতড়িতের প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া আদি প্রবাহকে ক্ষীণ করিয়া দিবে।

তারটা যত দ্রুত গতি অর্জন করিবে, উহার তড়িৎপ্রবাহ ততই ক্ষীণ হইবে। এই ক্ষীণ হওয়ার অর্থ উলটা প্রবাহের উৎপত্তি।

তাই একটা তারকে একটা চুম্বকের কাছে ঘুরাইয়া উহাতে ঋণতড়িতের বা ধনতড়িতের প্রবাহ ইচ্ছামতো উৎপন্ন করা চলে। যত দ্রুত ঘুরাইবে, ওই উৎপাদিত তড়িতপ্রবাহ ততই বলবান হইবে। আদি প্রবাহকে ইহা ক্রমেই ক্ষীণ করিবে। এমনকী, আদি প্রবাহ অপেক্ষা এই নূতন প্রবাহকে বলবত্তর করা যাইতে পারে; আদি প্রবাহ অতি ক্ষীণ, এমনকী, নগণ্য হইলেও এই নূতন উলটা প্রবাহ উহা অপেক্ষা বলবত্তর করা চলে। সে ক্ষেত্রে অবশ্য তড়িদ্ভাণ্ডে উৎপাদিত শক্তিতে কুলায় না। বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়; কুলি খাটাইয়াই প্রয়োগ করো বা কয়লা পোড়াইয়া ইঞ্জিনযোগেই প্রয়োগ করো। এ কালে ডাইনামো নামক এক বৃহৎ যন্ত্রে ইঞ্জিনযোগে বড়-বড় তারের আংটি চুম্বকের নিকট বা অন্য ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহের নিকট ঘুরাইয়া ওই আংটিতে প্রচুর প্রবাহ জন্মানো হইতেছে। এক-একটা ডাইনামোতে যেরূপ প্রবল প্রবাহ জন্মে, তড়িৎ ভাণ্ডারের সাহায্যে তত প্রবল প্রবাহ উৎপাদন অসম্ভব। এই সকল প্রবল তড়িৎপ্রবাহ যোগেই শহরের রাস্তায় ট্রামগাড়ি চালানো ও লোকের বাড়িতে পাখা টানা হইতে বিজলি বাতি জ্বালা পর্যন্ত কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন জ্যোতিষ

এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনকাল হইতে ইউরোপের লোকে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ করেন। আমরা আমাদের অতীতের গুণগৌরবে এত মুগ্ধ যে, সেকালে কি ছিল কি না-ছিল, অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখি না। তবে ইংরেজ লেখকের তর্জমা হইতে দুই চারিটা বাক্য সংকলন করিয়া সেই ভিত্তির উপর পদনির্ভর করিয়া তাণ্ডব নৃত্যে ব্রহ্মাণ্ড কম্পমান করিবার ক্ষমতা আমাদের প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে সংশয় নাই। কে বলে আমাদের কোপার্নিকাস ছিল না! কে বলে আমাদের নিউটন ছিল না!

যাহা হউক, এ পর্যন্ত ইউরোপে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি কল্পান্ত পর্যন্ত যেখানে যাহা কিছু আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইবে, তৎসমুদয়ই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে কোনও-না-কোনও নিগূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে, ইহা একরকম আমাদের মধ্যে সর্ববাদীসম্মত; এবং সেইসঙ্গে ইউরোপে বা অন্যত্র এ পর্যন্ত কী আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতেছে, এবং আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের কোন অন্ধকার গুহায় কোনও তথ্য লুক্কায়িত আছে বা না আছে, এ সম্বন্ধে আমাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, ইহাও একরকম সর্ববাদীসম্মত। সুতরাং আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে দুই চারিটা স্থূল কথা পাঠকের সমীপস্থ করিবার পূর্বে মার্জনাভিক্ষা আবশ্যক। তথাপি, প্রাচীন কালের অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রাচীন কালের জ্ঞানার্জনপন্থার সহিত আমাদের অধুনাতন জ্ঞানের পরিমাণ ও জ্ঞানার্জনপন্থার তুলনা করিলে পদে-পদে শোচনীয় অধঃপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত, কোথায় সে দিন, উচ্চারণ না করিয়া থাকা যায় না।

কীরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে প্রাচীনেরা জ্যোতিষ্কগণের স্থিতি গতি পর্যবেক্ষণ করিতেন, কীরূপে hypothesis নির্মাণ দ্বারা তাহাদের স্থিতি গতি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, কীরূপ উৎকট গণিত প্রয়োগে তাহাদের স্থিতি গতি গণনা করিতেন, ও কীরূপেই বা গণনার সহিত পর্যবেক্ষিত ফলের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইতেন, তাহা এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। সেকালের জ্যোতিষশাস্ত্রের দুই চারিটা স্থূল কথা বিবৃত করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রথম, পৃথিবীর আকার। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর আকার ও আয়তনের নিরূপণ জ্যোতিষের প্রথম বিষয়।

পৃথিবীর ত্রিকোণাকৃতি সম্বন্ধে বড়-বড় লোকের বড়-বড় উক্তি বর্তমান থাকিলেও জ্যোতিষশাস্ত্রে পৃথিবীর গোলত্ব অতি প্রাচীন কালেই স্বীকৃত হইয়াছিল। গোলত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি আজকাল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখনই ঠিক সেই-সেই যুক্তি প্রদত্ত হইত। যথা, পৃথিবী গোল না হইলে দৃষ্টি প্রতিষেধক ক্ষিতিজ রেখা (horizon) সর্বত্র বৃত্তাকার হইত না; গোল না হইলে উত্তরমুখে গমনকালে উত্তরস্থ তারকাগণের ক্রমশ উন্নতি লক্ষিত হইত না; গোল না হইলে চন্দ্রগ্রহণকালে দৃষ্ট পৃথিবীর ছায়া বৃত্তাকার হইত না; ইত্যাদি।

ভূগোলপৃষ্ঠ বিবিধ কল্পিত রেখা দ্বারা বিভক্ত হইত। অবস্থিতি, দূরত্বনির্দেশ,

উদয়াস্তগমনকালের অন্তর, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য এইরূপ রেখার কল্পনা এক্ষণে আবশ্যক হয়, তখনও আবশ্যক হইত। ভূগোলে সুমেরু-কুমেরু দুইটি বিন্দু নির্ধারণ করিয়া উভয় স্থান হইতে সমদূরবর্তী পরিধিটি নিরক্ষবৃত্ত নামে অভিহিত হইত। স্থানবিশেষ হইতে উত্তরদক্ষিণবর্তী সুমেরুকুমেরু-ভেদী একটি বৃত্ত আঁকিয়া মধ্যরেখা নিরূপিত হইত। নিরক্ষবৃত্ত হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে অক্ষাংশ ও মধ্যরেখা হইতে পূর্বে বা পশ্চিমে দেশান্তর, এই উভয়বিধ দূরত্ব নির্ধারণ দ্বারা ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্দিষ্ট হইত। বলা বাহুল্য, এখনো ঠিক এই উপায়ে বিভিন্ন স্থানের ভূপৃষ্ঠে অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমরা জানি, ভূমণ্ডল সম্পূর্ণ বর্তুলাকার নহে, নিরক্ষপ্রদেশসমীপে কিঞ্চিৎ স্ফীত ও মেরুপ্রদেশে "কিঞ্চিৎ চাপা"। এই স্ফীতির পরিমাণ নির্ধারণের মোটামুটি দুইটা উপায় আছে। প্রথম, নিরক্ষ প্রদেশের নিকটে দশ মাইল বা দশ যোজন পথ উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুবতারা যতখানি উন্নত হয়, মেরুপ্রদেশসমীপে দশ মাইল বা দশ যোজন উত্তরমুখে চলিলে ধ্রুবতারা ঠিক ততখানি উন্নত হয় না। পৃথিবী ঠিক বর্তুলাকার হইলে উভয়ত্রই সমান উন্নতি লক্ষিত হইত। দ্বিতীয়, নিরক্ষপ্রদেশে পেন্ডুলম বা পরিদোলক যন্ত্র এক মিনিটে যতবার দোলে, মেরু প্রদেশে পেন্ডুলম তাহার অপেক্ষা কিছু অধিক বার দোলে। সেকালে পেন্ডুলমের ব্যবহার ছিল না, এবং স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া ধ্রুবতারার উন্নতি দেখিবারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং ভূমণ্ডল ঠিক বর্তুলাকার বলিয়াই গৃহীত হইত। কিন্তু তাহাতে বড় আসে যায় না; কেন-না, সে সেকাল আর এ একাল।

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ঠিক উত্তর দিক নিরূপণ করা একটা বৃহৎ সমস্যা। ঠিক মধ্যাহ্নকালে ভূপৃষ্ঠে একটি যষ্টি খাড়া করিয়া তাহার ছায়া দেখিলে এই দিক নিরূপিত হইতে পারে। তবে ঠিক মধ্যাহ্নকাল অথবা মধ্যাহ্নক্ষণের নিরূপণ দুর্ঘট ব্যাপার। একটি সুচারু সহজ কৌশলে এইটি নিরূপিত হইত। 'অম্বুসংশুদ্ধ' (অর্থাৎ যাহার পৃষ্ঠদেশ স্থির অম্বুপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল, এইরূপ) শিলাতলে শঙ্কু দণ্ডায়মান রাখিয়া পূর্বাহ্নে যে-কোনও সময়ে ছায়ার গায়ে-গায়ে রেখা টানো। অপরাহ্নে যখন ছায়া ঠিক আবার সমান দৈর্ঘ্যযুক্ত হইবে, সেই সময়ে ছায়ার গায়ে আর একটি রেখা টানো। এই দুই রেখার অন্তর্বর্তী কোণকে জ্যামিতিশাস্ত্রোক্ত উপায়ে দ্বিখণ্ডিত করিলেই মধ্যাহ্নকালের ছায়া-রেখা পাওয়া যাইবে। বলা আবশ্যক, এই উপায়ে উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করিলে একটু ভুল থাকে। পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্ন মধ্যে সূর্যের গতির ব্যত্যয় তাহার প্রধান কারণ। সুতরাং আজিকালি উত্তর দিক নির্ণয়ে আরও সূক্ষ্মতর উপায় ব্যবহৃত হয়। সে যাই হউক, উল্লিখিত "অম্বুসংশুদ্ধ" শব্দটির গভীরার্থকতা অনুধাবন করিলেই সেকালের জন্য উষ্ণ শ্বাস আপনা হইতে নির্গত হয়।

ভূপৃষ্ঠে কোন স্থলের অবস্থাননির্দেশের জন্য সেই স্থলের অক্ষাংশের (latitude) অবধারণ আবশ্যক। প্রধানত দুই উপায়ে অক্ষাংশ অবধারিত হইত। প্রধানত দুই উপায়ে অক্ষাংশ অবধারিত হইত। প্রথম, ক্ষিতিজরেখা হইতে ধ্রুবতারার উন্নতি নির্ধারণ; দ্বিতীয়, যে দিন দিবারাত্রি সমান হয়, সেই দিন মধ্যাহ্নে নভোমণ্ডলে ঊর্ধ্বস্বস্তিক বিন্দু হইতে, অর্থাৎ যে বিন্দু ঠিক মস্তকের ঊর্ধ্বে রহিয়াছে (zenith), সেই বিন্দু হইতে সূর্যমণ্ডলের অবনতি-নিরূপণ। বলা বাহুল্য, ভূগোলের নিরক্ষদেশের স্ফীতিটুকু উপেক্ষা করিলে অক্ষাংশনির্ধারণের এই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। আজ পর্যন্ত আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে অক্ষাংশ নিরূপণের এই উপায়ই

শিখাইয়া থাকি। প্রয়োগের সময় যে সকল সাবধানতা বা সংশোধন আবশ্যক, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

উর্ধ্বস্বস্তিক হইতে সূর্যের অবনতি চক্রযন্ত্র দ্বারা সহজেই বাহির হইত। আর একটা কৌশল ব্যবহৃত হইত। নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত শঙ্কু প্রোথিত করিয়া তাহার ছায়ার পরিমাণের দ্বারা সূর্যের অবনতি গণীত হইত।*

তারপর পৃথিবীর আয়তন। অক্ষাংশ নিরূপিত হইলে পৃথিবীর পরিধি কত মাইল, কি কত যোজন, তাহা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। একালেও এই উপায়, সেকালেও এই উপায়। মনে করো, কৃষ্ণনগর কলিকাতার ঠিক উত্তরে। কৃষ্ণনগরের অক্ষাংশ হইতে কলিকাতার অক্ষাংশ বাদ দিলেই উভয়ের অক্ষান্তর কত অংশ পাওয়া যায়। তারপর কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা কত মাইল মাপিয়া দ্যাখো। সুতরাং এত অংশ অক্ষান্তরে এত মাইল ব্যবধান স্থির হইল। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ অংশে বিভক্ত। তারপর ত্রৈরাশিক; এক অক্ষ-অংশে যদি এত মাইল, ৩৬০ অংশে কত মাইল হইবে? পৃথিবীর পরিধি কত মাইল, এইরূপে বাহির হইত। আর্যভটের গণনায় পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন; এক যোজনে চারি ক্রোশ, ও দশ ক্রোশে উনিশ মাইল, এই হিসাবে আর্যভট্টের মতে ভূপরিধি ২৫০৮৫ মাইল। একালের গণনায় পরিধি ২৪৯০০ মাইল। পরিধি হইতে ব্যাস ও পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল বাহির হয়। ভাস্করাচার্য বলেন, ব্যাসকে পরিধির পরিমাণ দিয়া গুণ করিলেই পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। এই হিসাবে কোন ভুল নাই। পরিধির সহিত ব্যাসের সম্বন্ধ বাহির করিতে গাণিতবিদগণকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্বন্ধ যত দূর ইচ্ছা সূক্ষ্মতার সহিত বাহির করা যাইতে পারে। মোটামুটি উভয়ের সম্বন্ধ ২২ ঃ ৭ ধরা যায়। আর্যভট সেই হিসাবেই ধরিয়াছেন। কেহ-কেহ আরও স্থূল হিসাবে পরিধির বর্গকে ব্যাসের বর্গের দশগুণ ধরিয়া লইয়াছেন। ভাস্করাচার্য আরও সূক্ষ্ম ধরিয়া ৩৯২৭ ঃ ১২৫০ ধরিয়া গণনা করিয়াছেন।

নিরক্ষদেশের উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানে নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল একটি বৃত্ত ভূপৃষ্ঠে অঙ্কিত করিলে তাকে স্ফুটপরিধিবৃত্ত বলে। ইহার ইংরেজি নাম Parallel of latitude; এই বৃত্ত নিরক্ষবৃত্ত হইতে যত দূরে লওয়া যাইবে, ততই ইহার পরিমাণ ছোট হইবে। কলিকাতার অক্ষাংশ, অর্থাৎ কলিকাতা নিরক্ষবৃত্ত হইতে কত অংশ উত্তরে, জানা থাকিলেই কলিকাতার স্ফুটপরিধিবৃত্তের পরিমাণ জানা যায়। বলা বাহুল্য, এই স্ফুটপরিধির পরিমাণের উপায় সেকালে জানা ছিল। কলিকাতার কত ক্রোশ পূর্বদিক কয় দণ্ড আগে সূর্যোদয় হইবে, নির্ধারণের এই স্ফুটপরিধি পরিমাণের প্রয়োজন।

ইংরেজরা গ্রিনিচ নগরের মধ্যে দিয়া ভূগোলের মধ্যরেখা কল্পনা করেন, এবং সেই মধ্যরেখার পূর্বে বা পশ্চিমে অন্য স্থানের দেশান্তর (longitude) মাপিয়া থাকেন। সেকালে

* এইরূপ গণনা ত্রিকোণমিতির বিষয়। জ্যোতিষিক গণনার জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতির সৃষ্টি ও চর্চা আবশ্যক হইয়াছিল। উক্ত গণনার একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভুজ ও কোটির পরিমাণ হইতে কোটির সম্মুখীন কোণের পরিমাণ গণিতে হয়। সম্প্রতি এইরূপ স্থলে দুইটি রেখার পরিমাণ হইতে একটি কোণের পরিমাণ নির্ধারণ আবশ্যক হইলে উচ্চগণিতসম্মত বিশ্লেষণক্রিয়া দ্বারা যত দূর ইচ্ছা সূক্ষ্মভাবে ফল বাহির করা হইতে পারে। ভাস্করপ্রণীত প্রাচীন গ্রন্থে কোণ গণনার যে হিসাব দেওয়া আছে, তাহা ধরিয়া গণনা করিলে অধিক ভুল হয় না।

মধ্যরেখা উজ্জয়িনী নগর ভেদ করিয়া কল্পিত হইয়াছিল, এবং সেইখান থেকে অন্যান্য স্থানের দেশান্তর পরিমিত হইত।

তারপর পৃথিবীর গতি। আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিলে সে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক গতির কথা এক নিশ্বাসে উল্লেখ করিবে। তবে উভয় গতির পক্ষে প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া কিছু কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের বোধ হয়, যেন সমুদয় নক্ষত্রচক্র প্রত্যহ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে; পৃথিবী সেই নক্ষত্রচক্রের কেন্দ্রগত। পৃথিবী ঘুরিতেছে, নক্ষত্রচক্র স্থির আছে, কি নক্ষত্রচক্র ঘুরিতেছে ও পৃথিবী স্থির আছে, ইহা লইয়া বিতণ্ডা একালেও যেমন চলিয়াছিল, সেকালেও তেমনি চলিয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র পৃথিবী ঘুরিতেছে মনে করিলেই যখন চলে, তখন ওই প্রকাণ্ড নক্ষত্রচক্রটা ঘুরাইবার দরকার কী, সাধারণত এই ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। ফলত এই যুক্তি একরকম অকিঞ্চিৎকর; ইহাতে মীমাংসা কিছুই হয় না। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্য প্রবল প্রমাণ আছে; ফুকো সাহেবের উদ্ভাবিত পেন্ডুলম তাহার অন্যতম। কিন্তু সেকালে, যখন বলবিজ্ঞানের অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই, তখন এ প্রমাণ প্রয়োগের অবকাশ ছিল না। আর্যভট তীক্ষ্নদৃষ্টিবলে বলিয়াছিলেন, পৃথিবীই ঘুরিতেছে, নক্ষত্রচক্রের আবর্তনস্বীকারে কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু আর্যভট্টের এই মত বহাল থাকে নাই। পরবর্তী পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আমল দেন নাই। তবে আর্যভট্টের মতের অস্বীকার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি বা অসুবিধা সেকালে অনুভূত হয় নাই। আর্যভট্টের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা আজকাল বালকোচিত বোধ হইতে পারে ও হাস্যোদ্রেকও করে। তবে গ্যালিলিও নিউটনের পূর্বে সে সকল যুক্তির ঠিক সঙ্গত উত্তর মিলিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

পৃথিবীই ঘুরুক, আর নক্ষত্রচক্রই ঘুরুক, এই আবর্তনে সূর্যের এবং গ্রহণক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক উদয়াস্তগমন সম্পাদিত হয়। এবং সূর্যের উদায়স্তগতিতেই দিবারাত্রি। দেশবিদেশে দেশান্তর অনুসারে অর্থাৎ মধ্যরেখা হইতে দূরত্ব অনুসারে উদয়কালের যে তারতম্য হয়, তাহা যে সহজেই গণিত হইত, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

তারকারও উদয়াস্তগতি আছে, এবং সূর্যেরও উদয়াস্তগতি আছে। কিন্তু এই উভয় জ্যোতিষ্কের মধ্যে উদয়াস্তগতি বিষয়ে বড়ই প্রভেদ আছে। তারকামাত্রই ঠিক এক সময়ে এক পাক ঘুরিয়া আসে। কিন্তু সূর্যের এক পাক ঘুরিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হয়। আজ সকালে যদি দেখিয়া থাকি, কোনও একটি তারকা ও সূর্য ঠিক একসঙ্গে উদিত হইল, কাল দেখা যাইবে, সেই তারকাটি একটু আগে উঠিল, আর সূর্য যেন একটু পিছাইয়া গিয়া একটু পরে উঠিল। ফলে সূর্য প্রত্যহই একটু-একটু করিয়া পিছাইয়া সংবৎসরে সমুদয় নক্ষত্রচক্রটাই পিছাইয়া যায়। আজ যে তারকার নিকট সূর্যকে দেখিয়াছিলাম, সেই তারকা হইতে সূর্য প্রত্যহ একটু-একটু পূর্বমুখে সরিয়া আবার এক বৎসর পরে সমগ্র নক্ষত্রচক্রটা ঘুরিয়া ঠিক সেই তারকার নিকট উপস্থিত হয়, ও পরবৎসরে পুনরায় পিছাইতে থাকে। ফলে আমাদের বোধহয় যেন নক্ষত্রচক্র প্রত্যহই পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে, সূর্যও সেইসঙ্গে ঘুরিতেছে; তবে সূর্য নক্ষত্রগুলিব সঙ্গে ঠিক সমান বেগে না গিয়া একটু-একটু পূর্বাভিমুখে পিছাইতেছে। একখানি গাড়ির চাকা যেন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে, ও তাহার পরিধির উপরে একটি পিঁপড়া যেন অন্যমুখে ধীরে-ধীরে চলিতেছে।

সূর্যের গতি এই রকম। বুধশুক্রাদি গ্রহগণের গতি আরও গোলমেলে। ইহারাও প্রত্যহ নক্ষত্রচক্রের সঙ্গে ঘুরে, এবং সূর্যের মতো ক্রমশ পিছাইয়া যায়। সূর্য পিছায় বটে, কিন্তু প্রতিদিন প্রায় সমান পরিমাণেই পিছায়। গ্রহগুলির পক্ষে এ কথা খাটে না। ইহারা কেহ বা খুব দ্রুতগতিতে পিছু চলে, কেহ বা মন্দগতিতে পিছু চলে। বুধ ও শুক্র খুব দ্রুত চলে; বৃহস্পতি ও শনি খুব ধীরে-ধীরে চলে। সূর্যের সমুদয় নক্ষত্রচক্র ঘুরিতে এক বৎসর সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতি প্রায় বার বৎসরে নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসে। শুধু তাহাই নহে; বুধ ও শুক্র, নক্ষত্রচক্রে স্বতন্ত্রভাবে চলে বটে, কিন্তু সূর্যকে ছাইয়া পূর্বে বা পশ্চিমে অধিক দূরে যায় না; উহারা যেন কোনওরূপে সূর্যে বাঁধা আছে। অন্য গ্রহগুলির পক্ষে তাহা নয়। ইহারা পূর্বমুখে পিছাইতে-পিছাইতে দুই চারি দিনের জন্য আবার পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়। বেশ পূর্বমুখে চলিতেছিল; চলিতে-চলিতে যেন অকস্মাৎ কিছু কালের জন্য পশ্চিমমুখে চলিতে লাগিল।

সুতরাং গ্রহগণের গতি অতি জটিল ও বিচিত্র। গ্রহগণের অবস্থিতির ও গতির গণনাই যখন জ্যোতিষ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন এই জটিলতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফল বাহির করিতে পারিলেই জ্যোতির্বিদ্যা সার্থক হয়।

সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে একদিন সহসা এই জটিলতার আবরণ মুক্ত হয়; এই দুর্গম গহন পথ পরিষ্কৃত হয়; আঁধার দেশ আলোকিত হয়। মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসে সেইদিন চিরস্মরণীয় হইবে; এবং যে ব্যক্তি শুভ্র আলোকবর্তিকা হস্তে করিয়া এই নিবিড় তিমির ভেদ করেন, তিনিও চিরজীবী হইবেন। এই ব্যক্তির নাম নিকলাস কোপার্নিকাস।

যদি ধরা যায়, নক্ষত্রচক্র স্থির আছে এবং সূর্য স্থির আছে এবং বুধ, শুক্র, পরে পৃথিবী, ও পরে মঙ্গলাদি গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে গ্রহগণের আকাশভ্রমণের যত কিছু জটিলতা, সমুদয় একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, এবং কোন গ্রহ কোন সময়ে কোন স্থানে থাকিবে, গণনা অবোধ বালকেরও আয়ত্ত হইয়া উঠে। কোপার্নিকাস পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সূর্যকেন্দ্রক গতির আবিষ্কর্তা। তাঁহার পূর্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে।

আমাদের আর্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক গতির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বার্ষিক সূর্যকেন্দ্রক গতির সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, পূর্বে এদেশে যে প্রণালীতে গ্রহগণের অবস্থিতি গণিত হইত, এবং এত জটিলতা সত্ত্বেও যেরূপ সূক্ষ্মভাবে ফল নিষ্কাশিত হইত, তাহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরি ও ওস্তাদি আছে। সেই বাহাদুরি ও ওস্তাদি দেখিলে এক দিকে বাহবা না দিয়া থাকা যায় না। অপর দিকে যখন দেখা যায়, তাঁহারা অসীম পরিশ্রমে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বনজঙ্গল ভাঙিয়া পাহাড় কাটিয়া সহস্র পদস্খলন এড়াইয়া বিপুলবিক্রমে দুর্গম শৈলশিখরের সমীপবর্তী হইয়াছিলেন; কেবল আর একটা লাফ দিতে পারিলেই শৈলশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া নির্মল বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টিরেখাবর্তী ও আলোকিত দেখিতে সমর্থ হইতেন; তখন আর পরিতাপের ইয়ত্তা থাকে না।

সেকালে কীরূপে গ্রহগণের অবস্থিতি নির্ণীত হইত, দুই একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। মনে করো বুধ গ্রহ। পূর্বে বলিয়াছি, সূর্য পূর্বমুখে এক বৎসরে অর্থাৎ প্রায়

তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে একবার নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসে। বুধগ্রহ ঠিক নক্ষত্রচক্রে ঘুরে না। বুধগ্রহ একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর চারি দিকে প্রায় ৮৮ দিনে এক পাক ঘুরিয়া থাকে, আর সেই নির্দিষ্ট বিন্দুটি যেন স্থির না থাকিয়া সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে চলে, অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে নক্ষত্রচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসে। সেই বিন্দুটি এক বৎসরে পৃথিবীকে ঘুরিতেছে, আর বুধগ্রহ সেই বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ৮৮ দিনে একবার সেই বিন্দুটি প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেন একখানা বড় চাকা পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে ঘুরিতেছে, ও আর একখানা ছোট চাকা সেই বড় চাকারই পরিধিস্থিত একটি বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে আটাশি দিনে অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। বুধগ্রহ যেন এই ছোট চাকার পরিধির উপর উপস্থিত। অথবা, আজকাল আমরা যেমন মনে করি, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, আর পৃথিবী চন্দ্রকে পাশে লইয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, কতকটা সেইরূপ। সুতরাং আজ বুধগ্রহ অমুক স্থানে আছে বলিয়া দিলে দশ দিন পরে কোথায় থাকিবে, গণনা বড়ই সহজ হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে স্থির করো, সেই বিন্দুটি দশ দিনে কত দূর যাইবে। এক বৎসরে যদি যায় ৩৬০ ডিগ্রি, দশ দিনে যাবে কত ডিগ্রি, এইরূপ হিসাব। তারপর বুধগ্রহ দশ দিনে বিন্দুর পার্শ্বে কতটুকু ঘুরিবে স্থির করো। ৮৮ দিনে ঘুরে পুরোপুরি এক পাক, দশ দিনে ঘুরিবে কতটুকু? প্রথমে পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া বিন্দুটিকে দশ দিনের পথ সরাইয়া দাও, পরে বিন্দুটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া বুধগ্রহকে দশ দিনের মতো এতটুকু ঘুরাইয়া দাও। এইরূপে দশ দিন পরে বুধের স্থান পাওয়া গেল।

এইরূপে অন্য অন্য গ্রহেরও স্থাননির্দেশ চলে। মনে করো বৃহস্পতি। বৃহস্পতি প্রায় ৪৩৩৩ দিনে অর্থাৎ কিছু কম বারো বৎসরে, একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে ধীরে-ধীরে ঘুরে। কিন্তু এই বিন্দুটি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে ৩৬৫ দিনে নক্ষত্রচক্রে ঘুরিয়া থাকে।

ফলে গ্রহমাত্রই এক একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর চারি ধারে নির্দিষ্ট কালে কেহ দ্রুতগতিতে অল্পকালে, কেহ মন্দগতিতে অধিক কালে, (বুধ আটাশি দিনে ও বৃহস্পতি প্রায় বারো বৎসরে) ঘুরিতেছে; আর সেই বিন্দুগুলি যেন সূর্যে কোনওরকমে সংলগ্ন থাকিয়া সূর্যের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক এক বৎসরে নক্ষত্রচক্রে পূর্বমুখে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপ হিসাব করিলে গণনাও সহজ হয়, এবং গণিতফলও প্রত্যক্ষের সহিত বেশ মিলে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে এইরূপ প্রণালীতে গ্রহস্ফুট গণনা হইত, এবং এখনও দৈবজ্ঞ মহোদয়েরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নির্বিকারচিত্তে এইরূপ প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপে টলেমি* এই প্রণালীতে গণনার উদ্ভাবনা করেন; এবং এই উদ্ভাবনাই জ্যোতির্বিদ্যাকে বিজ্ঞানপদে উন্নীত করে, এবং উদ্ভাবককেও যশস্বী করে।

গ্রহমাত্রই স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট কালে এক-একটি বিন্দুকে কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে, এবং সেই বিন্দুগুলি যেন সূর্যে কোনওরূপে বাঁধা আছে বা সংলগ্ন আছে; তাই সূর্য ঘুরিবার সময় তাহাদিগকেও টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এইখানে কল্পনাকে একটু জাগাইয়া যদি মনে করা যায়, বিন্দুগুলি সূর্যে আবদ্ধ থাকার দরকার কী, সূর্যকেই সেই বিন্দুগত মনে করো না কেন; তাহা হইলে কী দাঁড়ায়? না, গ্রহগণ নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকেই কেন্দ্রগত করিয়া ঘুরিতেছে,

* প্রকৃতপক্ষে এই প্রণালী কত প্রাচীন, নির্ণয় করা দুষ্কর। টলেমি ইহা সংস্কৃত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র।

এবং সূর্য তাহাদিগের সকলকে লইয়া পৃথিবীকে কেন্দ্রগত করিয়া নক্ষত্রচক্রে ঘুরিতেছে। আর একটা কথা। সূর্য পৃথিবীকে পূর্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিলেও যে ফল, পৃথিবী সূর্যকে পূর্বমুখে প্রদক্ষিণ করিতেছে বলিলেও সেই ফল। অর্থাৎ অন্যান্য গ্রহ যেমন, পৃথিবীও তেমনি, নির্দিষ্ট কালে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। অর্থাৎ কিনা, সূর্যই স্থির, আর পৃথিবীটাও একটি গ্রহ। ইহার উপর প্রতিদিন এক পাক করিয়া আর্যভট্টের কথামতো পৃথিবীর অবয়বটা ঘুরাইয়া দিলেই আর কিছু বাকি থাকে না। যাহা জটিল ছিল, তাহা সরল হয়; যাহা দুর্বোধ্য ছিল, তাহা সুবোধ্য হয়; যাহা আঁধার ছিল, তাহা আলো হয়। কেবল এই কল্পনাটার উদ্বোধনের দরকার; কেবল একটা লাফের দরকার। সেকালের লোকে কোন গতিকে এই লাফটা দিতে ভুলিয়াছিল। কোপার্নিকাস এই লাফ দিয়াছিলেন; তাই কোপার্নিকাসের জয়।

প্রাচীন মতে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, ইহারা তিনটি সূর্যসংলগ্ন বিন্দু প্রদক্ষিণ করিতেছে; এই বিন্দু তিনটির নামে বৃহস্পতি-শীঘ্র ও শুক্রে-শীঘ্র ও শনি-শীঘ্র। এখন আমরা দেখিতেছি, ইহারা তিনটি পৃথক বিন্দু নহে; সূর্য স্বয়ং সেই তিন বিন্দুর সহিত অভিন্ন। বুধ ও শুক্র যে দুই বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, তাহাদের প্রাচীন নাম বুধমধ্য ও শুক্রমধ্য। এখন দেখা যাইতেছে, এই বিন্দু দুটিও আর কিছু নহে; সূর্য স্বয়ং। নামকরণকালে এক পক্ষে শীঘ্র ও অন্য পক্ষে মধ্য কেন হইল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন।

এই বৃহস্পতি-শীঘ্রাদি এবং বুধমধ্যাদির ভ্রমণ ব্যতীত গ্রহদের নিজের সেই-সেই বিন্দুর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণের যে কাল নির্দিষ্ট আছে, আমরা হাল হিসাবে তাহা সূর্য-প্রদক্ষিণকালের সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সেকালে নির্ধারিত গ্রহগণের কেন্দ্রপ্রদক্ষিণ (অর্থাৎ সূর্য-প্রদক্ষিণ) কালের সহিত অধুনাতন কালে নানাবিধ যন্ত্রাদিযোগে সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত সূর্য-প্রদক্ষিণকালের তুলনার জন্য নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া গেল। পাঠকগণ সেকালের ও একালের পর্যবেক্ষণ তুলনা করিবেন।

গ্রহ	সূর্য সিদ্ধান্ত মতানুযায়ী ভগণকাল			পাশ্চাত্যমতে ভগণকাল		
	দিন	দণ্ড	পল	দিন	দণ্ড	পল
বুধ	৮৭	৫৮	১০	৮৭	৫৮	০
শুক্র	২২৪	৪১	৫৫	২২৪	৪২	২
পৃথিবী	২৬৫	১৫	৩২	৩৬৫	১৫	২২
মঙ্গল	৬৮৬	৫৯	৫১	৬৮৬	৫৮	৪৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২	১৯	১৪	৪৩৩২	৩৫	৩৫
শনি	১০৭৬৫	৪৬	২	১০৭৫৯	১৩	১০

ফলিত জ্যোতিষের আচার্য মহাশয়গণ বাহুযুদ্ধে আহ্বান করিবেন, এরূপ আশঙ্কা বর্তমান থাকিলেও এ প্রস্তাবে আমরা বলিতে পারি যে, অন্যান্য গ্রহের গতির সহিত আমাদের তেমন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু পৃথিবীর গতির, অথবা প্রাচীন কালের হিসাবে সূর্যের গতির সহিত, আমাদের সম্বন্ধ বড়ই ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই গতির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে।

পূর্বে বলা গিয়াছে, সূর্য নক্ষত্রচক্রে পূর্বমুখে খানিকটা করিয়া হঠিয়া যায়। কিন্তু এই গতির বেগ সংবৎসর প্রায় সমান থাকিলেও ঠিক সমান থাকে না। সূর্য কখন একটু দ্রুত, কখন একটু ধীরে চলে। বারো মাস সমান বেগে চলিলে গণনায় কোনও গোলযোগ ঘটিত না। কিন্তু কখন একটু ধীরে, কখন বা একটু দ্রুত চলায় গণনায় জটিলতা আসে।

এই ব্যতিক্রম দুই কারণে ঘটে। প্রথম, সূর্যের পথ ঠিক নিরক্ষবৃত্তের সহিত এক সমতলে বর্তমান নাই। অর্থাৎ সূর্য সংবৎসর কাল নিরক্ষবৃত্তের উপরে থাকে না। একটু পাশ কাটিয়া কখন একটু উত্তরে আসে, কখন বা একটু দক্ষিণে যায়; বৎসরে দুই বার মাত্র ঠিক নিরক্ষবৃত্তের উপরে আসে। একবার চৈত্র মাসে, একবার আশ্বিনে। চৈত্রের পর ক্রমে উত্তরে গিয়া ২৩।।০ অংশ পর্যন্ত উত্তরে যায়; আশ্বিনের পর ক্রমে দক্ষিণে গিয়া ক্রমে ২৩।।০ অংশ পর্যন্ত দক্ষিণে যায়। জ্যোতিষের ভাষায় বলিতে গেলে, রবিমার্গ পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তকে ২৩।।০ অংশ (সূক্ষ্ম হিসাবে ২৩ অংশ ২৮ মিনিট) কোণ রাখিয়া দুই জায়গায় ছেদ করিয়াছে। হিন্দু জ্যোতিষে ২৩।।০ অংশকে ২৪ অংশ ধরা রীতি আছে। নিরক্ষবৃত্ত ও রবিমার্গের মধ্যগত কোণকে ক্রান্তি বলে। অতি প্রাচীন কালে এই ২৪ অংশ ক্রান্তি নির্ণীত হইয়াছিল। এই যে আধ অংশ ভুল এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ইহা বোধ করি কখনও সংশোধিত হয় নাই। এই ক্রান্তির পরিমাণ আবার চিরকাল ঠিক সমান থাকে না।* কোন সময়ে ক্রান্তির পরিমাণ ২৪ অংশ নির্ধারিত হইয়াছিল, না জানিলে কতটুকু পর্যবেক্ষণের দোষে, আর কতটুকু স্বাভাবিক ক্রান্তিহ্রাসের কারণে, এই আধ অংশ তফাত দাঁড়াইয়াছে, বলা দুর্ঘট হইয়া পড়ে।

বলা বাহুল্য, সূর্যের এই উত্তর দক্ষিণমুখ গতির কারণে, অর্থাৎ এই উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বশে ঋতুপরিবর্তন ও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু হইতে ২৩।।০ অংশ দূরস্থ দেশ পর্যন্ত সময়ে-সময়ে এমন ঘটে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের অস্তগমনই হয় না, অথবা সূর্যের উদয়ই হয় না। কোন স্থানে কোন সময়ে দিবারাত্রির পরিমাণ কত হইবে, তাহা সেকালে ত্রিকোণমিতি প্রয়োগে নিরূপিত হইত। মেরুস্থলে ছয়মাস দিন, ছয়মাস রাত্রি, কেবল আমরাই জানি, আর প্রাচীনেরা জানিতেন, না, এরূপ নহে।

সূর্যের গতির অনিয়মের আর একটি কারণ আছে। সূর্যের পথ (আজকাল বলিব, পৃথিবীর পথ) ঠিক বৃত্তাকার নহে। কেপলার প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, এই পথ বৃত্তাভাস ক্ষেত্রাকার। বৃত্তাভাসের ইংরেজি নাম ellipse। পথের আকার এইরূপ হওয়ায় সূর্য সংবৎসর ব্যাপিয়া পৃথিবী হইতে সমান দূরে থাকে না; কখনও একটু বেশি দূরে থাকে ও ধীরে চলে; কখনো একটু কম দূরে থাকে ও দ্রুত চলে। সম্প্রতি পৌষের মাঝামাঝি অন্য সময়ের চেয়ে নিকটে থাকে ও আষাঢ়ের মাঝামাঝি অন্য সময়ের চেয়ে দূরে থাকে। এই কারণে শীতকালে সূর্য দ্রুত চলে ও গ্রীষ্মকালে সূর্য ধীরে চলে, এবং এই কারণেই বৎসরের মধ্যে শীতার্ধটা এখন ছোট, ও গ্রীষ্মার্ধটা এখন বড়।

এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখিলে বোধ হইবে, ইংরেজিমতে পঞ্জিকাগণনা অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন মতের গণনা সমধিক যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রথম কথা, বৎসরে প্রায় ৩৬৫।।০ দিন; কিন্তু বাধ্য হইয়া সকলকেই ৩৬৫ দিনে ব্যবহারিক বৎসর ধরিতে হয়। এজন্য

*৪০০০ বৎসর পূর্বে এই বক্রতা ২৪ অংশের কাছাকাছি ছিল। আরও কয়েক বৎসর পরে ইহা প্রায় ২৩ অংশে দাঁড়াইবে। শুনা যায়, প্রাচীন মিশরের ও কালদিয়া দেশের লোক এই ক্রান্তিহ্রাস আবিষ্কার করিয়াছিল।

যে ভুল ঘটে, ইংরেজি পঞ্জিকায় তাহার চারি বৎসর অন্তর একদিন যোগ করিয়া সংশোধিত হইয়া থাকে। আমাদের পঞ্জিকায় বৎসর-বৎসর সঙ্গে-সঙ্গে সংশোধনের ব্যবহার আছে। দ্বিতীয় কথা, ইংরেজি বারো মাসের দিনসংখ্যার যে আঁটাআঁটি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ব্যবহারে কিছু সুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি কিছুই নাই। আমাদের পঞ্জিকামতে মাসের দিনসংখ্যা ঠিক সূর্যের গতির বেগানুসারে নির্ধারিত হয়। গ্রীষ্মকালে মাসগুলা বড় হয়, কেন না, সূর্য তখন ধীরে চলে; শীতকালে ছোট হয়, কেন না সূর্য তখন দ্রুত চলে। এই জন্যই সূর্যের উত্তরদেশভ্রমণে (১০ চৈত্র হইতে ১০ আশ্বিন পর্যন্ত) ১৮৭ দিন, এবং দক্ষিণভ্রমণে (১০ আশ্বিন থেকে ১০ চৈত্র পর্যন্ত) ১৭৮ দিনমাত্র অতিবাহিত হয়।

সূর্যের ভ্রমণপথ বৃত্তাভাস, এবং পৃথিবী ঠিক সেই পথের মধ্যস্থলে বা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নহে, একটু পাশ চাপিয়া রহিয়াছে, এই জন্যই উল্লিখিত গোলযোগ। সেকালে সূর্যের পথ ঠিক বৃত্তাভাস বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বৃত্তাভাসের তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু সূর্যের এই অনিয়ম গতি গণনার জন্য একটু কারিকুরির দরকার হইত। দুইটা বিন্দু খুব কাছাকাছি গ্রহণ করিয়া সেই বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া ঠিক সমান দুইটি বৃত্তে টানো। একটি বৃত্তের কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত, এবং সূর্য দ্বিতীয় বৃত্তে সমান বেগে ভ্রমণশীল, এইরূপ ধরিয়া লইলে, সূর্যের বেগ কখনও একটু অধিক, কখনও বা একটু কম বলিয়া আমাদের কেন বোধহয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। পৃথিবীকেন্দ্রক বৃত্তটিকে প্রতিবৃত্ত বলা যায়। উভয় বৃত্তের কেন্দ্র দুইটির দূরত্ব যদি অধিক না হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিবৃত্তে ভ্রমণ আর বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ, উভয়ে অধিক পার্থক্য দাঁড়ায় না।

এইরূপ প্রতিবৃত্তের কল্পনা করিয়া যে প্রণালীতে সূর্যের অবস্থিতি গণনা হইত, সেই প্রণালী আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জ্যোতিষেও বর্তমান আছে। তাহার মৌলিক পরিবর্তন কিছুই হয় নাই। প্রণালীটির বিস্তৃত বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভব না। গণনার জন্য প্রতি পদে ত্রিকোণমিতির সাহায্য আবশ্যক; এবং উপরে বলিয়াছি, এই কার্যসাধনের জন্য সেকালে ত্রিকোণমিতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

সূর্যের গতির সম্বন্ধে আর একটি কথা। রবিমার্গ ঠিক বৃত্তাকার নহে, অর্থাৎ পৃথিবী সকল সময়ে সূর্য হইতে সমান দূরে থাকে না। রবিমার্গ যে দুই স্থলে ১০ চৈত্র তারিখে এবং ১০ আশ্বিন তারিখে বিষুবরেখাকে ছেদ করে, সেই দুই স্থানের নাম ক্রান্তিপাত। এই ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয় আকাশে একত্র স্থির নহে; ক্রান্তিপাত দুইটা ক্রমশ পশ্চিমে একটু-একটু সরিয়া যাইতেছে। ইহাদের গতি এত ধীর যে, বহুকালব্যাপী পর্যবেক্ষণ ব্যতীত এই গতি ধরা পড়ে না। বাস্তবিকই সৌরজগতের অন্যান্য গতির তুলনায় এই গতি একরকম আধুনিক কালেই ধরা পড়িয়াছে বলিতে হইবে। ক্রান্তিপাত বৎসরে কিঞ্চিদধিক ৫০ বিকলা হিসাবে পশ্চিমে যায়। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার বৎসরে সমুদয় চক্রটা ঘুরিয়া আসে। সূর্য দ্রুত চলে পূর্বমুখে, আর ক্রান্তিপাত ধীরে চলে পশ্চিমমুখে। ফলে এই দাঁড়ায়, সূর্য ক্রান্তিপাত হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া পুরোপুরি এক পাক ঘুরিয়া আসিবার একটু পূর্বেই ক্রান্তিপাতকে আবার দেখিতে পায় ও ধরিতে পায়। ক্রান্তিপাতের এই গতিটুকু না থাকিলে অর্থাৎ ক্রান্তিপাত স্বস্থানে স্থির থাকিলে, সূর্য সংবৎসরে পুরা এক পাক ঘুরিয়া ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইত। আমরা সূর্যের পুরোপুরি এক পাক ঘুরিবার সময়কে এক বৎসর ধরি। পাশ্চাত্যেরা সূর্যের

ক্রান্তিপাত হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে উপস্থিতির সময় পর্যন্ত এক বৎসর ধরে। সেই জন্য আমাদের পঞ্জিকার বৎসরের চেয়ে ইংরেজি পঞ্জিকার বৎসর একটুকু ছোট। ইহাতে দোষ বা ভুল কোনও পক্ষেরই নাই। তবে আমাদের বর্তমান পঞ্জিকাগণনা যখন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সূর্য বৎসরান্তে পয়লা বৈশাখ তারিখেই ক্রান্তিপাতে ছিল; এই কয়েক শত বৎসরে ক্রান্তিপাত এতটা সরিয়া গিয়াছে যে, এক্ষণে বৈশাখের প্রায় বিশ দিন পূর্বে অর্থাৎ ১০ চৈত্র তারিখে, সূর্য ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়। আগে পয়লা বৈশাখ দিবারাত্রি সমান হইত; এখন ক্রমে পিছাইতে-পিছাইতে ১০ চৈত্র দিবারাত্রি সমান হইতেছে। আমরা যদি এই বড় বৎসরই অবলম্বণ করিয়া থাকি, ইংরেজদের মতো ছোট বৎসর না লই, তবে কালে পৌষ মাসে দিবারাত্রি সমান হইবে, ও মাঘে বৈশাখী গ্রীষ্মের অনুভব ঘটিবে। প্রাচীন জ্যোতিষে এই ক্রান্তিপাতের গতির নাম অয়নচলন। অয়নচলন এদেশে অতি প্রাচীন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃত পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা; আমাদের পঞ্জিকায় ৫৫ বিকলা ধরা হয়। ৫ বিকলার পার্থক্য; সমান্য বটে; আবার সামান্য নহেও।

কিন্তু এই অয়নচলন গতি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের একটি বড় বিষম ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল। এখন আমরা নিঃসংশয়ে জানি যে, ক্রান্তিপাত প্রতিবর্ষে একটু চলিয়া প্রায় ২৫০০০ বৎসরে এক চক্র ঘুরিয়া আসে। সেকালের পণ্ডিতদের অধিকাংশের ধারণা ছিল, ক্রান্তিপাতের গতি যেন পেন্ডুলমের মতো। পশ্চিমে চলিতে-চলিতে কিয়দ্দূর চলিয়া, (কাহারও মতে ২৭ অংশ, কাহারও মতে ২৪ অংশমাত্র চলিয়া) ক্রান্তিপাত পূর্বমুখে ফিরে; পূর্বে সেই পর্যন্ত চলিয়া আবার পশ্চিমে ফিরে। একটি স্থির বিন্দুর পশ্চিমে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) ও পূর্বে ২৭ অংশ (বা ২৪ অংশ) এই প্রদেশটুকুর মধ্যেই ক্রান্তিপাত পুনঃপুন গতায়াত করে; একবারে একই মুখে চলিয়া একচক্র ঘুরে না; ভাস্করাচার্য ও আরও দুই এক জন এই মতের প্রতিবাদ করিয়া ক্রান্তিপাতের চক্রভ্রমণই নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিউটনের পূর্বে এই উভয় মতের মধ্যে কোনটা ঠিক, তাহা নির্ণয়ের জন্য বহু শতাব্দের পর্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য উপায় বর্তমান ছিল না। নিউটনের পর মীমাংসার অন্য উপায় হইয়াছে। আমাদের পঞ্জিকায় আজ পর্যন্ত সেই ভ্রমাত্মক মত গৃহীত হইয়া আসিতেছে; ইহার সংশোধন না হইলে কালে বড়ই বিভ্রাট ঘটিবে। দেড়শো-দুইশো বৎসর পূর্বেও জ্যোতির্বিদেরা প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া গণনাপ্রণালী সংশোধনে সাহসী হইতেন। আজকাল আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত শামলা উপলক্ষিত ডিগ্রিপুঞ্জ সে সাহস ও সে ভরসা দেয় না। হায় সে কাল!

অনেকের হয়তো ধারণা আছে, ধ্রুবতারা চিরকালই ধ্রুবতারা আছে। বস্তুত তাহা নহে। অয়নচলনের হেতু ধ্রুবতারা কিছু দিন পূর্বে ধ্রুবতারা ছিল না; সুমেরু হইতে দূরবর্তী ছিল; এবং ভবিষ্যতেও বহু দিন সে ধ্রুবতারা রহিবে না; সুমেরু হইতে অনেক দূরে যাইবে।

বিজ্ঞানে পুতুলপূজা

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোনও এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, ইউক্লিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজে বোধ্য এবং সর্বজন যে, ইহার প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান কেহ কর্তব্য মনে করেন না; এই জন্য ইহা ইউক্লিড-প্রণীত শাস্ত্রের আরম্ভেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইউক্লিডের শাস্ত্র সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আকৃতি এবং বৃহত্তা মাত্র লইয়াই ইউক্লিডের কারবার। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, তাহাদিগকে খরিদ করিতে দাম লাগে না, ডাকে পাঠাইতে মাশুলও লাগে না, তাহাদের আছে কেবল দৈর্ঘ্য অথবা বিস্তার অথবা বৃহত্তা মাত্র। দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে বা বৃহত্তায় তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারাও পরস্পর সমান বলিয়া গৃহীত হয়, যে ছাত্র ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রতিজ্ঞা কোনোরকমে পার হইয়া পঞ্চমে আসিয়া আটকাইয়া যায়, সেও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ইউক্লিডের সীমানা ছাড়াইয়া যখন অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনো এই স্বতঃসিদ্ধে দ্বিধাবোধের কোনও সম্যক হেতু পাওয়া যায় না। রামু আর দামু উভয়ে যদি হরির সঙ্গে ঠিক একবয়সি হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সমানবয়সি হইবে; উভয়ের গায়ের রং যদি ঠিক কেদারের মতো ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইবে; এই সকল তথ্য স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; ইহার অন্যথাভাব কল্পনাতেও বোধ করি আসে না।

যে সকল বিষয়ের অন্যথাভাব কল্পনাতে আসে, যাহার অন্যথাভাব মনে আনিতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আঘাত পায় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে; তাহার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স সতেরো বৎসর তিন মাস, বৃন্তচ্যুত নারিকেল ফল বেলুনের মতো উধাও না উঠিয়া ভূমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন, ইত্যাদি সত্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে লব্ধ সত্য; ইহা অনুরূপ হইতে পারিত। ইহার অন্যথাভাব আমরা স্বচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ চাপ পাইলে বায়ু সংকুচিত হয়, গরমে বরফ গলিয়া জল হয়, চুম্বকে লোহা টানে ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপার সত্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত। চুম্বক যদি লোহাকে না টানিয়া ঠেলিয়া দিত, শোলা যদি জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃদ্ধি কিছুতেই আহত হইত না; আমরা ওই সকল বিপরীত ঘটনাকেই প্রাকৃতিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতাম।

অতএব সত্যের শ্রেণিভেদ রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আমরা মানিতে বাধ্য, না মানিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি বিদ্রোহাচরণ করিবে;

যদি কেহ উহাতে দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার স্থান। আবার কতকগুলি সত্য আছে, তাহা মানিতে আমরা বাধ্য নহি; তাহা না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উলটা মানিলেও কেহ পাগল বলিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে।

যে-যে বস্তু প্রত্যেকে কোনও এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, এই সত্যটি কোন শ্রেণির সত্য? ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে; কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেও কি তাহাই? পদার্থবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোনার গিনি খানিকটা জলের সমান গরম, একটা রূপার টাকাও সেই জলের সমান গরম; গিনি ও টাকা সমান গরম হইবে কি না? যে-কোনও ব্যক্তি নিঃসংকোচে উত্তর দিবে,—হাঁ, সমান উষ্ণ হইবে বইকী? এই উত্তর সত্য, কীরূপে সত্য? ইহা কি ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বতঃসিদ্ধ সত্য?

যাঁহারা পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। উভয়ে জলের সমান উষ্ণ হইয়াও পরস্পর সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। হয় নাই যে, তাহা পর্যবেক্ষণলব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

আমরা হাতে ছুঁইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন জিনিসটা গরম, কোনটা ঠান্ডা, মোটামুটি স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু পদার্থবিদ্যা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিতে একেবারে নারাজ।

পদার্থবিদ্যা মতে উত্তাপ নামে এমন একটা কিছু আছে, যাহা কোনও দ্রব্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহা সর্বদা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চলাফেরা করে। যে দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা বলেন, সেই দ্রব্যে উষ্ণতা অধিক, আর যে দ্রব্যে উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্থবিদ্যা মতে সেই দ্রব্যের উষ্ণতা অল্প; কোথায় উষ্ণতা অধিক, আর কোথায় অল্প, তাহা জানিবার পদার্থবিদ্যার মতে ইহাই একমাত্র উপায়; এবং উষ্ণতার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ। যদি দুই দ্রব্য পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তাপের বিনিময় হইতেছে না, অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথবা ওটার উত্তাপ এটায় আসিতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে, উভয় দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। পদার্থবিদ্যার ভাষায় উষ্ণতা আর উত্তাপ এক নহে। উত্তাপ চলাফেরা করে, উষ্ণতর দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ করে। যেখানে দেখিবে, দুই দ্রব্যের মধ্যে উত্তাপের যাতায়াত নাই, সেইখানে বুঝিতে হইবে, উষ্ণতারও প্রভেদ নাই; উভয় দ্রব্য সমান উষ্ণ; কাজেই উত্তাপের চলাফেরা বন্ধ। উত্তাপের এই আচরণ দেখিয়া উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উঁচু হইতে নীচে গড়াইয়া আসে, উত্তাপ তেমনই গরম জিনিস হইতে ঠান্ডা জিনিসে আসে; জলের সহিত উচ্চতার যে সম্বন্ধ, উত্তাপের সহিত উষ্ণতার সম্বন্ধ অনেকটা সেইরূপ। ঘরের মেজের কোন দিকটা উঁচু স্থির করিতে হইলে জল ঢালিয়া দিলেই বুঝা যায়, উঁচু দিক হইতে নীচু দিকে জল গড়াইয়া আসে। সেইরূপ উত্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই উষ্ণতা কোথায় অধিক, কোথায় অল্প, তাহা বুঝা যাইবে।

উষ্ণতার যদি এই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে গিনিটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে কী বুঝাইবে? বুঝাইবে এই যে, গিনিটা জলে ফেলিলে গিনির উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ

গিনিতে যাইবে না। সেইরূপ টাকাটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে বুঝাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইবে না। বেশ কথা—তাহা না যাক। ধরিয়া লইলাম, গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদের পরস্পর আচরণ এইরূপ। টাকা ও জলের মধ্যেও উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদেরও পরস্পর আচরণ এইরূপ। এখন গিনি ও টাকা যদি কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা যায়, উহাদের পরস্পর আচরণ কীরূপ হইবে? উহাদের মধ্যে পরস্পর উত্তাপের বিনিময় হইবে কি না? কে বলিতে পারে, হইবে কি না? গিনি সোনার জিনিস—অবস্থাভেদে সে জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। টাকা রূপার জিনিস—অবস্থাভেদে সেও জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমনকী বাধ্যবাধকতা আছে যে, গিনি ও টাকা—অর্থাৎ এক টুকরা সোনা ও এক টুকরো রূপা—সেই অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যেও উত্তাপের লেনা-দেনা করিবে না? করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোনও উত্তর দিতে অক্ষম। তবে পর্যবেক্ষণে উত্তর পাওয়া যাইবে, হাঁ কি না?

আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। সোনার গিনি যে জলের প্রতি যে আচরণ করিতেছে, রূপার টাকাও সেই জলের প্রতি সেই আচরণ করিতেছে, অতএব সোনা ও রূপা পরস্পরও সেইরূপ আচরণ করিবে, এরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি না? গদাধরের সঙ্গে রামের যে আচরণ, গদাধরের সঙ্গে শ্যামেরও সেই আচরণ, তাহা বলিয়া কি রাম শ্যামের পরস্পর আচরণও ঠিক সেইরূপই হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে ঘুষি তুলে, গদাধর শ্যামকে দেখিলেও ঘুষি তুলে, অতএব রামও শ্যামকে দেখিলে ঘুষি তুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? যদি বলো, রাম-শ্যামের দৃষ্টান্ত লইলে এখানে চলিবে না, রাম শ্যাম স্বাধীন জীব, তাহাদের কর্ম তাহাদের ইচ্ছাধীন; কিন্তু সোনা-রূপা জড়দ্রব্য মাত্র, সর্ববিধ স্বাধীনতায় বর্জিত, ইহা পদার্থবিদ্যার ব্যাপার;—আচ্ছা, পদার্থবিদ্যা হইতেই একটা দৃষ্টান্ত লইব। খানিকটা চা-খড়িতে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢালিলেও ফঁ্যাস করে, নাইট্রিক অ্যাসিড ঢালিলেও ফঁ্যাস করে, তাই বলিয়া সালফিউরিক অ্যাসিডে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢালিলেও কি ফঁ্যাস করিবে? কখনই না। চা-খড়ির প্রতি সালফিউরিক অ্যাসিডের আচরণ ওই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে; আবার চা-খড়ির প্রতি নাইট্রিক অ্যাসিডের আচরণ এই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। চা-খড়ির প্রতি অ্যাসিড দুইটার আচরণ দেখিয়া তাহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সেইরূপ সোনার গিনি ও রূপার টাকা পরস্পর উত্তাপ বিনিময় করিবে কি না, তাহা সোনা ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সোনা কিংবা রূপা প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্য জলের প্রতি কীরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া পরস্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির করা যায় না। লজিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ওই দুই premise হইতে কোনওরূপ conclusion অর্থাৎ সিদ্ধান্ত টানা চলে না।

লজিকে পারে না বটে, কিন্তু পর্যবেক্ষণে পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, গিনি যখন জলের উত্তাপ লয় না, টাকাও যখন জলের উত্তাপ লয় না, গিনি ও টাকা তখন,—কেন জানি না, গিনি না টাকা তখন পরস্পর উত্তাপের লেনা-দেনা করে না, প্রকৃতির এই বিধান। ইহা পর্যবেক্ষণ-লব্ধ সত্য—ইহা পরীক্ষিত সত্য; স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। কাজেই আমরা উহা মানিয়া লই। ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত; গিনির উষ্ণতা জলের সমান, টাকার উষ্ণতাও সেই জলেরই সমান, এরূপ হইয়াও গিনি ও টাকা সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, প্রকৃতির উপর আমাদের কোনোরূপ হুকুম চলিত না।

দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারা পরস্পর সমান হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও সকল ক্ষেত্রে উহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে না, ইহা দেখা গেল; কিন্তু দুই দ্রব্যকে কখন কোন গুণ দেখিয়া সমান বলিব, তাহাও একটা উৎকট সমস্যা।

শরীরী জড় দ্রব্যের বেলায় সমস্যা তো বটেই; ইউক্লিডের শাস্ত্রের মতো যে সকল শাস্ত্র অশরীরী দ্রব্য লইয়া বিচর করেন, সেখানেও সমস্যা নিতান্ত সহজ নহে।

মনে করো, দুই গাছা লাঠি সমান দীর্ঘ কি না, স্থির করিতে হইবে। এক গাছা লাঠি শ্যামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছা বৌবাজারে শ্যামের নিকট আছে। দৈর্ঘ্যের তুলনা দুই উপায়ে হইতে পারে। শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়া দুই গাছা লাঠি পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে, উহাদের দৈর্ঘ্য সমান কি না? একটার উপর আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান কি না, তাহা নিরূপণের প্রথা ইউক্লিড বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপায়ে—অন্য একটা মাপকাঠি বা গজকাঠি শ্যামবাজারে আনিয়া শ্যামবাজারের লাঠির ও বৌবাজারে আনিয়া বৌবাজারের লাঠির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা চলিতে পারে।

যদি এই গজকাঠির মাপে দেখা যায়, উভয় লাঠিই দৈর্ঘ্যে সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি, তাহা হইলে উভয়কেই সমান দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য, কার্যত এই রীতি অবলম্বন করাই সুবিধা; এবং ইহার মূলই হইল ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এইখানে কোনও ব্যক্তি যদি বিদ্রোহী হইয়া পূর্বপক্ষ করিয়া বসেন, দৈর্ঘ্য তুলনায় এই রীতি দুষ্ট, আমি ইহা মানিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরুত্তর করা কঠিন হইয়া পড়ে। উষ্ণতার ইতরবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, তাহা সর্বজনসম্মত; একই জিনিস গরম হইলে দৈর্ঘ্যে বাড়ে, ঠান্ডায় দৈর্ঘ্যে কমে; শ্যামবাজার ও বৌবাজারে যদি উষ্ণতার কোনো তারতম্য না থাকে, তাহা হইলে এ তর্ক উঠিবে না। কিন্তু যিনি বাদী, তিনি একবারে মূলে টান ধরিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, শুদ্ধ স্থানভেদেই কি দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে না? যে আকাশে বা যে দেশে আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের এমন ধর্ম কি থাকিতে পারে না যে, এক স্থানের দ্রব্যকে কেবল অন্য স্থানে লইয়া যাইবা মাত্র অন্য কারণ অসত্ত্বেও তাহার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হইয়া যায়? ইহা অসম্ভবও নহে, অকল্পনীয়ও নহে।

তুমি শ্যামবাজারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বলিতেছ; কিন্তু আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য অন্যের দ্বিগুণ। তবে শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবা মাত্র তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়া অর্ধেক হয়; আবার বৌবাজারের লাঠি শ্যামবাজারে আনিবা মাত্র উহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ এক লাঠি শ্যামবাজারে, অন্য লাঠি বৌবাজারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। গজকাঠি দিয়া

মাপিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না। সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য যদি স্থানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ওই গজকাঠিরও দৈর্ঘ্যে স্থানসাপেক্ষ হইবে। উহা শ্যামবাজারে আনিবা মাত্র উহার ইঞ্চির দাগগুলা বড়-বড় হইবে, এবং বৌবাজারে আনিবা মাত্র দাগগুলা খাটো হইয়া পড়িবে। কাজেই শ্যামবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি বৌবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চির সমান না হইলেও এই প্রভেদ ধরিবার কোন উপায় পাওয়া যাইবে না।

ফলে আমাদের বিশ্বজগৎ যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের যদি এইরূপই ধর্ম হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ স্থানভেদে দৈর্ঘ্যের ব্যত্যয় হইলেও আমরা কোনওরূপ পরিমাপের দ্বারা তাহা ধরিতে পারিব না; কেন না, যে গজকাঠি লইয়া পরিমাপ করিতে যাইব, সেই গজকাঠিই যখন স্থানভেদে ছোট-বড় হইয়া যায়, তখন এই প্রচলিত পরিমাপ-পদ্ধতি সেখান চালাইব কীরূপে?

অপর পক্ষ বলিবেন, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যখন বলিতেছে, স্থানভেদে এরূপ দৈর্ঘ্যভেদের কোনো প্রমাণ নাই, এবং প্রচলিত পরিমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাহাকেও কখন জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় নাই, তখন এ সকল নিষ্ফল ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি তুলিয়া লাভ কী? সমুদায় ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যা প্রচলিত পরিমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্যে ও উপপাদ্যে কেহ কখনও কোনও ভুল বাহির করিতে পারেন নাই; তখন এরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়া উপহাস্য হইবার দরকার কী?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবনযাত্রার জন্য যে কাণ্ডজ্ঞানটুকু আবশ্যক, সেই কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে জীবনযাত্রা একরকম নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়। প্রকৃতিদেবী, যিনি মনুষ্যকে জীবনযাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যকে যে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চা করিতেই হইবে, এরূপ তাঁহার আদেশ নাই। গো-পশু হইতে মনুষ্যপশু পর্যন্ত কাহাকেও তিনি জীবনযাত্রা বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অধীন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। ঘাস-জলের ব্যবস্থা হইলেই গোরুর গোজীবন চলে; আবার ডাল-রুটির ব্যবস্থা হইলেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়; এবং পৃথিবীর উপর যে দেড় শত কোটি মনুষ্য-পশু বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পৌনে ষোলো আনার অধিক লোক এই ডাল-রুটির অধিক কিছু চাহে না; ইহাতেই তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত আছে। আজিকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা যে কলকারখানা বসাইয়া পৃথিবীতে একটা তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছি, ভূপৃষ্ঠের উপর ছুটাছুটি করিবার জন্য নিরেট ভূমির উপর রেলগাড়ি চালাইয়া, সাগর-পৃষ্ঠের উপর কলের জাহাজ চালাইয়া, আর হাওয়ার ভিতরে হাওয়ায় উড়িবার জন্য হাওয়ার জাহাজ চালাইয়া লম্ফ-ঝম্ফ আরম্ভ করিয়াছি, ইহাও সেই ডাল-রুটির জন্য। ডাল-রুটির অন্বেষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য এই সমস্ত মহৎ কার্যের অভ্যন্তরে আবিষ্কার করা যায় না। এই ডাল-রুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও উহাকে একেবারে পরম পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কতকগুলি লোক চাহে না ও চাহিবে না। তাহাদের মতে ওই ডালরুটি-বিষয়ক কাণ্ডজ্ঞানই মনুষ্যের সর্বস্ব নহে; তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু নহিলে তাহাদের প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মিটে না। এই পিয়াসা মিটাইবার জন্যই নৈয়ায়িকেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার তৈল, এই বিচারে জীবন কাটাইতেন; এবং এই পিয়াসা মিটাইবার জন্য এই সেদিনও শেফিলড শহরে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে গণিত-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বারো আর পাঁচে সতেরো, এই

তথ্যটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বটে কি না এবং সর্বত্র সত্য বটে কি না, তাহা অন্বেষণের জন্য মাথা কুটিতে পণ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ন্যায় ব্যবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া লইয়াছে; এবং সেই অট্টালিকার মধ্যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা অবাধে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার চলিতে পারে। একটা মাত্র গজকাঠি লইয়া যখন আমরা শ্যামবাজারে ও বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লিতে, ভূমণ্ডলে ও সূর্যমণ্ডলে ও সপ্তর্ষিমণ্ডলে দীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা ধরিয়া লই যে, উষ্ণতাদির তারতম্যে ওই দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র দেশভেদে বা স্থানভেদে সেরূপ কোনও তারতম্য হয় না। ইহা আমরা ধরিয়া লই, এবং মানিয়া লই মাত্র; কিন্তু মানা উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখি না।, মানা উচিত হউক আর অনুচিতই হউক, আমাদের জীবনযাত্রায় ইহাতে কোনওরূপ ঠকিতে হয় না। ঠকিতে হয় না, কেন না, কোন দুই দ্রব্যকে যখন আমরা কোনও বিষয়ে সমান বলিয়া নির্দিষ্ট করি, ওই সমানতা আমাদের মনঃকল্পিত একটা সংজ্ঞা মাত্র; আমরা একটা নির্দিষ্ট সংকীর্ণ মনগড়া পারিভাষিক অর্থে 'সমান' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোনও পরমার্থতত্ত্ব নিহিত থাকে না। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আজকাল যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাসের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকট আমার বাচালতা মার্জিত হইবে।

দুইটা জিনিসকে আমরা সমান বলি কখন? দূর হইতে নিকটে আনিয়া এটার পাশে ওটা রাখিয়া, অথবা এটার উপর ওটা চাপাইয়া যদি দেখিতে পাই, দুইটার দৈর্ঘ্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমান বলি। নিকটে থাকিলেও সমান বলি, দূরে থাকিলেও সমান বলি। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সমান' এই শব্দটির সংজ্ঞাই এই। দূরে থাকিতে উহাদের দৈর্ঘ্যের কোনও প্রভেদ ছিল কি না সে প্রশ্নই আমরা তুলি না। সমান শব্দটিকে যদি ওই সংকীর্ণ অর্থ দেওয়া যায়, এবং সেই অর্থেই আমরা যদি সর্বদা ওই শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেই প্রশ্ন তুলিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। এবং সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোনও শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করি, সেই শাস্ত্রেও কোনও ভুল আসে না।

সোনা, রূপা ও জল, ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই প্রথমে নজরে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যে, বর্ণে, স্পর্শে, শব্দে, কোনও বিষয়েই ইহারা সদৃশ নহে: অথচ উহাদের পরস্পর একটা সাদৃশ্য আছে, যাহা আছে বলিয়া ওই তিন দ্রব্যকেই আমরা জড়পদার্থ বলিয়া নির্দেশ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, সেই সাধারণ ধর্ম কী, যাহা স্বর্ণখণ্ডে, রৌপ্যখণ্ডে এবং খানিকটা জলেও বর্তমান রহিয়াছে? যাহা আছে বলিয়া ওই তিন পদার্থই জড়ত্ব লাভ করিয়াছে?

তিনটা দ্রব্যের একটা সাধারণ ধর্ম অতি সহজেই ধরা পড়ে; উহার নাম ভার। সোনা, রূপা, জল, তিনেরই ভার আছে; এবং যে সকল দ্রব্যকে আমরা জড়দ্রব্য বলি, তাহাদের সকলেরই ভার আছে; অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভার তাহা হইলে জড়ত্ব। কিন্তু যাঁহারা পদার্থবিদ্যার একটু চর্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভার জড়ত্ব নহে। উহা জড় দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম হইলেও স্বাভাবিক ধর্ম নহে; উহা আগন্তুক ধর্ম, আকস্মিক কারণে

উহার উৎপত্তি। আমাদের এই পৃথিবীর এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে সকল দ্রব্যই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতনোন্মুখ; এবং এই পতনোন্মুখতা আছে বলিয়াই ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের ভার আছে। সোনা-রূপার যে ভার, তাহা সোনা-রূপার নিজগুণে নহে, সে ভার পৃথিবীর সমীপে অবস্থিতিসাপেক্ষ। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে যাইবে, ভার ততই কমিবে; আবার ভূপৃষ্ঠে কূপ খুঁড়িয়া নীচে নামিলে ভার তাহাতেও কমিবে। কলিকাতার কোনো দ্রব্য দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ভার একটু কমে; ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ভার নব্বই মণের ভারের সমান, চাঁদ যত দূরে আছে, তত দূরে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার ভার এক সেরের ভারের সমান দেখা যাইবে। আবার ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যদি ভূকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া ওই নব্বই মণের ভার এক কাঁচ্চার ভারের সমান হইত না, একবারে লোপ পাইত। অতএব সোনা, রূপা বা যে-কোনও জড় দ্রব্যের ভারকে সেই দ্রব্যের স্বাভাবিক নিজস্ব ধর্ম বলিতে পারি না; উহা পৃথিবীর সন্নিধানে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন ধর্ম; উহা একটা আকস্মিক ঘটনা বা আগন্তুক ঘটনা হইতে লব্ধ ধর্ম; পৃথিবী বা তদ্বিধ কোনও প্রকাণ্ড জিনিস নিকটে না থাকিলে কোন জিনিসেরই ভার থাকিত না।

কাজেই ভার দেখিয়া জড়ত্বের নিরূপণ হয় না। এক মণ চাউলের ভার যদি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে উহার ভার-বহনের ক্লেশ কাহাকেও সহিতে হইত না; কিন্তু তাহার তণ্ডুলত্ব, যাহার উপর উহার উদর-পূরণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না। কলিকাতার চাউল দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ভার কিছু কমে, কিন্তু উদর-পূরণের শক্তি কিছুই কমে না। ফলে চাউলের কিছু মাত্র ভার না থাকিলেও দোকানদার উহার পুরা মূল্য দাবি করিত; তবে ঘরে আনিবার সময় মুটে-ভাড়াটা হয়তো লাগিত না। সেইরূপ সোনার ভার না থাকিলেও উহার সুবর্ণত্ব কিছুই কমিত না,—যে সুবর্ণত্বের উপর ভামিনী-সমাজে উহার সমাদর প্রতিষ্ঠিত; বরং ভামিনীদের মধ্যে যাঁহারা একশো ভরিতেই এখন সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা তখন একশো মণের দাবি করিয়া বসিতেন।

জড়ের জড়ত্ব যদি ভারে না হয়, তবে জড়ের জড়ত্ব কীসে? ইংরেজিতে mass বলিয়া একটি শব্দ আছে, উহাই জড়ের জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক। কথায়-কথায় বলা হয় যে, এই mass-এর অর্থ quantity of matter। বাঙ্গালা ভাষায় ওই mass শব্দের ভালো প্রতিশব্দ নাই; গ্রন্থলেখকরা অনুবাদে যাঁহার যে শব্দ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমিও একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; mass অর্থে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিব। আশা করি, কালে একটা কোনও পারিভাষিক শব্দ লেখকরা একমত হইয়া গ্রহণ করিবেন। এই দ্রব্যটা massive—ইহার mass বেশি—এই অর্থে আমি বলিব, ইহাতে বস্তু আছে অনেকখানি। এই বস্তু শব্দকেই জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এই বস্তু-পরিমাণ নিরূপণের উপায় কী? পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব; এই ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর মাত্রা নিরূপিত হয়। যে-কোনো দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয় অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জন করে। যদি সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের বস্তু সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জন না করে, তাহা হইলে উভয়ের বস্তু অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার বস্তু অল্প; যেটার বেগ অল্প হইবে,

সেটার বস্তু অধিক। শূন্য কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা হটমট করিয়া ছুটিয়া পড়ে; পূর্ণ কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয়। অতএব পূর্ণ কুম্ভের বস্তু-পরিমাণ অধিক, শূন্য কুম্ভের অল্প। দুইটা হাতির দাঁতের ভাঁটা পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগে ছুটিয়া আসিলে পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া বিপরীত মুখে ফিরিয়া যায়। যদি সমান বেগে ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের বস্তু সমান বলা হয়। আর যদি অসমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে যেটার বেগ অধিক সেটায় বস্তু অল্প, যেটার বেগ অল্প সেটায় বস্তু অধিক বলিয়া গৃহীত হয়।

পরস্পরের ধাক্কা পাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয়, তাহাতে অল্প বস্তু ও যাহা অল্প বিচলিত হয়, তাহাতে অধিক বস্তু আছে। দুই সমান বস্তু সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগই অর্জ্জন করে। বস্তু-পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ওজন করিয়া বস্তু নির্দেশের চেষ্টা অনুচিত; কেন না, স্থানভেদে ভারের তারতম্য হয়; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহা জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোনও তারতম্য হয় না। এক সের চালের বা দশ ভরি সোনার ভার সর্বত্র সমান নহে, কিন্তু এক সের চাল সর্বত্রই এক সের চাল, আর দশ ভরি সোনা সর্বত্রই দশ ভরি সোনা। সের আর ভরি প্রকৃতপক্ষে বস্তু-পরিমাণ নির্দেশ করে, ভারের পরিমাণ নির্দেশ করে না। এক ভরি সোনা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়েরই বস্তু-পরিমাণ সমান; কেন-না, সমান ধাক্কায় উহারা সমান বলে বিচলিত হয়। হুগলিতেও হয়, আবার দিল্লিতেও হয়, ভূমণ্ডলেও হয়, আবার চন্দ্রমণ্ডলেও হয়। কাজেই এই ভরি-পরিমিত বস্তু সোনা-রূপার স্বাভাবিক ধর্ম, নিজস্ব ধর্ম; এই ধর্ম্ম পৃথিবীর সান্নিধ্যের কোনও অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক ভরি সোনা আর এক ভরি রূপার বস্তু যেমন সমান হইল, কিন্তু উহাদের ভার সমান হইবে কি না? তর্কশাস্ত্রে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে না। কোনও নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত বৎসর মাথা ঘামাইয়াও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না। বস্তু আর ভার এক নহে; বস্তু সমান হইলেই ভার সমান হইবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। জড় পদার্থের ভার উহার স্বাভাবিক ধর্ম নহে; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিয়াছি, তাহা জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। কাজেই এক ভরি সোনা ও এক ভরি রূপার বস্তু-পরিমাণ সমান হইলেও উহার ভার সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে। সমান বটে কি না, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

ভারের হেতু পৃথিবীর সান্নিধ্য—পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান। পৃথিবীর টান কোন জিনিসের উপর অধিক, তাহা পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহকর্ত্রীদিগের মতো পৃথিবী সোনাকেই বেশি পছন্দ করেন, তাহা হইলে এক ভরি সোনার ভার এক ভরি রূপার ভারের চেয়ে অধিক হইবে; আর যদি পৃথিবীর সেরূপ কোনও পক্ষপাত না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোনা ও এক ভরি রূপার ভার সমানই হইবে।

পৃথিবীর এইরূপ পক্ষপাত আছে কি না, তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পদার্থবিদ পণ্ডিতগণের যিনি শীর্ষস্থানীয়, সেই নিউটন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর এরূপ কোনও পক্ষপাত নাই। এ বিষয়ে পৃথিবী একেবারে উদাসীন। পৃথিবীর কাছে মুড়ি-মিছরির এক দর, কাচ-কাঞ্চন তুল্যমূল্য, লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সমান আদর। নিউটন পেন্ডুলমের সাহায্যে এই তত্ত্ব নির্ণয় করেন; যিনি পদার্থবিদ্যার কিঞ্চিৎ

আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন; যিনি জানেন না, তাঁহাকে দুই কথায় বুঝাইতে পারিব না, অতএব এই বিচার লইয়া সময়ক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

নিউটনের পূর্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না যে, এক ভরি সোনার ভার ঠিক এক ভরি রূপার ভারের সমান হইবে; অথবা পাঁচ সের চাউলের ভার পাঁচ সের লোহার বাটখারার ভারের সমান হইবে। বস্তু সমান হইলেই যে ভার সমান হইবে, ইহা নিউটনের পূর্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না; অথচ অদ্ভুত এই যে, নিউটনের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতেই মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খ পর্যন্ত সকলেই ভারের সমতা দেখিয়াই বস্তুর সমান মানিয়া লইয়া আসিতেছে।

তুলাদাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল আর অন্য পাল্লায় লোহার বাটখারা রাখিয়া, নিক্তির এক ধারে রূপা এক ধারে সোনা রাখিয়া, আমরা ভারের সমতা দেখিয়া লই। ওই তুলাদণ্ড বা নিক্তি ওজনের যন্ত্র, ভার নিরূপণের যন্ত্র, বস্তু-নিরূপণের যন্ত্র নহে। ওজন করিয়া দেখি আমরা ভার, কিন্তু চাই আমরা বস্তু। চাউলের যদি ভার নাই থাকিত, তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হইত না; ক্ষুধানিবৃত্তি সমান হইত, পরন্তু মুটে-ভাড়া লাগিত না। সোনার ভার না থাকিলে গৃহিণীদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। কাজেই চাই আমরা বস্তু, কিন্তু দেখিয়া লই ভার। নিক্তির দুই পাল্লায় বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়; কেন না, পৃথিবী অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে দুই ধারেই সমান টান দেন; সোনা আছে কি রূপা আছে, তাহা দেখেন না। পৃথিবী যদি সোনারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে দুই পাল্লায় সমান বস্তু রাখিলেও ওজনে ভার সমান হইত না। সোনার প্রতি টান অধিক হইলে সোনার দিকটাই পৃথিবীর দিকে ঢলিয়া পড়িত। অতএব বস্তুসামান্য ভারসামান্য হয়, ইহাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একবারে ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারে পরিণত হন। কিন্তু নিক্তি যতক্ষণ হাতে থাকে, ততক্ষণ তিনি গাণ্ডিবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।

এই নিক্তির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। লোহা আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহা এক নূতন দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহা না-লোহা, না-গন্ধক। এই অভিনব জিনিসে লোহার লৌহত্ব বা গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্বাদ, সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিস তৈয়ার হয়।

রসায়নবিদ পণ্ডিত কিন্তু নিক্তির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার ভারটুকু যায় নাই। লোহা আর গন্ধক ওজন করিয়া লও, দেখিতে পাইবে যে, যে-নূতন দ্রব্য উভয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হইল, তাহার ভার নিক্তির ওজনে লোহার ভারের ও গন্ধকের ভারের ঠিক যোগ-ফল।

ফলে জিনিসের রূপান্তর হয়, কিন্তু নূতন জিনিসে সাবেক ভারটুকু বজায় থাকে। আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে ভার সমান দেখিলে বস্তুও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হয় যে, যখন এই রাসায়নিক সম্মিলনে ভারের তারতম্য হয় নাই, তখন বস্তুর পরিমাণেও কোনোরূপ পরিবর্তন হয় নাই।

রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে সহস্রবিধ রাসায়নিক

কাণ্ড অহরহ সম্পাদিত হইতেছে। আবার প্রকৃতির বৃহত্তর পরীক্ষাগারে কত রকমের রাসায়নিক কাণ্ড নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু নিক্তিধারী রসায়নবিদ জোরের সহিত বলিতে চাহেন, এই সকল কাণ্ডকারখানায় জড় পদার্থের বস্তু-পরিমাণের কিছু মাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এক কণিকাও নূতন জন্মে না, এক কণিকারও ধ্বংস হয় না। বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, অর্থাৎ জড়ের জড়ত্ব যখন কমেও না, বাড়েও না, তখন জড়পদার্থ অবিনাশী, এবং সম্ভবত অনাদি। অতএব লাবোয়াশিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড়পদার্থকে অমরত্ব দিয়া তাহার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নানা উপচারে তাহার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন।

জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই, ইহা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য; নিক্তির ওজনে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ এমন পণ্ডিত অনেকে আছেন, যাঁহারা ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি বা অবস্তুতে বস্তুর পরিণতি, উভয়ই মানব-মনের কল্পনাতীত; অতএব ওই তথ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অনেক বড়-বড় দার্শনিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া এই স্বতঃসিদ্ধের সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে দিনও দেখিলাম, আমস্টার্ডম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলমানের কেমিস্ট্রি গ্রন্থের ইংরেজি তর্জমায় এই প্রসঙ্গে ছোট হরফে মুদ্রিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পর্যবেক্ষণলব্ধ সত্য নহে। উহার অন্যথাভাব কল্পনাতীত, অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ।

বস্তুহীন জড় পদার্থের কল্পনা হইতে পারে না, ইহা বলিতে পারি না, তবে ওই সকল বস্তুহীন পদার্থকে জড়পদার্থ নাম না দাও, সে স্বতন্ত্র কথা। বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঈথর নিজে বস্তুহীন পদার্থ, তবে ঈথরে ছোট-ছোট ঘূর্ণি জন্মিয়া উহাকে বস্তুবিশিষ্ট জড় পদার্থে পরিণত করে। যাক, এই সকল হেঁয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত থাকা যাক। কিন্তু আজকাল একটা নূতন তত্ত্বের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেটাকে একবারে ফেলিতে পারা যায় না। তড়িৎ নামক পদার্থ এত কাল সম্পূর্ণ হেঁয়ালির মধ্যে ছিল। সেই হেঁয়ালি এখনো আছে; কিন্তু তড়িতের কণিকা লইয়া এখন আমরা খেলাধূলা আরম্ভ করিয়াছি। রেডিয়ম নামক ধাতুর কথা খবরের কাগজের প্রসাদে সকলেই শুনিয়াছেন; এই রেডিয়াম হইতে তড়িতের কণিকা সর্বদা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল রেডিয়াম কেন, আরও নানাবিধ জিনিস হইতে তড়িতের কণা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা নূতন আবিষ্কার। এই তড়িৎ-কণিকাগুলি কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ। ইহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই তড়িৎ-কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া চলে; কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহাও নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। কাচে রেশম ঘষিয়া বা গালায় পশম ঘষিয়া যখন ওই ওই বস্তুতে তড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তড়িতের কণিকাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির থাকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া তড়িতের কণিকাগুলি ধীরে চলে; কিন্তু রেডিয়াম ধাতু হইতে কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। এই তড়িৎ-কণিকাগুলি জড়পদার্থ বটে কি না, ইহাই সমস্যা। কণিকাগুলির ভার আছে কি না, কেহ জানে না, কিন্তু তাহাদের বস্তু আছে, সে বিষয়ে এখন বড়-একটা সংশয় নাই। পূর্বে বলিয়াছি, ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন; ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন; ইহাতে প্রতিপন্ন হয়

যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত; উভয়েরই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে। তড়িতেরও সেইরূপ ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা তড়িতের ধাক্কা প্রয়োগে টানাপাখা হইতে ট্রামগাড়ি পর্যন্ত চালাইতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিজলি বাতি জ্বালাইয়া আঁধার ঘর আলো করিতেছি। মাইকেল ফারাডে, যাঁহার প্রাসাদে আজ আমরা বিজলি বাতির আলো ও টানাপাখার হাওয়া ভোগ করিতেছি, তড়িতের এই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা তাঁহারই আবিষ্কৃত। তাঁহার পূর্বে এই তথ্য গুহায় নিহিত ছিল।

তড়িতে যখন এই ক্ষমতা আছে, তখন উহা বস্তুবিশিষ্ট জিনিস এবং উহাতে জড়ত্ব বর্তমান। তড়িৎ-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখা গিয়াছে, তড়িতের কণিকাগুলিতেও এই জড়ত্ব বিদ্যমান আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, অচল থাকে, ততক্ষণ উহাদের জড়ত্ব থাকে না; যখন বেগে চলে, তখনই উহাদের জড়ত্ব জন্মে; এবং যখন বেগ খুব বাড়ে, তখন জড়ত্বও বাড়িয়া যায়। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল কথা নিতান্তই হেঁয়ালি ঠেকিবে; কিন্তু উপায় নাই। এই সকল বাক্যের তৎপরতা বুঝাইবার এ সময় নহে। সোনা-রূপা, জল-বাতাস প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিত জড় পদার্থের সহিত এই অভিনব জড় পদার্থের এইখানে প্রভেদ। পাঁচ ভরি সোনার বস্তু-পরিমাণ সর্বদাই পাঁচ ভরি; উহা বাক্সে বদ্ধ থাকিলেও পাঁচ ভরি, আর বেগে ছুটিলেও পাঁচ ভরি। কিন্তু তড়িৎ-কণিকাগুলিও যখন ধাতু-পদার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়া থাকে, তখন উহাদের বস্তু-পরিমাণ নাস্তি; যখন টেলিগ্রাফের তার বাহিয়া চলিতে থাকে, তখন অস্তি; আর যখন রেডিয়াম হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকেন্ডে দশ-বিশ হাজার ক্রোশ বেগে ছুটিতেছে, এমন তড়িৎ-কণিকা আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের মুঠোয়; ওই সকল কণিকার বস্তু-পরিমাণ প্রচুর। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে, যে-কণিকার বেগ সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, তাহার জড়ত্ব একবারে অপরিমেয়—পরিমাণের অতীত হইবার সম্ভাবনা হয়। সোনা-রূপা, জল বাতাসের বস্তু-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, কিন্তু তড়িৎ-কণিকার বেগ-বৃদ্ধির সহকারে উহার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তড়িৎ-কণিকাকে জড়পদার্থ বলিব কি না, এইরূপ আপত্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু জড়পদার্থ—সোনা-রূপার মতো জড়পদার্থ—বহুসংখ্যক তড়িৎ-কণিকার সমবায়ে উৎপন্ন, এইরূপ একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু-দ্রব্যের পরমাণুগুলি আপনা হইতে শত খণ্ডে ভাঙিতেছে এবং সেই ভঙ্গুর পরমাণুর মধ্য হইতে তড়িৎ-কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ-কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পদার্থের পরমাণুগুলি বহু তড়িৎ-কণিকাযোগেই নির্মিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে শ-দরুনে বা হাজার-দরুনে তড়িৎ-কণিকা আটকানো আছে, আটকানো আছে বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে তাহারা বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক-একটা পরমাণু যেন এক-একটা ঘূর্ণি—বহুসংখ্যক তড়িৎ-কণিকার ঘূর্ণি। কেলবিন ঈথরের মধ্যে ঘূর্ণির কল্পনা করিয়াছিলেন: এখন কল্পনা হইতেছে, জড় পরমাণু তড়িৎ-কণিকার ঘূর্ণি। ঘূর্ণির মাঝে পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে, এই জন্যই উহাদের বস্তুমত্তা; এবং কণিকাগুলির বস্তুমত্তার ফলে পরমাণুটিরও বস্তুমত্তা। এই বস্তুমত্তা যখন বেগসাপেক্ষ, তখন জড়-পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই

বলিয়া শান্তি উপভোগ আর চলিবে না। বেগ বাড়িলে যদি বস্তু বাড়িয়া যায়, তখন বস্তুর উৎপত্তি নাই, এ কথা টিকিবে কেমন করিয়া?

জড় পদার্থের এই দুর্দশা দেখিয়া কোনও-কোনও বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে জড় পদার্থকে একবারে নির্বাসন করিতে চাহেন এবং জড়ের স্থানে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ করিতে চাহেন। জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইহারা অনিচ্ছুক। আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে কারবার করে না; শক্তির সহিতই ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক; শক্তির আঘাত পাইয়া শক্তির বাহনস্বরূপ জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এই হেতু জড়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবার না দেখিয়া জড় পদার্থের কল্পনা হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রকে অব্যাহতি দিতে এই দলের পণ্ডিতেরা উৎসুক। আগে বলা হইত, জড় শক্তি-দেবতার বাহন; শক্তির আধার জড়। এখন ইহারা বলিতেছেন; শক্তি সর্বময়ী; জড়ের অস্তিত্ব কল্পনাই অনাবশ্যক; জড়ের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোনও ক্ষতি হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাৎপর্য কী? কাব্যের ভাষা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, এই শক্তি কাজ করিবার শক্তি। এই কাজ শব্দটি আবার বিজ্ঞানশাস্ত্রে অতি সংকীর্ণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কাজ করা আর বোঝা নামানো প্রায় একই কথা। কোনও ভারী জিনিস যখন উপর হইতে নীচে নামে, তখন সে কাজ করে; আর যত ঊর্ধ্বে উঠে, তত কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। পৃথিবীর টানে সকল বস্তুরই ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে ভূমির অভিমুখে যাহা পড়ে, তাহা কাজ করে। প্রোফেসর রামমূর্তির মতো বুকের উপর চব্বিশ ঘণ্টাকাল হাতি চড়াইয়া রাখিলে কোন কাজ হয় না, কিন্তু এক কাঁচ্চা দ্রব্য হাত-খানেক নীচে নামিলেই খানিকটা কাজ হয়। দুই হাত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। যেখানে যতরকম শক্তি আছে, সমস্তই এই কাজ করিবার শক্তি। বেগে চলন্ত বস্তুর শক্তি আছে; কেন না, চলন্ত বস্তু যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিয়া সেই বোঝাকে কাজ করিবার শক্তি দেয়। তপ্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না, উহার উত্তাপ দ্বারা যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিতে পারা যায়। তড়িৎ-যুক্ত দ্রব্যের শক্তি আছে; কেন না. ওই তড়িৎ প্রয়োগেও আমরা বোঝা তুলিতে পারি। কয়লাতে শক্তি আছে; কেন না, ওই কয়লা পোড়াইয়া আমরা বোঝা তুলিতে পারি। ইঞ্জিনে আমরা কয়লা পোড়াইয়া কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির করিয়া লই এবং সেই শক্তির প্রয়োগে বড়-বড় বোঝা ঊর্ধ্বে তুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্রে জড়কে অবিনাশী বলিয়াছিল,—আর ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। শক্তির অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণের কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই তত্ত্বটি স্পষ্ট বুঝিতে হইলে দুই একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক হইবে।

চলন্ত দ্রব্যের শক্তিমত্তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু চলন্ত দ্রব্যের শক্তি অতি সহজে উত্তাপে পরিণত করা যায়। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারিলে হাতুড়ি ও নেহাই উভয়ই গরম হইয়া উঠে; চলন্ত রেল গাড়ির ইঞ্জিন ব্রেক দিয়া থামাইবার সময় ইঞ্জিনে, গাড়িতে, আরোহীতে ও লগেজে যে শক্তিরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার সমস্তটা উত্তাপে পরিণত হইয়া ব্রেকের পিঠ

হইতে ঝরঝর করিয়া অগ্নিকণা নিকলিতে থাকে। চলন্ত দ্রব্য থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে; কিন্তু তৎপরিবর্তে খানিকটা উত্তাপের আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলন্ত দ্রব্যে যে শক্তি নিহিত ছিল সেই শক্তির উত্তাপে পরিণতি। আবার উত্তাপের পরিণতিতে নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছক্তি পাইয়া বেগে চলিতে থাকে। উদাহরণ ইঞ্জিন; এখানে কয়লা পোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপের কিয়দংশের তিরোভাব ঘটে; তৎপরিবর্তে ইঞ্জিনযুক্ত রেলগাড়ি মায় আরোহী ও লগেজ চলিতে আরম্ভ করে—অর্থাৎ চলচ্ছক্তি অর্জন করে। উত্তাপ লুপ্ত হয়, উত্তাপের স্থানে শক্তি অন্য মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, এই সকল দৃষ্টান্তে শক্তির ধ্বংস বা উৎপত্তি হয় না; তবে দেখা যায় যে, শক্তি এক মূর্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণে কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। দেখা যায় যে, জগতে সর্বদা সর্বত্র শক্তির আনাগোনা, চলাফেরা চলিতেছে; সেই অবসরে শক্তি এক মূর্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্তি গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির যাবতীয় মূর্তি কুড়াইয়া সংকলিত করিলে দেখা যাইবে, শক্তির পরিমাণে ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধি নাই। শক্তির এক কণিকা কেহ নূতন উৎপাদন করিতে পারে না বা এক কণিকা কেহ ধ্বংস করিতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত জুল সাহেব এইরূপ হিসাব দিয়াছিলেন। এক সের জলকে এক ডিগ্রি গরম করিতে যা উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি ইঞ্জিন-যোগে রূপান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা এক সের জল পৌনে আট শত ফুট ঊর্ধ্বে তোলা চলিবে। পক্ষান্তরে পৌনে আট শত ফুট উঁচু হইতে এক সের জল ঢালিয়া দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি ছাড়াইয়া না পড়িয়া সেই এক সের জলেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ওই জল এক ডিগ্রি গরম হইবে। অর্থাৎ এক সের জলকে পৌনে আটশত ফুট উপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উত্তাপে পরিণত হইলে সেই জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি মাত্র বাড়াইয়া দিবে।

সর্বত্র এইরূপ হিসাব বাঁধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি খরচ করিয়া আমরা এতটা উত্তাপ পাই, আবার এতটা উত্তাপ খরচ করিয়া আমরা এতটা চলচ্ছক্তি পাই। সর্বত্র সর্বদা এক রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোনও স্থানে কোনওরকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোনও-না-কোনঁও স্থানে অন্যরকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, শক্তির রূপ পরিবর্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, এবং সম্ভবত অনাদি।

বলা হয়, এক সের জল এক ডিগ্রি গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, আর এক সের জলকে পৌনে আট শত ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তি লাগে, উভয়েরই পরিমাণ সমান। কিন্তু এই সমানতা কীরূপ? এই প্রবন্ধের আরম্ভেই এক সমান শব্দটির তাৎপর্য লইয়া কিছু গোলে পড়া গিয়াছিল। এখানেই সেই গোল আছে কি না?

একটা টাকা দুইটা আধুলির সমান;—কীরূপ সমান? টাকা যে জিনিসে অর্থাৎ যে রূপাতে নির্মিত, আধুলিও সেই রূপাতে নির্মিত। এ বিষয়ে টাকায় ও আধুলিতে, সমানতা আছে। নিক্তির এক পাল্লায় টাকা, আর পাল্লায় দুটা আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ভার সমান। তুলা-যন্ত্রে ভারের তুলনা করিয়া সমান দেখা যায়, অতএব এক টাকা ভার-পরিমাণে দুই আধুলির তুল্য। আবার ভার সমান হইলে বস্তুপরিমাণ সমান হয়, এই হেতু

বস্তুপরিমাণেও উহারা তুল্য। পরন্তু এক টাকার বদলে দুই আধুলি এবং দুই আধুলির বদলে এক টাকা সর্বদা পাওয়া যায়; উহাদের মূল্য সমান; অতএব বাজারে খরিদ-বিক্রয়ে, বিনিময় ব্যাপারে উহারা তুল্যমূল্য। অতএব একটা টাকা ও দুইটা আধুলি উপাদানে সমান, ভারে সমান ও বস্তুপরিমাণে সমান এবং মূল্যেও সমান।

আবার আমরা বলি, একটা টাকা ষোলো আনা পয়সার সমান। এবার কীরূপ সমান? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়; ভারও এক নয়; একটা টাকায় যে বস্তু আছে, ষোলো আনা পয়সার বস্তু তার চেয়ে প্রচুর অধিক আছে; তবে কীসে সমান? উত্তর, —উভয়ের মূল্য সমান; এক টাকার বদলে সর্বদা ষোলো গণ্ডা পয়সা এবং ষোলো গণ্ডা পয়সার বদলে সর্বদা একটা টাকা পাওয়া যায়, এই বলিয়া উহারা তুল্যমূল্য; এখানে সমান অর্থে তুল্যমূল্য; সকল বিষয়ে তুল্য নহে।

অতএব টাকাকে আমরা যে অর্থে দুই আধুলির সমান বলি, ঠিক সে অর্থে উহাকে ষোলো আনা পয়সার সামনে বলিতে পারি না। ইংরেজি ভাষায় এক টাকা ও ষোলো আনা পয়সাকে equal না বলিয়া equivalent বলা হয়।

শক্তি পক্ষে সমানতা কীরূপ হইবে? এক রকমের শক্তি খবর করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অন্যরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ওই দুই মূর্তিভেদকে তুল্য না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই উচিত; equal বা সমান বা তুল্য না বলিয়া equaivalent বা তুল্যমূল্য বলাই উচিত। খানিকটা উত্তাপের বিনিময়ে যতটা গতিশক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে উত্তাপের equal না বলিয়া উত্তাপের equivalent বলাই হইয়া থাকে। জুল সাহেব hear-এর mechanical equivalent-ই বাহির করিয়াছিলেন।

বস্তুতই শক্তির ভিন্ন-ভিন্ন রূপভেদের মধ্যে আর কোনওরূপ সাদৃশ্য বা সজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। একমাত্র দৃষ্ট হয় তুল্যমূল্যতা। তড়িৎ শক্তির সহিত তাপশক্তির কোথায় কোনও গূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বলিতে পারেন না, কিন্তু এতটা তড়িৎ শক্তির বদলে এতটা তাপশক্তি পাওয়া যাইবে, তাহা তাঁহারা অক্লেশে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। একটা টাকা বদল দিয়া কত পয়সা পাওয়া যাইবে, অথবা একখানা নোটের বদলে কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা গভর্নমেন্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন। যত দিন গভর্নমেন্টের সেই আইন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন ওইরূপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতে হইবে না। হাজার টাকার বদলে একখানা চোতা কাগজ পাইয়াও আমি নিশ্চিন্ত থাকিব যে, আমার সম্পত্তিতে এক পয়সা কমে নাই; আমার ধনের পরিমাণে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই। প্রকৃতিরানীর গভর্নমেন্টেও ওইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানেও তড়িৎ শক্তির বিনিময়ে উত্তাপ ও উত্তাপের বিনিময়ে তড়িৎ শক্তি পাওয়া যায় এবং বিনিময়ের হারও নির্দিষ্ট আছে। হার নির্দিষ্ট আছে বলিয়াই হাজার মণ বোঝা তুলিতে কত গ্রেণ কয়লা পোড়াইতে হইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারি এবং চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া বিজলি বাতি জ্বালাইতে কত মণ কয়লা বা দস্তা পোড়াইতে হইবে, তাহার হিসাবেও কখনও ঠকিতে হয় না। দুই গভর্নমেন্টে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতিরানির এলাকা বিশ্বব্যাপী; আর তাঁহার আইন-কানুনে, বিধিব্যবস্থায় কখনও খামখেয়ালি নাই। তদ্ভিন্ন উভয়ত্র আর কোন ভেদ নাই!

যদি একটা গরুর বদলে দশটা ভেড়া ও দশটা ভেড়ার বদলে একটা গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গো-স্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় পরিণত করিয়া মনে-মনে নিশ্চিত থাকিতে পারেন,—আমার গোশালায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই এবং বিনিময়ের ওই হার যদি চিরকাল বজায় থাকে, তাহা হইলে ওইরূপ অদল-বদল করিয়া কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না; এমনকী, এই অতি সংকীর্ণ অর্থে দশটা গরু একটা ভেড়ার সমান বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া গরু ভেড়া হইবে না বা ভেড়া কখনও গরু হইবে না; এবং গরু ও ভেড়া সর্ব বিষয়ে সমান করিয়া গৃহীত হইবে না। আমার গোয়ালঘরে যে সম্পত্তি গরু-মূর্তিতে বা ভেড়ার মূর্তিতে বা গরু-ভেড়া এই দ্বিবিধ মূর্তিতে সঞ্চিত আছে, তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই বলিয়া যতই বড়াই করি, বাজার-দরে উভয়ের মূল্য হঠাৎ কমিয়া গেলে আমার সেই বড়াই চুরমার হইয়া যাইবে। এই বৃহত্তর বিশ্বশালায় শক্তির কখনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, অতি সংকীর্ণ পারিভাষিক অর্থে ইহা একটি পরীক্ষালব্ধ সত্য; কিন্তু ইহার ভিতর কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহা আমরাই অর্পণ করিয়াছি। কাজ করিবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলি; এই পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনগড়া। এবং সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাইবে যে, সেই কল্পিত মনগড়া পদার্থের বিবিধ মূর্তির মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা আবিষ্কার করিতেছি, তাহারও অধিকাংশই আমাদের মনগড়া। এই শক্তির কোন ধর্ম আমরা যদি পর্যবেক্ষণে আবিষ্কার করি, তাহাতে স্বতঃসিদ্ধতা কিছুই থাকিতে পারে না।

ফলে যে সকল জাগতিক সত্য লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপী পরম দেবতা কোথায় কীভাবে আছেন আমরা জানি না; আমরা কেবল "উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং" কতকগুলা মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ঢাক-ঢোল বাজাইয়া তাহাদের পূজা করিতেছি।

ফলত আমরা পাঁচটি মাত্র সংকীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া এই বিশ্বজগতের কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষ করি; এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোথায় কী আছে, তাহার কোন সন্ধান রাখি না। অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে; ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি কোন কালে না পাই, তাহা হইলে এই সংকীর্ণ সীমার বাহিরে আমরা কখনো যাইতে পারিব না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপে যেভাবে আমাদিগকে জানায়, তেমনি ভাবে সেইরূপে আমরা জানিতে পারি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি পরিচিত ব্যাপারের উপযোগী বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিয়া অন্য কোনওরূপ ব্যাপারের উপযোগী অন্য কোনওরূপ ইন্দ্রিয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মূর্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানে জাগতিক অভিব্যক্তির পরিণামে আমরা বর্তমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বর্তমান মনোবৃত্তি পাইয়াছে। বিশ্বজগৎ আমাদিগকে যেভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই নির্মিত হইয়াছি ও গড়িয়া উঠিতেছি, এবং এই সংকীর্ণ গঠনপ্রণালীর ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশকে আমরা যেভাবে দেখিবার অধিকার পাইয়াছি, সে অংশকে সেই ভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অন্যরূপ হইলে জগতের মূর্তিও অন্যরূপ হইত; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সেই একই জগতের মূর্তির অন্যরূপ বিবরণ দিত। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিকৃত বা সর্বসাধারণের তুল্য

নহে; তাহার নিকট জগতের মূর্তির অন্যরূপ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্তমান ভাষা তাহার নিকট অর্থহীন। আমরা অধিকাংশ লোকে যাহা দেখিতেছি, তাহা বিশ্বজগতের একটা বিশিষ্টরূপ সংকীর্ণ মূর্তি মাত্র;—আমাদেরই বর্তমান ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে লব্ধ এই মূর্তি আমরা আমাদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছি, এবং ইহার বিশেষ-বিশেষ অংশের বিশেষ-বিশেষ নাম দিয়াছি। জড় ও শক্তি আমারই মনঃকল্পিত পদার্থ মাত্র। একটা সংকীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের অবিনাশিতা আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি। অন্যরূপ পারিভাষিক অর্থ দিলে এই জড়ের এবং এই শক্তির অবিনাশিতা থাকিত না; তাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভাষা অন্যরূপ হইত, কিন্তু ফল অন্যরূপ হইত না। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-কর্ম সেই সংকীর্ণ মনগড়া-মূর্তি কল্পনার প্রধান উপায়। বিশ্বজগৎকে যেরূপে যেভাবে দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা সুধাধ্য হয়, বিশ্বজগৎ আমাদিগকে তেমনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে ও আমরাও বিশ্বজগৎকে তেমনই ভাবে দেখিতেছি। বাহ্য জগৎ আর অন্তর্জগৎ পরস্পরকে পরস্পরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; অন্য ভাবেও যে গড়িতে পারিত না, এমন নহে। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে আমরা ক্ষণ মাত্র টিকিতে পারিতাম না। উপযোগিতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় না। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ। জীবনযাত্রায় ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিতাম না। কিন্তু গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পিত বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে এই সকল পরীক্ষালব্ধ বা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ-সত্য কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক-একটি পুতুলের এক-একটি মূর্তি কল্পনা করিয়াছি। বিজ্ঞানবিদ্যা যে মানুষের মনগড়া মূর্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ না হীনতা নাই; কেন না, যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান; প্রকৃতি সংকীর্ণভাবে—জীবনযাত্রার অনুকূল সংকীর্ণভাবে —মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও তন্নির্মিত সংকীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সংকীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।

আরও একটু সূক্ষ্ম কথা এই যে, আমরা সকলে বিশ্ব-জগতের যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে সর্বতোভাবে এক যা সমান নহে; আমার দৃশ্যমান জগতের রূপ তোমার দৃশ্যমান জগতের রূপের সমান নহে; আফিমের নেশায় জগতের রূপ ভিন্ন হয়; পাগলের নিকট জগতের রূপ অত্যন্ত ভিন্ন। সুস্থ মানবের পক্ষেও প্রত্যেকের নিকট জগতের রূপে কিছু-না-কিছু ভেদ আছে। আমরা দশজনে মিলিয়া প্রত্যেকের বিশিষ্ট অংশ বর্জন করিয়া যে সাধারণ অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া জগতের যে রূপ কল্পনা করি, বিজ্ঞানবিদ্যা কেবল সেই রূপেরই আলোচনা করে এবং তাহারই বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের আলোচিত বিশ্বজগৎ প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎ প্রকৃতপক্ষে মানব সাধারণের জন্য কল্পিত একটা কাল্পনিক জগৎ; উহার কোনরূপ পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারে না। এই কাল্পনিক জগতের সহিত, আমরা প্রত্যেকে যে জগতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, সেই জগতের যেখানে মিল দেখিতে পাই না, সেখানে আমরা হতবুদ্ধি হই ও নানারূপ অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখি। আমাদের সকলের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা করিয়া লই এবং আমাদের নিজের প্রত্যক্ষ কোনও-কোনও

ঘটনার সেখানে স্থান দেখিতে না পাইয়া প্রকৃতির বাহিরে বা প্রকৃতির উর্ধ্বে একটা কিম্ভূতকিমাকার অতিপ্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করি। বিজ্ঞানবিদ্যার মতো ব্যবহারিক বিদ্যার সহিত পারমার্থিক বিদ্যার বা তত্ত্ববিদ্যার চিরন্তন বিরোধের মূল এইখানে। বিচারপথে আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, 'আমরা' এই বহুবচনান্ত পদপ্রয়োগেও পরমার্থত আমার অধিকার নাই; কেন না, যে তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আমি এই বহুবচন প্রয়োগের অধিকারী হইয়াছি, সেই তোমরাও সেই কল্পিত বাহ্য জগতেরই অধিবাসী। বিজ্ঞানবিদ্যা তোমাদিগকে নহিলে অচল, কিন্তু পরমার্থবিদ্যা তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকারে একেবারে বাধ্য নহে। তখন এক মাত্র আমিই বিদ্যমান থাকি, এবং প্রাকৃত জগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগৎ উভয়ই আমার খেলার জন্য কল্পিত হইয়া দাঁড়ায়। মৎকল্পিত ও মদ্রচিত বিশ্ব-জগতের দেবালয় জুড়িয়া আমিই এক মাত্র পরমদেবতা অধিষ্ঠান করি।

আমিই এই বিশ্বজগতের কল্পনাকর্তা এবং আমিই উহার রচনাকর্তা; ইংরেজিতে বলিলে আমিই এই বিশ্বজগতের ডিজাইনার ও আমিই উহার আর্কিটেক্ট। আমিই উহার 'রূপ' দিয়াছি এবং আমিই উহার 'নাম' দিয়াছি। আশ্চর্য এই যে, কী জানি, কী খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি, এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর-একজন কল্পনাকর্তার ও রচনাকর্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ডশ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ, পরাধীনবৎ, বদ্ধবৎ আচরণেই,—এই পণ্ডশ্রম স্বীকারেই,—আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।

জড় জগৎ

জড় জগতের কথা বলিব; আপনারা অবধান করুন। আজিকার খোরাক লঘুপাক হইবে না। উহা রুচিকর করিতেও পারিব কি না সন্দেহ। আপনাদের বমনোদ্রেক না হইলেই সন্তুষ্ট থাকিব। দয়া করিয়া ধৈর্য রক্ষা করুন, ইহাই এই অধীনের বিনীত অনুরোধ।

জগতের নানা বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছি। প্রাতিভাসিক জগৎ, ব্যবহারিক জগৎ, বাহ্য জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড় জগৎ—কোন বিশেষণটার কী তাৎপর্য, তাহা স্পষ্টভাবে সম্মুখে রাখিতে হইবে,—কথার ধাঁধায় দিশাহারা হইলে চলিবে না।

গোড়ার বহুজীববাদ মানিয়া লইব। আমি যেমন চেতন জীব, আপনারা প্রত্যেকে ঠিক সেইরূপ চেতন জীব,—এইটুকু মানিয়া না লইলে পরস্পর আদানপ্রদান বা ব্যবহার চলে না, জীবনযাত্রা চলে না, জীবনযাত্রা আদৌ আবশ্যক হয় না। অতএব মানিয়া লইব, আমি যেমন চেতন জীব, আপনারাও ঠিক তেমনই চেতন জীব; আমিও যেমন আমার প্রত্যক্ষ জগতের মাঝখানে বসিয়া আছি, আপনারাও তেমনই আপন-আপন প্রত্যক্ষ জগতের মাঝখানে বসিয়া আছেন। এই প্রত্যক্ষসমষ্টির নাম দিয়াছি প্রাতিভাসিক জগৎ। আমার প্রত্যক্ষসমষ্টি যেমন আমার প্রাতিভাসিক জগৎ, আপনাদের প্রত্যক্ষসমষ্টিও তেমনই আপনাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ। চেতন জীবের সংখ্যা বহু ধরিয়া লইয়াছি,—প্রাতিভাসিক জগতের সংখ্যাও তদনুসারে বহু। এই প্রাতিভাসিক জগত আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকের নিজস্ব জগৎ। আমার প্রাতিভাসিক জগতের সহিত আপনার প্রাতিভাসিক জগতের কোন বিষয়ে কোন অংশে কোনরূপ সাদৃশ্য বা সামান্য আছে কি না, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই,—জানা দূরে থাকুক, তাহা অনুমান করিবার কোনও উপায় বা কোনও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। অথচ আমরা ধরিয়া লই,—আমার প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশ আপনার প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশের সহিত তুল্য, সদৃশ বা সমান। সেই অংশ আমাকে যেরূপ অভিভূত করিতেছে, আপনাকেও সেইরূপ অভিভূত করিতেছে। আমিও সেই অংশকে যেভাবে দেখিতেছি, আপনিও সেই ভাবে দেখিতেছেন। এইটুকু ধরিয়া লই বলিয়াই আপনার সহিত আমার আদানপ্রদান কারবার বা ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। বহু জীবের সহিত যখন আমাকে কারবার করিতে হয়, তখন আমাদের সকলেরই প্রাতিভাসিক জগতের অন্তত একটা অংশকে তুল্যরূপ বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; না মানিলে জীবনযাত্রা চলে না। বহু চেতন জীবের বহু প্রাতিভাসিক জগতের যে অংশটিকে আমরা এইরূপে সকলে মিলিয়া সমান বা সদৃশ বা তুল্যরূপ মনে করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি বা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেইটুকুর নাম দিয়াছি ব্যবহারিক জগৎ। পরস্পর ব্যবহারের জন্য উহাকে ওই তুল্যরূপে দেখিতেছি বলিয়াই নাম দিয়াছি ব্যবহারিক জগৎ। এই ব্যবহারিকগ জগৎ প্রাতিভাসিক জগতেরই একটা অংশ মাত্র; একটা বিশেষ কারণে আমরা বাধ্য হইয়া এই অংশকে অপর অংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছি মাত্র। বস্তুগত্যা আমাদের প্রত্যেকের প্রাতিভাসিক জগৎ আমাদের প্রত্যেকের

সর্বতোভাবে নিজস্ব; কিন্তু কার্যত আমরা তাহার একাংশকে সর্বসাধারণের পক্ষে একরূপ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। ওই অংশে নিজের সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য চেতন জীবেরও তুল্য অধিকার মানিয়া লইয়াছি। প্রাতিভাসিক জগতের ওই অংশ বস্তুত না হইলেও কার্যত, পরমার্থত না হইলেও ব্যবহারত সর্বসাধারণের জগৎ। যাহা কাহারও নিজস্ব নহে, তাহা কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। আমি থাকিলেও উহা থাকিবে, আমি না থাকিলেও উহা অন্যের পক্ষে অন্যের জন্য থাকিবে। অতএব উহা কাহারও অন্তরের নহে, উহা সকলেরই বাহিরের। কেন না, এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে থাকার, এইরূপে অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া থাকার নামই বাহিরে থাকা। বাহিরে থাকা কথাটার আর কোনও মানেই নাই। অতএব এই যে ব্যবহারিক জগৎ, উহারই এই কারণে নাম দিয়াছি বাহ্য জগৎ। প্রাতিভাসিক জগতের অংশ হইলেও উহাকে আমরা প্রাতিভাসিক জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া যেন বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছি। ওই অংশে আপনার মমত্বটুকু ত্যাগ করিয়া মৎসসদৃশ অন্যান্য চেতন জীবের তুল্য অধিকার স্থাপন করিয়াছি। আমি প্রাতিভাসিক জগতের কিয়দংশকে সম্পূর্ণ নিজস্ব রাখিয়া অপরাংশকে অপরের জন্য টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, সেই অংশটাই ব্যবহারিক জগৎ ও বাহ্যজগৎ, আর যে অংশ এখনও সর্বতোভাবে আমার নিজস্ব রহিয়াছে, তাহাই আমার অন্তর্জগৎ।

আমার অন্তর্জগৎ কীরূপ, তাহা আমি জানি; তোমার অন্তর্জগৎ কীরূপ, তাহা তুমি জানো; কিন্তু আমার অন্তর্জগৎ তোমার জানিবার কোনও উপায় নাই, তোমার অন্তর্জগৎ আমার জানিবার কোনও উপায় নাই। উহা যখন আমাদের নিজস্ব সামগ্রী, তখন পরস্পরকে জানাইবার কোনও বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কিন্তু ওই ব্যবহারিক জগৎ—যাহাকে বাহ্য জগৎ বলিয়াছি, উহা যখন পরস্পরে ব্যবহারের জন্যই ওইরূপে নির্দিষ্ট আছে, তাহার দ্বারাই যখন আমরা পরস্পর কারবার করিয়া থাকি, তখন পরস্পর ব্যবহারের জন্যই উহা পরিচয়েরও আদানপ্রদান করিতে হইবে। ওই বাহ্য জগৎ আমার কাছে কীরূপে আসিতেছে, তোমার কাছে কীরূপে যাইতেছে, ইহা পরস্পরকে জানাইতে হইবে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ওই বাহ্য জগতের লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইবে। এই লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, জানাইবার প্রধান উপায় অথবা এক মাত্র উপায়—বাক্য। বাক্যের দ্বারায় আমরা বাহ্য জগতের বিবরণ দিই। বাহ্য জগৎ কী মূর্তি লইয়া, কীরূপ হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, আমি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করি। তোমার নিকটেও যে মূর্তি, যে রূপ লইয়া দাঁড়ায়, তুমিও তাহা বাক্যের দ্বারায় আমার নিকট প্রকাশ করো। এই বাক্যগুলি কতকগুলি শব্দের সমষ্টি। এক-একটা শব্দ এক-একটা সংকেত। এক সংকেত যদি সকলের নিকট এক অর্থই প্রকাশ করে, তবেই তাহার সার্থকতা থাকে। এই শব্দেই যদি ভিন্ন-ভিন্ন লোক ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ আরোপ করে, তাহা হইলে শব্দের প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। বাহ্য জগৎ যে মূর্তি লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, কতকগুলি নাম দিয়া, কতকগুলি শব্দ দিয়া আমরা তাহার একটা প্রতিমা গড়ি এবং সেই প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই প্রতিমাকেই বাহ্য জগতের স্বরূপের প্রকাশ বলিয়া ধরিয়া লই। আমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া এই যে প্রতিমা গড়িয়াছি, ইহা বস্তুত একটা বাঙ্ময়ী প্রতিমা। বাহ্য জগতের অর্থাৎ প্রাতিভাসিক জগতের ব্যবহারিক অংশের যে মূর্তি আমরা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, এই প্রতিমাকে তাহার অনুরূপ বা

অনুকল্প বলিয়া ধরিয়া লই। এই যে প্রতিমা, ইহা একটা মনগড়া প্রতিমা মাত্র। বাক্যের দ্বারা নির্মিত বলিয়া ইহার নাম দিয়াছি—বাঙ্ময় জগৎ। এই বাঙ্ময় জগৎ পূর্বকল্পিত বাহ্য-জগতের প্রতিমা মাত্র। ধ্যানগোচর দেবতার সহিত মৃন্ময় প্রতিমার যেরূপ সম্পর্ক, বাহ্য জগতের প্রকৃত মূর্তির সহিত বাহ্য জগতের এই বাঙ্ময় প্রতিমার কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক। প্রাতিভাসিক জগৎ প্রত্যক্ষ বস্তু; উহার যে অংশ ব্যবহারার্থ বাহ্য জগৎরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহাও প্রত্যক্ষ বস্তু। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বস্তুর গায়ে আমরা যে নামের টিকিট বসাইয়া দিই, সেই নামটা কখনো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে পারে না। পদ্মলোচন মানুষটা যে অর্থে প্রত্যক্ষ, পদ্মলোচন নামটা কখনো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু নহে। বাহ্য জগৎ যে অর্থে প্রত্যক্ষ, বাহ্য জগতের সেই বাঙময় প্রতিমা কখনও সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা প্রধানত এই বাঙ্ময় জগৎ তৈয়ার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিভাষা মতেই ইহার অপর আখ্যা জড় জগৎ হইয়াছে। এ-কালের বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে জড় জগৎ বলে, Material World বলে, তাহা প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ নহে, বাহ্য জগতের কল্পিত বাঙ্ময় প্রতিমা মাত্র। কল্পিত প্রতিমা এই জন্য বলিতেছি যে,—উহার কল্পনা অন্যরূপ হইতেও পারিত। ঘটনাক্রমে বিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাস যেরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ঘটনাচক্রে অন্যরূপ হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার ইতিহাস অন্যরূপ হইতে পারিত। গ্যালিলিও ও নিউটন বিজ্ঞান-বিদ্যাকে যে পথে চালাইয়াছেন, তাঁহাদের অনুবর্তীরা সেই পথে চলিয়া যে কল্পনা খাড়া করিয়াছেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা যদি সে পথে না চালাইতেন, অথবা তাঁহাদের তুল্য প্রতিভাশালী অন্য লোকে যদি অন্য পথে চালাইতেন, তাহা হইলে আমরা অন্য পথে আসিয়া অন্যরূপ কল্পনা গ্রহণ করিতাম। প্রতিমাটা যখন প্রতীক মাত্র, সাংকেতিক ব্যাপার মাত্র, convention মাত্র, তখন সেই কল্পনা স্বচ্ছন্দে অন্যরূপ হইতে পারিত। ঘটনাচক্রে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই আমাদের ব্যবহার চলিতেছে, তাহাতেই আমাদের জীবনযাত্রার সুবিধা বই অসুবিধা ঘটে নাই; কাজেই আমরা সেই বিশিষ্ট কল্পনাটাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, সেই কাঠামোও বজায় রাখিয়া পাঁচ রকমের রং ফলাইতেছি, নূতন-নূতন সাজ বসাইতেছি, আবশ্যকমতো মেরামত করিয়া লইতেছি, অথবা নূতন-নূতন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসাইয়া পূর্ণতা সাধনের প্রয়াস করিতেছি। আমি বলিতে চাহি যে, বাহ্য জগতের সেই কল্পিত প্রতিমাই বৈজ্ঞানিকদের জড় জগৎ। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে জড় জগৎ বলেন, তাহা একটা কৃত্রিম বস্তু। প্রত্যক্ষ বস্তুকে যদি সত্য বস্তু বলা যায়, তাহা হইলে উহা কখনোই সত্য বস্তু নহে।

আমরা সকলে বৈজ্ঞানিক নহি। আমরা সাদাসিধা মানুষ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, এই সকল প্রত্যক্ষ সামগ্রী লইয়াই কারবার করিতে চাই। আমাদের নিকট বাহ্য জগৎ এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, এই পঞ্চ প্রত্যক্ষ পদার্থে নির্মিত। বাহ্য জগৎ এই প্রত্যক্ষ মূর্তি লইয়াই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। কোনো বাহ্য বস্তুর বিবরণ দিতে হইলেই আমরা বলি—উহা ঠান্ডা বা গরম, তিক্ত বা মিষ্ট, রাঙা বা নীলা, কোমল বা কঠিন। আমরা যে বাহ্য বস্তুর এইরূপ বিবরণ দিই, ইহা আমাদের বৈজ্ঞানিকতার অভাবে। বৈজ্ঞানিকেরা এ জন্য আমাদিগকে অবজ্ঞা বা উপহাস করিবেন। এই যে রূপ-রস-শব্দাদি, এইগুলিকে আমরা sensation বা অনুভূতি বলি। যে-কোনও Physical Science-এর বহি খুলিয়া দেখুন, এই sensation-গুলিকে যথাসাধ্য বর্জন করিয়া বাহ্য জগতের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা দেখিতে

পাইবেন। সর্বত্র দেখিবেন এই চেষ্টা। তাপ-বিজ্ঞানের অধ্যায়টা খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—দুধটা গরম, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন—দুধের উষ্ণতা বা temperature এত ডিগ্রি। কিন্তু সে temperature মাপিবার সময় তিনি স্পর্শেন্দ্রিয়কে একেবারেই বিশ্বাস করিতেছেন না, দেখিতেছেন—thermometer-এর পারা কতখানি উর্ধ্বে উঠিতেছে। শব্দ-বিজ্ঞানের অধ্যায় খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—এ সুরটা কোমল বা তীয়র, বৈজ্ঞানিক সেখানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর একেবারে নির্ভর না করিয়া বলিতেছেন, বাতাসে সেকেন্ডে এত বার ধাক্কা পড়িতেছে। আলোক-বিজ্ঞানের অধ্যায় খুলিয়া দেখুন, আমরা যেখানে বলি—এ রংটা রাঙ্গা বা নীলা, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন, ether-এ প্রতি সেকেন্ডে এত কোটি বার ধাক্কা পড়িতেছে। আমরা যেখানে বলি—এ জিনিসটার আস্বাদন টক, বৈজ্ঞানিক সেখানে বলিতেছেন, এখানে হাইড্রোজেনের ion-গুলি স্বাধীনভাবে এত বেগে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ফলে আমরা দেখি, বাহ্য জগৎ রূপ-রস-শব্দাদিময়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন, ওই রূপ-রস-শব্দাদি কেবল accident মাত্র, বাহ্য জগতের আগন্তুক ধর্ম মাত্র। ওগুলিকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে পারিলেই বাহ্য জগতের খাঁটি বৈজ্ঞানিক বিবরণ দেওয়া হইবে। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়াই বাহ্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করি, নতুবা আমাদের গত্যন্তর নাই। বৈজ্ঞানিককেও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া আরম্ভ করিতে হয়; কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্য বর্জন করিয়া, sensation-গুলিকে যথাশক্তি দূরে ফেলিয়া, বাহ্য-জগতের বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এমনকী, বিজ্ঞান-বিদ্যার যে অধ্যায় এ sensation-গুলিকে যতটা বর্জন করিতে পারে, সেই অধ্যয়টিই বৈজ্ঞানিকতায় ততটা পূর্ণতা পাইয়াছে। Chemistry বা রসায়নশাস্ত্রকে এখনো বহু স্থলে এই অনুভূতিগুলি অবলম্বন করিয়াই কথা কহিতে হয়; সেই জন্য Chemistry-শাস্ত্র এখনও অপূর্ণ। কোনও দ্রব্যের বিবরণ দিতে গেলেই রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এখনও বলেন—ইহার বর্ণ এইরূপ, স্বাদ এইরূপ, গন্ধ এইরূপ; কিন্তু এই যে বিবরণ, ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার পরিচয় নাই, ইহাতে বৈজ্ঞানিকতার অপূর্ণতারই পরিচয়। Physics-শাস্ত্র বা পদার্থ-বিদ্যা ইহার তুলনায় অনেকটা পূর্ণতা পাইয়াছে। যিনি Physics-ব্যবসায়ী, তিনি উষ্ণতার বিবরণ দিতে গিয়া বলেন, এখানে molecule-গুলি বা অণুগুলি এত বেগে ছুটিতেছে; শব্দের বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—এখানে তারটা সেকেন্ডে এত বার কাঁপিতেছে; আলোর বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—ether-এ ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য এতটুকু; electric current বা তড়িৎ স্রোতের বিবরণ দিতে গিয়া বলেন—ইহা চুম্বকের কাঁটাকে এতটা ঠেলিয়া দেয়। তাঁহারা স্বাদ আর গন্ধ এই দুইটা sensation-কে এখনো সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। এখনও উহাদিগকে টানাটানি আর ঠেলাঠেলি আর ছুটাছুটির ব্যাপারে বিবৃত করিতে পারেন নাই। কাজেই Physics-এর বহিগুলিতে আপনারা Heat, Sound আর Light-এর অধ্যায় দেখিতে পাইবেন; কিন্তু স্বাদের বা গন্ধের অধ্যায় দেখিতে পাইবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত sensation ছাড়িয়া না যাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা sensation-গুলিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ লইয়াই আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্য জগৎ। এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ বর্জন করিলে আমাদের নিকট বাহ্য জগতের কিছুই অবশেষ থাকে না। কোনও পণ্ডিত, কোনও দার্শনিক পণ্ডিত, কোনও empirical philosopher বাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া রূপ-রস-গন্ধ-

শব্দ-স্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাইবেন না। বৈজ্ঞানিক ইহা জানেন, অথচ তিনি বাহ্য জগতের বিবরণ দিতে গিয়া এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকেই অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতের বিবরণ দেওয়া বৈজ্ঞানিকের এক মাত্র ব্যাবসা, অথচ তিনি বাহ্য জগতের সেই প্রত্যক্ষ লক্ষণগুলিকেই একেবারে চাপা দিয়া, উহাদিগকে তাড়াতাড়ি ঠেলিয়া ফেলিয়া, উহাদিগকে একেবারে অতিক্রম করিয়া, উহাদের অন্তরালে বা আড়ালে কী আছে বা কী না আছে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল। এও একটা মস্ত paradox বা হেঁয়ালি। paradox-টার নিশ্চয়ই একটা মানে আছে। আসুন, আমরা এই মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করি।

ওই যে যাহাকে অনুভূতি বা sensation বলিতেছি, উহার মতো প্রত্যক্ষ পদার্থ আর কিছু নাই, উহার মতো সত্য পদার্থ আর কিছু নাই; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, উহার কোনওরূপ description বা বর্ণনা দেওয়া চলে না। যে অজ্ঞ, তাহাকে উহার কোনওরূপ জ্ঞান দেওয়া চলে না। যে জন্মান্ধ, রূপ কী পদার্থ, বর্ণ কী পদার্থ, তাহাকে কিছুতেই বাক্য দ্বারা বুঝানো চলে না। যে জন্ম-বধির, তাহাকে শব্দ কী পদার্থ, তাহা কিছুতেই বুঝান চলে না। অনুভূতি মাত্রেরই এই বিশিষ্টত্ব। জন্মান্ধের কথা ছাড়িয়া দিন; যে ব্যক্তি রাঙা জিনিস কখনও দেখে নাই, তাহাকে রাঙা বর্ণ কী, তাহা বাক্যের দ্বারা কিছুতেই বুঝানো চলে না। নিতান্তই যদি বুঝাইতে চান, তাহা হইলে একটা রাঙা জিনিস আনিয়া তাহার চোখের সামনে ধরিয়া দেখাইতে হইবে এবং শিখাইতে হইবে—এই যে বর্ণ দেখিতেছ, ইহাই রাঙা। মজা এই যে, তদবধি সে ব্যক্তি রাঙাকে রাঙা বলিলেও রাঙাকে রাঙা দেখিতেছে কি না, উহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলিবে না। রক্তজবাকে আমিও রাঙা বলি, আপনিও রাঙা বলেন; কিন্তু আমরা উভয়ে ঠিক যে এক রকমই দেখি, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইন্দ্রিয়সাদৃশ্য অনুসারে আমরা অনুভূতি-সাদৃশ্য অনুমান করিয়া লই মাত্র। আমিও মানুষ, আপনিও মানুষ, আমারা চোখ সুস্থ, আপনারও চোখ সুস্থ। অতএব আমি ধরিয়া লই, ওই জবাফুল আমিও যেমন রাঙা দেখিতেছি, আপনিও তেমন রাঙা দেখিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক কি আমার চোখ ও আপনার চোখ সর্বতোভাবে সমান? উভয়ের চোখের গঠনে, উভয়ের ইন্দ্রিয়শক্তিতে কি কোনও ভিন্নতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। নতুবা আপনিই বা চশমা লয়েন কেন, আর আমিই বা লই না কেন? এই যে ভিন্নতা, এটা তো মোটা। উভয়ের চোখের গঠনে আরও কত যে সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে, তাহা কোনও চোখের ডাক্তারও ধরিতে পারে না। ফলত আমরা উভয়েই বলি জবাফুল রাঙা; কিন্তু আমি যেমন রাঙা দেখি, আপনি ঠিক তেমন রাঙা দেখেন না—ইহা নিশ্চয়। উভয়ের রাঙাতে একটু-না-একটু ভেদ আছে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কতটুকু ভেদ আছে, কীরূপে বলিব? Helmholtz যে দিন colour sensation-এর theory তৈয়ার করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে,—Maxwell যে দিন colour triangle এবং colour pyramid তৈয়ার করিয়া বর্ণ-বিশ্লেষণের এবং বর্ণ-বিশ্লেষণের উপায় বিধান করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে ভিন্ন-ভিন্ন লোকের বর্ণানুভূতি মিলাইবার নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; কিন্তু চাপিয়া ধরিলে দেখা যাইবে যে, গোড়ার সমস্যাটা এখনো মীমাংসা হয় নাই। Sensation জিনিসটা মূলেই comparable বা তুলনীয় নহে। এক জনের অনুভূতির সহিত অপরের অনুভূতির কোনওরূপে তুলনা হয় না। ওই দৃষ্টান্তটাকেই চাপিয়া ধরুন, তাহা হইলে আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে।

রাঙা একটা sensation নীলা আর একটা sensation। উভয়ে ভেদ কী, তাহা আমি জন্মাবধি জানি। জবাফুল দেখিয়া আমি বলি রাঙা, আকাশের পানে চাহিয়া বলি উহা নীলা। আমি আজন্ম জবাফুলকে রাঙা বলিয়া আসিতেছি এবং আকাশকে নীল বলিয়া আসিতেছি, ইহাই আমার শিক্ষা। আপনি বয়সে আমার ছোট। জ্ঞানোদয়ের পর কোন রংকে কী নামে ডাকিতে হয়, আপনি আমারই নিকটে শিখিয়াছেন। আমি আপনাকে শিখাইয়াছি, জবাকে রাঙা বলিতে হয়, এবং আকাশকে নীল বলিতে হয়। আমারই শিক্ষা পাইয়া আপনি আজন্ম বলিয়া আসিতেছেন, জবা রাঙা, আব আকাশ নীল। ধরিয়া লইলাম, আমার চোখ সর্বতোভাবে আপনার চোখের সহিত সমান। দর্শনেন্দ্রিয় আমার যেমন সর্বতোভাবে সুস্থ, আপনারও তেমন সর্বতোভাবে সুস্থ। তথাপি আমি যদি জোর করিয়া বলি যে, আমার অনুভূতির সহিত আপনার অনুভূতির আদৌ মিল নাই—আপনি তাহা অপ্রমাণ করিবেন কীরূপে? আমি বলিতে চাহি যে, আপনি জন্মাবধি জবাফুলকে নীলই দেখিতেছেন, আমি আকাশকে যেরূপ নীল দেখি, আপনি জবাফুলকে সেইরূপই নীল দেখিতেছেন। দেখিতেছেন নীল, কিন্তু বলিতেছেন রাঙা; কেন না, আমি আপনাকে এরূপই শিখাইয়াছি। আমার শিক্ষা পাইয়া আপনি জবাফুলকে নীল দেখিয়াও চিরকালই রাঙা বলিয়া আসিতেছেন এবং চিরকালই উহাকে রাঙা বলিয়া যাইবেন; কোনও কালে নীল বলিবেন না। কাজেই আমার অনুভূতির সহিত আপনার অনুভূতির কিছু মাত্র মিল না থাকিলেও কস্মিনকালেও সেই প্রভেদ ধরা পড়িবে না। আমি যে দ্রব্যকে যে বিশেষণ দিয়া আসিতেছি, আপনিও সেই দ্রব্যকে সেই বিশেষণ দিয়া আসিতেছেন এবং চিরকাল দিতে থাকিবেন। আপনার সহিত আমার ব্যবহারে আদানে প্রদানে কোনওরূপই অসুবিধা ঘটিবে না। উভয়েরই জীবনযাত্রা অবাধে নির্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে। ফলে তাহাই হয়। খুব সম্ভব আপনাদের মধ্যেই অনেকে রংকানা আছেন। আপনারা নিজেও তাহা জানেন না, অন্যেও তাহা জানে না। যিনি রংকানা, তিনি কোনও-কোনও রং আদৌ দেখিতে পান না; অথচ সকলেই যে জিনিসকে যে রঙের বলে, তিনিও সেই জিনিসকে সেই রঙের বলিয়া চালাইয়া আসিতেছেন, এ পর্যন্ত কখনও ধরা পড়েন নাই। হয়তো দৈবক্রমে একদিন ধরা পড়িবেন। Helmholtz এবং Maxwell-এর theory-মতে রং সম্বন্ধে তিনটি মাত্র মূল sensation আছে। এই তিনটা sensation ভিন্ন-ভিন্ন ভাগে মিশাইয়া অসংখ্য যৌগিক sensation-এর উৎপত্তি হয়। কোনও রংকানা লোকের যদি সেই মূল sensation-এর একটার অভাব থাকে, তাহা হইলে যৌগিক sensation-এর বেলায় তাহার সহিত অন্যের প্রভেদ দাঁড়াইয়া যায়। কোনও এক নূতন অদৃষ্টপূর্ব যৌগিক রঙের sensation উপস্থিত হইলে যে রংকানা, সে এক নাম দেয়, আর যে রংকানা নয়, সে অন্য নাম দেয়। তখন হয়তো সে ধরা পড়ে। কিন্তু এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। আমি যদি গোড়ায় ধরিয়া বসি যে, মূল sensation-গুলিতেই আপনাতে আমাতে মিল নাই, অথচ আমিও যে নাম দিই, আপনিও সেই নাম দেন, সেখানে নিরুত্তর হইতে হয়। ফলে sensation জিনিসটাকে তুলনা করিবার কোনও উপায়ই নাই। এক জনের sensation-কে অপরের sensation-এর পাশে রাখিয়া তুলনা করিবার কোনও উপায় এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। উহা একেবারে অন্তরের সামগ্রী। উহাকে বাহিরে আনিবার কোনও উপায়ই নাই। অন্যের সহিত আদান-প্রদানের সময় আমি কেবল নাম লইয়াই কারবার করি। এই নামগুলি কেবল সংকেত মাত্র। এই সংকেতগুলির

ব্যবহারে যদি consistency থাকে, যদি কোনও খামখেয়ালি না থাকে, তাহা হইলে আদান-প্রদানে জীবনযাত্রায় কোনও অসুবিধা ঘটে না। কারবার করি আমরা নাম লইয়া; আসল জিনিসটার স্বরূপের সহিত তাহার নামের কোনও সম্পর্ক থাকা আবশ্যক নহে। সেই স্বরূপটা যিনি যে ভাবেই দেখুন না, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। সকলে যদি এক নামে তাহাকে ডাকেন, তাহা হইলে জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে চলিয়া যায়। এই জীবনযাত্রা নিতান্তই কাজ চালানো ব্যাপার। জীবনের কাজ কোনওরূপে চলিয়া গেলে আমাদের মতো মাঝারি মানুষের পক্ষে তত্ত্বান্বেষণের এবং তত্ত্বচিন্তার কোনও প্রয়োজন থাকে না।

এখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যা কেন রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ sensation-গুলিকে অতিক্রম করিয়া বাহ্য জগতের ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বিষয় বাহ্য জগৎ। এই বাহ্য জগৎ সর্বতোভাবে ব্যাবহারিক জগৎ। জীবে জীবে আদানপ্রদান বা ব্যবহার না থাকিলে এই জগতের অস্তিত্ব কল্পনা অনাবশ্যক হইত। আদানপ্রদান ব্যবহার করিতে হয় বলিয়াই ইহাকে প্রাতিভাসিক জগতের মাঝে হইতে ছিনিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিতে হইয়াছে। বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বরূপত প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক জগতেরই অংশ মাত্র। প্রাতিভাসিক জগতের মধ্যে নানা sensation, নানা feeling, নানা emotion রহিয়াছে; তাহাদের সংখ্যা নাই। তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি মাত্র sensation-কে আমরা পৃথকভাবে—স্বতন্ত্রভাবে দেখি। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ সেই কয়টি sensation। আমি ধরিয়া লই যে, এই কয়টি sensation বিষয়ে আমার সহিত আপনার ও অন্যের যাহা কিছু সমানতা বা তুল্যতা। যে কয়টা sensationt-এ এই দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, সেই কয়টাকে আমরা বাহির হইতে আগত মনে করি, কিন্তু মনে করি মাত্র। আমরা প্রত্যেকে যদি আপন-আপন বাহ্য জগৎকে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে ওই রূপ-রস-গন্ধাদি অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা ব্যাবহারিক বিদ্যা, কেবল বিশ্লেষণে আর স্বরূপ-নির্ণয়ে ক্ষান্ত থাকিলে বিজ্ঞান-বিদ্যার চলিবে না। বাহ্য জগৎটা জীবনের কাজের জন্যই রহিয়াছে এবং যাহাতে উহা ভালো করিয়া জীবনের কাজে লাগে, বিজ্ঞান-বিদ্যাকে সেই চেষ্টায় থাকিতে হইয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে যেরূপেই হউক, বাহ্য জগতের এবং বাহ্য জগতের অন্তর্গত যাবতীয় বাহ্য দ্রব্যের একটা পরিচয় দিতে হইবে। সর্বসাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারে, এমন ভাষায় পরিচয় দিতে হইবে। রূপ-রস-গন্ধাদি অনুভূতি যদি প্রত্যেক জীবের পক্ষে সর্বতোভাবে সমান, এরূপ মনে করিবার উপায় হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ অনেকটা কাজ হইতে পারিত। তাহা হইলে বাহ্য জগৎকে in terms of the sensations অর্থাৎ অনুভূতির সমষ্টিরূপে পরিচিত করা চলিতে পারিত। আমরা বৈজ্ঞানিক নহি, আমরা মোটামুটি ওইরূপে in terms of the sensations বাহ্য জগতের পরিচয় দিয়া থাকি। আমরা বলিয়া থাকি, জবাফুল রাঙা, আকাশ নীলবর্ণ, চিনি মিষ্ট, কুইনাইন তিক্ত ইত্যাদি। ইহাতে মোটামুটি জীবনের কাজ চলিয়া যায়; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজ চলে না। তাঁহাকে আরও সূক্ষ্ম হিসাব দিতে হয়। তিনি দেখিতে পান যে, কোনও দুই ব্যক্তি একই ক্ষেত্রে একই অনুভূতি প্রত্যক্ষ করে না। যাহারা মাঝারি মানুষ, মোটামুটি যাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়, তাহাদের মধ্যে হয়তো একটা মোটা মিল আছে মাত্র। যাহারা অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, কানা, কালা, তাহাদের নিকট সকল অনুভূতি তো পৌঁছোয়ই না। তাহাদিগকে

ছাড়িয়া দিয়া যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সুস্থ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহাদেরও মধ্যে পরস্পর মিল নাই। কোনও দুই জনের ইন্দ্রিয়-শক্তি ঠিক সমান নহে। কাহারও অনুভব-শক্তি সূক্ষ্ম, কাহারও স্থূল। সমান থাকিলেও কী জানি কোনও কারণে মানুষের মধ্যে রুচিভেদ আছে; যাহা একের নিকট মিষ্ট, তাহা অন্যের নিকট তিক্ত। যে শব্দ একের নিকট মধুর, অন্যের নিকট তাহা কর্কশ। একই ব্যক্তি ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে একই sensation-এর ভিন্ন-ভিন্ন বিবরণ দেয়। অবস্থাভেদে একই জিনিস তিক্ত বা মিষ্ট হয়, একই শব্দ মধুর বা কর্কশ হয়। যাহা এক হাতে লাগে ঠান্ডা, তখনই অন্য হাতে তাহা গরম লাগে। ইন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। আগেই বলিয়াছি, বৈজ্ঞানিককে বহু লোকের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে হয়। স্পষ্টত যাহারা অসুস্থ, একেবারে তাহাদিগকে বর্জন করিয়া বহুসংখ্যক সুস্থ প্রকৃতিস্থ মাঝারি মানুষের সাক্ষ্য লইয়া average কষিতে হয়। বহু লোকের average কষিয়া একটা কাল্পনিক Mean Man খাড়া করিতে হয় এবং সেই কাল্পনিক Mean Man বাহ্য জগতের যে পরিচয় দিবে, তদনুসারে তাঁহাকেও বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে হয়; কিন্তু এই Mean Man-ও যেমন কাল্পনিক, তিনি যে জগতের পরিচয় দেন, সে জগৎটাও তদনুসারে ততটা কাল্পনিক। ইহাতেও রক্ষা নাই; এই যে পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাই বা কোন ভাষায় হইবে। যে সকল সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ আসিয়া সাক্ষ্য দিবে, তাহারা কোন ভাষায় দিবে। তাহারা নিজে বৈজ্ঞানিক নহে, তাহারা মাঝারি মানুষ মাত্র। তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে in terms of the sensations তাহারা উত্তর দিবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, এই sensation বিষয়ে সাক্ষ্য জীবনের মোটা কাজ চালাইবার জন্য যথেষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম হিসাবে একেবারে অগ্রাহ্য। রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে মনুষ্যের সাক্ষ্য নিতান্ত স্থূল। কোনও সাক্ষীকে বিশ্বাস করিবার কোনও উপায় নাই। অনুভূতি পদার্থই যখন comparablc নহে, তখন কোন সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব কীরূপে? জবাফুলকে আমি রাঙা দেখিয়া রাঙা বলি, কিন্তু আর একজন উহাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণের, হয়তো উহাকে নীল বর্ণের দেখিয়াও যখন রাঙা বলে, তখন সে ব্যক্তির সে সাক্ষ্যের মূল্য কতটুকু? কোনও মূল্যই নাই। ফলে বৈজ্ঞানিককে একেবারে হাল ছাড়িতে হইয়াছে। অনুভূতিগুলিকে একেবারে পরিহার করিয়া, উহাদিগকে একেবারে অতিক্রম করিয়া বাহ্য জগতের পরিচয় দিবার জন্য অন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সেই উপায় কী, এইবার দেখা যাউক।

অধ্যাপক Staniey Jevons-এর প্রণীত Principles of Science নামে একখানি সুন্দর পুস্তক আছে। এক কালে আমাদিগকে উহা পড়িতে হইয়াছিল। ওই বহিতে পড়িয়াছিলাম, Physics-শাস্ত্র যে-কোনও রাশিকে বা quantity-কে মাপিবার পূর্বে উহাকে একটা length-এ বা রেখায় পরিণত করিয়া মাপিয়া থাকেন। যাঁহারা পদার্থবিদ্যা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত মনে আসিবে। পদার্থবিদ্যা কোনও physical quantity-র পরিমাণ বা মাত্রা নিরূপণের সময় কোন ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না। শেষপর্যন্ত একটা রেখার দৈর্ঘ্য মাপেন মাত্র। পদার্থবিদ্যার নিকট উষ্ণতা স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। থার্মোমিটারের পারা কতটা উপরে উঠিয়াছে, পদার্থবিদ্যা মতে উষ্ণতার তাহাই পরিমাণ। দুইটা বাতির আলোর উজ্জ্বলতা তুলনা করিতে গিয়া পদার্থবিদ্যা দেখেন, কোনটা কত দূরে রাখিলে সমান উজ্জ্বল দেখায়। বাতাসের চাপ কত, মাপিতে গিয়া দেখেন—ব্যারোমিটারের পারা কতখানি উঠিয়াছে।

আলোর রং ঠিক করিতে গিয়া তিনি দেখেন—কাচের prism-এর ভিতর দিয়া যাইতে কোনও আলো কত দূর সরিয়া গিয়াছে। কোনও ধ্বনির সুর দেখিতে গিয়া যে বাঁশি হইতে সেই ধ্বনি বাহির হইতেছে, সেই বাঁশি, অথবা যে তন্ত্রী হইতে সেই ধ্বনি বাহির হইতেছে, সেই তার কতটা লম্বা, তাহাই তিনি পরিমাণ করেন। দুইটা জিনিস ওজনে সমান কি না, তাহা পরীক্ষার সময় তিনি দেখেন যে, তুলদাঁড়ির বা নিক্তির অবলম্ববিন্দু বা fulcrum হইতে জিনিস দুইটা সমান দূরে ঝুলানো হইয়াছে কি না। এমনকী, কালের পরিমাণ করিতে গিয়াও তিনি দেখেন যে, ছায়া কতটা সরিয়াছে, অথবা ঘড়ির কাঁটা কতটা নড়িয়াছে। অধ্যাপক Jevons কথাটা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন না। সম্প্রতি দার্শনিক পণ্ডিত Bergson এই কথাটাকে অত্যন্ত চাপিয়া ধরিয়াছেন। যে-কোনও physical quantityর magnitude বা মাত্রা নিরূপণ করিতে হইলে উহাকে একটা length-এর স্বরূপে অথবা in special terms প্রকাশ করিতে হয়। বের্গসোঁ বলেন যে, space বা দেশ বা আকাশই এক মাত্র জিনিস, যাহার quantitative measurement বা পরিমাণ নির্দেশ চলে। দেহ বা আকাশ ভিন্ন আর কোন সামগ্রী নাই, যাহা আমরা মাপিতে পারি। সংখ্যা এবং পরিমাণ, number এবং magnitude সম্বন্ধে আমাদের যে কিছু ধারণা আছে, তাহা সমস্তই space হইতে উৎপন্ন। ছোট আর বড়, এই দুই প্রভেদের মূলে ওই space। বের্গেসোঁ বলিতে চাহেন, আমাদের sensation-গুলি আদৌ measurable নহে। উহাদের পরিমাণ নির্দেশ একেবারে অসম্ভব। কোন দুইটা অনুভূতি একজাতীয় হইলেও তাহার মধ্যে এইটা ছোট এইটা বড়, এইটা অল্প এইটা অধিক, এরূপ নির্দেশ করা উচিত নহে। দুইটা sensation একজাতীয় হইলেও তাহাদের যে ভেদ, তাহা qualitative বা গুণগত, কখনোই quantitative বা মাত্রাগত নহে। আপনারা জানেন, আজকাল অনেক পণ্ডিত feeling ও sensationগুলি মাপিয়া একটা Science গড়িবার চেষ্টায় আছেন। উহার নাম Psyco-physics বা Experimental Psychology। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের curriculum-এর মধ্যে এই নূতন বিদ্যা কয়েক বৎসর হইতে ক্যালেন্ডারের পাতা জুড়িয়া বসিয়া আছে। বের্গসোঁর কথা মানিতে হইলে বলিতে হইবে, এই বিদ্যার গোড়ায় গলদ। আপনারা Fechaner's Law-এর কথা শুনিয়া থাকিবেন। Stimulus-এর মাত্রার সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় ওই Law-এর উদ্দেশ্য। কোনও গুরু দ্রব্য হাতে ধরিলে ভার বোধ হয়। এই গুরু দ্রব্যের, ভারটা stimules, আর ওই ভারবোধটা sensation। দুই সের আর আড়াই সের ওজনে যতটুকু প্রভেদ, sensation-এর ১২ সের আর ১২।। সের ওজনে ঠিক সেই প্রভেদ। তুলদাঁড়িতে মাপিয়া উভয় ক্ষেত্রেই একই প্রভেদ দেখা যাইবে। এই যে প্রভেদ, ইহা Stimulus-এর প্রভেদ। কিন্তু হাতে ধরিয়া দেখুন, ২ সের আর ২।। সের ভারের প্রভেদ স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু ১২ সের আর ১২।। সেরের প্রভেদ বুঝা যায় না বলিলেই হয়। এক বাতির আলোর এবং দুই বাতির আলোর উজ্জ্বলতার ভেদ চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে, কিন্তু ১১টা বাতির উজ্জ্বলতার সহিত ১২টা বাতির উজ্জ্বলতার প্রভেদ চোখে ধরিতে পারে না বলিলেই হয়। এইরূপ প্রায় সর্বত্র। Stimulus-এর ভেদ সমান হইলেও তজ্জাত sensation-এর ভেদ সমান হয় না। Stimulus যে হারে বাড়ে, sensation সেই হারে বাড়ে না। ইহাই হইল Fachner's Law। নানা experiment করিয়া ইহার একটা quantitative expression

দেওয়া হইয়াছে। Stimulus যদি বাড়ে geometric progression-এ, sensation বাড়িবে arithmetic progression-এ। Bergson-কে যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে Fechner's Law ভুয়া হইয়া দাঁড়ায়। Stimulus জিনিসটা physical quantity; উহা মাপা চলে; কিন্তু sensation মাপের জিনিস নহে। হাতে তুলিলে দুই সের আর দুই ছটাকের ভারে যে ভেদ বোধহয়, উহা পরিমাণগত ভেদ নহে; উহা গুণগত ভেদ। Sensation হিসাবে দুই ছটাকের ভার অল্প, আর দুই সেরের ভার অধিক, ইহা বলা চলে না। দুই ছটাকের ভার একরকমের sensation, দুই সেরের ভার অন্য রকমের sensation। প্রভেদ যাহা তাহা গুণগত, তাহা মাত্রাগত নহে। দুই ছটাক ওজন হাতে তুলিলে গোটাকতক মাংসপেশিতে, গোটাকতক স্নায়ুতে চাপ পড়ে, দুই সের হাতে তুলিলে তদতিরিক্ত আরও অন্য মাংসপেশিতে, আরও অন্য স্নায়ুতে চাপ পড়ে। দুই মণ তুলিতে গেলে সর্বাঙ্গেই হয়তো কিছু-না-কিছু চাপ পড়ে, রক্তচলাচল বিকৃত হয়, নিশ্বাস আটকাইতে হয়, ইত্যাদি নানা নূতন উৎপাত উপস্থিত হয়। যে sensation হয়, তাহা এই নানা উৎপাত-সমষ্টির সহকারী। উহাকে নূতন রকমের sensation বলাই উচিত।

Bergson-এর সমুদয় ব্যক্তি আপনাদের নিকট উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করি না। sensation পরিমাণযোগ্য হউক আর নাই হউক, উহার পরিমাণ কত দুঃসাধ্য, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। physical Science কেন sensation-কে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও আপনারা এতক্ষণ বুঝিতেছেন। sensation-এর উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহারা অন্য উপায়ে বাহ্য জগতের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, Science is measurement। অন্য Science-এর পক্ষে যাহাই হউক, Physical Science-এর পক্ষে পরিমাণকর্মই প্রাণ। Sensation-এর পরিমাণ দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য দেখিয়া Physical Science পরিমাণযোগ্য অন্য পদার্থের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পরিমাণযোগ্য পদার্থই Space। বাংলায় আমি ইহাকে আকাশ বা দেশ বলিব।

Physical Science বাহ্য জগৎকে Space-মধ্যে, দেশ-মধ্যে, আকাশ-মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছেন। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে চলো, বাম দিক হইতে ডান দিকে চলো, অধঃ হইতে ঊর্ধ্বমুখে চলো, যে দিকেই যাও, ইহাকে বিস্তীর্ণ দেখিবে। যে দিকেই চলো না কেন, কোথাও ইহার সীমানা পাওয়া যায় না; এই জন্য বলা হয়—ইহা অসীম। অপিচ এই আকাশ সর্বত্র সর্বতোভাবে সমাকার, একাকার এবং নির্বিশেষ—absolutely homogeneous। এক স্থান হইতে অন্য স্থানকে পৃথক করিয়া চিনিবার কোনও বিশিষ্ট চিহ্ন নাই। এই আকাশ পরিমাণযোগ্য; উহার এক টুকরার ভিতরে আর এক টুকরা থাকিতে পারে, এক অংশ অন্য অংশকে include করে। যে টুকরা ভিতরে থাকে, তাহাকে বলি ছোট; আর যে টুকরা বাহিরে থাকিয়া উহাকে include করে, তাহাকে বলি বড়। Space-এর এক টুকরার মধ্যে আরও ছোট টুকরা যত ইচ্ছা তত সংখ্যায় বসাইতে পারি; উহার বিভাজ্যতর, উহার divisibility-র অন্ত নাই। এক টুকরা space যত ছোট হউক, তাহার অভ্যন্তরে তাহার চেয়ে ছোট টুকরা বসাইতে পারি। এই সকল কারণে আকাশ absolutely continuous। উহার কোথাও কোন ছেদ বা পরিচ্ছেদ নাই। Space নিজেই ফাঁকা, দুই টুকরা space-এর মধ্যে অন্যরূপ ফাঁক থাকিতে পারে না; যাহা থাকিবে, তাহাও space। বিজ্ঞান-বিদ্যার যে আকাশ, এইগুলি তাহার

লক্ষণ। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের বাহ্য জগৎকে এই আকাশ জুড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই আকাশ সর্বত্র সর্বতোভাবে সমান; ইহার কোনও স্থানে কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ বা চিহ্ন নাই। অকূল পাথারে তারকাহীন অন্ধকার রাত্রে নাবিক যেরূপ দিক নির্ণয় করিতে পারে না, সেইরূপ ইহার কোথাও কোনও দিক নিরূপণের উপায় মাত্র নাই। এইরূপ সর্বত্র সমাকার ভাবে থাকা না-থাকা সমান। ইহা থাকিলেও কোনও জীবের কোনও লাভ নাই, অথচ বিজ্ঞান-বিদ্যা জীবগণের কারবারের বিদ্যা। সেই কারবারের অনুরোধে এই আকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন চিহ্ন কল্পনা করিতে হইয়াছে। যাহা সর্বতোভাবে homogeous নির্বিশেষ বা সমাকার, তাহাকে দায়ে পড়িয়া heterogeneous সবিশেষ বা বিষমাকার করিয়া লইতে হইয়াছে। আকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন চিহ্ন বসাইতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় সেই সকল চিহ্নের নাম material body বা জড় দ্রব্য। বৈজ্ঞানিকেরা সেই জন্য নানা স্থানে নানা জড় দ্রব্য বসাইয়াছেন; এখানে চিত্রা ওখানে স্বাতী, এখানে সূর্য ওখানে চন্দ্র, এখানে শুক্র ওখানে শনি, এখানে হিমালয় ওখানে গন্ধমাদন। এক-এক স্থানে এক-একটা চিহ্ন এবং তাহাদের মাঝে-মাঝে কেবলই ফাঁকা,—ফাঁকা আকাশ বা অবকাশ। এইরূপ কোটি-কোটি চিহ্ন এবং তাহাদের মাঝে-মাঝে অবকাশ দিয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আকাশ স্বয়ং চিহ্নবর্জিত, ওই চিহ্নগুলিই যেন উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে চিহ্নিত করিয়াছে। আকাশ নিজে গট হইয়া বসিয়া আছে; উহা যেন স্থিরত্বের প্রতিমূর্তি, উহার এক অংশকে ঠেলিয়া অন্যত্র লওয়া চলে না, উহার এক টুকরা কিছুতেই অন্যত্র গিয়া অন্য টুকরার সহিত মিশে না, উহার প্রত্যেক বিন্দু আপন-আপন স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া আছে; কিন্তু এই চিহ্নগুলি কোথাও স্থির হইয়া নাই। উহারা এখন এখানে, তখন ওখানে, এইরূপে সর্বদা সঞ্চরণশীল। আকাশের মধ্যে উহারা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। বিজ্ঞান-বিদ্যা বাহ্য জগতের যাবতীয় ঘটনাকে এই ছুটাছুটিরূপে বর্ণনা করিতে চাহেন।

জড় দ্রব্যগুলির ইতস্তত বিচরণের দ্বারা যাবতীয় ঘটনার বিবরণ দেওয়ার নাম mechanical description of the physical world। এইজন্য বিজ্ঞান-বিদ্যা Mechanical Science বা Mechanics-এ পরিণত হইয়াছে। এক-একটা জড় খণ্ড আকাশের এক-এক টুকরা জুড়িয়া আছে। তাহাদের মাঝে-মাঝে ফাঁকা আকাশ। এই ফাঁকা আকাশ বা শূন্যদেশ না থাকিলে জড় খণ্ডগুলি ওইরূপে বিচরণ করিতে পারিত না। একটা জড় খণ্ড আর এক খণ্ড হইতে দূরে যায়, নিকটে আসে, পাশে আসিয়া বসে, কিন্তু একেবারে মিশিয়া যাইতে পাবে না। দুইটা material body আকাশের একই অংশ জুড়িয়া বসিতে পারে না। একটা আর একটার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রবিষ্ট বা অনুস্যূত হইতে পারে না, পরস্পর interpenetrate করে না। জড় দ্রব্যের কাজই হইতেছে আকাশের নানা স্থানকে নানা রূপে চিহ্নিত করা, এক স্থানকে অন্য স্থান হইতে বিশিষ্ট করা। একটা দ্রব্য আর একটায় অনুপ্রবিষ্ট হইলে, উভয়ে পরস্পর সর্বতোভাবে মিশিয়া গেলে এইরূপ চিহ্নের কোনও সার্থকতা থাকে না, জড় দ্রব্যেরও কোনও সার্থকতা থাকে না। এইজন্য বলা হয়, জড় দ্রব্যের একটা মুখ্য লক্ষণ impenetrability। যেখানে দেখা যায়, একটা দ্রব্য আর একটা দ্রব্যে যেন মিশিয়া যাইতেছে,—জলে চিনি মিশিতেছে, hydrogen-এ oxygen মিশিয়া জল হইতেছে, তামায় দস্তায় মিশিয়া পিতল হইতেছে, তখন একটা fiction-এর আশ্রয় লওয়া হয়—বলা হয়,

বস্তুত তাহারা interpenetrate করে নাই—বলা হয়, উহাদের খুব ছোট-ছোট অংশ বা কণিকা আছে; খুব ছোট বলিয়াই তাহাদিগকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারিতেছি না। ওই ছোট কণিকাগুলি পাশাপাশি রহিয়াছে, উহাদেরও মাঝে-মাঝে ফাঁক আছে। একটা কণিকা আর একটা কণিকার সহিত মিশিয়া গিয়া এক স্থান জুড়িয়া নাই। এই সকল কণিকাগুলির ক্ষেত্রভেদে নাম দেওয়া হয় অণু, পরমাণু, particle, corpuscle, atom, colecule ইত্যাদি। বিজ্ঞান-বিদ্যা সমস্ত আকাশমধ্যে এইরূপ ছোট বড় অসংখ্যেয় জড় দ্রব্য বা material body ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কাপিণ্ড, তারকা, এইগুলি বড়-বড় দ্রব্য, আর অণু পরমাণু প্রভৃতি ছোট-ছোট দ্রব্য। ছায়াপথের মধ্যে বহু কোটি তারকা বিছানো রহিয়াছে, তাহাদের এক-একটা বৃহত্তায় সূর্যের সহিত তুলনীয়। সূর্য বৃহত্তায় বারো লক্ষ পৃথিবীর সহিত তুলনীয়। পৃথিবীর তুলনায় একটা ফুটবল যেমন, এক ফোঁটা জলের তুলনায় একটা জলের অণু তদ্রূপ।

আকাশ জুড়িয়া ছোট-বড় জড় দ্রব্য ছড়ানো আছে; তাহাদের মাঝে-মাঝে অবকাশ। সেই অবকাশমধ্যে তাহার নানা বেগে নানা মুখে বিচরণ করিতেছে। আকাশ নিজে সর্বতোভাবে সমাকার; উহার কোনও স্থানে কোনও চিহ্ন নাই। কাজেই কোনও জড় দ্রব্য আকাশের কোনও নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া আছে কি না বলিবার কোনও উপায় নাই। অগত্যা একটা কোনও জড় দ্রব্যকে স্থির ধরিয়া লইয়া অন্যগুলার গতিবিধি নিরূপণ করিতে বাধ্য হই। আমরা সৌর জগতের অধিবাসী, সূর্যকে স্থির ধরিয়া লইয়া অন্যান্য দ্রব্যের গতিবিধি নির্ণয় করায় আমাদের পক্ষে সুবিধা। সূর্যকে স্থির নিশ্চল ধরিয়া তাহার তুলনায় কোন দ্রব্য কোন বেগে চলিতেছে, তাহা নিরূপণ করি। এই বেগ আপেক্ষিক বেগ মাত্র—ইংরেজিতে উহাকে relative velocity বলা হয়। এইরূপে নিরূপিত বেগ আপেক্ষিক; উহার প্রকৃত পরিমাণ কত, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বেগের হ্রাস বা বৃদ্ধি সে অর্থে আপেক্ষিক নহে। পুকুরে কত জল আছে, না জানিয়াও সেই জল বাড়িতেছে বা কমিতেছে, তাহার নিরূপণ চলে। গরমি কালে জলে কমে, বর্ষাকালে জল বাড়ে, পুকুরের পাশে দাঁড়াইলে অতি বালকেও তাহা জানিতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে দাগ দিয়া রাখিলে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিন কতটুকু বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহার নিরূপণ হয়। আপনার তহবিলে কত টাকা আছে, তাহা আমি জানি না; কিন্তু বাক্সের কত টাকা বাহিরে আসিতেছে, বাহিরের কত টাকা বাক্সে প্রবেশ করিতেছে, তাহা আমি বাহিরে থাকিয়াও জানিতে পারি। দেখা যায়, জড় দ্রব্য মাত্রের বেগ বৃদ্ধির দিকে, বেগ অর্জনের দিকে একটা প্রবণতা, একটা প্রবৃত্তি আছে। কোনও দ্রব্যের অধিক, কোনও দ্রব্যের অল্প। চন্দ্র, সূর্য হইতে জলকণা ধূলিকণা পর্যন্ত সকল জড় দ্রব্যেরই বেগ বর্ধনে—বেগ অর্জনে প্রবৃত্তি আছে; সেই প্রবৃত্তি বা প্রবণতা নিরূপণ করা চলে। পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করা চলে। একটা ঘড়ি ও আর একটা গজকাঠি মাত্র আবশ্যক হয়। এই যে বেগার্জনের প্রবৃত্তি, দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে চলিবার প্রবৃত্তি, ইহার একটা নাম দেওয়া দরকার। ঘটনাক্রমে সেই প্রবৃত্তির কোনও নাম দেওয়া হয় নাই; অপ্রবৃত্তির একটা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজিতে তাহাকে inertia বলে। বাংলায় আমি উহাকে জড়ত্ব বলিব। উহা অপ্রবৃত্তির নাম; কেন না, যে দ্রব্যের দ্রুত চলিবার প্রবৃত্তি যত অধিক, তাহার inertia-কে তত অল্প বলা হয়। এই কথাটুকু মনে রাখিবেন। সূর্যের সহিত পৃথিবীর তুলনায় দেখা যায়, পৃথিবীর সূর্যের অভিমুখে দৌড়োবার প্রবৃত্তি অধিক; পৃথিবীর অভিমুখে সূর্যের দৌড়োবার

প্রবৃত্তি তার তুলনায় অতি অল্প। বলা হয়, পৃথিবীর inertia বা জড়ত্ব অল্প; সূর্যের inertia বা জড়ত্ব তার তুলনায় অধিক, তিন লক্ষগুণ অধিক। ওইরূপ পৃথিবী ও চাঁদ পরস্পরের অভিমুখে দৌড়োবার প্রবৃত্তি রাখে; পৃথিবী ধীরে দৌড়োয়, চাঁদ দ্রুত দৌড়োয়। পৃথিবীর জড়ত্ব অধিক, আশি গুণ অধিক। বোঁটা হইতে খসিবা মাত্র আপেল-ফল পৃথিবীর অভিমুখে ছুটিয়া পড়ে; পৃথিবী কিন্তু প্রায় নিশ্চল থাকে; আপেল-ফলকে প্রত্যুদ্গমনের প্রবৃত্তি তাহার বুঝাই যায় না। অতএব আপেলের তুলনায় পৃথিবীর inertia খুব বেশি। বৈজ্ঞানিক যেন যাবতীয় জড় দ্রব্যের দৌড়ের পরীক্ষায় বসিয়াছেন,—দেখিতেছেন, কোনটা ঢিমা, কোনটা চটপটে;—চাঁদের তুলনায় পৃথিবী ঢিমা, পৃথিবীর তুলনায় সূর্য ঢিমা। যে যত ঢিমা, তাহাকে তদনুরূপ নম্বর দিয়া উচ্চে স্থান দিতেছেন। যেটাকে যে নম্বর দেওয়া যায়, সেই নম্বর তাহার inertia-র বা জড়ত্বের দ্যোতক। আপনারা মাস্টারি করেন—ছেলেদের নম্বর দিয়া একজামিন করা আপনাদের অভ্যাস হইয়াছে। যে ছেলে যত নম্বর পায়, সেই নম্বর তাহার চিহ্ন। সেই চিহ্ন দেখিয়া কোন ছেলের কোথায় স্থান, তাহা আপনারা স্থির করেন। বৈজ্ঞানিকেরাও এইরূপে যাবতীয় জড় দ্রব্যের একজামিন করেন; এবং এক-একটা দ্রব্যকে এক-একটা নম্বর দিয়া চিহ্নিত করেন।

ছেলেদের নম্বরে আর জড় দ্রব্যের নম্বরে একটা মস্ত পার্থক্য আছে। ছেলেদের নম্বরে ঠিক থাকে না। এবারকার পরীক্ষায় যে হয় প্রথম, অন্য বারের পরীক্ষায় সে হয় হয়তো পঞ্চম; এবারে যে পায় ৭০, অন্য বারে সে পায় ৫৫। পরীক্ষার ফল অস্থির। কিন্তু জড় দ্রব্যের inertia-র পরীক্ষার ফলে কোনরূপ অস্থিরতা নাই। এখনও যে দ্রব্যের পরীক্ষা করো, সেই একই নম্বর পাইবে। যে একবার ৭০ পায়, সে চিরকালই ৭০ পাইবে; যে একবার ৫৫ পায়, সে চিরকালই ৫৫ পাইবে। সর্বদা, সর্বত্র, সকল ক্ষেত্রে সেই একই অঙ্ক তাহার স্থান নির্দেশ করিবে; কিছু মাত্র ইতরবিশেষ হইবে না। বস্তুত এই যে inertia, ইহা একটা অঙ্ক মাত্র। এই অঙ্কের ছাপ দিয়া আমরা ভিন্ন-ভিন্ন জড় দ্রব্যকে নির্দিষ্ট করি। একটা হইতে অন্যটাকে পৃথক করিয়া চিনিয়া লই। প্রত্যেক জড় দ্রব্যের গায়ে যেন পাকা-কালিতে এই অঙ্কের ছাপ দেওয়া রহিয়াছে—তাহা মুছা যায় না। এক-এক অঙ্কের টিকিট যেন এক-এক দ্রব্যের গায়ে খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার কখন লোপ বা ব্যত্যয় হয় না। এই অঙ্কই সেই দ্রব্যের inertia-জ্ঞাপক বা জড়ত্ব-জ্ঞাপক।

কথাটা মনে রাখিবেন—নির্বিশেষ, একাকার, নিরবয়ব, চিহ্নহীন আকাশকে চিহ্নিত করিবার জন্যই জড় দ্রব্যের অবতারণা। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে অবৈজ্ঞানিকে বড় ভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক কেবল সূক্ষ্ম হিসাবে চিহ্ন করেন। প্রত্যেকে জড় দ্রব্যকে পৃথকভাবে চিনিবার জন্য তাঁহার এক-একটা অঙ্কের মার্কা দিয়া দেন। এই মার্কা স্থায়ী মার্কা। একবার যে মার্কা দেওয়া গেল, তাহা বদল করিবার প্রয়োজন হয় না। কাজেই বলা হয়, inertia লক্ষণটা স্থায়ী লক্ষণ; কোনও দ্রব্যে কোনও কারণে ইহার ব্যত্যয় বা ইতরবিশেষ হয় না। এই inertia-র আর একটা নাম দেওয়া হয়—mass of a body; কেহ-কেহ সোহাগ করিয়া বলেন—quantity of matter in a body. এই quantity of matter-এর ইতরবিশেষ হয় না। জড়ের জড়ত্বের ইতরবিশেষ বা তারতম্য হয় না দেখিয়া কবির ভাষায় বলা হয়—matter is indestructible,—জড়ের ধ্বংস নাই, নাশ নাই। ইহা একটা principle,—ইহাকে বড় করিয়া নাম

দেওয়া হইয়াছে Principle of Conservation of Matter। আসল কথাটা এই যে, প্রত্যেক জড় দ্রব্যের জন্য একটা-একটা অঙ্ক, একটা মার্কা, একটা চিহ্ন স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা যায়; তাহাই তাহার characteristic—মুখ্য লক্ষণ। আধুনিক Mechanics এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। গ্যালিলিও ও নিউটনই এই Mechanics-এর উদ্ভাবনকর্তা।

এই inertia-কে আর একটু চাপিয়া ধরা আবশ্যক। পৃথিবীর জড়ত্ব চাঁদের আশি গুণ, সূর্যের জড়ত্ব পৃথিবীর তিন লক্ষ গুণ। এক বাটি জলের যাহা জড়ত্ব, একটি বাটি পারার জড়ত্ব তাহার ১৩।। গুণ। একটা hydrogen পরমাণুর যে জড়ত্ব, একটা oxygen পরমাণুর জড়ত্ব তাহার ষোলো গুণ। বন্দুকের গুলির জড়ত্ব অপেক্ষা কামানের গোলার জড়ত্ব অধিক। এইরূপে ছোট-বড় প্রত্যেক দ্রব্যের জড়ত্ব বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহার inertia যত বেশি, তাহার বেগ বাড়ানো তত কঠিন।

বিজ্ঞান-বিদ্যা বলেন, কোন দ্রব্যটার জড়ত্ব কত, তাহা আমাকে একবার বাঁধিয়া ফেলিতে দাও। তারপর আমি গণিতের সাহায্যে গণিয়া বলিতে পারিব, আজ যেটা এই স্থলে রহিয়াছে, কালই হউক আর কোটি বর্ষান্তেই হউক, সেটা কোথায় থাকিবে। বিজ্ঞান-বিদ্যার যে অংশের নাম জ্যোতির্বিদ্যা, সেই অংশে বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ গণনায় আশ্চর্যরূপে সফলতা লাভ করিয়াছেন। সৌর জগতের অন্তর্গত যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির গণনা যে পরিমাণ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। সৌর জগতের বাহিরে যে প্রকাণ্ডতর তারকা-জগৎ বর্তমান, সেখানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এখনো হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছেন। সেই বৃহত্তর জগতের তারকাগুলি এত দূরে রহিয়াছে যে, আমাদের সূর্যের তুলনায় তাহাদিগকে প্রায় নিশ্চলই দেখায়। তাহাদের দূরত্ব নিরূপণও দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। কোন্ তারকাটা কোথায়, কোন্ বেগে চলিতেছে বা না চলিতেছে, তাহাদের বেগের হ্রাসবৃদ্ধি আছে কি না আছে, তাহা এখনো নিরূপণ হয় নাই। কাজেই দুই একটা স্থল ব্যতীত অধিকাংশ স্থলেই তারকাগুলির জড়ত্ব নিরূপণের কোনও উপায় পাওয়া যায় নাই। উহাদের গতিবিধিও গণনার বহির্ভূত রহিয়াছে। সম্প্রতি গণিতে পারি আর না-পারি, বৈজ্ঞানিকেরা ধরিয়া রাখিয়াছেন যে, এই গণনার problem fully determinate। গণনার জন্য যে data-র আবশ্যক, সেগুলি যখন পাইব, তখন আর আটকাইবে না। ইহাই হইল mechanical science-এর determinism; data যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে problem-টার solution মিলিবেই। অবশ্য যদি গণিত-বিদ্যার সামর্থ্যে কুলায়। একটার বেশি দুইটা solution হইবে না। এক রকমের বেশি দুই রকমের উত্তর হইবে না। একটা ছোট formula-র ভিতরে যাবতীয় দ্রব্যের গতিবিধি বাঁধিয়া ফেলিতে পারিব। সমস্ত জড় জগৎটা, উহার প্রত্যেক অংশ এই formula-র বা নিয়মের শিকলে বাঁধা পড়িয়া যাইবে; সেই শিকল লোহার শিকল অপেক্ষাও কঠিন। উহা ভাঙিবার বা মোচড়াইবার উপায় থাকিবে না। একবারে যাহাকে এই শিকলে বাঁধিয়া ফেলিব, কস্মিন কালেও তাহার আর নিস্তার থাকিবে না।

বৈজ্ঞানিকের জড় জগৎ কেমন, তাহার কতকটা পরিচয় পাইলেন। জড় জগতের পরিচয় দিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা রূপ-রস-গন্ধাদি sensation-এর কোনও কথাই তোলেন না। রূপ-রস-গন্ধাদি আমার পক্ষে একরকম, আপনার পক্ষে অন্যরকম; পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গের পক্ষে যে কীরূপ, তাহা বলিবার কোনও উপায় নাই। মানুষের পক্ষে রূপ-রসাদি

যেরূপ, মাছির কিংবা পিঁপড়ার পক্ষে রস-রসাদি তুল্যরূপ, একথা মনে আনিতেও কেহ সাহস করিবেন না। মানুষ হইতে মাছি পর্যন্ত প্রাণী অবর্তমান থাকিলে বাহ্য জগতের রূপ রস গন্ধ অনুভব করিবার জন্য কেহই কোথাও থাকে না। অথচ বৈজ্ঞানিককে মানিয়া লইতে হয় যে, বাহ্য জগৎ কোনও জীবের অপেক্ষা করে না; কোন প্রাণী বর্তমান না থাকিলেও বাহ্য জগৎ রহিয়াছে; উহা চেতন জীবের নিরপক্ষে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্র বলিয়াই সকলের বাহ্য। কাজেই রূপ-রসাদিকে একেবারে সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া সেই বাহ্য জগতে পরিচয় দিতে হয়। বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন, স্পর্শহীন জগৎ; উহা সীমাহীন আকাশ জুড়িয়া রহিয়াছে। সেই আকাশ বাহ্যতার প্রতিমূর্তি। সেই আকাশ সর্বত্র একাকার। উহার কোথাও কোনও অবয়ব নাই, দাগ নাই, চিহ্ন নাই। উহাকে চিহ্নিত করিবার জন্যই এক-একটা জড় দ্রব্য আকাশের এক-এক টুকরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে;—বসিয়া আছে বলিলেও কোনও লাভ নাই উহারা ইতস্তত ছুটিয়া বেড়াইতেছে বলাই দরকার হইবে। ছুটিয়া বেড়াইতেছে অর্থাৎ উহাদের পরস্পর মধ্যগত ব্যবধান বা অবকাশ বা দূরত্ব কখনও অল্প, কখনও অধিক হইতেছে। এই যে দূরত্ব বা ব্যবধান, ইহা মাপিতে পারা যায়—ইহা পরিমাণযোগ্য; কেন না, আকাশই এক মাত্র পদার্থ, যাহা পরিমাণ করিতে পারা যায়, যাহার প্রতি ছোট আর বড় এইরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আকাশ ছাড়া এমন কোনও সামগ্রী নাই, যাহা মাপিতে পারা যায়। অন্য কোনও সামগ্রীকে যদি নিতান্তই মাপিতে হয়, তাহাকে in terms of a length মাপিতে হয়। জড় দ্রব্যের পরস্পর ব্যবধান মাপিয়া এই ক্ষণে ব্যবধান কত এবং পর ক্ষণে ব্যবধান কত, তাহা স্থির করিয়া তাহাদের গতিবিধির নিরূপণ হয়; দেখা যায়, পরস্পরের তুলনায় কেহ দ্রুত চলে, কেহ ধীরে চলে। এই ধীরে চলিবার প্রবৃত্তি আর দ্রুত চলিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া প্রত্যেক জড় দ্রব্যের, প্রত্যেক material body-র জড়ত্ব বা inertia নিরূপিত হয়। দ্রুত চলিবার যার প্রবৃত্তি, তার জড়ত্ব অল্প, ধীরে চলিবার যার প্রবৃত্তি, তার জড়ত্ব অধিক। এইরূপে প্রত্যেক দ্রব্যের জড়ত্বের মাত্রা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। একবার যে দ্রব্যে যতটুকু জড়ত্ব assign করা যায় বা আরোপ করা যায়—সেইটুকু চিরকাল তাহার পক্ষে বজায় থাকে; তাহার ইতরবিশেষ বা তারতম্য করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। তারতম্য করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়াই বলা হয়—জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণই inertia; উহাই জড় দ্রব্যের জড়ত্ব। রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ অনুভূতিগুলি যেন নিতান্তই accidents মাত্র, আগন্তুক ধর্ম মাত্র; জড় পদার্থের সহিত ওই সকল অনুভূতির যেন মজ্জাগত ধাতুগত কোনও সম্পর্কই নাই; উহাদের সম্পর্ক চেতন জীবের সহিত। চেতন জীব যেখানে আছে, সেখানে সেই চেতন জীবের উপযোগী রূপ-রস-গন্ধাদি থাকে; কিন্তু চেতন জীব যেখানে নাই, সেখানে রূপ-রসাদি থাকে না; থাকে কিন্তু জড় দ্রব্য, আর থাকে তাহার জড়ত্ব। Psychology বা মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের যে-কোনও প্রচলিত বহি খুলিলেই দেখিতে পাইবেন যে, বলা হইতেছে—রূপ-রস-গন্ধাদি জড় দ্রব্যের secondary properties; উহারা মুখ্য ধর্ম নহে, উহারা গৌণ ধর্ম। এ বড় আশ্চর্য কথা। যাহা প্রত্যক্ষ, যাহার সত্যতার সম্বন্ধে সংশয় করিবার অধিকার প্রত্যক্ষবাদীর পক্ষে একেবারে নাই, তাহাই হইল এই সকল পণ্ডিতদের মতে জড় দ্রব্যের গৌণ ধর্ম; মুখ্য ধর্মের জন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষে বর্জন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া বেড়াইতে থাকেন। এটা বস্তুতই একটা হেঁয়ালি; কিন্তু

এই হেঁয়ালির তাৎপর্য এত ক্ষণে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। যখনই প্রত্যক্ষদৃষ্ট রূপরসাদিময় ব্যবহারিক জগৎকে সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ স্বতন্ত্র অর্থাৎ চেতন জীবের নিরপেক্ষ জগৎ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তখনই সেই ব্যবহারিক জগৎ বাহ্য জগতে পরিণত হয় এবং সেই বাহ্য জগৎ রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন একটা কিম্ভূতকিমাকার কাল্পনিক জগতে পরিণত হয়। রূপ-রস-গন্ধাদি প্রত্যক্ষ পদার্থ তখন তাহার গৌণ লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই কিম্ভূতকিমাকারতাই তাহার মুখ্য লক্ষণ হইয়া পড়ে। জড় পদার্থের primary properties বা মুখ্য লক্ষণ কী, তাহার অন্বেষণ করিতে গিয়া ওই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, জড় পদার্থের মুখ্য লক্ষণ extension এবং inertia—দেশব্যাপ্তি এবং জড়ত্ব। আকাশের এক-এক অংশ অধিকার করিয়া থাকাই জড় দ্রব্যের extension; ঘুরাইয়া বলিলে উহাই impentrability। আকাশমধ্যে জড় দ্রব্যগুলো ছুটাছুটি করিতেছে; বেগে ছুটিবার প্রবৃত্তি অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্যের inertia বা জড়ত্ব নির্ধ্বারিত হয়। বাহ্য জগতে থাকে কেবল Matter ও তাহার Motion। Mechanical Science-এর কাজ হইল description of the motion। অতএব বৈজ্ঞানিকের যে জড় পদার্থ, তাহার মুখ্য লক্ষণ extension এবং inertia। Mechanical Science এই extension এবং intertia মাত্র অবলম্বন করিয়া জড় জগতের গতিবিধির পরিচয় দেন, সেই গতিবিধিকে formula-বদ্ধ, সূত্রবদ্ধ, নিয়মবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। নিয়মে একবার বাঁধিয়া ফেলিলে কর্তব্য প্রায় শেষ হয়; তখন সমস্ত জড় জগৎটাই বৈজ্ঞানিকের করতলগত আমলকী-ফলবৎ আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত জড় জগৎটাকে এখনও সেরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় আছেন এবং ক্রমশ কৃতকার্য্য হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, problem-টা fully determinate। কোন দ্রব্য এখন কোথায় আছে জানিতে পারিলে, কালই হউক বা শতবর্ষান্তেই হউক, কোন দ্রব্য কোথায় থাকিবে, তাহা গণিয়া বলিতে পারিব এবং এখন কোথায় আছে জানিলে শত বর্ষ পূর্বে কখন কোথায় ছিল, তাহা গণিয়া বলিতে পারিব।

Newton যে mechanical science-এর ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আদর্শ যথাসম্ভব উপস্থিত করিলাম। জড় দ্রব্য-ঘটিত ব্যাপারটা কতকটা টানাটানি-ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার। আমরা ধাক্কা দিয়া, টান দিয়া, ঠেলা দিয়া জড় দ্রব্যের গতি উৎপাদন করিতে পারি। ধাক্কা দেওয়ার ও ধাক্কা লইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব বা inertia। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী যেন পরস্পর দূরে থাকিয়াও, পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়াও এইরূপ ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। আপনি দূরে বসিয়া আছেন, আমার ইচ্ছা—ধাক্কা দিয়া আপনাকে উত্তেজিত করি। আমার তিন উপায় আছে; এই কেতাবখানা ছুঁড়িয়া আপনাকে মারিতে পারি,—এই একটা উপায়; লম্বা লাঠিগাছটা লইয়া তাহার গুঁতা দিতে পারি,—এই দ্বিতীয় উপায়; আপনার গলায় দড়ি বাঁধিয়া হেঁচকা টান দিতে পারি,—এই তৃতীয় উপায়। তিন উপায়েই আমার দেহের সহিত আপনার দেহের কোনওরূপ immediate স্পর্শ বা সংযোগ থাকিল না। মধ্যস্থ বা ব্যবহিত যন্ত্র দ্বারা সংস্পর্শ ঘটিল। ওই কেতাবখানা, লাঠিটা, চাদরখানা সেই মধ্যস্থ যন্ত্র। যন্ত্র দ্বারা এক দ্রব্যের ধাক্কা ঠেলা বা টান অন্য দ্রব্যে সঞ্চালিত হয়। ইহা বুঝিতে মোটা বুদ্ধির দরকার। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, ইহাদের পরস্পরের মাঝে শূন্য দেশ বা ফাঁকা আকাশ বর্তমান। সেই ফাঁকা আকাশমধ্যেই তো তাঁহারা বিচরণ করিতেছে; পরস্পরকে স্পর্শ করে না, অথচ দূরে

থাকিয়াও পরস্পরকে ধাক্কা বা টান দিতেছে; মধ্যস্থ কোন দ্রব্যের বা যন্ত্রের ব্যবধান দেখি না। কাজেই মোটা বুদ্ধিতে ইহা কেমন-কেমন ঠেকে। এক শ্রেণির লোক আছেন, তাঁহাদের এইরূপ মোটা বুদ্ধি। তাঁহারা এই বিনা যন্ত্রে ধাক্কা সঞ্চালন ব্যাপারটা বুঝিতে পারেন না। স্পর্শ বা সংযোগ ব্যতীত অথবা কোনও মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কীরূপে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি চলিতে পারে, তাহা তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। জড় দ্রব্যের গতিবিধিকে নিয়মবদ্ধ, formula-বদ্ধ করিয়া তাঁহারা তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। বিনা সংযোগে, বিনা স্পর্শে এই যে ধাক্কাধাক্কি, ইহাকে action at a distance বলা হয়। এই action at a distance তাঁহাদের পক্ষে দুরবগাহ তত্ত্ব। তাঁহারা formula-য় সন্তুষ্ট থাকেন না। তাঁহারা প্রত্যেক action-এর সঞ্চালন জন্য একটা যন্ত্র বা visual model তৈয়ার করিতে চান। Mechanics-এ তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা চাহেন mechanism। কোনওরূপ মধ্যস্থ যন্ত্র তাঁহারা দেখিতে পান না, অগত্যা তাঁহারা মধ্যস্থ যন্ত্রের কল্পনা করেন। এই কল্পনার শাস্ত্রসঙ্গত নাম hypothesis। তাঁহারা দেখেন, কোনও মধ্যস্থ বা Medium নাই। তাঁহারা বলেন, একটা মধ্যস্থ বা medium আবশ্যক। এই medium তাঁহারা সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের যাঁহারা বড় বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাদের পরাক্রমের অন্ত নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করেন, কামনা করেন, একটা medium হউক। যেমনটুকু medium দরকার, তেমনই medium হউক। তাঁহারা বলেন, medium হউক,—অমনই একটা medium হয়। তাঁহারা দেখিতে পান, তাঁহাদের দরকার-মতো medium হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, ইহা অতি "উত্তম" medium। আমি এখানে বসিয়া শব্দ করিলাম, আপনি দূরে থাকিয়া চমকিয়া উঠিলেন; অর্থাৎ আমি দূরে থাকিয়াও আপনাকে ধাক্কা দিলাম। একটা medium আবশ্যক। মাঝে হাওয়া আছে, উহাই সেই medium। ওই যে শব্দটা আপনি শুনিলেন, উহা আপনার প্রত্যক্ষ হইল বটে, আপনি মনে করিতেছেন যে, উহাই আপনাকে উত্তেজিত করিয়াছে। ইহা আপনার ভুল। ওই শব্দ অনুভূতি মাত্র; বৈজ্ঞানিক উহার ধার ধারেন না। বৈজ্ঞানিক জানেন কেবল জড় দ্রব্য; যাহা আকাশ জুড়িয়া আছে, যাহার inertia আছে, যাহা ধাক্কা লইতে পারে ও ধাক্কা দিতে পারে। আমার কণ্ঠনালিতে আছে দুইগাছা তার, পেশিনির্মিত তার; উহা জড় দ্রব্য। আপনার কানের ভিতরে আছে পরদা এবং তৎসংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রী; উহাও জড় দ্রব্য। উভয়ের মাঝে আছে খানিকটা হাওয়া: উহাও জড় দ্রব্য। উহারও কিঞ্চিৎ inertia আছে। উহা ধাক্কা লইতে পারে এবং ধাক্কা দিতে পারে। প্রবল ঝড়ে বড়-বড় মহীরুহ উৎপাটিত হয়, তাহাই প্রমাণ। কণ্ঠনালির তার দুইগাছা হওয়াতে পুনঃপুন ধাক্কা দেয়। হাওয়া medium বা মধ্যস্থ যন্ত্র, সেই ধাক্কা সঞ্চালিত করিয়া আপনার কানের পরদায় ও স্নায়ুতন্ত্রীতে ধাক্কার-পর-ধাক্কা দেয়। এইরূপে আমি দূরে থাকিয়াও আপনাকে উত্তেজিত করিলাম; তাহার mechanism বুঝা গেল। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসে। আলো চোখে লাগিলে আমরা উত্তেজিত হই। সূর্য নয় কোটি মাইল দূরে আছে; মাঝে তো কেবল ফাঁকা শূন্য। এখানে medium কই? এখানে medium কল্পনা করিতে হইবে। এখানে hypothesis দরকার। Newton কল্পনা করিলেন, সূর্য হইতে ছোট-ছোট কণিকা ছুটিয়া আসিতেছে। সেই কণিকাগুলি ছুটিয়া আসিয়া চোখের পরদায় ধাক্কা দিতেছে। এই কণিকাগুলি medium। ব্যাপারটা সেই কেতাব ছোঁড়ার মতো। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; নয় কোটি মাইল

অতিক্রম করিতে ৮ মিনিট মাত্র সময় লাগে। কী ভীষণ বেগ! সেকেন্ডে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার মাইল। Newton-এর কল্পিত কণিকাগুলি এই ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; শূন্যপথে এই বেগে আসিতেছে। জলপথে চলিতে Newton-এর মতে আরও অধিক বেগে চলা উচিত। জলপথে আলো চালাইয়া দেখা গেল, শূন্যপথের চেয়ে বেগ বেশি হয় না, বরং কমই হয়। Newton-এর কল্পিত medium দরকারমতো হইল না। অন্যরূপ medium আবশ্যক হইল। Young এবং Fresnel বলিলেন, অন্যরূপ medium হউক। অমনই অন্যরূপ medium হইল। সূর্যের তপ্ত কণিকাগুলি সেই medium-এ পুনঃপুন সেকেন্ডে কোটি-কোটি বার ধাক্কা দেয়; সেই ধাক্কা medium দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে আসিয়া আমাদের চোখে ধাক্কা দিয়া আমাদিগকে উত্তেজিত করে। তাঁহারা সেই medium-এর নাম দিলেন ether। ব্যাপারটা কেতাব ছোঁড়ার মতো নহে; লাঠির গুঁতার মতো। তাঁহারা দেখিলেন, এই ether অতি 'উত্তম' হইয়াছে, Newton-এর কল্পিত কণিকাগুলি 'উত্তম' হয় নাই।

এই যে ether, ইহা দরকার মতো হওয়া চাই; সূর্য হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত ফাঁকা জায়গায় বর্তমান থাকা চাই। ইহার ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হইবে; অতএব ইহা জড় দ্রব্য; ইহার inertia থাকা চাই। জলবায়ুর মতো তরল জড় দ্রব্য ঠেলিয়া দেওয়া চলে, মোচড়ানো চলে না। ইস্পাতের মতো কঠিন জড় দ্রব্যে ঠেলাও চলে, মোচড়ও চলে। আলোর সঙ্গে যে ধাক্কা আসে, উহা মোচড়ানোর মতো; অতএব ওই যে ether, উহা জলের মতো বা বায়ুর মতো তরল হইলে চলিবে না। কতকটা ইস্পাতের মতো হওয়া চাই। অতএব এই যে ether কল্পিত হইল, উহা ইস্পাতের মতো কঠিন; উহা সমস্ত আকাশ জুড়িয়া আছে; কেন-না, যেমন সূর্য হইতে আলো আসে, তেমনই অতিদূরের তারাগুলি হইতেও আলো আসে। যে আকাশকে একেবারে ফাঁকা মনে করা যাইতেছিল, উহা আদৌ ফাঁকা নহে; এই ইস্পাতজাতীয় কঠিন ether-এ পরিপূর্ণ। উহা সমস্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে; অণু পরমাণুর মধ্যেও যে ফাঁকা আকাশ বা অবকাশ, তাহাও পরিপূর্ণ করিয়া আছে; অথচ এই ইস্পাতের ভিতর দিয়া গ্রহ উপগ্রহ হইতে অণু পরমাণু পর্যন্ত অক্লেশে বিচরণ করে, আপনারাও সেইরূপ ইস্পাতের সমুদ্রমধ্যে অক্লেশে বিচরণ করিতেছে। মাছ যেমন জলের মধ্যে অক্লেশে বিচরণ করিতেছেন; প্রভেদ এই যে, জল মাছের শরীরের ভিতর ঢুকে না; কিন্তু এই ইস্পাত আপনাদের দেহের প্রত্যক্ষ রক্তকণিকার ভিতর পর্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। এ কীরকমের ইস্পাত? ইহা কি সম্ভব? Fresnel এবং তাঁহার অনুবর্তীরা বলিলেন, ওই ইস্পাতের মতো কঠিন ether বড়ই দরকার, অতএব উহা আমরা সৃষ্টি করিলাম। Lord Kelvin গলা ছাড়িয়া বলিলেন, বাজারের ইস্পাতের অস্তিত্বে আমি বরং বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী ইস্পাতে আমার সংশয় মাত্র নাই।

ভালো কথা। আপনারা তড়িতের এবং চুম্বকের কথা শুনিয়াছেন। একটা electrified body-র সহিত আর একটা electrified body-র টানাটানি ঠেলাঠেলি হয়। একখানা চুম্বকের সহিত আর একখানা চুম্বকের টানাটানি ঠেলাঠেলি হয়; পরস্পর দূরে থাকিলেও হয়। Newton গ্রহ উপগ্রহের টানাটানিকে যে formula-য় ফেলিয়াছিলেন সে Formula-য় electrified body এবং magnet-এর গতিবিধি বাঁধা চলে না; ভিন্ন formula আবশ্যক হয়। Coulomb

সেই ভিন্ন formula বাহির করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারও action at a distance। তাড়িত যখন স্থির না থাকিয়া স্রোতে প্রবাহিত হয়, তখন ওই স্রোত দূরস্থিত চুম্বককে ঠেলা দেয়। উহাও action at a distance। Ampere ইহার formula বাঁধিয়াছিলেন। ওই action at a distance যাঁহাদের মনঃপূত হয় না, তাঁহারা medium খুঁজিতে লাগিলেন। Coulomb এবং Ampere খাঁটি ফরাসি; formula বাঁধিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত ছিলেন। Faraday এবং Maxwell খাঁটি ইংরেজ; তাঁহারা formula-তে তৃপ্ত থাকিলেন না; যন্ত্র বা medium খুঁজিতে লাগিলেন। Faraday আসিয়া বলিলেন, medium দরকার। এ আবার কোন medium? Maxwell আসিয়া বলিলেন, নূতন medium আবশ্যক নয়; আলোর ধাক্কা বহিবার জন্য যে medium-এর সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেই medium-য়েই কাজ চলিতে পারে; সেই medium দিয়েই electro-magnetic ধাক্কা সঞ্চালিত হইতে পারে। Hertz আসিয়া সেইরূপ ধাক্কা চালাইতে লাগিলেন। তদবধি wireless-telegraphy-র ধাক্কা বিনা তারে আকাশপথে চালানো হইতেছে। আলো ধাক্কা second-এ এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে চলে। এই electro-magnetic ধাক্কা সেই ether দিয়াই সেই এক লাখ নব্বই হাজার মাইল বেগে চলে। আলোর ধাক্কা ছোট-ছোট, এই ধাক্কাগুলি মোটা-মোটা, বড়-বড়। আমাদের চোখের পরদা ছোট-ছোট ধাক্কায় কাঁপিয়া ওঠে, বড়-বড় ধাক্কাগুলি ধরিতেই পারে না। সাব্যস্ত হইল, আলোর ধাক্কায় আর electro-magnetic ধাক্কায় জাতিগত কোনও পার্থক্য নাই।

যে ether-এর মাঝ দিয়া এই electro-magnetic ধাক্কা সঞ্চালিত হয়, তাহার inertia আছে, ধরা হইয়াছে। inertia আছে বলিয়াই উহা ধাক্কা লইতে এবং ধাক্কা দিতে পারে এবং ধাক্কা সঞ্চালন করিতে পারে। এইজন্যই উহা জড় দ্রব্য। কিন্তু এই যে electricity এবং magnetism, এই দুইটা পদার্থ কী? Coulomb-এর সময় হইতে এই দুই জিনিস লইয়া নাড়াচাড়া হইতেছিল; কিন্তু উহার inertia-র কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। Faraday আসিয়া দেখাইলেন—তড়িতের, electricity-র কোনও inertia নাই বটে, কিন্তু তড়িতের স্রোতের inertiaর মতো কিছু আছে। তড়িৎ-স্রোত যখন চলিতে থাকে, তখন হঠাৎ তাহাকে থামানো যায় না; যখন থামিয়া থাকে, তখন হঠাৎ তাহাকে চালানো যায় না। Faraday ইহা দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আপনারা ঘরে বসিয়া তড়িৎ-স্রোতের ধাক্কায় টানা-পাখার হাওয়া খাইতেছেন এবং রাজপথে ট্রামগাড়িতে চড়িয়া যাইতেছেন। যাহাকে আমরা জড় দ্রব্য বলি, তাহার inertia আছে। অণু-পরমাণুর মতো অতি ক্ষুদ্র জড় দ্রব্যেরও inertia আছে; inertia আছে বলিয়াই অণু-পরমাণুকে জড় দ্রব্য বলিতেছি। এই অণু-পরমাণু যখন electrified বা তড়িৎ-যুক্ত হয়, তখন সেই inertia-র কোনও ইতরবিশেষ হয় না; কিন্তু electrified হইয়া যদি অণু-পরমাণু ছুটিতে থাকে, তখন উহার inertia বৃদ্ধি পায়। Electrified অণু-পরমাণু ছুটিতে থাকিলেই তড়িৎ-স্রোত উৎপন্ন করে। তড়িতের inertia নাই; কিন্তু তড়িৎ-স্রোতের inertia আছে; যত বেগে ছুটে, inertia-ও তত বাড়িয়া যায়। এখন প্রশ্ন উঠিল যে, এই যে তড়িৎ, যাহা স্থির থাকিলে inertia-হীন থাকে, যাহা বেগে ছুটিলে inertia যুক্ত হয়, উহাকে জড় দ্রব্য বলিব কি না? এ পর্যন্ত যাহাকে জড় দ্রব্য বলিয়া আসিতেছি, তাহা সকল অবস্থাতেই inertia যুক্ত; স্থির থাকিলেও inertia যুক্ত, বেগে ছুটিলেও inertia যুক্ত। বেগের ইতরবিশেষে তাহার inertia-র ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু

এই যে তাড়িত, স্থির থাকিলে যাহার inertia থাকে না, ছুটিলেই যাহাতে inertia আসে, যত বেগে ছুটে, inertia তাহার তত বাড়ে, ইহাকে জড় দ্রব্য বলিব কি না? এই তড়িতের যদি জড়ত্ব থাকে, সে কীরূপ জড়ত্ব?

Mechanics-শাস্ত্র এতদিন গ্রহ-উপগ্রহ হইতে অণু-পরমাণু পর্যন্ত বড়-ছোট জড় দ্রব্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল; প্রত্যেকে দ্রব্যে খানিকটা inertia আরোপ করিয়া সন্তুষ্ট ছিল; কিন্তু এই এক নূতন উৎপাত আসিয়া জুটিল। Hydrogen-এর পরমাণুর চেয়ে ছোট জড় কণা ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। হঠাৎ একদিন বাহির হইয়া পড়িল, তাহার চেয়েও ছোট কণা রহিয়াছে। ইহাদের নাম দেওয়া হইল electron বা তড়িৎ-কণা। তড়িতের যাবতীয় ধর্ম এই কণিকায় বিদ্যমান আছে। অতএব ইহার নাম দেওয়া হইল--তড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রন। চলন্ত তাড়িতের inertia আছে; অতএব চলন্ত ইলেকট্রনের inertia আছে। হাজারখানিক তাড়িতকণার inertia hydrogen পরমাণুর inertiaর সমান। আবার একদিন বাহির হইল, Radium ধাতু। এই Radium ধাতু হইতে কেবলই Electron ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল Radium কেন, সকল দ্রব্য হইতেই অবস্থাভেদে ইলেকট্রন-কণিকা ছুটিয়া বাহির হয়। ছুটিবার বেগই বা কী ভীষণ! Radium হইতে যে electron বাহির হয়, তাহার বেগ second-এ লক্ষ মাইল। কোনও জড় দ্রব্যের এরূপ ভীষণ বেগ ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। ইলেকট্রন যখন বেগে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন তাহার inertia থাকে; যত বেগে বাহির হয়, inertia-ও তত অধিক হয়। জড় দ্রব্যের পরমাণু মাত্রেরই ভিতরে ইলেকট্রন রহিয়াছে। এক-একটা পরমাণুর ভিতরে হয়তো হাজার দরুনে ইলেকট্রন রহিয়াছে; কিন্তু তাহারা স্থির নাই; সেই পরমাণুটুকুর সীমানার ভিতরেই ভীষণ বেগে ছুটিতেছে, কাঁপিতেছে, ঘুরিতেছে। এই বেগের প্রাবল্যে দুই দশটা ইলেকট্রন মাঝে-মাঝে পরমাণু হইতে ছটকিয়া বাহিরে পড়ে। Radium-এর পরমাণু হইতে বহু ইলেকট্রন অনবরত ছটকিয়া বাহিরে আসিতেছে। জড় দ্রব্যের পরমাণুগুলি খুব সম্ভব এই ইলেকট্রনগুলিরই সমষ্টি মাত্র। জড় দ্রব্যের যে জড়ত্ব, তাহা হয়ত সেই ইলেকট্রনগুলিরই জড়ত্ব। ইলেকট্রনগুলি স্থির থাকিলে কোনও জড়ত্বই থাকিত না; ইলেকট্রনগুলি বেগে ছুটে বলিয়াই উহাদের জড়ত্ব থাকে। এই ইলেকট্রন তড়িতের কণিকা মাত্র; তড়িতের কোনও জড়ত্ব নাই; কিন্তু চলন্ত-তড়িতের জড়ত্ব আছে।

গ্যালিলিও এবং নিউটন যে Mechanics বিদ্যার ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন, সে ভিত্তি টলমল করিয়া উঠিল। এই mechanics-এর গোড়ার কথা, প্রত্যেক জড় দ্রব্যের একটা characteristic আছে; প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট inertia আছে; কোনওরূপ অবস্থাভেদে সেই inertia-র কোনওরূপ ইতরবিশেষ, কোনরূপ তারতম্য, কোনওরূপ মাত্রাভেদ ঘটে না। এইটুকু ধরিয়া লইয়া mechanics-বিদ্যার যাবতীয় formula বাঁধা হইয়াছে। সমস্ত Physical science এই কথাটা মানিয়া লইয়া জড় জগতের যাবতীয় ঘটনার mechanical explanation দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। সমস্ত electro-magnitic ঘটনা কোনও-না-কোনও দিন এইরূপ mechanical formula-র ভিতরে পড়িবে, এই ভরসায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ mechanical science-এর ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। এই যাহাকে electricity বলা যায়, যাহার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকাকে electron নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা এক হিসেবে জড় দ্রব্য হয়, অন্য হিসেবে হয় না। জড় দ্রব্যের inertia অবস্থানিরপেক্ষ; ইহা Mechanics-

র গোড়ার কথা। কিন্তু এই electricity-র inertia তাহার অবস্থাসাপেক্ষ; উহারা তাহার বেগের অপেক্ষা করে। Electricity যখন স্থির থাকে, যখন উহার বেগ থাকে না, তখন উহাতে inertia থাকে না; তখন জড়ত্ব থাকে না। তখন উহাকে জড় পদার্থ বলা চলে না। বেগে ছুটিলেই অমনি জড়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। বেগ যত বাড়ে, জড়ত্ব বা inertia-ও তত বাড়িয়া যায়। অবস্থাভেদে এই electricity-র জড়ত্ব থাকে বা থাকে না, জড়ত্ব অল্প বা অধিক হয়। এইরূপ যে পদার্থ, উহাকে জড় পদার্থ বলিব কি না? এত কাল জল-বায়ু, সোনা-রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে জড় দ্রব্য বলিতেছিলাম। ওই সকল দ্রব্যকে অণু এবং পরমাণু—molecule এবং atom-এর সমষ্টি বলিয়া জানিতাম; প্রত্যেক অণু এবং প্রত্যেক পরমাণু জড় দ্রব্য বলিয়াই গৃহীত হইতেছিল; প্রত্যেক অণুর, প্রত্যেক পরমাণুর inertia বা জড়ত্ব একেবারে নির্দিষ্ট ছিল। এখন দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক অণু এবং প্রত্যেক পরমাণু সহস্র বা সহস্রাধিক electron-এ নির্মিত; প্রত্যেক electron বেগে চলিতেছে বলিয়াই প্রত্যক electron-এর জড়ত্ব; যতটুকু বেগে চলে, তদনুসারে তাহার জড়ত্ব। অণু-পরমাণুর যে জড়ত্ব, তাহা সেই চলন্ত electron-এর জড়ত্বেরই সমষ্টিমাত্র। জড়ত্ব যদি বেগসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার পরিমাণের কোনও নির্দেশ থাকে না; বেগের তারতম্যে উহার জড়ত্বেরও তারতম্য হয়। Newtonian Mechanics-এর যাহা ভিত্তি, তাহা থাকে না। এখন নূতন করিয়া ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে। ভিত্তি পত্তন করিতেছেন Lorentz; সেই ভিত্তির উপর গাঁথিতেছেন তাঁহার সহবর্তী এবং অনুবর্তী পণ্ডিতগণ।

জড় জগৎকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকেরাই সৃষ্টিকর্তা। তাঁহারাই জড় জগতের একভাবে কাঠামো বাঁধিয়াছিলেন; যেমন দরকার হইয়াছিল, সেইরূপ বাঁধিয়াছিলেন; এখন অন্য ভাবে কাঠামো বাঁধিতে হইবে; এখনকার দরকারমতো বাঁধিতে হইবে। এত কাল স্থির ছিল—জড়ত্বের তারতম্য হয় না, জড় দ্রব্য অবিনাশী, অনশ্বর। এখন দেখা যাইতেছে, ওইরূপ জড় পদার্থে চলিবে না। জড়ত্বের তারতম্য কল্পনা করিতে হইবে; উহা বাড়িতেও পারে, কমিতেও পারে। জড়কে অবিনাশী বলা আর চলিবে না। যাহাকে এত ক্ষণ জড়ত্ব বলিতেছিলাম, যাহাকে জড়ের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছিলাম, সেই মুখ্য লক্ষণই যদি লোপ পায়, তাহা হইলে কোন লক্ষণে জড়কে জড় বলিব? জড়ের লক্ষণই বা কী হইবে?

লোষ্ট্রখণ্ড হইতে চন্দ্র, সূর্য, তারকা পর্যন্ত সকলকেই জড় দ্রব্য বলিতেছিলাম। এই সকল ছোট-বড় জড় দ্রবা ছোট-ছোট molecule বা অণুর সমষ্টি ছিল; molecule বা অণুগুলি atom বা পরমাণুর সমষ্টি ছিল। চন্দ্র-সূর্য হইতে অণু-পরমাণু পর্যন্ত সকলেরই জড়ত্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। পরমাণু হইল electron-এর সমষ্টি: ওই electron তড়িতের কণিকা মাত্র। ওই তড়িৎ-কণিকার জড়ত্ব থাকিতে পারে বা নাও পারে। বেগে ছুটিলে উহার জড়ত্ব জন্মে, বেগ বাড়িলে উহাব জড়ত্ব বাড়ে। লোষ্ট্রখণ্ড স্থির থাকিলে উহাতে আমরা যে জড়ত্ব আরোপ করি, উহা বস্তুত লোষ্ট্রখণ্ডের জড়ত্ব নহে; লোষ্ট্রখণ্ডের অভ্যন্তরে উহার প্রত্যেক পবমাণুর ভিতরে যে হাজার-হাজার তড়িৎ-কণা আছে. লোষ্ট্রখণ্ডের জড়ত্ব সেই সকল তড়িৎ-কণারই জড়ত্ব। তড়িৎ-কণাগুলি স্থির নাই; উহারা চঞ্চল, ভীমবেগে চঞ্চল, সেই জন্যই উহাদের জড়ত্ব। অতএব লোষ্ট্রখণ্ড তাহার জড়ত্ব হারাইল। চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী বড়-বড় লোষ্ট্রখণ্ড মাত্র;

তাহারাও তাহাদের নির্দিষ্ট জড়ত্ব হারাইল। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতে এখন থাকিল কি?

এখনও আছে আকাশব্যাপী ether। এই ether-এ জড়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। Ether-এর ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হয়। এই দেখিয়া ether-এ জড়ত্ব কল্পিত হইয়াছে। যে দ্রব্যের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হয়, যাহা ধাক্কা লইতে পারে ও ধাক্কা দিতে পারে, তাহাকেই জড় দ্রব্য বলা গিয়াছে। ধাক্কা দিবার এবং ধাক্কা লইবার ক্ষমতা জড়ত্ব। আমি লাঠিগাছটাব গুঁতায় আপনাকে ঠেলিতে পারি; সেই ঠেলার ধাক্কা লাঠি দিয়া সঞ্চালিত হয়। অতএব লাঠি জড় দ্রব্য। আপনার গলায় চাদর জড়াইয়া টানিতে পারি; চাদর দিয়াই এই টানের ধাক্কা সঞ্চালিত হয়। অতএব চাদর জড় দ্রব্য। জলের ধাক্কায় বাঁধ ভাঙে; হাওয়ার ধাক্কায় গাছ উপড়ায়। অতএব জল, হাওয়া জড় দ্রব্য। আলোর ধাক্কা চালাইবার জন্য ether নামক জড় দ্রব্যের কল্পনা হইয়াছিল। জড় দ্রব্য তাহার জড়ত্ব হারাইয়াছে; লাঠি, চাদর হইতে জল হাওয়া সকলেই তাহাদের জড়ত্ব হারাইয়াছে। আলোর মোচড় সহিবার জন্য ether-কে ইস্পাতজাতীয় কঠিন দ্রব্য মনে করা গিয়াছিল; কিন্তু ইস্পাতও তাহার জড়ত্ব হারাইয়াছে। তাহা হইলে ether-এ জড়ত্ব থাকে কোথায়? চলন্ত electron-এর জড়ত্ব আছে বটে; কিন্তু এই ether তো কোনরূপ electron-এ নির্মিত নহে। Ether সমুদ্রের মধ্যে অণু-পরমাণু ভাসিয়া বেড়ায়। অণু-পরমাণুর মাঝে-মাঝে যে ফাঁক, তাহা ether-এ পরিপূর্ণ। Ether-এর কোথাও কোনও ফাঁক নাই। Ether একেবারে নিরেট জিনিস। উহার কোথাও কোনও ছিদ্র, কোথাও কোনও ফাঁক, কোথাও কোনও অবকাশ নাই। উহা একেবারে Plenum। Ether-এর কাজই হইতেছে ধাক্কা সঞ্চালন করা। Ether-এর কোথাও কোনও ফাঁক থাকিলে, সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চালিত হইবে কীরূপ? তাহা হইলে action at a distance সম্ভব হইয়া পড়ে। Action at a distance সম্ভব হইলে ether-এর কল্পনা আবশ্যক হইত না। কাজেই ether নিজে একাকার জিনিস। উহার ভিতরে কোনোরূপ জড় দ্রব্যের অণু-পরমাণুগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পরমাণুগুলি যদি electron-এর সমষ্টি হয়, তাহা হইলে ether-এর মধ্যে electron-গুলি চলিয়া বেড়াইতেছে। চলন্ত electron-ই এক মাত্র জড় পদার্থ। Ether-সমুদ্র স্থির, অচঞ্চল। উহার জড়ত্ব থাকিবে কীরূপে? উহাকে জড় বলিতে পারা যায় না। জড়ত্ব বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহা ether-এ থাকিতে পারে না; ether-এর inertia থাকিতে পারে না। Ether-এর মধ্য দিয়া যাহা সঞ্চালিত হয়, তাহাকে ধাক্কা বলা চলে না। উহা একটা change মাত্র, একটা বিকার মাত্র। উহার নাম দাও electro-magnetic oscillation। এই electro-magnetic oscillation ব্যাপার কী, তাহা visualise করিবার চেষ্টা করিও না। ওই নামেই সন্তুষ্ট থাকো। নামই যথেষ্ট; তাহাতেই কাজ চলিবে; রূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা formula-য়, নামে তৃপ্ত হন না, তাঁহারা maechanical model অন্বেষণ করিতে গিয়া ether-এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ether তাহার রূপ হারাইল; থাকিল formula আর নাম।

Mechanics -শাস্ত্র নূতন করিয়া গড়িতে হইতেছে। Inertia শব্দটি বজায় আছে। এক কালে inertia বলিতে আমরা যাহা বুঝিতাম, এখন আর তাহা বুঝি না। কি বুঝি, তাহা বলাও দুষ্কর। উহা একটা symbol মাত্র, একটা concept মাত্র, একটা সংজ্ঞা মাত্র, একটা ralation-এর নাম মাত্র; এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন Mechanics-এর এই নূতন

inertia হইতে পৃথক করিবার জন্য নূতন Mechanics-এর এই নূতন inertia-কে electro-magnetic inertia নাম দেওয়া হয়; এবং বলা হয়, এই electro-magnetic inertia ব্যতীত আর কোনও inertia নাই; এবং যে-কোনও জড় দ্রব্যের interia তাহা এই electro-magnetic inertia। ইহা কোনও স্থায়ী ধর্ম নহে; উহা ইচ্ছামতো বাড়াইতে কমাইতে পারা যায়; উহা জড় দ্রব্যের বেগের সাপেক্ষ; বেগ বাড়িলে উহা বাড়ে, বেগ কমিলে উহা কমে; বেগ না থাকিলে হয়তো উহা একেবারে লুপ্ত হয়।

এইখানে আর একটা নূতন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। কোনও জড় দ্রব্যের বেগ আছে কি না এবং থাকিলেও উহার পরিমাণ কত, তাহা জানিব কীরূপে? বেগের তারতম্য যদি inertia-র তারতম্য হয়, তাহা হইলে বেগের পরিমাণ নির্দেশ না করিলে inertia-রও মাত্রা নির্দেশ হইবে না। কিন্তু বেগের পরিমাণ কীরূপে স্থির করিব? আপনারা জানেন, আকাশের কোথাও কোনও চিহ্ন নাই। উহার কোন স্থানে কোন দ্রব্য আছে, তাহা বুঝিবার কোনও উপায় নাই। বাহ্য জগতে যদি একটি মাত্র জড় দ্রব্য থাকিত, তাহা আকাশে ছুটিয়া বেড়াইলেও তাহা জানিবার কোনও উপায় থাকিত না। একাধিক জড় দ্রব্য আছে বলিয়াই আমরা তাহার মধ্যে একটিকে স্থির ধরি এবং অন্যগুলি তাহা হইতে কখন কত দূরে রহিয়াছে দেখিয়া তাহাদের বেগের পরিমাণ করিয়া থাকি। এই যে বেগ, ইহা নিতান্ত আপেক্ষিক জিনিস; ইহার absolute measure জানিবার কোনও উপায় নাই। আপনি যখন গাড়ির ভিতরে সুখাসীন হইয়া চলিতে থাকেন, তখন আপনার কোনও অঙ্গ-সঞ্চালন হয় না, কোনও প্রয়াস হয় না; গাড়ির তুলনায় আপনি তখন স্থির, নিশ্চল, নির্বেগ; কিন্তু পথপার্শ্বে যে সকল গাছপালা, ঘরবাড়ি আছে, তাহাদের তুলনায় আপনি বেগে গতিশীল ওই গাড়ি যদি রেলগাড়ি হয়, তাহা হইলে আপনি হয়তো ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে গতিশীল। আবার এই ভূমণ্ডলটা একটা প্রকাণ্ডতর গাড়ি। ওই গাড়িতে আজন্ম আপনি চাপিয়া আছেন এবং প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল পাক খাইতেছেন এবং প্রতি বৎসরে সাতান্ন কোটি মাইল পথ ঘুরিয়া সূর্য পবিভ্রমণ করিতেছেন। অগত্যা আপনি সূর্যকে আকাশ-মধ্যে স্থির ধরিয়া লইয়াছেন; কিন্তু ওই সূর্যও পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর সহিত আপনাকেও কোনদিকে কত বেগে টানিয়া চলিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আপনি যে সুখাসীন হইযা বিশ্রাম করিতেছেন, আপনার বেগ কত, তাহা কীরূপে বলিব? কত কোটি মাইল বা কত কোটি-কোটি মাইল, তাহা কীরূপে জানিব? এবং inertia যদি বেগসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে আপনার জড় দেহের inertia-ই বা কত, তাহা কীরূপে বলিব? Newton-যে Mechanics-এর পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ কোনও বালাই ছিল না; কেন না, inertia তখন বেগের কোনও অপেক্ষা করিত না। বেগ অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, inertia-র মাত্রার কোনও তারতম্য ঘটিত না। কিন্তু এখনকার inertia বেগসাপেক্ষ; বেগের মাত্রা না জানিলে inertiaর মাত্রা স্থির হইবে কীরূপে?

একটা উপায় আছে। এই যে ether আকাশ ব্যাপিয়া আছে, এই ehter-এর ভিতর দিয়া সে আলো আসে, সেই আলোর বেগকে আমরা এক হিসাবে absolute velocity-রূপে গ্রহণ করিতে পারি। উহার পরিমাণ সেকেন্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। চন্দ্র সূর্য তারকাদি যে সকল চলন্ত দ্রব্য হইতে আলো আসে, তাহাদের বেগের সহিত উহার

কোনো সম্পর্ক নাই। যে দ্রব্য হইতে আলো আসে, তাহা যে বেগেই চলুক না, আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা, আলো পাইবার সময় উহার কোনও ইতরবিশেষ দেখিতে পাই না। আধুনিক Mechanics স্থির করিয়াছেন, কোনও দ্রব্যেরই বেগ, এমনকী electron এর বেগও এই আলোকের বেগকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। যাহাই হউক, এই আলোকের বেগকে আমরা নিরপেক্ষ বা absolute বেগরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাশালায় বসিয়া আমরা যদি প্রদীপের আলো জ্বালি, আলো ether দেয়া ঠিক সেই বেগে চলিয়া থাকে। Ether-কে আমরা স্থির-সমুদ্র ধরিয়া লই। উহা চঞ্চল নহে, উহাতে কোনওরূপ প্রবাহ বা স্রোত নাই। এই স্থির-সমুদ্রে পৃথিবী চলিতেছে; পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্য চলিতেছে; রিপন কলেজের বাড়িও চলিতেছে; তাহার পূর্বেস্থিত শিয়ালদহ স্টেশনের বাড়িও চলিতেছে। উভয় বাড়িই একমুখে, একই বেগে চলিতেছে। রিপন কলেজে প্রদীপ জ্বালিলে ওই আলো ether বাহিয়া পূর্বমুখে চলিবে; আলো চলিতে-চলিতে শিয়ালদহ স্টেশনও একটু না একটু পূর্বদিকে সরিয়া যাইবে; কলেজের আলো স্টেশনে পৌঁছিতে একটু সময় লাগিবে বেশি। আবার শিয়ালদহ স্টেশনে প্রদীপ জ্বালিলে তাহার আলো পশ্চিমমুখে আসিতে-আসিতে কলেজের বাড়িও একটু-না-একটু পূর্বমুখে অগ্রসর হইবে। কাজেই স্টেশন হইতে কলেজে আসিতে সময় লাগিবে একটু অল্প। কলেজ হইতে স্টেশনে আলো যাইবার সময় এবং স্টেশন হইতে কলেজে আলো আসিবার সময় ঠিক সমান হইবে না; উভয়ের মধ্যে একটু না একটু তারতম্য বা প্রভেদ ঘটিবেই। পৃথিবী যদি ether-এর মধ্যে স্থির থাকিত, অর্থাৎ কলেজের বাড়ি এবং স্টেশনের বাড়ি, উভয়েই যদি স্থির থাকিত, তাহা হইলে কোন তারতম্যই ঘটিত না। পৃথিবী ether বাহিয়া যত অধিক বেগে চলিবে, এই তারতম্য তত অধিকই হইবে। একালের সূক্ষ্ম-যন্ত্রে অতিসূক্ষ্ম তারতম্যও ধরা পড়ে। সম্প্রতি Michelson এবং Morley অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের দ্বারা এই তারতম্য ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ধরিতে পারেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছেন, আলো পূর্ব হইতে পশ্চিমে, কিংবা পশ্চিম হইতে পূর্বে আসিতেও যে সময় লাগে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, কিংবা দক্ষিণ হইতে উত্তরে আসিতেও ঠিক সেই সময় লাগে; কোনও দিকেই আলোর যাতায়াতে আলোর বেগের কোনও তারতম্যই ধরিতে পারা যায় নাই। Ether-এর স্থির সমুদ্র দিয়া পৃথিবী দ্রুত বেগে পূর্বমুখে চলিতেছে; অথচ কলেজ হইতে স্টেশন এবং স্টেশন হইতে কলেজে আলো আসিতে ঠিক এক সময়ই লাগিতেছে। যেন নদীর স্রোতে ভাটিয়া চলিতে যে সময়, উজানে চলিতেও সেই সময় লাগিতেছে। এ এক মহাসমস্যা। এ সমস্যার পূরণ হইবে কীরূপে? Fitz-Gerald উত্তর দিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, ether ভেদ করিয়া চলিবার সময়ে সকল দ্রব্যেরই আয়তনে একটু সংকোচ ঘটে। পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্য পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে বেগে চলিতেছে; অতএব পৃথিবীর এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় দ্রব্যের পূর্ব-পশ্চিমে একটু সংকোচ ঘটিয়াছে। সংকোচ ঘটিয়াছে বলিয়াই কলেজের বাড়ির এবং স্টেশনের বাড়ির মাঝের দূরত্বে বা ব্যবধানে একটুকু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ওই ব্যবধান আমরা যতটুকু মনে করি, ততটুকু নয়;—নয় বলিয়াই আলোর যাতায়াতের সময়ও আমরা যাহা মনে করি, তাহা নয়। উত্তর হইতে দক্ষিণে বা দক্ষিণ হইতে উত্তর সেরূপ কোনও সংকোচ ঘটে নাই। উত্তর দক্ষিণে যে ব্যবধান বা দূরত্ব, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

সমস্যা ক্রমেই গহন হইয়া আসিল। ওই লাঠিগাছটা টেবিলের উপর পূর্ব-পশ্চিমে

রাখো; আবার ঘুরাইয়া উত্তর-দক্ষিণে রাখো; ঘুরাইবা মাত্র উহার দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হইবে। পূর্ব-পশ্চিমে উহা একটুকু খর্ব হইবে, উত্তর-দক্ষিণে রাখিলে উহা তদনুপাতে দীর্ঘ হইবে। টেবিলটারও ওই দশা হইয়াছে। আপনারা মনে করিতেছেন যে, টেবিলটা square, পূর্ব-পশ্চিমে যত লম্বা, উত্তর-দক্ষিণেও তত লম্বা; সে টেবিল তাহা নহে, উহা একটুকু rectangular। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য, আর পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য সমান দেখাইলেও সমান নহে;—একটুকু প্রভেদ আছে। ওই প্রভেদ জানিবেন কীরূপে? গজকাঠি বা ফুটরুল দিয়া মাপিতে চান?—অসম্ভব। গজকাঠিটারও পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য আর উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ঠিব সমান নহে। গজকাঠিকে ঘুরাইবা মাত্র উহারও দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হইয়া যায়। অতএব পূর্ব-পশ্চিমে যাহা এক গজ, উত্তর-দক্ষিণে তাহা ঠিক এক গজ নহে। পূর্ব-পশ্চিমের মাইল, উত্তর-দক্ষিণের মাইলের সমান নহে। বাল্যাবধি আপনারা শুনিতেছেন—পৃথিবীব গোলাকার; কিন্তু ঠিক গোলাকার নহে; উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা; কতটুকু চাপা, তাহার হিসাবও একটা পাইয়াছেন। পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীর যে ব্যাস, উত্তর-দক্ষিণে ব্যাস তাহার চেয়ে প্রায় ২৫ মাইল ছোট। Geodesy নামক শাস্ত্র কত মেহনত করিয়া এই প্রভেদ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মতের যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহাদের মাপকাঠি উত্তর-দক্ষিণে রাখিলে যে মাপের থাকে, পূর্ব-পশ্চিমে রাখিলে সে মাপের থাকে না। পৃথিবীর যদি উত্তর-দক্ষিণে চাপা না হইয়া সম্পূর্ণ গোলাকারই হইত, তাহা হইলেই বা কী হইত? আমরা দেখিতাম, উহা সম্পূর্ণ গোলকার; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা হইত ডিম্বাকার। ডিম্বাকার হইলেও আমরা উহাকে গোলাকারই দেখিতাম; কোন সূক্ষ্ম মাপকাঠির দ্বারা উহার ডিম্বাকৃতি ধরিবার উপায় থাকিত না।

আপনারা শুনিয়া আসিতেছেন; Science is measurement, পরিমাণ-কর্মই বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রাণ। যেগুলি প্রত্যক্ষ বস্তু, যাহাকে sensation বলা যায়, যাহার অন্তরালে empirical philosophy-র মতে আর কিছু নাই, সেগুলি তো পরিমাণযোগ্যই নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা যাহার পরিমাণ করেন, তাহা কতকগুলি conceptual পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, মনগড়া পদার্থ। সেগুলির নাম দেন physical quantities। সেই conceptual পদার্থগুলিরও পরিমাণযোগ্যতা নাই। পরিমাণ নিরূপণের সময়ে আমরা in terms of space পরিমাণ করি। সকল পদার্থকেই একটা length-এ পরিণত কবিয়া সেই length-রূপে পরিমাণ করি। এই length-ই একমাত্র পরিমাণযোগ্য পদার্থ। এই পরিমাণের উপরেই বিশ্বাস করিয়া এত বড় বিজ্ঞান-বিদ্যা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কোন দ্রব্য কখন কত দূরে থাকিবে, গণনার দ্বারা তাহা বলিতে পারিলেই বিজ্ঞান-বিদ্যা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই যে দূরত্ব, তাহা পরিমাণের বিষয়; এই দূরত্ব গজকাঠি দিয়া মাপিতে হয়; কিন্তু দূরত্ব পরিমাণে এই গজকাঠির ক্ষমতার পরিচয় আপনারা পাইলেন। স্থানভেদে যদি গজকাঠির দৈর্ঘ্য ভিন্নরূপ হয়, তাহা হইলে সেই গজকাঠির সার্থকতা কতটুকু থাকিল। অবস্থাভেদে গজকাঠির দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হয়, তাহা আমরা জানি; উষ্ণতাভেদে দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়, তাহা আমরা জানি। সেটুকু আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু কেবল অবস্থানভেদে যদি দৈর্ঘ্যের ব্যতিক্রম হয় এবং কতটুকু ব্যতিক্রম হইল, তাহা ধরিবার কোনও উপায় না থাকে, তাহা হইলে দৈর্ঘ্য-পরিমাণের সার্থকতা কতটুকু থাকে! দৈর্ঘ্যের পরিমাপে এবং দূরত্বের পরিমাপে এরূপ গোড়ায় গলদ থাকিলে বিজ্ঞান-বিদ্যার যে সকল formula

এই সকল পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে সকল formula-রই বা সার্থকতা কীরূপ হয়?

আকাশব্যাপী ether-এর ভিতর দিয়া আলোর বেগ এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। এই বেগকে এক হিসাবে absolute velocity বলা যাইতে পারে। যে জড় দ্রব্য হইতে আলো আসিতেছে, তাহার বেগের সহিত আলোর এই বেগের কোনও সম্পর্ক নাই। Ether-কে স্থির, অচঞ্চল, stagnant ধরিয়া লইয়া আলোর এই বেগ নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এই যে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইলের কথা বলা যাইতেছে, এখানে এই মাইল শব্দের অর্থ কী? ১৭৬০ গজে মাইল, ইহা আমরা ধরিয়া লই বটে, কিন্তু ওই গজ কোন গজ? আপনারা হয়তো বলিবেন, উহা British standard গজ; কিন্তু British standard গজ নিতান্তই পার্থিব গজ। উহা চন্দ্রলোকে গেলে যদি একরূপ হয় এবং সূর্যলোকে গেলে অন্যরূপ হয়; পৃথিবীতে থাকিয়াও উত্তর মুখে থাকিতে যদি একরূপ হয় এবং পূর্বমুখে ধরিলে যদি অন্যরূপ হয়, তাহা হইলে সে গজেরই বা অর্থ কী হয় এবং মাইলের অর্থই বা কী হয়? সেকথা এখন থাক। ধরিয়া লইলাম, গজের ব্যতিক্রম হয় না। Mechanics-শাস্ত্র relative velocity লইয়াই কারবার করেন; absolute velocity-র সহিত কোনওরূপ কারবার অসাধ্য। গজকাঠির তুলনার দ্বারাই সেই relative velocity মাপিতে হইবে। Ether যখন স্থির ও নিশ্চল, তখন ether-এর মধ্য দিয়া কোনও দ্রব্য যে বেগে চলে, তাহা মাপিতে পারিলে সেই বেগকে সেই দ্রব্যের absolute velocity বলা যাইতে পারিত। কিন্তু Michelson এবং Morley-র experiment হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, absolute velocity মাপিবার কোনও উপায় নাই; কাজেই relative velocity মাপিয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। রেলের গাড়ি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল চলে। রেলের গাড়ির এই বেগ relative celocity, আপেক্ষিক বেগ; পৃথিবীকে স্থির ধরিয়া পৃথিবীর তুলনায় উহা নির্দিষ্ট হয়। পৃথিবী এক বৎসরে সাতান্ন কোটি মাইল চলে, উহাও আপেক্ষিক বেগ। সূর্যকে স্থির ধরিয়া সূর্যের তুলনায় উহা নিরূপিত হয়। এই বেগ খুব ভীষণ বেগ বটে; কিন্তু আলোর বেগের তুলনায় যৎসামান্য। উহা সেকেন্ডে উনিশ মাইল; আর আলোর বেগ সেকেন্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল। Electron-এর কথা পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছি। জড় দ্রব্যের পরমাণু হইতে electronগুলি ছট্‌কিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসে, তাহাও বলিয়াছি। এই electron-গুলিরই বেগ পরিমিত হইয়াছে। উহাদের বেগ আলোর বেগের তুলনায় যৎসামান্য নহে। সেকেন্ডে লক্ষ মাইল বেগে চলিতেছে, এমন electron আজকাল সুপরিচিত। মনে করুন, একটা electron সেই বেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতেছে;—পূর্বমুখে ছুটিতেছে। মনে করুন, আর একটা electron ঠিক সেই বেগে অর্থাৎ সেকেন্ডে লক্ষ মাইল বেগে উলটোমুখে ছুটিতেছে,—পশ্চিমমুখে ছুটিতেছে। উহাদের পরস্পর আপেক্ষিক বেগ কী হইবে? একটার তুলনায় আর একটার আপেক্ষিক বেগ হইবে সেকেন্ডে দুই লক্ষ মাইল; কেন না, এক লক্ষ আর এক লক্ষ, একযোগে দুই লক্ষের সমান। আপেক্ষিক বেগ পরিমাণযোগ্য। উহা যত ভীষণই হউক, একটা ঘড়ি আর একটা গজকাঠি থাকিলেই উহা পরিমাণ করা যায়। এখানে আপেক্ষিক বেগের পরিমাণ হইল সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল। কিন্তু আলোর বেগ সেকেন্ডে এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল মাত্র; অতএব electron-এর বেগ হইল তাহার চেয়ে অধিক—সেকেন্ডে দশ হাজার মাইল অধিক। ইহা অসম্ভব। কোনও দ্রব্যের বেগ আপেক্ষিকই হউক, আর নিরপেক্ষই হউক, আলোর বেগের

অধিক হইতে পারে না। নূতন Mechanics-মতে আলোর বেগই চরম সীমা, ওই এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইলই চরম সীমা। কোনও দ্রব্যের কোনওরূপ বেগ ওই সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। অথচ স্পষ্ট দেখিতেছি, এক-একটা electron সেকেন্ডে লক্ষ মাইল বেগে চলিয়া থাকে। দুইটা electron পরস্পর উলটোমুখে চলিলে তাহাদের আপেক্ষিক বেগ সেকেন্ডে দুই লক্ষ মাইল হইবে, আলোর বেগকে ছাড়াইয়া যাইবে। এ একটা নূতন সমস্যা। শুধু নূতন নহে, একটা তুমুল সমস্যা। সেকেন্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগ—আলোর বেগের চেয়ে অধিক বেগ নূতন Mechanics-এর মতে অসম্ভব; হউক না তাহা আপেক্ষিক বেগ। আপেক্ষিক বেগ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ বেগ মাপিবার কোনও উপায় কেহ জানেন না। পুরাতন Mechanics তাহা জানিতেন না, নূতন Mechanics-ও তাহা জানেন না। এই সমস্যার মীমাংসা কী? সেকেন্ডে দুই লক্ষ মাইল বেগ স্পষ্ট দেখিতেছি; অথচ উহা হইতে পারে না। মীমাংসা এইরূপ—যে কালটুকুকে এক সেকেন্ডে মনে করিতেছ, উহা এক সেকেন্ড নহে, উহা এক সেকেন্ডের চেয়ে একটুকু দীর্ঘ। তোমার ঘড়িতে উহা এক সেকেন্ডে দেখাইতেছে বটে; কিন্তু ওই ঘড়ির সাক্ষ্য সর্বত্র গ্রাহ্য নহে; স্থানভেদে, অবস্থাভেদে উহার সাক্ষ্য সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যাহাকে এক সেকেন্ড মনে করিতেছে, তাহা সর্বত্র সর্বাবস্থায় এক সেকেন্ড নহে।

সমস্যা ক্রমশ ঘনাইয়া আসিল। আগে দেখিয়াছি, যাহাকে এক গজ বলিতেছি, তাহা সর্বত্র এক গজ নহে। গজ কথাটারই কোনও নির্দিষ্ট মানে নাই। এখন দেখিতেছি, যাহাকে এক সেকেন্ডে বলিতেছি, তাহারা সর্বত্র সর্বদা এক সেকেন্ড নহে। সেকেন্ড কথাটারও নির্দিষ্ট কোনও মানে নাই। গজের হিসাবে আমরা দেশ পরিমাণ করি, সেকেন্ডের হিসাবে আমরা কাল পরিমাণ করি। এখন দেখিতেছি, দেশের পরিমাণে এবং কালের পরিমাণে কোনও বাঁধা standard নাই। আমরা দায়ে পড়িয়া যে standard অবলম্বন করি, সে standard-এর কোনও স্থিরত্ব নাই। দেশ মাপের সময়ে যাহাকে এক মাইল বলি, সে এক মাইলের কোথায় কী অর্থ, জোর করিয়া বলিতে পারি না। কাল মাপিবার সময়ে যাহাকে এক ঘণ্টা বলি, তাহার কখন কী অর্থ, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। দেশের এবং কালের পরিমাণে এইরূপ গোড়ায় গলদ। এই পরিমাণের উপর ভর করিয়াই বিজ্ঞান-বিদ্যা যাবতীয় গণনা করিতেছেন। সেই গণনা অনুসারে আমরা জীবনযাত্রা চালাইতেছি। জীবনযাত্রাও বেশ চলিয়া যাইতেছে; অথচ সেই পরিমাণকর্মে কোনরূপ স্থিরতা নাই। বিজ্ঞান-বিদ্যার ভিত্তি খুঁজিতে গিয়া এই ফাঁক বাহির হইয়া পড়িল। কেঁচো বাহির করিতে গিয়া সাপ বাহির হইয়া পড়িল। পূর্বে বলিয়াছিলাম, জড় জগতের তথ্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে অগাধ জলে সাঁতার দিতে হইবে;—সাঁতার দেওয়া দূরে থাকুক, এখন অতলস্পর্শে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। উদ্ধারের উপায় আছে কি না, দেখিবার ইচ্ছা থাকিল। আপনাদের ধৈর্য পরিমাণের কোনও standard আমার হাতে নাই। যদি অভয় দেন, বারান্তরে চেষ্টা করিব।

বৈজ্ঞানিকের আকাশ

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচ্য জড় জগতের কথা বলিতেছিলাম। মনের সামনে উহার একটা ছবি আঁকিবার চেষ্টা করুন। আকাশ সমাকার। সেই আকাশকে বিষমাকার করিয়া এই জড়জগৎ বিদ্যমান। সূর্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, এই সকল খণ্ড-খণ্ড জড়দ্রব্য আকাশের এখানে ওখানে সেখানে ছড়াইয়া আছে। তাহাদের মাঝে-মাঝে ফাঁক। সেই ফাঁকও একেবারে শূন্য নহে। উহা যাহাতে পূর্ণ, তাহার নাম ether। ওই সকল জড়খণ্ড অণুতে পরমাণুতে নির্মিত। অণু-পরমাণুগুলো ছোট-ছোট জড়খণ্ড; তাহাদেরও মাঝে-মাঝে ফাঁক, সেই ফাঁক ইথারে পূর্ণ। বিজ্ঞান-বিদ্যা এখন বলিতে চাহিতেছেন যে, অণু-পরমাণুগুলিও আরও ছোট ইলেকট্রনে নির্মিত। এক-একটা পরমাণুর মধ্যে হাজার দরুনে ইলেকট্রন আছে। সেই সকল ইলেকট্রন মাঝে-মাঝে যে ফাঁক, তাহাও ইথারে পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল ইথার এবং ইলেকট্রন। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া ইথার আর তার মাঝে-মাঝে ইলেকট্রন। অতএব আকাশ-জোড়া জড়জগৎ বিচ্ছিন্ন, সন্ততিহীন, discontinuous; electron-গুলি আকাশকে বিচ্ছিন্নতা—discountinuity দিতেছে। ঈথার জিনিসটা হয়তো বিচ্ছেদরহিত—continuous ; ether যেমনই হউক, উহার মাঝে-মাঝে electron থাকিয়া উহাকে discontinuity দিতেছে। এইরূপে সমস্ত জড় জগৎটাই ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। এইরূপেই সমাকার আকাশ, অথবা সমাকার আকাশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান সমাকার ether বিষমাকৃতি পাইয়াছে। এই বিষমাকৃতি পাওয়া নিতান্তই দরকার। নতুবা সর্বত্র সমাকার আকাশের সার্থকতা কী হইবে? সর্বত্র সমাকার বা একাকার পদার্থের বিবরণ দেওয়া চলে না। Electronগুলি ether-এর স্থির-সমুদ্রমধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পরস্পর ব্যবধানে থাকিয়া কাছে আসিতেছে, দূরে যাইতেছে। কিন্তু দুইটা electron একেবারে মিশিয়া যায় না। দুইটা electron বোধহয় কখনও গায়ে-গায়ে লাগে না,—মিশিয়া যাওয়া দূরের কথা। প্রত্যেক electon-এর চারিদিকে এক-একটু প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশের মধ্য অন্য electron-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রত্যেক electon আপনার সেই ক্ষুদ্র এলাকাটুকু কোনও-না-কোনওরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। অন্য electron-কে সেখানে আসিতে দেয় না। কাজেই একটা আর একটার গায়ে পড়িয়া মিশিয়া যাইবার অবসর পায় না। আপনার হাতে গুলিভরা পিস্তল থাকিলে আপনি ক্ষীণদেহ হইয়াও যেমন দশ বিঘা জমি অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন, অপরে সেই এলাকার মধ্যে ঘেঁষতে সাহস করে না, ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। আমি Clerk Maxwell-এর ভাষা ব্যবহার করিলাম। তিনি পরমাণু সম্বন্ধে এইরূপ ভাষার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই জড় দ্রব্যের impenetrability। একটা জড়দ্রব্য আর একটা জড় দ্রব্যে একবারে মিশিয়া যাইতে পারে না। তাহা কতকটা ব্যাখ্যা এইরূপে মিলিতে পারে। তামায় দস্তায় মিলিয়া যখন পিতল হয়, সে পিতলের মধ্যে তামা বা দস্তা কিছুই

পৃথক করিয়া দেখা যায় না; অথচ তখনও সেই পিতলের অভ্যন্তরে তামার পরমাণু ও দস্তার পরমাণু পাশাপাশি রহিয়াছে, পরস্পর মিলিয়া যায় নাই। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে electron গুলিও পাশাপাশি রহিয়াছে—এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জড় দ্রব্যকে বিচ্ছিন্ন বা discontinuous মনে করিতেই হইবে। এরূপ মনে না করিলে বোধ করি, dynamics বিদ্যা জড় দ্রব্যকে আয়ত্ত করিতে পারিত না। আয়ত্ত করিতে পারিত না বলিয়াই কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত পণ্ডিতের ether-কে পর্যন্ত discontinuous মনে করিতে বাধ্য হইতেন। ইথারেও একটা কণিকাময়তা, grained structure, molecular structure আরোপ করিতে বাধ্য হইতেন। আজকাল ether জিনিসটা খাঁটি dynamics-এর আলোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। উহাকে continuous বলিব, কি discontinuous বলিব, কি বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহাতে সন্দিহান রহিয়াছেন। Ether-এর পক্ষে যাহাই হউক, electron-গুলিকে পরস্পর ব্যবহিত বলিয়া মনে করিতেই হয়। এই discontinuity ব্যাপারের উপর আমি অধিক জোর দিতে চাই জড় দ্রব্যের কাজই হইতেছে—সমাকার আকাশকে বিষমাকার করা। এক-একটা জড়দ্রব্য, অথবা জড় দ্রব্যের অন্তর্গত এক-একটা electron এক-একটা চিহ্ন মাত্র; জড় জগতের বিবরণ ওই চিহ্নগুলিরই বিবরণ। চিহ্নগুলি স্থির etherসমুদ্রমধ্যে ছুটিতেছে। সেই ছুটাছুটির বিবরণ জড় জগতের বিবরণ। বর্তমান ক্ষণে কোন electronটি কোথায় রহিয়াছে বলিয়া দাও এবং কোন পথে কি বেগে চলিতেছে, তাহা বলিয়া দাও তাহা হইলে সমস্ত অতীত কালে উহা কখন কোথায় চলিতেছিল এবং সমস্ত ভবিষ্যতে কখন কোথায় চলিবে, তাহা আমি গণিয়া বলিব;—বৈজ্ঞানিকের ইহাই প্রতিজ্ঞা। বর্তমানের জ্ঞান হইতে অতীতের জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান আদায় করিব, বৈজ্ঞানিকের ইহাই প্রতিজ্ঞা। Electronগুলোর গতিবিধি সম্বন্ধে কতকগুলা concept-এর সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক পাতাইয়া, সেই সম্পর্ককে সূত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেই সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। দুঃখ এই, electronগুলোর গতিবিধি মাপিবার কোন উপায় পাওয়া যায় নাই। Ether-সমুদ্রকে স্থির-সমুদ্র ধরিয়া লইয়া সেই স্থির-সমুদ্রে কোন electron স্থির আছে, কি বেগে চলিতেছে, তাহা মাপিবার কোন উপায় পাওয়া যায় নাই। কোন electron কতটুকু সময়ে কতটা পথ অতিক্রম করিল, তাহা মাপিতে গেলে ঘড়ির দরকার হয় এবং গজকাঠির দরকার হয়। কিন্তু সেরূপ ঘড়িও পাওয়া যায় না, গজকাঠিও পাওয়া যায় না। ঘড়ির সময় ঠিক থাকে না এবং গজকাঠিরও দীর্ঘতা ঠিক থাকে না, ইহা আপনাদিগকে আগে বলিয়াছি। অগত্যা ether-কে বর্জন করিয়া প্রচলিত ঘড়ি ও গজকাঠি দিয়া electron-দের পরস্পরের দূরত্ব মাপিতে হয় এবং তদনুসারে উহাদের বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে হয়। এই প্রচলিত ঘড়িতে যে সময় পাওয়া যায় এবং এই প্রচলিত গজকাঠিতে যে দূরত্বের নিরূপণ হয়, তাহা নিতান্তই কাজ চালানো, conventional; লজিকের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে উহা গুঁড়া হইয়া যায়—কোনও তাৎপর্যই থাকে না। এইরূপে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি দেখিয়া inertia বা জড়ত্বের অঙ্কের নিরূপণ হয়। পুরাতন বিজ্ঞান নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এই জড়ত্বের অঙ্ক স্থায়ী অঙ্ক; ইহার ইতরবিশেষ হয় না। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখিতেছেন, বেগ-বৃদ্ধির সহিত জড়ত্ব বাড়িয়া যায়। স্থির সমুদ্রে

নিশ্চল electron-কে চাপিয়া ধরিবার কোনও উপায় নাই বটে, কিন্তু যদি তেমন কোনও নিশ্চল electron থাকে, তাহা জড়ত্ববর্জিত হইবে। অর্থাৎ এই যে inertia বা জড়ত্ব, ইহা electron-এর স্বাভাবিক লক্ষণ নহে; উহা অর্জিত লক্ষণ। বেগবশে উহা অর্জিত হয়। Electron নিজে জড়ত্বহীন। উহা যখন বেগে ছুটে, তখনই উহা জড়ত্ব পায়। কোনও-কোনও পণ্ডিত বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা জড়ত্বহীন, তাহা তো বস্তুহীন, তাহা তো ফাঁকি। তাঁহারা বলিতে চাহেন, জলে যেমন বুদ্বুদ, ether সমুদ্রে electronগুলো তেমনই বুদ্বুদ। বুদ্বুদ যেমন ফাঁকা অথবা প্রায় ফাঁকা জিনিস, electronগুলোও সেইরূপ ফাঁকা বা প্রায় ফাঁকা জিনিস। উহাতে কোনও বস্তু নাই। বস্তু যদি থাকে, তাহা ether-এ। ব্যাপারটা বুঝুন। সবই ওলট-পালটের ব্যাপার। বৈজ্ঞানিকদের মগজে ether-এর যখন কল্পনা হয় নাই, তখন জড় দ্রব্যগুলোই ছিল বাস্তব জিনিস, আর চারিদিকের আকাশ ছিল ফাঁকা। এখন ফাঁকা আকাশ হইল নিরেট; উহা বাস্তব ether-এ পরিপূর্ণ, আর electronগুলি অথবা electron-নির্মিত জড় দ্রব্যগুলি হইল সম্পূর্ণ ফাঁকি। আপনারা ওই ফাঁকা আকাশের মধ্যে ওই যে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি গোল গোল নিরেট জমাট দ্রব্য দেখিতেছেন, উহা নিতান্তই আপনাদের মনের ভুল। সমস্ত আকাশটা নিরেট অথবা নিরেট ether-এ পরিপূর্ণ। আর এই চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী প্রভৃতি যে সকল জমাট দ্রব্য দেখিতেছেন, উহারাই নিতান্ত ভুয়া ফাঁকা বুদ্বুদ বা বুদ্বুদ সমষ্টি। উহাদের নিজের কোনও জড়ত্ব নাই। Ether ঠেলিয়া বেগে চলে বলিয়াই উহারা জড়ত্ব পায়। বেগবত্তা হইতেই জড়ত্ব। স্থির থাকিলে হয়তো জড়ত্ব থাকিত না। বেগে চলিতেছে বলিয়াই জড়ত্ব পাইয়াছে। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা শুনিলে স্তম্ভিত হইবে! সবই উলটাইয়া লইতে হইবে। যাহা ফাঁকা, তাহাকে মনে করিতে হইবে নিরেট জমাট; আর যাহা জমাট, তাহাকে মনে করিতে হইবে ভুয়া ফাঁকি।

সে কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা ether-কে জানিত না, জড় দ্রব্যকেই জানিত। সূর্যকে জানিত, পৃথিবীকে জানিত; সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোর ধাক্কা আসে, তাহাও জানিত। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে ধাক্কা বহিবার জন্য যে আসে, তাহাও জানিত। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে ধাক্কা বহিবার জন্য যে ether-এর midium আবশ্যক, তাহা সে-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা জানিত না। পৃথিবীর মতো জড় দ্রব্যই ধাক্কা লয় এবং ধাক্কা দেয়; ইহা দেখিয়াই—সেই ধাক্কা বহিবার জন্যই সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এই ধাক্কাবাহী ether-কে বসাইতে হইয়াছিল। Analogy বা উপমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে, তবে analogy পথ দেখায়, ইহা আগেই বলিয়াছি। লাঠির মতো বা দড়ির মতো ধাক্কা প্রেরণে সমর্থ জড় দ্রব্যের analogy হইতেই ether-এর কল্পনা হইয়াছিল। এখন জড়দ্রব্য যদি তাহাদের জড়ত্ব হারায়, তাহা হইলে তাহার analogy হইতে কল্পিত ether-এই বা জড়ত্ব থাকে কীরূপে? জড় দ্রব্যগুলাই যদি ফাঁকি হয়, তবে ether-কে বরং ফাঁকির উপরে ফাঁকি বলাই সঙ্গত। Ether-কেই বা একটা নিরেট বস্তু মনে করিবার হেতু কী থাকে?

বস্তুতই এখন বিজ্ঞান-বিদ্যা কতকটা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। Inertia বা জড়ত্ব—এই concept-ই তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। তাহার একটা নূতন বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—electron-magnetic inertia; জড়ত্ব মাত্রই এখন electro-magnetic—

তাড়িত—চৌম্বক জড়ত্ব। কিন্তু এই জড়ত্ব কোন দ্রব্যের জড়ত্ব? যে দ্রব্যে এত কাল জড়ত্ব অর্পণ করা হইতেছিল, তাহা তো ফাঁকিতে দাঁড়াইতেছে। তাহা হইলে জড়ত্ব আরোপ করিব কীসে? শুধু ফাঁকা শূন্য vacuous বস্তুহীন আকাশে জড়ত্ব অর্পণ করা চলে কি না? না করিবার বিশেষ হেতু আছে কি? বৈজ্ঞানিকেরা যে সেরূপ কল্পনা করিতে একেবারে অসমর্থ, তাহা বলিতে পারি না। আপনারা Boscovich-এর নাম শুনিয়া থাকিবেন। জ্যামিতি-বিদ্যায় point বা বিন্দু কাহাকে বলে, তাহা আপনারা জানেন। এই বিন্দু পদার্থের কোনওরূপ অংশই না, পরিমাণ নাই। উহা নিতান্তই একটা বস্তুহীন concept মাত্র। অথচ এই বিন্দুগুলার গতায়াত কল্পনা করা হয়। একটা বিন্দু যে পথে চলে, জ্যামিতি-শাস্ত্রে সে পথের নাম line বা রেখা। এই line বা রেখাও নিতান্ত বস্তুহীন, উহাও একটা concept। জ্যামিতি-বিদ্যা যে সকল পদার্থ লইয়া আলোচনা করে, তাহারা সকলেই concept মাত্র; কাহারও কোনও বস্তু নাই, কাহারও কোনও জড়ত্বও নাই। জড়ত্ব থাক আর না থাক, জড়ত্বহীন বস্তুহীন point বা বিন্দু জ্যামিতিবেত্তার কল্পনামতে শূন্যপথে স্বচ্ছন্দে ছুটিয়া বেড়াইতে পারে। নতুবা Kinematics বা গতিবিজ্ঞান-বিদ্যা থাকিত না। বস্কোবিচের সময়ে atom-এর কথা উঠিয়াছিল। বস্কোবিচ বলিলেন, মনে করো না কেন—এই pointগুলোই atom। উহারাই দূর হইতে পরস্পরকে টানাটানি করে, ঠেলাঠেলি করে; পরস্পরকে না ছুঁইয়াও পরস্পরকে বেগ দেয় এবং পরস্পরের নিকট হইতে বেগ লয়। এই বেগ দিবার ও বেগ লইবার প্রবৃত্তি দেখিয়াই ওই বিন্দুগুলারই inertia নিরূপণ করিতে পারি। মনে রাখিবেন, ওই যে inertia, উহা কেবল একটা সম্পর্ক মাত্র—একটা relation মাত্র। আপেল-ফল পৃথিবীর দিকে দ্রুতবেগে ধায়, পৃথিবী আপেলের দিকে সেরূপ দ্রুতবেগে ধায় না। উভয়ের দ্রুতত্ব তুলনা করিয়াই বলা হয়, আপেলের inertia অল্প, আর পৃথিবীর inertia তাহার তুলনায় অধিক। সেইরূপ দুইটা বস্তুহীন অথচ চলন্ত বিন্দুর পরস্পরের অভিমুখে দ্রুতত্ব তুলনা করিয়া তাহাদেরও inertia-র তুলনা করা না চলিবে কেন? যে বিন্দুটি চলিবে দ্রুত, তাহার জড়ত্ব হইবে অল্প; আর যে চলিবে ধীরে, তাহার inertia হইবে অধিক। এইরূপ জড়ত্বযুক্ত, কিন্তু বস্তুহীন point-কল্পনার দ্বারা Mechanical science-এর সমস্ত কাজই না চলিবে কেন?

ফল কথা, সমাকার আকাশে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলে না। ওই আকাশকে কোনও-না-কোনওরকমে বিষমাকার করিয়া লইতে হইবে। কোনও-না-কোনওরূপ চিহ্ন নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বিষমাকাব করিয়া লইতে হইবে। এইটুকুই দরকার। কিন্তু ইহার জন্য আকাশের মধ্যে এই সকল চন্দ্র-সূর্যের মতো বা অণু-পরমাণুর মতো বড়-ছোট ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করার নিতান্ত প্রয়োজন কী? এই ইট-পাটকেলগুলো যে নিতান্তই foreign body। জন্তুদেহে যেমন foreign matter কিছুতেই হজম হয় না, লোহার পেরেকের মতো গায়ে বিঁধে, অথবা কুলের আঁটির মতো পেটের পীড়া জন্মায়, এই ইট-পাটকেলগুলোও সেইরূপ আকাশের গায়ে হজম হয় না; তত্ত্ববিদের চোখে নিতান্তই বিস্ফোটকের মতো পীড়া জন্মায়। আকাশ জিনিসটাই একটা বিশুদ্ধ Geometrical পদার্থ। উহা খাঁটি জ্যামিতিবিদ্যার প্রতিপাদ্য এবং আলোচ্য। আকাশের যে কিছু লক্ষণ, তাহা সমস্তই জ্যামিতিক বা geometric লক্ষণ। কেবল এই জ্যামিতিক লক্ষণ ভেদের দ্বারা আকাশকে বিষমাকারে চিহ্নিত করা চলে না

কি? একেবারে গোড়াতেই চাপিয়া ধরুন না। আকাশের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন বিশিষ্ট বিন্দু কল্পনা করিয়া, এবং ভিন্ন-ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন-ভিন্ন জড়ত্ব অর্পণ করিয়া বস্কোবিচ আকাশকে বিষমাকার করিয়া লইয়াছিলেন। এই জড়ত্বযুক্ত বিন্দুগুলির প্রত্যেকের একটু করিয়া এলাকা আছে। এক বিন্দু অন্য বিন্দুকে সেই এলাকামধ্যে আসিতে দেয় না, এইরূপ মনে করিলেই তো impenetrability ও discontinuity, উভয়ই পাইয়া যাইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যারও কাজ চলিবে।

অন্যরূপেও আকাশকে বিষমাকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আপনারা Michael Faraday-র নাম শুনিয়াছেন নিশ্চয়। এই অদ্ভুত মানুষটির মগজে যে সকল কল্পনা খেলিয়াছিল, তাহাই মূর্তি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইয়া বিজ্ঞান-বিদ্যারও মূর্তি বদলাইতে চলিয়াছে; নিউটন যে ভিত্তির উপর বিজ্ঞান-বিদ্যাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় স্থাপন করিয়াছিলেন, সে ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপাইয়াছে। ফারাডে কারবার করিতেন তড়িৎ এবং চুম্বক লইয়া। তড়িৎ-যুক্ত দ্রব্য পরস্পর দূরে থাকিয়াও টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। চুম্বকের কাঁটাও পরস্পর দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে টানাটানি ঠেলাঠেলি করে। পরস্পর দূরে থাকিয়া পরস্পরকে ধাক্কা দেয়। ইহা action at a distance। এই action at a distance ফারাডেরও মনঃপূত হয় নাই। তিনিও মাঝে একটা medium খুঁজিতেছিলেন। কোনও স্থূল medium তিনি পান নাই বটে, কোনওরূপ দড়ি-দড়া খুঁজিয়া পান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মনশ্চক্ষু কতকগুলা শরীরহীন বস্তুহীন conceptual রজ্জুর আবিষ্কার করিয়াছিল। এইগুলির নাম দিয়াছিলেন তিনি lines of force। এই line of force-গুলি দিগদিগন্তে শূন্য বাহিয়া প্রসারিত হইয়াছে এবং তাহাদেরই চলাচলি টানাটানি এবং ঠেলাঠেলিতে যাবতীয় তাড়িতঘটিত এবং চুম্বকঘটিত ধাক্কাধাক্কি চলিতেছে। এ-কালের বিজ্ঞান-বিদ্যা ফারাডের সৃষ্ট এই line-গুলিকে বা রেখাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এই line-গুলি আকাশ জুড়িয়া বর্তমান আছে। কেহ কাহারও গায়ে পড়ে না। কেহ কাহাকেও কাটে না। কেহ কাহারও সহিত মিশে না। অথচ পরস্পরকে ঠেলিয়া দিগদিগন্তে প্রসারিত হইতেছে এবং চলিতেছে, ছুটিতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, ঘুরিতেছে। আকাশের মধ্যে এই রেখাগুলি কোথাও বা ঘন-সন্নিবিষ্ট, কোথাও বা বিরল। এই সন্নিবেশভেদেই তাহারা আকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানকে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, সমাকার আকাশকে বিষমাকার করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহাদের গতিশীলতা হইতেই আকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন inertia অর্পণ করিয়াছে। জড় দ্রব্যের যে inertia এবং impenetrability, তাহা এই অশরীরী, বস্তুহীন, রেখাগুলিরই inertia এবং impenetrability। রেখাগুলি পরস্পরকে কাটে না; যেখানে converge করিবার কথা, পরস্পরকে কাটিবার কথা, সেখানেও কাটাকাটি করিতে না পাইয়া হয়তো কোনওরূপে লুপ্ত হইয়া যায়; এইরূপে সেখানে বিচ্ছেদ বা discontinuity আসিয়া পড়ে। যদি ইলেকট্রনই আনিতে হয়, সেই স্থানটাই হয়তো ইলেকট্রন। উহারা পরস্পর মেশে না; অতএব উহারা impenetrable। পরস্পরকে বেগ দেয় এবং পরস্পর হইতে বেগ লয়। ইহা হইতেই তাহাদের inertia। এই line-গুলির সন্নিবেশবিধি এবং উহাদেরই গতাগতি—এতদ্দ্বারাই জড় জগতের যাবতীয় বিবরণ দেওয়া অসম্ভব নহে। আজকালকার

বিজ্ঞান-বিদ্যার যাঁহারা খোঁজ রাখেন, তাঁহারা এ কথা জানেন। আমার পক্ষে এখানে অলং বিস্তরেণ।

বস্কোবিচের point আর ফারাডের line, এই দুইটা দৃষ্টান্ত লইয়াছি। আর একটা দৃষ্টান্ত লইতে চাহি। জ্যামিতিশাস্ত্রের সরল রেখা সোজা পথে চলে। উহার কোথাও কোনও বক্রতা নাই, উহা সর্বত্র সমাকার। উহার এক টুকরা অন্য টুকরার গায়ে-গায়ে মিশিয়া যায়। আর যাহাকে বক্র রেখা বলা যায়, উহা কুটিল পথে চলে, উহা সর্বত্র সমাকার না হইতেও পারে। উহার বক্রতা সর্বত্র সমান না হইতেও পারে। উহার এক টুকরা অন্য টুকরার সহিত না মিশিতেও পারে। আপনি যদি সরলরেখা ধরিয়া চলিতে চান, কখন কত দূরে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন না; কেন না, সরল রেখার কোথাও কোনও চিহ্ন থাকে না। আর বক্রপথে চলিলে ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের ভিন্ন-ভিন্ন বক্রতা দেখিয়া, কখন কোথায় কত দূরে আসিলেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খোলা মাঠে, প্রান্তরে,—যেখানে কোনও ঘর বাড়ি নাই, গাছপালা নাই, তেমন প্রান্তরে,—রাজপথ যদি সরল রেখায় চলে, তাহা হইলে পথিকের পথ চলিবার জন্য মাঝে-মাঝে milestone পোঁতার নিতান্তই দরকার হয়। আর রাজপথ যদি বাঁকিয়া চুরিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলে, তাহা হইলে বুদ্ধিমান পথিক কিনা milestone-এও পথের বক্রতা দেখিয়াই স্থান নির্ণয় করিতে পারে। ইউক্লিডের আগে হইতে নিউটনের পরে পর্যন্ত আমাদের আকাশকে সর্বত্র সমাকার বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আকাশের কোথাও কোনও বক্রতা নাই, উহার প্রত্যেক টুকরা সর্বাংশে সর্বতোভাবে অপর টুকরার সমান। এইরূপ সমাকার আকাশকে চিহ্নিত করিবার জন্যই জড় দ্রব্যের milestone সেই আকাশমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। সেই জড় দ্রব্যের milestoneগুলিকে বাহির হইতে আমদানি করিয়া আকাশমধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই যদি আমি আকাশকে সমাকার মনে না করি, গোড়াতেই যদি ধরিয়া লই যে, আকাশের বক্রতা সর্বত্র সমান নহে, তাহাতে ক্ষতি কী? সেই বক্রতা ভেদ দেখিয়া আমরা আকাশমধ্যে চিহ্নিত করিয়া লইতে পারি; এবং সেই বক্রতার ভেদকেই যদি জড়দ্রব্য বলিয়া নির্দেশ করি, তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ আটকায় কি? এইরূপ কল্পনাটা আপনাদের নিকট নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের hyper-space এবং meta-geometry-র খবর রাখেন, তাঁহারা আমার এই উক্তিতে শঙ্কিত হইবেন না। বস্তুত, আমাদের আকাশকে সর্বত্র সমাকার মনে করিবার খুবই যে একটা আবশ্যকতা আছে, তাহা নহে। ইউক্লিড যে আকাশের কথা কহিয়াছেন, তাহা সমাকার আকাশ। নিউটন এবং তাঁহার অনুবর্তীরাও সেই সমাকার আকাশই মানিয়া লইয়াছেন। তাহাতে এত দিন কাজও চলিয়াছে বেশ। বিজ্ঞান-বিদ্যা কাজ চালাইবার বিদ্যা। কাজ চলিতেছে দেখিয়া সর্বসাধারণেই অসংকোচে তাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিবার এখন সময় আসিয়াছে। স্থানে-স্থানে কাজ আটকাইবার উপক্রম হইয়াছে। আকাশের বক্রতাভেদ মানিয়া লইয়া তেমনই যদি কাজ চলে, অথবা আরও ভালো কাজ চলে, তাহা হইলে বিজ্ঞান-বিদ্যার আপত্তি করিবার কোনও হেতু থাকিবে না। আকাশকে সর্বত্র সমাকার মনে না করিয়া উহার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-

ভিন্ন বক্রতা অর্পণ করিতে পারা যায়। মনে করা যাইতে পারে, এই বক্রতাও কোথাও স্থির নাই, উহা নিশ্চল নহে। ওই বক্রতারই গতিবিধি অনুসারে আকাশের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে inertia-ভেদও নির্দেশ করা চলিতে পারে।

ফলে এগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র। বস্তুতই বস্কোবিচের point-এর দ্বারা, অথবা ফারাডের line-এর দ্বারা, অথবা নূতন জ্যামিতির বক্রতাভেদের দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার যাবতীয় কাজ, বাহ্য জগতের যাবতীয় বিবরণ,—অতীত ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় ঘটনার গণনা চলিবে কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বিচার করিবেন। বস্তুত তাহার বিচার চলিতেছে। আমি কেবল আপনাদিগকে জানাইতে চাহি যে, জড় জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের মন যে প্রশ্ন করে, তাহার কেবল একটা মাত্র উত্তর মিলিবে, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতু নাই। প্রশ্নটা এক বটে, কিন্তু উত্তর তাহার নানাবিধ হইতে পারে। গোড়া হইতেই বলিয়া আসিতেছি, বৈজ্ঞানিকের এই যে জড়জগৎ, ইহা বাঙ্ময় জগৎ—কতকগুলি concept-এ নির্মিত জগৎ। এই concept-গুলি বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া জিনিস। পাঁচ জনে পাঁচ রকম concept সৃষ্টি করিয়া একই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। উহার মধ্যে এটা সত্য, এটা অসত্য, ইহা বলিবার উপায় নাই। যেটায় যেমন কাজ চলিবে, যেটায় ব্যবহার চালাইবার যেমন সুবিধা হইবে, সেটা তত দূর গ্রাহ্য হইবে, এই পর্যন্ত। এ সমস্ত সত্যই ব্যবহারিক সত্য—কাজ চালানো সত্য। আকাশ জিনিসটা geometrical পদার্থ। উহার geometrical properties ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া যদি বাহ্য জগতের সমুদয় বিবরণ দেওয়া চলে, সমাকার আকাশের পরিবর্তে বিষমাকার আকাশ কল্পনায় যদি বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলে, তাহা হইলে বাহির হইতে ইট-পাটকেল দ্বারা আকাশকে চিহ্নিত করিয়া বদহজমের উৎপাদন নিতান্ত আবশ্যক না হইতেও পারে।

আপনারা হয়তো বলিবেন, আকাশ সমাকারই হউক, আর বিষমাকারই হউক, উহা তো নিতান্ত unsubstantial, বস্তুহীন পদার্থ। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জড় জগতের আলোচনা করে, উহা তো অত্যন্ত substantial জিনিস; উহার ভিতরে একটা বস্তু আছে—একটা substance আছে। কোনওরূপ substance-বর্জিত শূন্য আকাশের জ্যামিতির ধর্ম দ্বারা—geometrical properties দ্বারা এমন substantial বাস্তবিক জড় জগতের ব্যাখ্যা কখনোই চলিতে পারে না।

প্রশ্ন হয়. এই যে substance, এই যে বস্তুমত্তা, ইহা তো নিতান্ত প্রত্যক্ষ পদার্থ। উহাকে একেবারে বর্জন করিয়া, একেবারে unsubstantial ও conceptual ও geometrical আকাশ দিয়া বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ কীরূপে চলিবে? আকাশ স্বভাবত সমাকারই হউক, আর বিষমাকারই হউক, উহা জ্যামিতি-শাস্ত্রেরই আলোচ্য। উহার আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু উহার সহিত কারবার চলিতে পারে না। জড়জগৎ আমাদের কারবারে জগৎ। উহাকে বস্তুহীন মনে করিলে চলিবে কেন? মনে আছে, পাঠদশায় একদিন Science Associations-এ ফাদার লাফোঁর লেকচার শুনিতে গিয়াছিলাম। যে হতভাগ্যেরা জড় জগতের substance বা বস্তুমত্তা স্বীকার করে না, তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ফাদার হাসিতে-হাসিতে সবলে সম্মুখের টেবিল চাপড়াইলেন এবং বলিলেন, জড় দ্রব্যে বস্তু আছে কি না, এই প্রশ্নের

আমার এই উত্তর। আমি এ পর্যন্ত জড় পদার্থের বস্তুহীনতা সম্বন্ধে যে সকল ছেঁদো কথা তুলিলাম, আপনারাও হয়তো এক চপেটাঘাতে তাহার উত্তর দিয়া আমাকে নিরুত্তর করিবেন।

আসুন, আমি চপেটাঘাতের জন্য প্রস্তুত আছি। আপনার চপেটাঘাতে আমি যখন ব্যথা পাইয়াছি, এবং আপনার হাতেও কিঞ্চিৎ ব্যথা হইয়াছে, তখন ওই ব্যথাটাকে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। ব্যথাটুকু স্বীকার করিবই; কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু স্বীকার করিব না। এই ব্যথাটুকু নিতান্তই সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ। জড় জগতের সহিত কারবার করিতে গিয়া আমরা পদে-পদে ওইরূপ চপেটাঘাতের ব্যথা সহিতেছি। পদে-পদে আমরা প্রতিহত হইতেছি এবং তদনুসারে ক্লেশ পাইতেছি, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই যে ব্যথা, ইহার নাম resistance। সমস্ত জড়জগৎ আমাদের নিকট একটা প্রকাণ্ড resisting something রূপে অনুভূত হয়। এই resistance নানা মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রত্যক্ষ-সীমায় আইসে। উঠিতে, বসিতে, নড়িতে, নড়াইতে, বিচরণে, ভ্রমণে, ভারবহনে—সর্বত্র আমরা আঘাতের ও প্রতিঘাতের বেদনা পাই। আমাদের দেহভার বহন করাই একটা বেদনা। জড় জগতের সহিত কারবারে প্রতি পদে আমরা আছাড় খাইতেছি ও মাথা ঠুকিতেছি এবং তদনুসারে বেদনা অনুভব করিতেছি। এই বেদনা একটা অনুভূতি। এই অনুভূতির নানা মূর্তি। এই বেদনাই resistance এবং এই resistance-এর অনুভূতি হইতেই জড় জগতে আমরা substance আরোপ করি। যেখান হইতে আমরা যেমন resistance পাই, সেখানটাকে তেমন substantial মনে করি। 'যত' না বলিয়া আমি 'যেমন' বলিলাম; কেন না, এই resistance একটা অনুভূতি বা feeling; উহার মাত্রা নির্দেশ হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা যে resistance যন্ত্র দ্বারা মাপেন, তাহা feeling নহে, তাহা একটা পরিমাণযোগ্য conceptual term। ওই resistance-এর অনুভূতি অনুসারে আমরা কঠিন, তরল, দৃঢ়, কোমল, কর্কশ, বন্ধুর, গুরু, লঘু ইত্যাদি নানা বিশেষণে জড় দ্রব্যকে বিশেষিত করি। আমরা মনে করি, এই বেদনার অনুভূতি বাহ্যজগৎ হইতেই আসে, এবং তদনুসারে আমরা বাহ্য জগৎকে substantial জগৎ ঠিক করিয়া লই। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির ন্যায় এই বেদনাও একটা প্রত্যক্ষ অনুভূতি; ইহা কিন্তু রূপ-রস-গন্ধ হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের অনুভূতি। রূপ-রসাদির জন্য যেমন চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আছে, এই বেদনানুভূতির জন্য তদ্রূপ স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আবশ্যক হয়। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে কুলায় না দেখিয়া, আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুঁজিতে হয়। দেহের মাংসপেশির, এবং তৎসম্পৃক্ত স্নায়ুযন্ত্রের সহিত হয়তো এই resistance অনুভূতির বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। তজ্জন্য ইহাকে muscular sensation বলা হয়। হইতে পারে, tactile sense বা স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে এই muscular sense সম্পূর্ণ পৃথক। খাঁটি স্পর্শেন্দ্রিয় হয়তো কেবল শীতোষ্ণতারই খবর আনে, কোনওরূপ resistance-এর কোনও খবর দেয় না। ইহা শরীর-বিজ্ঞানের বা physiology-র আলোচ্য। ইহা লইয়া এখানে আমার মাথা ব্যথার দরকার নাই। ইন্দ্রিয় যাহাই হউক, এই অনুভূতিটা একটা সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ। এই অনুভূতির সহিত জড় দ্রব্যে বস্তু কল্পনার অতি নিকট সম্পর্ক। আমাদের এমনই সংস্কার ও অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে যে, জড় দ্রব্যকে আমরা বরং রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন,

শব্দহীন মনে করিতে পারি; কিন্তু উহাকে বস্তুহীন অথবা resistance হীন, এরূপ মনে করিতেই পারি না। রূপ-রস-গন্ধাদি সমস্ত বর্জন করিয়াও জড় দ্রব্যের এই resisting power, এই ব্যথা দিবার শক্তি অবশিষ্ট থাকে। এটুকু গেলে আর যেন কিছুই থাকে না। এই জন্য মনোবিজ্ঞানের কোনও-কোনও পুঁথি খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, জড় দ্রব্যের মুখ্য লক্ষণ extension এবং resistance। জড় দ্রব্য প্রথমত আকাশ জুড়িয়া আছে; দ্বিতীয়ত উহা বাধা দেয় বা বেদনা দেয়। অতএব resistance উহার অন্যতম মুখ্য লক্ষণ। মনোবিজ্ঞান জোর করিয়া এইরূপ বলিতে পারেন। মনোবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক পদার্থ লইয়া আলোচনা করেন। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের নিকট ওই প্রত্যক্ষ বেদনুভূতি ব্যবহারিক বাহ্য জগতে নিক্ষিপ্ত হইয়া জড় দ্রব্যরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু Physical science-এর ব্যবসায় অন্যরূপ। Physical science প্রত্যক্ষ অনুভূতি লইয়া কারবার করেন না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জন করাই তাঁহার ব্যবসায়। এই যে resistance, ব্যথা বা বেদনা, ইহা ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভিন্ন-ভিন্ন। উহার মধ্যে কতটুকু সর্বসাধারণের, তাহা নিরূপণের কোনও উপায় না দেখিয়া, বিজ্ঞান-বিদ্যা এই sensationa-কে বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির স্থলে সাধারণ জড়দ্রব্য পক্ষে মনগড়া inertia এবং impenetrability বসাইয়াছেন এবং কাঠিন্য তারল্য প্রভৃতি বিশিষ্ট জড়-ধর্মের পক্ষে নানাবিধ conceptual kinetic বিবরণ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকের নিকট সাধারণ জড়দ্রব্য inertia মাত্র এবং impenetrability মাত্র। উহা পুরোপুরি conceptual জিনিস। উহা একেবারেই অনুভূতির সীমায় আসে না। উহা বাঙ্ময় জগতের নাম-লোকের জিনিস। আর প্রত্যক্ষ resistancc, উহা প্রত্যক্ষ রূপ-লোকের জিনিস। বিজ্ঞান-বিদ্যাকে এই প্রত্যক্ষ resistance-কে বর্জন করিতেই হইবে—নিঃসংকোচে বর্জন করিতে হইবে। বিজ্ঞান-বিদ্যা যে জগতের আলোচনা করেন, উহাতে যেমন রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই; আছে কেবল ছুটাছুটি;---সেইরূপ উহাতে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত resistance-এরও কোনও স্থান নাই। উহাতে আছে কেবল inertia অর্থাৎ ছুটাছুটিতে প্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি; আর impenetrability অর্থাৎ মিশিয়া যাইবার অক্ষমতা। আপনারা ভূতে-পাওয়া কাহাকে বলে, জানেন। আমাদের থিয়সফিস্ট বন্ধুদের প্রত্যক্ষ জগতে ভূত যতই সত্য পদার্থ হউক, আমাদের মতো মাঝারি মানুষের ব্যাবহারিক জগতে ভূত নামাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। ভূত নামাইতে গেলে উহা কেবল বিভীষিকা দেখায়, অথচ উহাকে চাপিয়া ধরিতে পারা যায় না। চাপিয়া ধরিতে গেলে, উহা ছায়ার মতো এড়াইয়া যায়। উহা কিছুতেই বশ হয় না। এক লোকের জিনিসকে অন্য লোকে আনিতে গেলেই এইরূপ বিড়ম্বনা ঘটে। যাহার স্থান প্রত্যক্ষ প্রাতিভাসিক রূপ-লোকে, তাহাকে কাল্পনিক বাঙ্ময় নাম-লোকে আনিতে গেলেও সেইরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। জড় জগতের যে resistance, উহা অনুভূতি মাত্র, অতএব প্রাতিভাসিক জগতের—প্রত্যক্ষ জগতের অন্তর্গত সত্য বস্তু। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাঙ্ময় জড় জগতে আনিতে গেলে উহা কেবল বিভীষিকা জন্মাইবে না। উহাকে বৈজ্ঞানিকের Reason-এর এলাকায় ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। বৈজ্ঞানিকের ব্রহ্মাস্ত্র logic। সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া উহাকে বশে রাখা চলিবে না। জড় জগতে যে substance

বা বস্তুমত্তার আরোপ করা যায়, উহা তাহার resistance-এরই ছায়া মাত্র—resistance-এর ভূত মাত্র। সেই substance মনোবিজ্ঞানের নিকট যতই সত্য পদার্থ হউক, জড় বিজ্ঞানের নিকট—Physical science-এর এলাকায় তাহার ভূত নামাইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

এই উপলক্ষ্যে আর একটা দৃষ্টান্ত দিব। দৃষ্টান্তটা বাল্যকালে আচার্য ক্লিফোর্ডের নিকট পাইয়াছিলাম এবং তদবধি আমার মনের মধ্যে কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে। এখন উহা আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সরলরেখা ও বক্ররেখার কথা আগে বলিয়াছি। সরলরেখা সর্বত্র সমাকার, উহার কোথাও কোনও চিহ্ন নাই। বক্ররেখা বিষমাকার, উহার বক্রতা সর্ব্বত্র সমান না হইতেও পারে। ইউক্লিড যে সরলরেখা এবং বক্ররেখার কথা বলেন, সেই সরলরেখা ও বক্র রেখার কথা বলিতেছি। উহাদের কোনওরূপ বস্তু বা substance আছে, এরূপ কেহ বলিবেন না। তারপর মনে করুন, একটি ক্ষুদ্র জন্তু। ছোট্ট এক টুকরা সরলরেখায় এই জন্তুর দেহটি নির্মিত। মনে করুন, জন্তুটি বুদ্ধিজীবী। উহার দেহে কোনও বস্তু নাই বটে, কিন্তু উহার অনুভবক্ষমতা আছে, ইচ্ছেক্ষমতা আছে; ইচ্ছামতো দেহটিকে সে বাঁকাইতে পারে এবং তজ্জন্য প্রয়াস—effort অনুভব করিতে পারে। এই জন্তুটি যখন সরলরেখা ধরিয়া চলিবে, তখন তাহার দেহ বাঁকাইবার কোনও প্রয়োজন হইবে না; সরল পথে চলিতে কোথাও কোনও প্রয়াস বোধ হইবে না, কোথাও কোনও বাধা বা resistance অনুভব করিবে না। কিন্তু তাহাকে যদি বক্ররেখা ধরিতে চলিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পথের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে বক্রতাভেদে ভিন্ন-ভিন্নরূপ প্রয়াস বোধ, ভিন্ন-ভিন্নরূপ resistance বোধ নিশ্চয় জন্মিবে। ওই বক্র রেখাটি তাহার বাহ্য জগৎ। সেই বাহ্য জগতে সে বিচরণ করে এবং তাহাতে চলিতে ফিরিতে বাধা অনুভব করে। ওই রেখাকৃতি জগৎ আমাদের নিকট কেবল রেখা মাত্র,—বস্তুহীন রেখা মাত্র। কিন্তু সে যখন ওই জগতে চলিতে ফিরিতে পদে-পদে বাধা অনুভব করে, তখন সেই জগৎকে বস্তুময় ভাবে দেখা তাহার পক্ষে অসঙ্গত হইবে না। আমাদের অবস্থাও কতকটা সেই জন্তুর মতো নয় কি? আমরা আমাদের বাহ্য জগতে বিচরণ করি। এই বিচরণ ব্যাপারটা কেবল বাধা এবং বিরোধের অনুভূতি মাত্র। এই অনুভব ক্ষমতাটুকু না থাকিলে বাহ্য জগতে বস্তু-কল্পনার অবসর কোথায় থাকিত? বাহ্য জগতে যে বস্তু-কল্পনা, তাহা সেই বিরোধ-অনুভূতিরই নামান্তর মাত্র। এই বিরোধানুভব প্রত্যক্ষ ঘটনা, অতএব সত্য পদার্থ। সেই সত্য ঘটনাকে যদি নিতান্তই conceptual ভাষায় ব্যক্ত করিতে হয়, তবে তজ্জন্য কোনও substance-এর ভূত নামানো নিতান্তই অনাবশ্যক। আকাশকে কেবল মাত্র তাহার geometrical properties দিয়া ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া না চলিবে কেন?

এই আকাশ পদার্থকে আর একটুকু চাপিয়া ধরিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই আকাশে আমরা বিচরণ করি এবং পদে-পদে বাধা পাই। বিচরণ কর্মটাই একটা বিরোধের অনুভূতি। এই যে বাধা আর বিরোধ, তাহা সর্বত্র সমান নহে। উপরে যে জন্তুটির উল্লেখ করিয়াছি, সে যে রেখাপথে বিচরণ করে, সে রেখাপথের dimension একটা মাত্র। সে রেখাপথের দৈর্ঘ্য আছে; কিন্তু বিস্তার নাই বা স্থূলত্ব নাই। আর আমরা যে দেশে বা আকাশে বিচরণ

করি, উহার তিনটা dimension। এই তিনটা dimension-এর মানে কী? উহার মানে এই—অধ হইতে উর্ধ্বে, বামে হইতে ডাইনে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে কিছু দূরে চলিয়া, আমরা আকাশের এক স্থান হইতে অন্য যে-কোনও স্থানে যাইতে পারি। এই তিন দিকে বিচরণেই প্রয়াস বোধহয়, কিন্তু সে প্রয়াস একজাতীয় নহে। এ-ঘর হইতে ও-ঘর যাওয়ার প্রয়াস, আর নীচের তলা হইতে উপর তলা যাওয়ার প্রয়াস যে একজাতীয় প্রয়াস নহে, তাহা আপনাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না; বিশেষত আমাদের কলেজের চৌতলার সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আপানারা যখন অভ্যস্ত। বামে হইতে ডাইনে চলার প্রয়াস আর পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে চলার প্রয়াসও যে একজাতীয় প্রয়াস নহে, তাহাও আপনারা জানেন; বিশেষত ঝড়ের সময়। এই তিন প্রকার প্রয়াসের সমষ্টি হইতে আমাদের দেশ-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়: এবং মূলে তাহা হইতেই শেষ পর্যন্ত আকাশের তিন dimension ধরিয়া লইয়াছি। আমরা যাহাকে দেশ বলি বা আকাশ বলি, প্রত্যক্ষ তাহা এই তিনজাতীয় প্রয়াসের সমষ্টি-বুদ্ধি মাত্র। এই তিনজাতীয় অনুভূতি লইয়া আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ আকাশকে গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ আকাশ বলিতেছি, তাহার একটু মানে আছে। এই প্রত্যক্ষ আকাশই আমাদের real আকাশ, আমাদের perceptual আকাশ। ইহা বিজ্ঞান-বিদ্যার আকাশ নহে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। ইহাকে কিছুতেই অসীম বলা যাইতে পারে না। সে প্রদেশটুকুর মধ্যে আমরা বিচরণ করি, এবং বিচরণ করিতে-করিতে পদে-পদে বাধা পাই, কখনও দেওয়ালে মাথা ঠুকি, কখনো বা পিছলিয়া আহত হই, কখনও ট্রামগাড়ি চাপা পড়ি, সেই সংকীর্ণ প্রদেশমধ্যে এই আকাশ নিবদ্ধ। যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষের সীমা, এই আকাশেরও সীমা সেইখানে। যত বয়স বাড়িয়াছে, ততই ইহার সীমা বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমশ বাড়িতেছে। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ সীমার বাহিরে বৃহত্তর আকাশ আছে কি না, প্রত্যক্ষ তাহা বলে না। আমরা বয়স্ক মানুষ ওই বৃহত্তর আকাশ কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু সূতিকাগারের শিশু তাহা করে না। শিশুর হাতের খেলনা পড়িয়া অদৃশ্য হইলে উহা তাহার পক্ষে লুপ্তই হয়। কতকগুলা প্রত্যক্ষ অনুভূতি, actual sensations লইয়া এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ আকাশ আমরা গড়িয়া লইয়াছি। এ সমুদয় sensation-ই mussscular sensation। রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি এ বিষয়ে কোনও সাহায্য করে না বলিলেই হয়। মুখ্যভাবে তো করে না, তবে গৌণভাবে করিতে পারে। আপনারা হয়তো চমকিয়া উঠিবেন; বলিবেন, সে কি? দর্শনেন্দ্রিয় যে চোখ, তাহাতে কি আমাদের দেশবুদ্ধি জন্মে না? চমকাইবেন না। খাঁটি দর্শনেন্দ্রিয় যে রূপের জ্ঞান দেয়, সে কেবল বর্ণজ্ঞান—শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল পীতাদি বর্ণজ্ঞান। এই বর্ণজ্ঞানে দেশবুদ্ধি জন্মায় না। আমাদের চোখ দুইটা যদি কোটরের মধ্যে ঘুরিতে ফিরিতে না পারিত, চোখ দুইটা লইয়া মাতা যদি ঘাড়ের উপর ঘুরিতে ফিরিতে না পারিত; এবং মাথা সমেত সমস্ত দেহটা যদি এখানে ওখানে চলিতে না পারিত, এবং এই ঘোরাফেরা বিচরণকর্মে যদি muscular effort না হইত, তাহা হইলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় আমাদের দেশবুদ্ধিতে কোন আনুকূল্যই করিত না। ফলে এই যে দেশবুদ্ধি, তাহার পৌনে ষোলো আনাই—হয়তো ষোলো আনাই muscular effort-এর বুদ্ধি; এবং এই muscular effort-এর অনুভূতি যে সংকীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যে আবদ্ধ, সেইটুকুই

আমাদের real space, perceptual space—প্রত্যক্ষ আকাশ। চাক্ষুষ অনুভূতি এই প্রত্যক্ষ আকাশকে স্পষ্টতর করিতে পারে, কিন্তু তাহা গৌণভাবে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ নিতান্ত সংকীর্ণ এবং অত্যন্ত বিষমাকার; উহার সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ ভিন্নরূপ, উর্ধ্ব হইতে অধ ভিন্নরূপ, দক্ষিণ হইতে বামদেশ ভিন্নরূপ। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ সীমা সরিয়া যাইতেছে এবং এই প্রত্যক্ষ আকাশের সীমা আমরা বাড়াইয়া লইতেছি। আমি একমাত্র চেতন জীব নহি। আপনারাও মদ্বিধ চেতন জীব। আমারও যেমন সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, বিষমাকৃতি, প্রত্যক্ষ আকাশ আছে, আপনাদেরও প্রত্যেকের সেইরূপ সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ একটা-না-একটা প্রত্যক্ষ আকাশ আছে। আমার আকাশ হইতে আপনার আকাশ অনেকাংশে পৃথক। উভয়ের সীমানা এক নহে। স্থানে-স্থানে overlap করে মাত্র। এই রিপন কলেজচিহ্নিত আকাশটুকু উভয়ের পক্ষে সাধারণ, কিন্তু তৎপর তাহার বাহিরে গিয়া উভয়ের মধ্যে প্রভেদ। আপনার প্রত্যক্ষ সমগ্র আকাশের আপনি যে বিরবণ দিবেন, আমার প্রত্যক্ষ সমগ্র আকাশের আমি সে বিবরণ দিব না। উভয়ের বিবরণ কিয়দংশে মিলিবে, সকল অংশে মিলিবে না। কিয়দংশে মেলে; এবং যে অংশে মেলে, সেই অংশমধ্যে উভয়ের নিঃসংকোচে কারবার চলে। কারবারে ঠকিতে হয় না। বাহিরের অংশের বিবরণ ঠিক মিলিবে কি না, আমি তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে দেখিতে পাই, অনেক সময় মিলিয়া থাকে। আমি কাশী যাই নাই; কাশী-চিহ্নিত আকাশ, উহা আমার প্রত্যক্ষ আকাশের অন্তর্গত ছিল না। আপনার প্রত্যক্ষ আকাশের অন্তর্গত ছিল। আপনার মুখে তাহার বিবরণ পাইয়াছিলাম। কাশী প্রাপ্তির পর কাশী যখন আমারর প্রত্যক্ষ-সীমায় আসিল, তখন দেখিলাম, আপনার বিবরণের সহিত আমার প্রত্যক্ষের মিল আছে। গোড়ায় ইহা মানিয়া লইলেও আমাকে ঠকিতে হইত না। আমি বিলাত যাই নাই; এ বয়সে যাইবার সম্ভাবনাও নাই। আপনি বিলাতের যে বিবরণ দেন, তাহাও আমি মানিয়া লই। মনে করি, যদি কখনো যাই, আপনার দত্ত বিবরণ অনুযায়ী বিলাত প্রত্যক্ষ করিব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথা বলিতেছি না, muscular effort-এর দ্বারা প্রত্যক্ষের কথা বলিতেছি। আপনি আপনার muscular effort অনুসারে বিলাতকে যেখানে রাখিয়াছেন, আমিও আমার muscular effort অনুসারে বিলাতকে সেইখানে ফেলিব। বিলাত যাত্রার অনুভূতি আপনার পক্ষে actural sensation, আমার পক্ষে possible sensation। এই possible sensation-গুলিতেও বিশ্বাস করিয়া আমি জীবনযাত্রা চালাই। মোটের উপর আমাকে ঠকিতে হয় না। যে সংকীর্ণ আকাশটুকু আমার প্রত্যক্ষ, তাহা আমার actual অনুভূতিতে নির্মিত। তাহাকে ঘেরিয়া তাহার বহির্দেশে আর খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ; বহির্ভূত, অস্পষ্ট আকাশ আমি রাখিয়া দিয়াছি, যাহা possible অনুভূতির সমষ্টি। এক্ষণে উহা possible, কিন্তু কালে উহা actual হইতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং এই বিশ্বাসেই জীবনযাত্রা চালাইতেছি। তাহাতে মোটামুটি আমাকে ঠকিতে হয় নাই। এইরূপেই আমরা কলম্বস ও মঙ্গোপার্ক, স্টানলি ও নানসেন প্রভৃতি ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত হইতে পৃথিবীর বৃত্তান্ত খাড়া করিয়াছি। ভ্রমণকারীর muscular effort হইতে ভূগোলের কোন স্থান কত দূরে আছে, তাহা শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হইয়াছে। শুধু ভূগোলবৃত্তান্ত কেন, চন্দ্র-সূর্য-তারা-মণ্ডিত খগোলের বৃত্তান্তও আমরা এইরূপ ভ্রমণকারীর muscular effort হইতেই খাড়া

করিয়াছি। চমকাইবেন না। চন্দ্র সূর্যে ভ্রমণ জন্য আর ব্যোমযান আজিও তৈয়ার হয় নাই। কিন্তু পৃথিবীতে ভ্রমণকালেই আমরা ওই সকল খেচর দ্রব্যের দূরত্ব নির্দেশ, স্থান নির্দেশ করি। পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া যদি ওই সকল খগোলবিহারী দ্রব্যের কোনও parallax না পাইতাম, তাহা হইলে উহারা খগোল হইতে নামিয়া আসিয়া আমাদের বুকের উপর চাপিয়া পড়িত; উহাদিগকে দূরে স্বস্থানে রাখিতে পারিতাম না,—ইহা জ্যোতিষবিদ্যার ব্যবসায়ীরা জানেন। এই ভূগোল-চিহ্নে বা খগোল-চিহ্নে চিহ্নিত আকাশের কিয়দংশ মাত্র আমার প্রত্যক্ষ। উহা অতি সংকীর্ণ, অথচ অনেকটা স্পষ্ট। এই সংকীর্ণ অংশের বাহিরে খানিকটা কল্পিত অংশ আছে, তাহা এখনও প্রত্যক্ষ হয় নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ হইলে কেমন দেখাইবে, তাহার একটা অস্পষ্ট ছবি আমার মনে আছে। এইরূপে আমার প্রত্যক্ষ আকাশে খানিকটা কল্পিত আকাশ যোগ করিয়া আমি আমার সমগ্র আকাশ তৈয়ার করিয়া লইয়াছি। সেই আকাশের একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সীমা আছে। তবে সেই সীমারেখা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে—ক্রমেই পরিসর পাইতেছে। স্থায়ী সীমারেখা আমি টানিতে পারি না। আজ যেখানে টানি, কাল সেখান হইতে সরিয়া যায়। মন ক্রমশ ক্লান্ত হইয়া আসে, সীমা টানিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। শেষে পণ ধরিয়া বসি, আর আমি উহার সীমা টানিব না। মনে করিয়া লইব—উহার সীমা নাই। বস্তুত এই আকাশ সর্বদাই সীমাবদ্ধ। উহাকে যে অসীম মনে করি, উহাতে আমার মনের ক্লান্তিরই পরিচয় হয়। যে আকাশকে অসীম বলি, যাহার অসীমত্বের মহিমা কীর্তনে আমরা বাগ্মিতার ফোয়ারা ছোটাই, উহার প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব কোথাও নাই। আমার কাছেও নাই, আপনাদের কাছেও নাই। উহার পৌনে ষোলো আনাই আমার মনগড়া। এই অসীম আকাশ আমার সৃষ্ট। এই সৃষ্টকর্মে আমার ক্ষমতার পরিচয় আছে; আমি বলি যে, অক্ষমতার পরিচয় আছে। আমার প্রত্যক্ষের উপর আপনাদের প্রত্যক্ষ চাপাইয়া, পৃথিবীর দেড় শত কোটি লোকের প্রত্যক্ষ সমষ্টীকৃত করিয়া, এবং এই সমষ্টির উপরে যাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই বা হইবে না, সেই অত্যন্ত অস্পষ্ট অন্ধকার দেশ চড়াইয়া আমরা আমাদের এই আকাশ নির্মাণ করিয়া লইয়াছি; এবং নির্মাণকার্যে মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া উহাকে অসীম বলিয়া দিয়াছি, এবং তৎপরে এই অসীম আকাশকে বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। বিজ্ঞান-বিদ্যা এই অসীম আকাশের আলোচনা করিতেছেন, আর কবি তাহার মাহাত্ম্য গান করিতেছেন। এই অসীম আকাশের কিয়দংশ আমাদের প্রত্যক্ষ, ওইটুকু স্পষ্ট, আর বহু অংশ অস্পষ্ট বা একেবারে অন্ধকার। এই অসীম আকাশ একটা কাল্পনিক পদার্থ, একটা মনগড়া পদার্থ, একট conceptual পদার্থ, উহা প্রত্যক্ষের বহির্ভূত। বিজ্ঞান-বিদ্যা উহার আলোচনা করেন। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনার জন্য আমরা উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। কেন না, বিজ্ঞান-বিদ্যা প্রত্যক্ষ লইয়া কারবার করেন না। তাঁহার আলোচনা conceptual পদার্থের সহিত।

যে সংকীর্ণ আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ, অতএব সেই অর্থে সত্য পদার্থ, তাহাকে কখনওই সমাকার, homogeneous আকাশ বলা চলিবে না। উহার ডান দিক বাম দিকের সমান নহে, উর্ধ্ব অধের সমান নহে, সম্মুখ পশ্চাতের সমান নহে। এক-এক দিক এক-এক মত। এক-এক দিকে বিচরণে প্রয়াস-বোধ যখন ভিন্নরূপ, তখন এই আকাশের ভিন্ন-

ভিন্ন দিক ভিন্ন-ভিন্ন রূপ বলিতেই হইবে। যে-কোনও একটা দিক পছন্দ করিয়া একমুখে চলিতে গেলেও যখন অনুভূতি স্থানে-স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ হয়, কোথাও কাঠিন্য, কোথাও তারল্য অনুভূত হয়, কোথাও বা কাঠিন্য-তারল্য পর্যন্ত অনুভূত হয় না, তখন উহাকে বিষমাকার বলিতেই হইবে। প্রত্যক্ষের ভাষায় এই অনুভূতি সর্বত্রই প্রয়াসের অনুভূতি, বাধার অনুভূতি, বিরোধের অনুভূতি। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি মুখ্যত এ বিষয়ে কোনও সাহায্য করে না। তবে ওই প্রয়াস অনুভূতির সহিত association-এর দ্বারা গৌণত সাহায্য করে বটে। আমরা মাঝারি মানুষ, প্রত্যক্ষ লইয়া কারবার করি; প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভাষা ব্যবহার করিতে চাই। আমরা এই অনুভূতিকে বলি বাধা, বিরোধ, প্রয়াস, resistance। ইহাকে যদি substance বলিতে হয়, বলো—ক্ষতি নাই। Substance কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলে, ওই প্রয়াসের অনুভূতির বা বিরোধের অনুভূতির অতিরিক্ত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞান-বিদ্যা কিন্তু মাঝারি মানুষের ভাষা যথাসাধ্য বর্জন করিবেন। তিনি সাবধানে প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে বর্জন করিয়া চলিবেন। কেন চলিবেন, তাহা পুনঃপুন বলিয়াছি। তাঁহাকে conceptual language ব্যবহার করিতে হইবে। নিতান্তই তিনি যদি বলেন—এখানে কঠিন দ্রব্য, ওখানে তরল দ্রব্য, এখানে কোমল দ্রব্য, ওখানে বন্ধুর দ্রব্য; তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে—সর্বসাধারণে কঠিন, তরল, কোমল, বন্ধুর বলিতে যাহা বুঝে, বিজ্ঞান-বিদ্যা তাহা বুঝে না। সর্বসাধারণের নিকট ওই সকল বিশেষণ এক-একটা অনুভূতির নাম মাত্র; কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যায় উহাদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। কী অর্থ, তাহা বিজ্ঞানের পুঁথিতে পাইবেন। অথবা তিনি বলিতে পারেন—অণু, পরমাণু electron; কিন্তু তাঁহার নিকট অণু, পরমাণু, electron কেবল কতকগুলি concept মাত্র, নাম মাত্র, সংজ্ঞা মাত্র। উহার কোনওটার ভিতরে কোনও বস্তু নাই। উহার কোনওটা কাহাকেও কোনওরূপে ক্লেশ দেয় না। বাধা অনুভবের জন্য কোনও চেতন জীব জগতে বিদ্যমান না থাকিলেও, ওই সকল বস্তুহীন অণু পরমাণু ইলেকট্রন বিজ্ঞান-বিদ্যার কল্পনায় বর্তমান থাকিত। তাহাদের বর্ণহীন, স্বাদহীন, শব্দহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন এবং বস্তুহীন কাল্পনিক অস্তিত্ব লইয়া কাল্পনিক আকাশ জুড়িয়া থাকিত। যে কাল্পনিক আকাশে বৈজ্ঞানিক ওই সকল বস্তুহীন দ্রব্য ছড়াইয়া ও ছুটাইয়া দিয়াছেন, উহা প্রত্যক্ষ আকাশ নহে; উহা কাল্পনিক, বাঙ্ময়, conceptual আকাশ। প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ, বিষমাকৃতি; অনুভূতিভেদে উহার বৈষম্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের আকাশ conceptual কাল্পনিক;—বৈজ্ঞানিক যথেচ্ছভাবে উহার কল্পনা করিতে পারেন; যাহাতে তাঁহার কাজ চলে, যাহাতে তাঁহার গণনার সুবিধা হয়, যাহাতে তাঁহার furmula গড়িবার সুবিধা হয়, সেইরূপে তাহার কল্পনা করিতে পারেন। সেইরূপ কল্পনা তাঁহার ইচ্ছাধীন; যেরূপ কল্পনায় তাঁহার ভালো কাজ চলিবে, তিনি সেইরূপ করিবেন। সেই কল্পিত আকাশকে অসীম, সমাকার homogeneous কল্পনা করিয়া, উহাতে অণু পরমাণু ইলেকট্রন বসাইয়া, উহাকে বিষমাকৃতি প্রদান করিতে পারেন এবং সম্প্রতি তাহাই করিতেছেন। সুবিধা বুঝিলে তিনি বস্কোবিচের point অথবা ফেরাডের কল্পিত line বসাইয়া উহাকে বিষমাকার করিতে পারেন। অথবা ইচ্ছা করিলে ও সুবিধা বুঝিলে তিনি ওই আকাশকে সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ মনে করিতেও পারেন; উহার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন বক্রতা

আরোপ করিতেও পারেন; এবং ওই বক্রতাভেদে এবং ওই বক্রতার তারতম্যে উহাকে বিষমাকৃতি দিতে পারেন। এ সমুদয় তাঁহার ইচ্ছাধীন; এ বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ। তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রভু। তিনি আপনার উদ্দেশ্য বুঝিয়া সৃষ্টি করিবেন এবং আপনার সৃষ্টিমধ্যে আপনার ব্যবস্থা করিবেন;—তাঁহার প্রভুত্বে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও কোনও অধিকার নাই।

Real Space এবং Conceptual Space—জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আকাশ এবং বৈজ্ঞানিকের কাল্পনিক আকাশ—এই উভয় আকাশকে পৃথকভাবে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ইহা না বুঝিলে perception of space সম্বন্ধে যত কিছু থিয়োরি, সকল থিয়োরিতেই গণ্ডগোল থাকিবে। আমার যতটুকু বিদ্যা, তাহাতে বোধহয়, Ernest Mach-এর পর হইতে বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যে এই প্রভেদটা স্পষ্ট হইয়াছে। Real space—প্রত্যক্ষ আকাশ সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, উহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়াসের অনুভূতি হইতে—muscular effort হইতে উহা গড়িয়া লইয়াছে। এই muscular effort-এর প্রকার ভেদেই আমরা বলি, এটা ডাইনে বা বামে, সম্মুখে বা পশ্চাতে, নিকটে বা দূরে, এক হাত দূরে বা এক ক্রোশ দূরে। এই প্রত্যক্ষ আকাশ কাজেই স্বভাবত বিষমাকৃতি; কেন না, আমাদের অনুভূতি পরম্পরাই বিষমরূপ। এই প্রত্যক্ষ আকাশ প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, এবং প্রত্যেকের অনুভূতির পরিসর অনুসারে, প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার পরিসর অনুসারে ক্রমশ প্রত্যেকের পক্ষেই প্রসরণশীল। প্রত্যেকের বয়স অনুসারে ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি সহকারে উহা ক্রমেই প্রসার পাইতেছে। কিন্তু প্রসার পাইলেও কোনও কালেই সীমাহীন হয় না। বিজ্ঞান-বিদ্যা ছত্রিশ কোটি মাঝারি মানুষের প্রত্যক্ষ আকাশের বিবরণ দিতে গিয়া একটা মাঝারি আকাশের—Mean Space-এর সৃষ্টি করিতে বাধ্য হন; ছত্রিশ কোটি লোকের অনুভূতির সম্মিলন সাধন করিতে না পারিয়া সকলের অনুভূতিকেই বর্জন করিতে বাধ্য হন; এবং অবশেষে কোনও লক্ষণই দিতে না পারিয়া সর্বলক্ষণ-বর্জিত করিতে বাধ্য হন। কোনও স্থানে সীমা টানিবার অবসর না পাইয়া একবারে অসীম করিয়া ফেলেন। এইরূপেই বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সমাকার বা homogeneous সীমাহীন আকাশের সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ তিনি সমাকার আকাশের বিবরণ দিতে না পারিযা, নানারূপ conceptual চিহ্ন অর্পণ করিয়া উহাকে বিষমাকৃতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সকল চিহ্ন অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, particle, corpuscle প্রভৃতি ছোট-বড় জড় খণ্ড। চন্দ্র-সূর্যাদিও তাহাই। সাধারণের নিকট চন্দ্র সূর্য যে পদার্থ, বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট চন্দ্র সূর্য সেরূপ পদার্থ নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যায় সূর্যে আলো নাই, কোনও উত্তাপ নাই, কোনও resistance নাই, কোনও substance নাই; উহার আছে কেবল volume আর shape, আর inertia; আর আছে উহার ভিতরে অণু, পরমাণু, ইলেকট্রনের ছোটাছোটি। বিজ্ঞান-বিদ্যা এইরূপে সমাকার আকাশে বিষমাকৃতি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিতেছেন; কিন্তু এরূপ না করিলেও চলিতে পারিত। আধুনিক জ্যামিতির এবং আধুনিক তাড়িতবিদ্যার উৎপত্তি হইতে দেখা যাইতেছে। বৈজ্ঞানিক আকাশকে সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ আকাশ মনে করিয়া উহার মধ্যে বক্রতাভেদে কল্পনা দ্বারা অথবা উহার মধ্যে নানাবিধ বিশিষ্ট লক্ষণ, বিশিষ্ট বিন্দু বা বিশিষ্ট রেখার সন্নিবেশে বিষমাকৃতি অর্পণ করিতে

পারিবেন। অতএব বৈজ্ঞানিকের conceptual space একবিধ হইতে হইবে, এমন কোনও হেতু নাই। উহা নানাবিধ হইতে পারে। যেমন করিলে ভালো কাজ চলিবে, সেইরূপই হইতে পারে।

এইবার থামিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের জড়জগৎ বাহ্যজগৎ, ইহা স্বীকার্য; ইহা প্রথম postulate। যখনই বহু জীবের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছি, তখনই সেই বাহ্য জগৎ মানিয়া লইয়াছি। এই বাহ্যতা যে মূর্তি লইয়া আমাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হয়, উহাই প্রত্যক্ষ আকাশ। ওই প্রত্যক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার। আমাদের প্রত্যেকের অনুভূতি হইতে আমরা প্রত্যেকে উহা নিজের মতো করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। এই যে অনুভূতি, ইহা resistance-এর অনুভূতি। বিজ্ঞান-বিদ্যা প্রত্যক্ষ আকাশ লইয়া কারবার করিতে পারেন না। এই সকল প্রত্যক্ষ আকাশের সাধারণ অংশ অবলম্বন করিয়া তিনি একটা মনগড়া আকাশ তৈয়ার করেন। এই মনগড়া আকাশ কাল্পনিক conceptual আকাশ। ইউক্লিড ইহাকে অসীম ও সমাকার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিউটন ও তাঁহার অনুবর্তীরা সেই অসীম সমাকার আকাশ মানিয়া লইয়া, তাহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য তন্মধ্যে নানা চিহ্ন প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রক্ষিপ্ত বস্তুর নাম দিয়েছিলেন, জড়দ্রব্য। যে অঙ্কে প্রত্যেক জড়দ্রব্য চিহ্নিত হইয়াছিল, তাহা তাহার inertia। এই inertia একটা concept মাত্র; ইহা কোনও বস্তু নহে, ইহার কোনও resistance নাই। কেন না, resistance-এর নামান্তরই বস্তুমত্তা। উহা চেতন জীবের অনুভূত সত্য পদার্থ; বৈজ্ঞানিকের কল্পিত নহে। এইরূপে চিহ্নিত, অসীম এবং সমাকাররূপে কল্পিত আকাশ লইয়াই বর্তমানে বিজ্ঞান-বিদ্যার কাজ চলিতেছে। চলিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। অন্যরূপে চিহ্নিত সীমাবদ্ধ আকাশেও যে কাজ চলিতে না পারে, এমন নয়। কীরূপে চিহ্ন কল্পনা করিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার কল্পনা করিবেন। সে বিষয়ে তাঁহারা প্রভু। অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপে অধিকার নাই। আকাশ যেরূপেই কল্পিত হউক, উহা কাল্পনিক আকাশ, conceptual আকাশ হইবে। জ্যামিতিবিদ্যা উহার আলোচনা করিবে। আমাদের মতো মাঝারি মানুষের জীবনযাত্রায়, মোটা জীবনযাত্রায় সংকীর্ণ প্রত্যক্ষ আকাশই যথেষ্ট। সেই conceptual আকাশের তেমন প্রয়োজন নাই। এক কথা যদি বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য বাহ্য জগতের বিবরণ চাহেন, আমি বলিব—এই বাহ্যজগৎ আকাশ জুড়িয়া অবস্থিত। সেই আকাশে বিষমাকারে চিহ্নিত এবং সেই চিহ্নগুলি চলনশীল। অতএব সেই আকাশে থাকিল কেবল extension এবং motion। যাহাকে জড়জগৎ বলিতেছি, তাহা আকাশ জুড়িয়া আছে, অর্থাৎ তাহার extension আছে। এক-একটা জড়দ্রব্য এক-একটা conceptual বা কাল্পনিক চিহ্ন। আর সেই চিহ্নগুলি সেই আকাশমধ্যে হেলিয়া দুলিয়া, কাঁপিয়া, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাই হইল বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ—সমস্তটাই conceptual। প্রত্যেক concept-এর ভিত্তি অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই percept-এ পৌঁছোতে হয়। বৈজ্ঞানিকের এই conceptual জড় জগতের ভিত্তি কোথায়, ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি এইরূপে উত্তর দিব। যখনই আমি বহু জীব স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তখনই সেই বহু জীবের ব্যবহারার্থ যে ব্যবহারিক জগৎ, তাহাকে একটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অস্তিত্ব

দিয়াছি। মনে করিয়াছি, উহা কোনও জীবেরই অন্তরের জিনিস নহে, সকলেরই বাহ্য। চেতন জীবকে ছাড়িয়া উহার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি এবং সেই স্বতন্ত্রতাই বাহ্যতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই স্বতন্ত্রতাই বাহ্যতা, সেই স্বতন্ত্রতাই extension, সেই স্বতন্ত্রতাই আকাশ। অতএব আকাশের মূল বহুজীববাদ। জগতে একমাত্র জীব থাকিলে, সেই জীবের কোনও ব্যবহার থাকিত না। তাহাকে কাহারও সহিত কোনওরূপ ব্যবহার করিতে হইত না। তাহার পক্ষে কোনও ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব আবশ্যক হইত না। তাহার পক্ষে কোন আকাশ থাকিত না এবং আকাশব্যাপী কোনও বাহ্য জগৎও থাকিত না। এই কথাটুকু যদি আমি বুঝাইতে না পারিয়া থাকি, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। যেখানেই বহু জীব এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার, সেইখানেই ব্যবহারিক জগৎ এবং সেই ব্যাবহারিক জগৎ যখন তাহাদের সাধারণের জগৎ, যখন কাহারও উহা নিজস্ব নহে, তখন জগৎ। এই স্বতন্ত্রটাই বাহ্যতা। আবার বলি, ইহাই উহার স্বতন্ত্র extension। যিনি একজীববাদী, যিনি বহু জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহার নিকট এই ব্যাবহারিক জগতের অস্তিত্ব নাই। তাঁহার নিকট বাহ্য জগৎও অস্তিত্বহীন। তাঁহার জগৎটা সমস্তই প্রাতিভাসিক—সমস্তটাই আন্তরিক এবং নিজস্ব। যখনই তিনি নিজেকে ছাড়িয়া অতিরিক্ত অপর জীবের কল্পনা করিবেন এবং তাহার সহিত আদানপ্রদান ব্যবহার করিতে যাইবেন, তখনই এই নিজস্ব প্রাতিভাসিকের কিয়দংশে আপনার স্বত্বস্বামিত্ব ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য অর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন। তখনই সেই অংশকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অতএব এই বহু জীবের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার হইতেই বাহ্য জগতের সৃষ্টি। আবার এই ব্যবহার হইতেই বাহ্য জগতের বিষমাকৃতি। কেন না, এই যে ব্যবহার, তাহার নামান্তর বিরোধ। এই ব্যবহারটাই জীবনযাত্রা এবং জীবনযাত্রার নামান্তর বিরোধ। এই বিরোধের নানা মূর্তি এবং কাজেই বাহ্য জগতের বিষমাকৃতি। স্থূলভাবে দেখিলে ইহা অন্নের জন্য বিরোধ। যখনই আমি বহু জীব কল্পনা করিয়াছি, তখনই আমি বাহ্যজগৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই বাহ্য জগতের কিয়দংশ আমার হেয়, কিয়দংশ আমার উপাদেয়। এই উপাদেয় অংশকে আমি আত্মসাৎ করিতে চাই। আমিও যেমন আত্মসাৎ করিতে চাই, অন্যেও সেইরূপ আত্মসাৎ করিতে চায়। স্থূলত এই উপাদেয় অংশকে আমি অন্ন বলিতে চাহি এবং এই অন্নকে লাভ করিবার এবং আত্মসাৎ করিবার জন্য আমাদের যাবতীয় জীবনচেষ্টা। Biology বিদ্যায় যাহাকে life বলে বা প্রাণ বলে, এই অন্নের অন্বেষণেই তাহা প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রত্যেকে অন্নের অন্বেষণ করি এবং অন্নের জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি করি। যাহা উপাদেয়, তাহা পরিমিত। এই পরিমতি উপাদেয়কে আত্মসাৎ করিবার জন্য প্রত্যেক জীব লালায়িত এবং তাহার ফলে জীবে-জীবে বিরোধ। সমস্ত জীবনযাত্রাটাই বিরোধের ব্যাপার। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিরোধ ব্যাপার। বিরোধের নানা মূর্তি। বায়লোজি বা প্রাণবিদ্যা বিরোধের এই নানা মূর্তির আলোচনা করে। জীবনের যাবতীয় চেষ্টাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—আহারের চেষ্টা এবং প্রহারের চেষ্টা। অন্ন অন্বেষণ আহারের চেষ্টা এবং সেই অন্ন লইয়া কাড়াকাড়িতে প্রহারের চেষ্টা। এই উভয় চেষ্টা হইতেই আমাদের যাবতীয় কর্ম, আমাদের সমুদয় activity। ইহার পদে-

পদে প্রয়াস, বাধা, বিঘ্ন, বিরোধ—নানাবিধ বিরোধ। সমস্ত জীবন ধরিয়া সেই নানা বিরোধ আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করি। এই বিরোধের অনুভূতি ক্ষণে-ক্ষণে নূতন-নূতন মূর্তি গ্রহণ করে—নূতন বাধা, নূতন বিঘ্ন, নূতন বিরোধ উপস্থিত করে। এই বিরোধের অনুভূতি স্থূলত activity বা muscular effortরূপে অনুভূত হয় এবং প্রত্যক্ষ জগতে substance-এর কল্পনা আনয়ন করে এবং বাহ্য জগৎকে বিষমাকৃতি করিয়া দেয়। বিরোধ যে ক্ষণে-ক্ষণে নূতন মূর্তি গ্রহণ করে, অনুভূতির ধারায় যে চাঞ্চল্য, যে চপলতা, যে পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহাই conceptual জগতে movement-রূপে—গতিরূপে কল্পিত হয়। অতএব বাহ্য জগতের যে বাহ্যতা এবং সেই বাহ্যতামধ্যে যে চাঞ্চল্য, তাহা সমস্তই এই বহু জীবের পরস্পর আদানপ্রদান হইতে উৎপন্ন। সমস্ত extension এবং সমস্ত motion সেই বহুজীবতা হইতেই উৎপন্ন। বহু জীব হইতেই বাহ্য জগতের উৎপত্তি এবং বহু জীবের কর্ম হইতেই বাহ্য জগতে কল্পিত চাঞ্চল্যের উৎপত্তি। এইরূপে আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ বিরোধের অনুভূতি, সেই perceptual ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকের বাহ্য জগৎ, কাল্পনিক conceptual বাহ্যজগৎ,—বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচ্য বাহ্যজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাকে সৃষ্টি না বলিয়া বিসৃষ্টি, বিসর্গ বা বিসর্জন বলাই ভালো। জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চেতন জীবের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে যেন বাহিরে বিসর্জন করা হইয়াছে, ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা একান্তই অন্তরের জিনিস, তাহাকে নিতান্তই স্বতন্ত্র করিয়া শব্দরূপে, সংজ্ঞারূপে concept রূপে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই concept নিতান্তই মনগড়া পদার্থ, কল্পিত পদার্থ, সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টি করিয়া ইহাকে বাহিরে ছুড়িয়া ফেলাই ব্যাবহারিক জড় জগতের সৃষ্টি। concept-কে যদি শব্দ বলা যায়, উহার রূপ যদি বাঙ্ময় রূপ হয়, তাহা হইলে শব্দ হইতে বাহ্য জগতের সৃষ্টি এই অর্থে সত্য। বৈজ্ঞানিকের জড় জগতের মুখ্য লক্ষণ যে বাহ্যতা বা extension, যে বাহ্যতা বা extension আকাশরূপে আমাদের নিকট পরিচিত, আমাদের শাস্ত্রে সেই আকাশকে শব্দের প্রথম আকাশ বলা হয়, উহাও আমরা এই অর্থে গ্রহণ করিতে পারি। আমি বলিতে চাহি, এই যে ব্যাবহারিক জগৎ, এই যে বাহ্যজগৎ, এই যে জড়জগৎ, তাহা বহু জীবের অস্তিত্ব হইতেই কল্পিত। বহু জীবের মধ্যে আদানপ্রদান হইতেই উহার বিষমাকৃতি এবং সেই বিষমাকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্য। এই যে আদানপ্রদান, ইহা বিরোধাত্মক। এই বিরোধটাই প্রত্যক্ষ বাহ্য জগতে বস্তুরূপে, substance রূপে কল্পিত হয় এবং একটা substantial জগতের বিভীষিকা লইয়া আমাদের প্রাণের উপর চাপিয়া বসে। প্রাণই এই আদান-প্রদান এবং প্রাণই এই বিরোধ। প্রাণবিদ্যা বা Biology ইহার আলোচনা করে। এই প্রাণ পদার্থটাকে আর এতটুকু চাপিয়া না ধরিলে জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা সেই গোমুখীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। চলুন, আগামী বারে এই প্রাণের তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কারপরম্পরা বলা উচিত। কেন না, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নূতন-নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের মতো ধারা বাঁধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নূতন তত্ত্বের নির্ণয় হইয়াছে, আবার প্রত্যেক নির্ণীত তত্ত্ব এক-একটা আঁধার দেশ আলোপূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত অধিক আছে, তাহা নহে।

আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্তু সত্তর বৎসর পূর্বে যখন লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনস্টিটিউশনের) প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারপরম্পরা একের-পর-এক বাহির হইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল, সেই সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকটা মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভালো।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তড়িৎ ঊর্মির অস্তিত্ব ধরিবার জন্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তখন কথাটাতে বিশ্বাস হয় নাই। কেন না, বাঙালির মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহা তো একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহু পূর্বে অবধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে তড়িৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আর একটা ছোট বাক্সের ভিতর রক্ষিত লোহার তারের ওপর পতিত হইবামাত্র সেই তারে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং প্রবাহকালে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ পর্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!

বস্তুতই সে দিন বিজয়ের দিন বটে; কেন না, এত অল্প আয়াসে এত বড় দুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্বে শুনি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে জার্মান অধ্যাপক হার্জ তড়িৎ তরঙ্গের উৎপাদনের ও তড়িৎ তরঙ্গের অস্তিত্বের প্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত অল্প আয়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ যেখানে যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশিয় এক ব্যক্তি সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্তা।

সেই দিন হইতে নূতন-নূতন সংবাদ সহকারে ভারতবাসীর এই বিজয়বার্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, কিন্তু আনন্দপ্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্যের ও সবলতার প্রয়োজন, সেইটুকু বল ও স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নাই।

ঘটনা বৃহৎ, কিন্তু এই বৃহৎ ঘটনা কীরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা বুঝিতেছি না।

ধাতুদ্রব্য কাহাকে বলে, বুঝাইতে হইবে না; কোন জিনিস ধাতু নহে, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। ধাতু, যথা—সোনা, রূপা, তামা। ধাতু নহে—জল, বায়ু, ইট, কাঠ। কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার স্বরূপ ঠিক বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই হয়তো বুঝিবেন না। কিন্তু সে কথা বুঝাইবার এখন সময় নাই। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্তমান, এবং সূর্যমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে সংবাদবহন এই আকাশের নিরূপিত কার্য। সূর্যের ও নক্ষত্রের শরীরগত পরমাণুগুলি এই আকাশে যে ধাক্কা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন করিয়া আমাদের চোখে লাগে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই বলি আলো ও তাহার অভাবই আঁধার। এবং সেই আলোকের অনুভূতি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ওইখানে ওটা সূর্য, আর ওইখানে ওটা একটা তারকা। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত বেশি যে, সেই ঢেউগুলি প্রায় সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে আকাশ বাহিয়া চলিয়া থাকে।

আলোকের উৎপাদক শক্তি সেই আকাশের ঢেউ, কিন্তু তড়িৎ শক্তি ও চৌম্বক শক্তি নামে আরও দুইটা আমাদের অতিপরিচিত শক্তি আছে, সেই দুইটার সহিত আকাশের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, সত্তর বৎসর পূর্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। উপরে যে মনস্বী পুরুষ মাইকেল ফ্যারাডের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই আবিষ্কারপরম্পরা প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া দেয় যে, সেই আলোকবাহী আকাশপদার্থই তড়িৎ শক্তির ও চৌম্বক শক্তিরও আধার হইতে পারে।

তৎপরে মাক্সোয়েল, ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রায় প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশ মধ্যে কোনওরূপ টান পড়িলেই তড়িৎ শক্তির ও আকাশ মধ্যে কোনওরূপ ঘূর্ণি উৎপন্ন হইলেই চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও একখানা দস্তার থালা উপরি-উপরি স্পর্শ করিয়া দুইখানাকে বিচ্ছিন্ন করিলেই, উভয়ের মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টান পড়ে; তখন আমরা বলি, থালা দু-খানা তড়িৎযুক্ত হইয়াছে। এই টানটা বায়ুর মধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর ন্যায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যস্থ আকাশেই পড়ে; ধাতুদ্রব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান সংক্রান্ত হয় না। ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাবর্জিত; যেন উহা টান সহিতে পারে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন টানসহ। অধাতব পদার্থের আকাশ যে রবারের মতো বা ইস্পাতের মতো, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মতো বা কাদার মতো। ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশে এই টান দিলে সেই আকাশ যেন মোমের মতো বা কাদার কত বা গুড়ের মতো বা জলের মতো সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায়, উহাতে টান পড়ে না; এইরূপে উহাতে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে টান দিলে উহা রবারের মতো বা স্প্রিং-এর মতো খেঁচিয়া ধরে; উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে না।

ধাতুপদার্থের উদাহরণ একটা তামার তাব। এই তারের ভিতর আকাশে টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায় ও এইরূপে উহার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ জন্মে। এই তড়িৎ প্রবাহেব সাহায্যে আমরা আজকাল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করি ও

টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম-পথে গাড়ি চালাই ও রাজপথে ও গৃহমধ্যে আলো জ্বালি।

তারপথে এই তড়িৎ প্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে বায়ুমধ্যস্থ আকাশে ঘূর্ণাবর্ত উপস্থিত হয়। সেইখানে একটা লোহার কাঁটা ধরিলে লোহার অণুগুলো সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাঁটাটাও ঘুরিয়া গিয়া সেই আবর্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই ব্যাপারের নাম চৌম্বক ব্যাপার, এবং সেই তদবস্থ লোহার কাঁটার নাম চুম্বকের কাঁটা বা কম্পাসের কাঁটা বা দিগদর্শন-শলাকা।

মাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের কোনও অংশে একটা টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছুক্ষণ দুলিবার সম্ভাবনা;—একটা স্প্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়ে দিলে উহা দুলিতে থাকে। এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই আন্দোলনের ধাক্কায় চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবার সম্ভাবনা। আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলিতে পারে, তবে এই তড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিও ঠিক সেই লক্ষ ক্রোশ বেগেই চলিবার সম্ভাবনা।

মাক্সোয়েল বলিয়াছিলেন, আকাশই যদি তড়িৎ শক্তির আধার হয়, তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের ঊর্মি চলিয়া থাকে, তবে বড়-বড় তড়িৎ ঊর্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তড়িৎ শক্তির আধার বটে কি না; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড়-বড ঢেউ উঠে কি না, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। আলোক বহন করে যে আকাশ, সেই আকাশই তড়িৎ শক্তির আধার না হইতেও পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আকাশ বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। এবং তড়িতের ঢেউ একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত নূতন ব্যাপার—কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক।

হাৎর্জ সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন; একটাতে তড়িৎ-তরঙ্গ উৎপাদন করিবে, আর একটাতে উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে একবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন জন্মিবে; দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া পৌঁছিলে সে কোনওরকমে সাড়া দিবে। আলোকের সঙ্গে তুলনা করো। প্রথমটা যেন দীপশিখা, সেই স্থলে আকাশে ধাক্কা লাগিয়া আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ, সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। মেঘের কোলে যখন বিদ্যুৎলতা চমক দেয়, তখন আকাশে সহসা ধাক্কা পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাক্কা লাগে। বিড়ালের গায়ে একটা চাপড় দিলেও যে আকাশে ধাক্কা না লাগে, এমন নহে।

হার্ৎজের বাহাদুরি এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির আবিষ্কারে—যে যন্ত্রটি তড়িৎ-তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মতো কাজ করে। দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তড়িৎ-তরঙ্গ আকাশ বহিয়া এই যন্ত্রে ধাক্কা দিলে সেই যন্ত্রমধ্যেও তড়িতের খেলা আরম্ভ হয়, এবং সেই তড়িতের খেলার বিবিধ

প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। তড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। আলো জ্বালা হইতে গাড়ি টানা পর্যন্ত তাহার উদাহরণ।

হার্ৎজ এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বাস্তবিকই আকাশের মধ্য দিয়া তড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। দূরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তড়িৎ প্রবাহ নাচাইয়া দিলে, সেই তড়িৎ নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দূরস্থিত আর একখানা ধাতুপৃষ্ঠে তড়িৎ প্রবাহ নাচাইয়া দেয় ও সেই নর্তনের প্রত্যক্ষ ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়। মাক্সোয়েল যাহা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, হাৎর্জ তাহা চর্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দিলেন।

তড়িৎ প্রবাহ ও তড়িৎ তরঙ্গ, এই দুইটি শব্দ পুনঃপুন ব্যবহার করিয়াছি ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, প্রবাহ ও তরঙ্গ, উভয়ের অর্থে তফাত আছে। প্রবাহের বশে পদার্থ এক মুখে চলে, যেমন—নদীতে স্রোতের জল। আর তরঙ্গের বশে গতি ইতস্তত ঘটে; নদীর তরঙ্গে তরণী উঠা-নামা করে ও দোদুল্যমান হয়। সেইরূপ তড়িতের প্রবাহে আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে—এই প্রবাহে টেলিগ্রাফের খবর চলে। আর তড়িতের তরঙ্গে আকাশ ইতস্তত দুলিতে থাকে; দোদুল্যমান হয়। ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ সংক্রামিত হইলে আকাশ একবার এধার যায়, একবার ওধার যায়। বর্তমান প্রবন্ধের সর্বত্র এই অর্থগত প্রভেদটি মনে রাখা আবশ্যক। তরঙ্গের সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ওপরে 'দোলন', 'আন্দোলন', 'নৃত্য', 'নর্তন', 'নাচ' প্রভৃতি স্পন্দনবোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে।

এখন দেখা গেল, আকাশমধ্যে ছোট বড় বিবিধ ঊর্মি উৎপন্ন হইয়া সেকেন্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। ছোট-ছোট ঢেউগুলির নাম আলোকতরঙ্গ, বড়-বড় ঢেউগুলির নাম তড়িৎ তরঙ্গ; ছোট-বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ। উপযুক্ত ঊর্মি নির্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল ঊর্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আকাশতরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাহার পক্ষে ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। উপযুক্ত ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের অভাবেই হাৎর্জের পূর্বে কেহ বড়-বড় আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

হার্ৎজের পরবর্তীকালে এই ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তড়িৎ প্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশতরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কী জানি, কীরূপে উহার তড়িৎ-প্রবাহ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। এই তড়িৎ প্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পারো বা আলো জ্বালিতে পারো বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পারো বা গাড়ি টানিতে পারো। এই লোহাচুরে ঊর্মিনির্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরেজিতে Coherer বলে।

ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক। নিরেট ধাতুপদার্থে তড়িৎ প্রবাহ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,—কিন্তু ধাতুচূর্ণে এই ফাঁক পার হইয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক লজ অনুমান করেন যে, আকাশ-তরঙ্গের প্রভাবে কোনও মতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি

পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তড়িৎ প্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগসাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer।

ধাতুর গুঁড়া না হইলেই যে Coherer প্রস্তুত হয় না, এমন নহে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের Coherer কতকগুলি তারে নির্মিত হইয়াছিল। তারে-তারে স্পর্শ থাকে, স্পর্শস্থলে তড়িৎ তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলেই তারের প্রবাহ পরিচালন শক্তি জন্মে।

ফলে যেরূপেই হউক, তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে অপরিচালক দ্রব্যে পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচালক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায়। Coherer অর্থাৎ উর্মিনির্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই।

মার্কনি যে উর্মিনির্দেশক যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন, তদ্বারা ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত তড়িৎ-তরঙ্গ অবলীলাক্রমে ধরা পড়িতেছে।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্তা প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়। মার্কনি এই কয় বৎসর মধ্যে বহু ক্রোশ দূর হইতে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র বহু দূর হইতে সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাঁহার বন্ধুগণ এই জন্য কতকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। জগদীশবাবু তাঁহার বন্ধুগণের নিকট অনুযোগভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সংবাদপ্রেরণের ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এ জন্য স্বদেশ কালে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত বটে, কিন্তু আজ আমরা যেসকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতেছি, সে আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইত।

যাহা হউক, তৎকালে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত উর্মিনির্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্রেণির বা তদুদ্দেশ্যে নির্মিত আর সকল যন্ত্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তড়িৎ-তরঙ্গের বিবিধ ধর্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন রহস্য উদঘাটন করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে,—আকাশবাহিত তড়িৎ-তরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোনও মৌলিক প্রভেদ বর্তমান নাই।

আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে। ধাতুপদার্থের মধ্যে আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ধাতুপদার্থ অনচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোকতরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে বা প্রতিফলিত বা পরাবর্তিত হয়।

সান্দ্র পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া যায়, অর্থাৎ আলোকরশ্মি তির্যক্‌গামী হইয়া তিরোবর্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই ধর্ম বর্তমান।

এই যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ-তরঙ্গের যেসকল অজ্ঞাতপূর্ব ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন পুরাণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তড়িৎ-তরঙ্গ একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর বহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে না; চুলের গোছার ভিতর চলে, ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে চলে না; কাষ্ঠদণ্ডের ভিতরে

আঁশগুলি কোন মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়; প্রস্তরখণ্ডের কোনদিকে পরিচালকতা বেশি, কোনদিকে কম, তাহা ঠিক ধরিয়া দেয়; ইত্যাদি তত্ত্ব চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে নূতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তড়িৎ-তরঙ্গের যে অভিনব ধর্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ধাতুচূর্ণ তড়িৎ প্রবাহের অপরিচালক, কিন্তু ধাতুচূর্ণের উপর তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলে উহার পরিচালকতা সহসা বৃদ্ধি পায়; তখন সেই ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তড়িৎ প্রবাহ চলিতে পারে। ইহা পুরাণ কথা, এবং ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক ঊর্মিনির্দেশক Coherer যন্ত্র সকল নির্মিত হইয়াছে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার স্বভাবে আনিতে হইলে একটা আঙুলের ঠোকা দেওয়া প্রয়োজন হয়; একবার নাড়িয়া দিলে তবে উহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার স্বাভাবিক অপরিচালকত্ব শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

দুই বৎসর হইল জগদীশচন্দ্র দেখান, এইরূপ নাড়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক নহে। এমন অনেক ধাতুদ্রব্য আছে, যাহাকে নাড়া না দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে ঘুরিয়া আইসে। একটা তারে একটা মোচড় দিলে প্রথমে পাক লাগে, কিন্তু তারটার পাক আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, কতকটা সেইরূপ।

ফলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে। স্থিতিস্থাপক তারকে মোচড়ানো দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্থাপকতাগুণে আপনা হইতেই সেই পাক খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু এই সীমার ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে, আর সে পাক আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক খুলিতে হয়।

ইস্পাতে ও সীসাতে এইখানে প্রভেদ; কুঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ইস্পাত ঘুরিয়া আসে। সীসাকে বাঁকাইয়া ধরিলে উহার আকুঞ্চন স্থায়ী হইয়া যায়।

ধাতুপদার্থের অণুগুলোতেও যেন এইরূপ একটা স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম আছে। তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া অণুগুলি স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও আপনার স্থিতিস্থাপতাগুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধাক্কাটা যদি অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর আপনা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন জোর করিয়া নাড়া দিয়া আঙুলের ঠেলা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এই জন্য coherer যন্ত্রে আঙুলের ঠোকর দেওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার আরও বিচিত্র। এ পর্যন্ত জানা ছিল যে, তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে ধাতুচূর্ণের তড়িৎ প্রবাহ পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান, কতিপয় ধাতুর পরিচালনক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু অনেক ধাতুর পরিচালনক্ষমতা আবার কমিয়া যায়। এইরূপে "সোনা রূপা আদি করি যত ধাতু আছে", সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, ধাতুগুলিকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে; কাহারও পরিচালনশক্তি তড়িৎ-তরঙ্গ-সংক্ষোভে বাড়িয়া যায়; কাহারও বা কমিয়া যায়। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব; ইউরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত

তরঙ্গের সহিত পরিচালনশক্তির এই সম্বন্ধ কেবল ধাতুবিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপদার্থ মাত্রেই—কেবল ধাতুপদার্থ কেন—ধাতু, অপধাতু বা অধাতু—সকল পদার্থেই অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্তমান আছে, তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ধর্মের আবিষ্কার হইল বলা যাইতে পারে। মাইকেল ফ্যারাডে বহু দিন পূর্বে পদার্থমাত্রেরই চুম্বকত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। এই নূতন আবিষ্কারের সহিত সেই প্রাচীন আবিষ্কারের অনেকটা তুলনা হইতে পারে।

গোটা সত্তর মূল পদার্থ এখন রাসায়নিকগণের পরিচিত। ইহাদের সকলেরই পরিচালকতা তড়িৎ তরঙ্গের প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। আবার কোনো দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রায় আবার তারতম্য আছে। কোনও দ্রব্য বেশি বাড়ে, কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশি কমে, কাহারও কম কমে; এই হ্রাস বৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখিলে একটা বিস্ময়কর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রুশীয় রাসায়নিক মেন্দেলিয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাইতে গিয়া উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সত্তরটি মূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একটা অদ্ভুতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বর্তমান আছে, মেন্দেলিয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পায়। ক্রুকস প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই জ্ঞাতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর প্রকার দ্রব্য কীরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার নিরুপণের জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ প্রাণীজাতির ও উদ্ভিদজাতির মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ডারউইন যেমন এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টিপ্রণালীর আবিষ্কারে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, এই সত্তরজাতীয় মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টিপ্রণালী আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টিরহস্য ভবিষ্যতের যে ডারউইন আবিষ্কার করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলিয়েফের আবিষ্কৃত সম্পর্কের সমর্থন দ্বারা তাঁহাদের পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই।

তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে কোনও বস্তুর পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরাইল না। এই আঘাতের প্রবলতানুসারে আবার একই ধাতুরই পরিচালকতা হয়তো কমে, অথবা বাড়ে। আঘাতের তারতম্যানুসারে কখনও বা বাড়িয়া যায়, কখনও বা কমিয়া যায়। আবার যে সকল ধাতুর পরিচালকতা সহজে বাড়ে কমে না, তাহাকে একটু গরম করিলে আবার বাড়িতে থাকে বা কমিতে থাকে। অণুগুলি যেন জমাট বাঁধিয়া ছিল; উত্তাপ পাইয়া তাহারা কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া হেলিবার দুলিবার অবকাশ পাইল। এখন তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কায় তাহারা হয় এদিকে, কিংবা ওদিকে হেলিয়া পড়িবার অবকাশ পাইল।

কেবল যে মৌলিক পদার্থেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থাবিকার ঘটে, তাহা নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ তরঙ্গের ঘা পাইয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্তমান রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র লোহাভস্ম (সাদা কথায়, লোহার মরীচা) লইয়া তদুপরি তড়িৎ-

তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার সদৃশ্য অণুগুলিকে কীরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক।

তরঙ্গপ্রতিঘাতে ধাতুচূর্ণের পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন। উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া কণিকাগুলির অণুগুলি কতকটা সংহত ও সন্নিকৃষ্ট হয় ও জমাট বাঁধে; যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা কাছাকাছি আসে; ফলে পরিচালকতা বাড়িয়া যায়। এই সংহতি বাড়ে বলিয়াই পরিচালকতা বাড়ে। সংহতির ইংরেজি নাম coherer ; এই জন্য ধাতুচূর্ণ-নির্মিত উর্মিনির্দেশক যন্ত্র coherer আখ্যা পাইয়াছে।

কিন্তু যদি কোনও দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও আবার কমে; এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে; ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে আর সংহতির ব্যাখ্যা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়; অধ্যাপক লজের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোট কথায়, তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা খাইলে জড় পদার্থমাত্রেরই,—ধাতুই বলো আর অপধাতুই বলো,—জড় পদার্থমাত্রেরই পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এদিকে, বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায়; ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি হ্রাস পায়। এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আবার অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতাবলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই বিচলিত হইলেও কিছুক্ষণ পরে আপনা হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও স্বাভাবিক পরিচালনশক্তি ফিরিয়া পায়। প্রবল ধাক্কা পাইলে স্থিতিস্থাপকতা সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না; তবে বাহির হইতে কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য মুখে কিছুদূর পর্যন্ত চলিয়া যায়। পেন্ডুলমকে যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করিতে গিয়া আবার বামে উঠিয়া পড়ে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপ, যাহা ক্ষণেকের জন্য অতিপরিচালক হইয়াছিল, তাহা আবার ক্ষণেকের জন্য অপরিচালক হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারস্রোত যদি এই পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাঁহার কার্যের জন্য বিস্মিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সেই স্রোত এখন যে নূতন মুখ অবলম্বন করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে, তাহাতে কোথায় যে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন কূলহীন প্রকাণ্ড মহাসাগরে লীন হইয়া আমাদিগকেও ভাসাইয়া দিবে, তাহা বিস্ময় ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গ হইতে ধরাতলে নামাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে কোনও সগরসন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারি না; তিনি অগ্রণী হইয়া এই পুণ্যধারার পথপ্রদর্শন করিতেছেন, তিনিও হয়তো জানেন না, ইহার সমাপ্তি কোথায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা পুরাতন কথার আলোচনা আবশ্যক।

নির্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে একটা

প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। জীবদেহে সাধারণ জড়ধর্ম সমুদয়ই বিদ্যমান আছে; তবে জড়ধর্ম ব্যতীত কোনও অসাধারণ ধর্ম বা অতিজড়ধর্ম—যাহা নির্জীব জড়ে বিদ্যমান নাই, এরূপ কোনও অসাধারণ ধর্ম--বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিচার্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্য-পরিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলির সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে; কিন্তু তথাপি জীবশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বর্তমান জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায় না। গতিবিজ্ঞান, আর তাপবিজ্ঞান, আর তড়িৎ-বিজ্ঞান, আর রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়ার অর্থ কতক-কতক বুঝা যায়; কিন্তু সমস্ত বুঝা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণি আছে। এক শ্রেণির পণ্ডিতে বলেন,—জীবন-তত্ত্বের সমগ্র ভাগ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার কখনও সম্ভাবনা নাই। তাপ ও তড়িৎ ও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনওরূপ অজ্ঞাত ক্রিয়ার প্রভাবে জীবনযন্ত্র প্রধানত কাজ করে। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে vital force বা জীবনীশক্তি বা এইরূপ একটা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে বা হইবে না। জড় পদার্থে এই জীবনীশক্তি নাই; কাজেই উহা জড়। জীবদেহে উহারই প্রভুত্ব; এই জন্য জীবদেহে জীবন। জীবে ও জড়ে এইজন্য মূলগত বিরোধ।

দ্বিতীয় শ্রেণির পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা প্রাকৃতিক পরিচিত শক্তিসমূহের সাহায্যেই জীবনের কাজ সমস্ত বুঝাইতে পারিব। জীবের ও জড়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না। বস্তুত উভয়ের মধ্যে কোনও মূলগত প্রভেদ নাই। জীবদেহে ও জড়দেহে কোনও মৌলিক প্রভেদ নাই। জীববিজ্ঞান কালে জড়বিজ্ঞানেই পরিণত হইবে।

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয় পক্ষে মতের প্রকৃত অনৈক্য নাই; কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। মূলে কেবল কথার অর্থ লইয়া ঝগড়া। এখানেও অনেকটা সেইরূপ।

বর্তমান কালে আমরা জড় উপকরণ লইয়া জীবশরীর নির্মাণ করিতে পারি না, একথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক জৈব পদার্থ, ইংরেজিতে যাহাকে অর্গানিক পদার্থ বলে, যথা—ঘি, তেল, চিনি, মদ প্রভৃতি পদার্থ, যাহা সচরাচর প্রাণীদেহে বা উদ্ভিদের দেহ মধ্যে নির্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্মিত হইতেছে। এমন দিন ছিল, এই সকল পদার্থ মানুষে জড় উপাদান লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিত না। ঘি-র জন্য গরু ও তেলের জন্য সরিষাগাছ ও চিনির জন্য ইক্ষুদণ্ড ও মদের জন্য দ্রাক্ষালতা প্রভৃতির অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই সকল জৈব অর্থাৎ জীবজ পদার্থ জড় উপাদান হইতে অবাধে নির্মাণ করিতে পারেন। এইজন্য তাঁহাদের এক সময়ে অত্যন্ত দুরাশা হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক কয়লা, আর জল, আর অ্যামোনিয়া উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ডাল-রুটি, এমনকী, মাছ-মাংস পর্যন্ত তৈয়ার করিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সে আশা অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই।

এখনও ডাল-রুটি ও মাছ-মাংসের জন্য রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রকৃতিদেবীর বৃহত্তর কর্মশালায় উপস্থিত হইতে হয়, এবং শীঘ্র যে সে আশা সফল হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে কিছু দিন পূর্বে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল, এবং অদ্যাপি অনেক অপণ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, জড় পদার্থ হইতে কৃমি-কীট, মাছি-মশা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাণীবর্গকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু অধিক দিনের কথা নহে, এই বিশ্বাসের মূলভিত্তি পর্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জীব হইতেই নূতন জীব জন্মে; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীজ হইতেই জন্তু হয়। এখন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্বেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পর্যন্ত সকলেই অণ্ডজ।

জীবের উৎপাদন দূরে থাক, যে মশলায় জীবদেহ নির্মিত, ইংরেজিতে যাহাকে প্রোটোপ্লাজম বলে, যাহার বাঙলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলিল না, তাহাও এপর্যন্ত জড় উপাদানে নির্মাণ করিবার কোনও উপায়ই দেখা যায় না। সেই প্রোটোপ্লাজম পদার্থ এখনও কোনও রসায়নবিৎ কয়লা, জল ও অ্যামোনিয়ার সাহায্যে নির্মাণ করিতে সমর্থ হন নাই। যদি কখনও সমর্থ হন, তখন জীবের ও জড়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে বলিয়া নৃত্য করিবার কারণ মিলিবে; এখন নহে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু—

প্রোটোপ্লাজম এখনো নির্মিত হয় নাই, সুতরাং জীবদেহ জড় উপাদানে গঠিত হইলেও সেই জড় উপাদানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ নির্মাণ করিতে পারি না। আমরা পারি না, কিন্তু প্রকৃতি পারেন। নৈসর্গিক কারণে জড় উপাদানেই জীবদেহ গঠিত হইতেছে। উদ্ভিদের শরীর বা জন্তুর শরীর বিশ্লেষণ করিয়া জড় উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান এক কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা কী-ই বা পারি? আমরা জীবদেহনির্মাণে অসমর্থ; জড়দেহনির্মাণেই কি আমরা সমর্থ? যখন আমরা উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সে নির্মাণ কি আমাদেরই কাজ? এক হিসেবে উহা আমাদের কাজ বটে, আর এক হিসেবে আমাদের কাজ নহে। উদজান আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্মবশে অম্লজানসংযুক্ত হইয়া পোড়ে ও জলে পরিণত হয়; গন্ধকও আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্মবশে পুড়িয়া গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়, আমাদের সেখানে প্রভুত্ব বা কর্তৃত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা আমাদের কৃতকর্ম নহে। আমরা জিনিসগুলোকে এমনভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া মিশাইয়া আগুন ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে আগুন ধরাইয়া হাওয়া আর জল মিশাইয়া দিই, তখন উদজান আর গন্ধক আপনা হইতে প্রাকৃতিক ধর্মে পুড়িতে থাকে ও জল তৈয়ার হয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈয়ার হয়। এইটুকুই যা আমাদের কর্তৃত্ব। অর্থাৎ, আমাদের যা কিছু কর্তৃত্ব এই যোজনাকার্যে; পাঁচটা উপকরণকে আমরা এইরূপে জোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন-আপন ধর্মবশে নূতন-নূতন জিনিসের

উৎপত্তি করে।

জীবদেহের নির্মাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। জল আর গন্ধকদ্রাবক আমরা জড় উপাদান লইয়া নির্মাণ করি; কিন্তু জড় উপাদান লইয়া জীবদেহ নির্মাণ করিতে পারি না। উভয়ে এই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধানের অর্থ কী? এই নির্মাণের অর্থ কি? নির্মাণ আমরা করি না; নির্মাণ প্রকৃতি করেন; প্রাকৃতিক ধর্মে নির্মাণকার্য চলে, উভয়ত্রই চলে। আমাদের নির্মাণের নাম যোজনা। একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ; অন্যত্র এই যোজনাকার্যে অসমর্থ। জীবদেহেও জড় উপাদান ব্যতীত অজড় অপরিচিত অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই কয়লা আর উদজান আর অম্লজান আর যবক্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ—নিতান্ত পরিচিত জড় পদার্থ। কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কীরূপে যোজনা করিলে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হইবে, কীরূপে উপাদানগুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া সমাবেশ করিলে প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ নির্মিত হইবে—প্রাকৃতিক ধর্মবশে নির্মিত হইবে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানি না। এই যোজনাকার্যে আমরা একান্তই অজ্ঞ, কাজেই আমাদের জীবদেহনির্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। প্রকৃতিতে এই নির্মাণকার্য চলিতেছে; প্রকৃতির কারখানায় জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই আপনাআপনি সর্বদাই নির্মিত হইতেছে। জড় হইতেই জড় নির্মিত হইতেছে ও জীবদেহ হইতে জীবদেহ ও জড়দেহ, উভয়ই নির্মিত হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই যোজনাকার্য ঘটে বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই নিয়ত গঠিত হইতেছে। জড়দেহের নির্মাণানুযায়ী যোজনাকার্যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু জীবদেহ নির্মাণের জন্য যে যোজনার প্রয়োজন, তাহা আমরা এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসমর্থ।

এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা প্রকৃতির কর্মশালায় কার্যপ্রণালীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে-করিতে জানিতে পারিব যে, কীরূপে উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নির্মিত হইতে পারিবে। তখন অবশ্যই আমরা জীবদেহ "নির্মাণ" করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন না আসিতেও পারে; যদি না আসে, তাহা হইলে আমরা জীবদেহগঠনে কখনই সমর্থ হইব না। তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রুটি-মাংস কোনও কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয়তো পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা এখন এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে যে, আর এখন জড় উপাদানের সেইরূপ সংযোজন-ঘটনাই জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়শক্তির সাহায্যে জড় উপাদান হইতে জীবদেহের নির্মাণচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সে যাই হউক, আমাদের পক্ষে নির্মাণের অর্থ যোজনা মাত্র, এবং জীবই বল, আর নির্জীবই বল, সর্বত্রই নৈসর্গিক নিয়মে গঠনকার্য চলে, তাহার উপর আমাদের প্রভুত্ব কিছুই নাই। আমরা এক জায়গায় যোজনাকার্যে সমর্থ হইয়াছি, অন্যত্র এখনও হই নাই বা হইতে পারিব না; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নির্জীবের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় প্রাচীর নির্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না।

আসল কথা, যাঁহারা জীবনী-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত বলিতে চাহেন এবং জীবনীশক্তি নামে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহারা সকল সময়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা গোল আছে। মনুষ্যজাতির

অধিকাংশ লোকে "সৃষ্টিকর্তা" নামক এক সৃষ্টিছাড়া "কী জানি-কী ময়" পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্মশালায় যখন একটা অদ্ভুত গোছের রহস্যাবৃত যোজনা-ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্যভেদ কুলায় না, অথচ মনের বোঝা ভারী হইয়া আসে, তখন মানুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত সৃষ্টিকর্তার ওপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগের অবসর পায়। জাগতিক ব্যাপারের সর্বত্র এই সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া, স্বয়ং চিন্তায় দায় হইতে মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত আরাম পায়; এবং যখনই কোনও ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোনও একটা অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্পিত প্রভুর শক্তিসংকোচের আশঙ্কা করিয়া চিৎকারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিতে থাকে। এই শ্রেণির লোকের জন্য এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতির রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার করিবার, অথবা প্রকৃতির নাটমন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার শক্তি ও অধিকার যখন মানুষের আছে; এবং সেই শক্তি জ্ঞানের ইতিহাসে পুনঃপুন প্রযুক্ত হওয়াতেও যদি সৃষ্টিকর্তার প্রভুশক্তি সংকুচিত না হইয়া থাকে, এখনো হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। মাধ্যাকর্ষণ ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের আবিষ্ক্রিয়ায় ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিষ্কারে পুনঃপুন এই ব্যবধান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; এখন জীব ও নির্জীবের মধ্যে পর্দাটা কেহ তুলিয়া ফেলিলেও বিশ্বব্যাপার বিপর্যস্ত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

জীবনীশক্তি নামক কোনও অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞান যে কয়টি শক্তির অস্তিত্ব অবগত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও শক্তি যে থাকিবে না, তাহার কোনোই কারণ নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই যে সমস্ত জীবনীক্রিয়ার তথ্য বুঝানো যাইবে, তাহাও মনে করিবার কোনও কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা একই শক্তির অভিনব মূর্তির সহিত আমাদের নূতন পরিচয় স্থাপিত হইতেছে। তখন জীবনীক্রিয়ার জন্য যদি একটা অভিনব, অচিন্তিতপূর্ব বা অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি বা শক্তির অভিনব মূর্তি, কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনোই কারণ নাই। এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি বা Vital force বা যাহা ইচ্ছা নাম দাও, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সেই শক্তির কার্যপ্রণালীর সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন নিয়মবন্ধনহীন অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

জীবন্ত জড়দেহে আর নির্জীব জড়দেহে প্রধান বিভেদ কতকটা এইরূপ,—

(১) জীবদেহে বাহির হইতে কোনও শক্তি কাজ করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ। চিমটি কাটিলেই মাংসপেশির সংকোচন ঘটে; চোখের স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোকতরঙ্গের ধাক্কা লাগিলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত-পায়ের মাংসপেশিতে নাড়িয়া দেয়। কখনও বা সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায়। আজ বাহিরের শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল; সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি স্নায়ুযন্ত্রে কোনোরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় সেই ধাক্কার ফল

সহসা প্রকাশ পাইল। পেশিযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূলে এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এবং এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness জড়দেহে বর্তমান দেখা যায় না। জড়দেহেও বাহ্য শক্তির সংঘাতে সঙ্গে-সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক এরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কীরূপ তফাত, তাহা সহজে অল্প কথায় বুঝানো যায় না। তবে জড়দেহের ও জীবদেহের এবিষয়ে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ স্থলে তজ্জন্য বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। হার্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানত এই সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ্য জগৎ হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ আবশ্যকমতো তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্যকমতো বিলম্বে বা অবিলম্বে আত্মপ্রসার বা আত্মসংকোচ বা আত্মবিকার সাধিত করিয়া, সেই আক্রমণ নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার নিরন্তর চেষ্টার নামই জীবন।

(২) জীবদেহের আত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নির্জীব জড় পদার্থ তৈয়ারির মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে-বাহিরে সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটা মিছরির দানা বা ফটকিরির দানা অথবা একখানা মেঘ বা কুয়াশা। আর জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতা হাওয়া আর জল আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নির্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস মজ্জা স্নায়ু নির্মাণ করিয়া লয় ও বৃদ্ধি পায়।

(৩) জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ রক্ষা করে ও সন্তান উৎপাদন করে। এক খণ্ড জীবদেহ হইতে বহু খণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের সমুদয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

প্রধানত জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ আশ্রয়ে জীবদেহে ও জড়দেহে প্রভেদ, উল্লিখিত তিনটি। প্রথম—জীবদেহ বাহ্য শক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়। দ্বিতীয়—জীবদেহ বাহিরের অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধিত করিয়া বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়—জীবদেহ কালে-কালে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংশবিস্তার করে ও সন্তান সর্বাংশেই পিতৃধর্ম পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি, স্বতন্ত্র জীবধর্মস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, একটু তর্কের স্থল। জন্মের অর্থ, পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। উহা তৃতীয় লক্ষণের অন্তর্গত। মৃত্যু অর্থে সেই স্বাধীন জীবনের সমাপ্তি। স্পেন্সারের সংজ্ঞানুসারে বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যখন জীব সেই আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারে না, তখনই তাহার মৃত্যু। উন্নত জীবমাত্রেরই জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটে, সেদিন বাহির হইতে বিবিধ

শক্তি আক্রমণ করিলেও সেই জীব সেই আক্রমণ নিবারণে চেষ্টা করে না; সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবমাত্রের না বলিয়া উন্নত জীবমাত্রের বলিলাম; কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য, ত াহা আজিকার দিনে বোধ করি আর বলা চলে না। ওয়াইজমান (Weismann) স্পষ্ট

াবে দেখাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য নহে; তাহারা প্রকৃতহ অমরত্বের অধিকারী। জন্ম ও মৃত্যু গেল; থাকে ব্যাধি। জীব বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা চলে, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ফলে জীব এই ক্ষমতার বলে বাহ্য শক্তিকে আপনার জীবনের অনুকূল করিয়া লয়; এই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। আর যখন বাহ্য শক্তি জীবনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ নিবারণে জীব অংশত অশক্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় যাহা জীবনের অনুকূল, ব্যাধির অবস্থায় তাহা প্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও ব্যাধিকে এইভাবে দেখিলে জীবদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া বলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতাত্ত্বিকগণের বিবেচনায় এই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোনও মূলগত বিভেদ নাই। বংশবৃদ্ধি দেহপুষ্টিরই একটা অবান্তর ভেদ মাত্র, আধুনিক জীববিদ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। নিম্নতম পর্যায়ের জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে সীমানির্দেশ প্রায় অসাধ্য। এই সকল জীবের শরীর কেবল একটি মাত্র কোশে নির্মিত। খাদ্য গ্রহণ সহকারে এই কোশটি অর্থাৎ জীবের দেহটি ক্রমে পুষ্টি পায় ও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিসহকারে একটা সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সমগ্র শরীরটি ভাঙিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি কোশ হইতে দুইটি কোশ নির্মিত হইয়া দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। এক পিতৃপুরুষ আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দুইটি সন্তানের উৎপাদন করে। পিতা বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র। কেবল নিকৃষ্ট জীবে কেন, উন্নত জীবের মধ্যেও এই প্রণালী বর্তমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া শাখা বিস্তার করে। সেই শাখাকে ছেদন করিয়া পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে শাখাই আবার স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। ফলে বংশপুষ্টি ও আত্মপুষ্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি লক্ষণকে দুইটি মাত্র লক্ষণে আনা যাইতে পারে। এবং এই দুই লক্ষণ থাকায় জড়দেহে ও জীবদেহে ব্যবধান।

জড়ে ও জীবে এখন এই দুই বিষম ব্যবধান বর্তমান। জগদীশচন্দ্রের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাৎ প্রথম ব্যবধান দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জীবদেহের এই বাহ্য শক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, এই সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জীবদেহের প্রত্যেক অংশেই ও প্রত্যেক অঙ্গেই বর্তমান। এক খণ্ড মাংসপেশি লইয়া বা একটা স্নায়ুতন্ত্রী লইয়া তাহাতে চিমটি কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে কোনো পুস্তক উদঘাটন করিলেই মাংসপেশির ও স্নায়ুতন্ত্রীর এই সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। দুই চারিটার এখানে উল্লেখ করিব।

১। একখানা মাংসপেশিতে একটা ধাক্কা দিলেই উহা একটু পরে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সংকোচ, তার পর ক্রমশ স্বভাবে ফিরিয়া আসে।

২। এই সংকোচের একটা সীমা আছে। প্রবল ধাক্কায় সংকোচনমাত্রা এই সীমায় পৌঁছে;

তারপর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না।

৩। একবারে প্রবল ধাক্কা না দিয়া সামান্য আঘাত দিলে খানিকটা সংকোচ হয়। আবার আঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর একটু। পরপর আঘাতে সংকোচ একটু-একটু করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রথম আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে; তৃতীয়ে আরও কম; চতুর্থে আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌঁছিলে সংসকচে আর বাড়ে না।

প্রথম আঘাতে এতখানি সংকোচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে ততখানি ঘটে না, জীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ। এক সের বোঝার উপরে আর এক সের বোঝা স্পষ্ট ভার বাড়ায়। কিন্তু এক মণ বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপাইলে আর তেমন ভার বোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতন্ত্র ভাবে ভারী, কিন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি নগণ্য। আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলো কত উজ্জ্বল, কিন্তু সূর্যালোকে প্রদীপের সেই আলোর উজ্জ্বলতা কোথায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner's Law* ও Weber's Law** নামে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসূচক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই।

৪। আঘাতের পর আঘাত, সংকোচের পর একটু সংকোচ। কিন্তু এই আঘাতের পর আঘাত খুব তাড়াতাড়ি দিলে, সঙ্কোচন ব্যাপার আর বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশি একবারে ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৫। আঘাত যখন খুব প্রবল হয়, তখন সংকোচনের মাত্রা পরম বা চরম সীমায় পৌঁছে; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সঙ্কোচলাভের পর মাংসপেশি আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন ধাক্কা দিলেও আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মাংসপেশিটা যেন প্রবল আঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই শ্রান্তির অপনোদন ঘটে; সংকুচিত মাংসপেশি তখন ধীরে-ধীরে স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মাংসপেশি বা স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিষ্ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বলো, আর কর্মেন্দ্রিয়ই বলো, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই সাধারণ ধর্ম, এবং বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তির অপনোদনও নিত্য ঘটনা। উত্তাপপ্রয়োগে বা মর্দনে ক্লান্ত মাংসপেশির স্বাস্থ্যলাভ ঘটে।

৬। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশি আবার স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃদু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘাতের পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাবপ্রাপ্তিতে ও স্বাস্থ্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহারই নাম ঔষধ।

ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখনও বা ঔষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহা ঔষধ। কোন দ্রব্য অবসাদক, কোন দ্রব্য উত্তেজক। আবার একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও বা উত্তেজক, কখনও অবসাদকের কাজ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ঔষধের ফল জন্মায়। হোমিওপ্যাথির

* Gustav Theodor Fechner, ১৮০১-১৮৮৭—সম্পাদক

** Earnst Heinrich Weber, ১৭৯৫-১৮৭৮—সম্পাদক

আচার্যেরা বলিবেন, যাহা মাত্রাধিক্যে বিষবৎ, তাহাই ন্যূন মাত্রায় পরম ভেষজ।

আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশির উল্লিখিতরূপ বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিবিধ বাহ্য শক্তির প্রয়োগে মাংসপেশি ভিতর হইতে নানারূপে সাড়া দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে সমবেত ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের এবং গত মে মাসে লন্ডন রয়াল ইনস্টিটিউশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমীপে যে নূতন আবিষ্কারবার্তা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড়দেহেরও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি বর্তমান আছে। আঘাতে ও মাংসপেশি বা স্নায়ুতন্ত্রী যেমন সাড়া দেয়, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে নির্জীব জড়পদার্থ ঠিক সেই একই রকমে সাড়া দিতে পারে।

জীবদেহে ও নির্জীব জড়দেহে প্রভেদ কীসে, জিজ্ঞাসা করিলে মোটামুটি এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ঃ

১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির হইতে বৃদ্ধি পায়। জীবদেহ অপরিণত অপগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অভ্যন্তরে গ্রহণ করে ও তাহাকে পুনর্গঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায়; এবং বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনি বিভক্ত হইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। বিসদৃশ বস্তু দেহ মধ্যে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্টি; উভয় ব্যাপারই মূলত অভিন্ন; জীবদেহে উভয়ই বর্তমান; জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই।

২। জড়দেহ বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকৃত হয় ও প্রতিক্রিয়াও উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাশুভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাহ্য শক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া সাড়া দেয়; এবং সেই বাহ্য শক্তিকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতে চায়। এই সাড়া দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা, এই আক্রমণ নিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। যখন উচিত মতো সাড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রয়াস যখন সম্পূর্ণ সফল হয় না, তখন বাহ্য শক্তি জীবনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনকার অবস্থা ব্যাধি; এবং যখন সাড়া দিবার ক্ষমতা চিরতরে লোপ পায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ আর নিরস্ত হয় না, তখন মৃত্যু।

সংক্ষেপে এই দুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কীরূপ? বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা যে জড়ের একবারে নাই, এমন নহে। বায়ু মধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্বতশীর্ষে তুষারশৈল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, চিনির শরবতে মিছরির দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই জড়দেহের বৃদ্ধি ও জীবদেহের বৃদ্ধি (আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি), উভয়ের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে, উভয় বৃদ্ধিকে এক পর্যায়ে ফেলিতে সাহস হয় না। সেইরূপ আবার বাহ্য শক্তির আহ্বানে নির্জীব জড়ও যে সাড়া না দেয়, এমন নহে। বাত্যাবলে শৈলশিখর ভূমিসাৎ হয়, ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়; পর্বতবক্ষে যুগব্যাপী নৈসর্গিক উৎপাতের চিহ্নসকল অঙ্কিত রহিয়া যায়। এ সমস্তই বিকার বা বিক্রিয়া; কিন্তু জীবদেহে বিকার বা বিক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া আছে; তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নির্জীব জড়ে খুঁজিয়া মেলে না। এই প্রতিক্রিয়াই জীবন, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই

প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার আংশিক বিলোপে ব্যাধি ও পূর্ণ বিলোপে মৃত্যু। জড়ের স্বাস্থ্য বা ব্যাধি বা মৃত্যু কাব্যের ভাষাতে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতে উহার এত দিন স্থান ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে বোধ করি, উহা বিজ্ঞানের ভাষাতেও স্থান পাইতে চলিল।

লোহাভস্মের মতো নিতান্ত নির্জীব জড় পদার্থের ওপর তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা দিয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—

১। তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচালন ক্ষমতা সহসা বাড়িয়া যায়। এক ধাক্কায় বাড়ে; আবার ক্রমশ স্বাভাবিক পরিচালকতা ফিরিয়া আসে।

২। পরিচালনশক্তির বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, প্রবল ধাক্কায় পরিচালন মাত্রা সেই সীমায় পৌঁছে; তখন আর ধাক্কা দিলে বাড়ে না।

৩। ধাক্কার পর ধাক্কা দিলে প্রতি আঘাতে পরিচালন ক্ষমতা একটু-একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে ততটা নহে, তৃতীয় আঘাতে আরও কম ইত্যাদি।

৪। পুনঃপুন দ্রুতগতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়া বিরামের অবকাশ না দিলে পরিচালন শক্তি এক টানে আপনার নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাই জড় পদার্থের ধনুষ্টঙ্কার।

৫। প্রবল আঘাতে পরিচালন শক্তি একবারে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনওরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাই জড় পদার্থের ক্লান্তিলাভ। ইহাই উহার সাময়িক ব্যাধি, এবং এই ব্যাধির ফল স্থায়ী হইলেই মৃত্যু। আবার একটা নাড়া দিলে অথবা একটু গরম করিলে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রচলিত coherer যন্ত্রে তড়িৎ-তরঙ্গের আঘাতে এই ক্লান্তির অবস্থা ঘটে, নাড়া না দিলে সেই ক্লান্তির অপনোদন হয় না।

৬। নির্জীব জড়দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কখনও অবসাদকের, কখনও বা উত্তেজকের মতো কাজ করে ও কোনও দ্রব্যে সেই জড়দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোনও দ্রব্যে কমাইয়া দেয়। কোনওটা বিষের মতো কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়; কোনও দ্রব্য ঔষধের কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে। একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে।

তড়িতোর্মির উত্তেজনায় জড় দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তিঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম যে জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির অনুরূপ, তাহা ইতিপূর্বে কেহ জানিত না। জগদীশচন্দ্র গত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূর্বেই জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মুখে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আবিষ্কারপরম্পরা সমবেত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি লন্ডন রয়াল সোসাইটিতে আরও কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন ও রয়াল ইনস্টিটিউশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ওই সকল

প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এদেশে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিজ্ঞানের গহনবনে যে নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীরের মতো তিনি যাত্রাকালে মরুপৃষ্ঠে অম্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, "নাব্যা নদী"-কে "সুপ্রতরা" করিয়া ও কুঠারঘাতে "বিপিন" সকলকে "প্রকাশ" করিয়া পুরোমুখে অগ্রগামী হইতেছেন।

আঘাত পাইলে মাংসপেশি সংকুচিচত হয়; স্নায়ুতন্ত্রীতে সংকোচন-পরিবর্তে তড়িৎ প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংসপেশির সঙ্কোচন লাভের প্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রীর তড়িৎ বিকার লাভের প্রণালী ঠিক একই নিয়মের অনুসরণ করে। শরীরবিদ্যাশাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ কোনো শাস্ত্রেই নাই। একটা স্নায়ুর সূতার একপ্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে তড়িৎ প্রবাহ জন্মে, তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞ মাত্রই জানেন; কিন্তু একটা তামার তারের একপ্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তড়িৎ প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না।

আবার আঘাতপরম্পরায় স্নায়ুসূত্রে তড়িৎ প্রবাহ একটা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরূপ আঘাত-পরম্পরায় তার মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ একটা চরম পরিণামের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম পরিণাম ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্বে কেহ জানিত না। অতিশয় উত্তাপের বা অতিশয় শৈত্যের প্রয়োগে স্নায়ুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে না, উহা সকলেই জানিত। কিন্তু একটা নির্জীব ধাতুময় তারের তড়িৎ প্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে লোপ পায়, তাহা কেহ জানিত না। দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ে; আবার দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত। কিন্তু নির্জীব ধাতুপদার্থনির্মিত একটা তার যে দ্রব্যগুণে উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, উহার প্রতিক্রিয়াশক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত? ঔষধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদকতা ও আফিমের অবসাদকতা, এতদিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণস্বরূপে প্রযুক্ত হইত। জড়দেহের প্রতি ওই সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের মতো নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি ওই সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশূন্য হইবে না।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোকসম্পাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় কীরূপে আহত হয়, তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর ভিতরে স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ বিকার লাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িততরঙ্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নির্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, দর্শনক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র; কিন্তু সেই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কীরূপ, তাহা শরীরবিদ্যাশাস্ত্র ঠিক জানে না; এখন সেই কাজকর্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধহয় বাহির হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষপর্যন্ত কীরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিকসমাজ-শরীর সেই উত্তেজনায় কীরূপ সাড়া দিবে জানি

না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্থিতিশীলতায় বৈজ্ঞানিকসমাজের কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেহ কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকেন। নূতন সত্যকে সহসা অঙ্গীকার করিতে চাহেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সত্য যতই মনোরম বেশে আসুক, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহাকে বাস দান করিতে স্বভাবত কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। জ্বলন্ত আগুনে উহার "বিশুদ্ধি" বা "শ্যামিকা" পরীক্ষা না করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্ম মাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার আকার কীরূপ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতা মাত্র।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্যতর প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতির উত্তেজনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরামে বাহ্য জগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে; এই প্রয়োগকার্যে অবিরাম চেষ্টাই জীবন। জড়দেহেও যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বর্তমান থাকে, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকার লাভ করিয়া সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্তত একটা ব্যবধান তিরোহিত হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্ন রহিবে, তাহা বলা আবশ্যক। জীব, বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধি সাধন করিয়া স্বয়ং সংসার হইতে অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্মের সংক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট জীবধর্ম, তখনও জড়ের ও জীবের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত রাখিয়া সম্প্রদায়বিশেষকে আরও কিছুদিন সান্ত্বনা প্রদান করিবে।

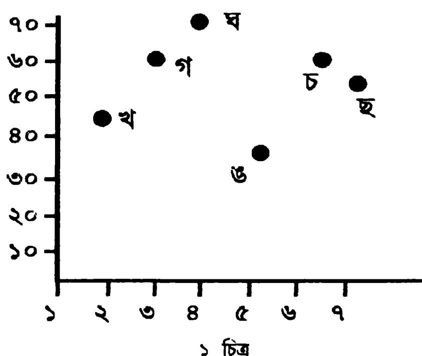
'সাহিত্য', ১৩০৮ ভাদ্র

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার

কলকাতা শহরের দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা প্রত্যহ খবরের কাগজে বাহির হয়। সাত দিনের সংবাদ একত্র করিয়া এইরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে ঃ—

তারিখ	মৃত্যুসংখ্যা
১ বৈশাখ	৫০
২ বৈশাখ	৪৫
৩ বৈশাখ	৬২
৪ বৈশাখ	৭০
৫ বৈশাখ	৩৫
৬ বৈশাখ	৬০
৭ বৈশাখ	৫৫

এই তালিকা দেখিলে কোন দিন কত লোক মরিয়াছে, জানা যায়। তালিকার পরিবর্তে রেখা দ্বারা দৈনন্দিন মৃত্যুসংখ্যা-নির্দেশ চলিত পারে।



১ চিত্র

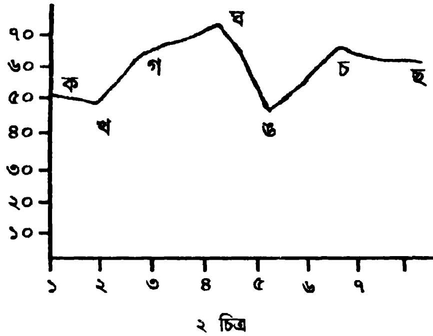
১ম চিত্রে দুইটি রেখা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত। একটি রেখা সময়নির্দেশক, উহাতে ১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখের অংক লেখা আছে। অন্য বেখাটি মৃত্যুসংখ্যা নির্দেশক, উহাতে ১০ হইতে ৭০ পর্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা অঙ্কিত আছে।

১০ অংক ও ২০ অংকের মাঝের স্থানটুকু দশ ভাগে বিভক্ত করিলে ১১. ১২ হইতে ১৯ পর্যন্ত অংক পাওয়া যাইতে পারে। চিত্র কদাকার হইবার ভয়ে ওই সকল চিহ্ন দেওয়া হয় নাই। পাঠকগণ মনে-মনে ওইরূপ ভাগ করিয়া লইতে পারেন।

১ হইতে ৭ পর্যন্ত তারিখ নির্দেশক অংকের ওপর ক,* খ ইত্যাদি ক্রমে ছ পর্যন্ত

সাতটি বিন্দু রহিয়াছে। এক-এক অংকের উপর এক এক বিন্দু। ৩ অঙ্কের ওপর গ, ৬ অংকের ওপর চ, ইত্যাদি।

সকল বিন্দুর উচ্চতা সময়-নির্দেশক রেখা হইতে সমান নহে। কোনওটির উচ্চতা অধিক, কোনোটির কম। ঘ-বিন্দু সর্বোচ্চ আছে, আর ঙ-বিন্দু সকলের নিম্নে আছে। কোনও বিন্দু কত উঁচুতে আছে, মাপিতে হইলে পাশের মৃত্যুসংখ্যা নির্দেশক রেখায় তাকাইলেই চলিবে। ক-বিন্দুর উচ্চতা ৫০; খ-বিন্দুর উচ্চতা ৪০ ও ৫০-এর মাঝামাঝি অর্থাৎ ৪৫; গ-এর উচ্চতা ৬০-এর একটু বেশি অর্থাৎ ৬২; ঘ-বিন্দুর উচ্চতা ৭০; ঙ-বিন্দুর উচ্চতা আবার ৩৫ মাত্র।



২ চিত্র

২য় চিত্রে বিন্দুগুলির মাঝ দিয়া একটা ভাঙা-চোরা বাঁকা রেখা টানা গিয়াছে।

এই রেখার অন্তর্গত কোন বিন্দু কত উচ্চে আছে দেখিলেই, কোন তারিখে কত লোক মরিয়াছে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

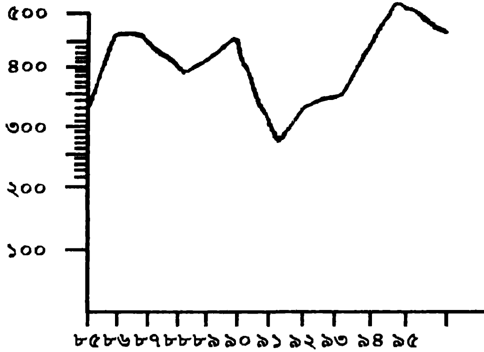
মনে করো, জানিতে চাই—৬ই তারিখে কত লোক মরিয়াছে। তারিখের অংক ৬-এর ওপরে রেখাস্থ চ-বিন্দু; চ-বিন্দুর উচ্চতা ৬০; স্থির হইল, ৬ই তারিখে ৬০ জন লোক মরিয়াছে।

তালিকার কাজ এইরূপ রেখা দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। রেখায় একটা সুবিধা আছে, তালিকায় তাহা নাই। রেখার ওঠা নামা দেখিলেই মৃত্যুর হারের ওঠা-নামা বুঝিতে পারা যায়—রেখাটি যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, মৃত্যুসংখ্যা কোন দিন কত বাড়িয়াছে, কোন দিন কত কমিয়াছে। ৪ঠা তারিখে মৃত্যুর হার একবারে ৭০ পর্যন্ত উঠিয়াছে। তার পরদিন একবারে সহসা ৩৫-এ পতন। কলকাতার যিনি বাসিন্দা, তাঁহাকে এইরূপ রেখা দেখাইলে, তিনি রেখার সহসা উর্ধ্বগতি দেখিলে আতঙ্কিত হইবেন; রেখার নিম্নে পতনে, তাঁহার আশ্বাসলাভ ঘটিবে।

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যবিবরণীতে কোন বৎসর কত ছাত্র বি, এ, পাশ করে, তাহার তালিকা বাহির হয়। সেই তালিকার বদলে ৩য় চিত্র দেওয়া গেল। চিত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে, কোন বৎসরের পাশের ফল কীরূপ।

* "ক" চিহ্নটি চিত্রে উঠে নাই, উহা পঞ্চাশের ঘর ঘেঁষিয়া অবস্থিত এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে।—সম্পাদক।

৮৫ হইতে ৯৫ পর্যন্ত ইংরেজি বৎসরের অংক; ৮৫ অর্থে ১৮৮৫, ৯৫ অর্থে ১৮৯৫। অন্য রেখায় ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত অংক উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা নির্দেশক। বক্র রেখাটি দেখিয়া কোন বার কত ছাত্র পাশ করিয়াছে, অক্লেশে বুঝা যায়। ৮৫ সালে পাশের সংখ্যা প্রায় ৩১০; ৮৬ ও ৮৭ সালের প্রায় সমান, সাড়ে চারি শতর কাছাকাছি; ৮৮ সালে কিঞ্চিৎ



৩ চিত্র

পতন, প্রায় পৌনে চারিশতে; ৮৯ ও ৯০ দুই বৎসর ক্রমিক উত্থান, ৮৯এ ৪০৯; ৯০এ ৪৩৫; ৯১ সালে একবারে অধঃপতন ৩০৩ সংখ্যায়। আবার ৯৫ পর্যন্ত ক্রমশ উত্থান। ৯৫ সালে উন্নতির সীমা প্রায় পাঁচশত পর্যন্ত।

কলকাতা শহরের মৃত্যুসংখ্যার হিসাব ২৪ ঘণ্টা পরপর পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে বৎসর অন্তরে ছাত্রেরা বি. এ. পাশ করে। কিন্তু এমন বিবিধ ঘটনা আছে, যাহা ক্ষণে-ক্ষণে



৪ চিত্র

পরিবর্তিত হয়; ক্ষণে-ক্ষণে তাহার কীরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া উঠে। যেমন বায়ুর উষ্ণতা। বায়ুর উষ্ণতা চব্বিশ ঘণ্টায় সমান থাকে না, উহা ক্ষণে-ক্ষণে বদলায়। বড়-বড় মানমন্দিরে থার্মোমিটার দ্বারা এই অবিরাম পরিবর্তনের হিসাব রাখা হয়। এবং সেই

অবিরাম পরিবর্ত্তন রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। ৪র্থ চিত্রে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতা কখন কীরূপ ছিল, দেখানো হইতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে বেলা ১২টা পর্যন্ত পূর্বাহ্ন; বেলা ১২টা হইতে পররাত্রি ১২টা পর্যন্ত অপরাহ্ন। সময়-নির্দেশক রেখায় পূর্বাহ্নের ও অপরাহ্নের ঘটিকাচিহ্ন এইরূপে অঙ্কিত আছে। উষ্ণতা-নির্দেশক অপর রেখায় উষ্ণতা অংশ থার্মোমিটারের ডিগ্রি ১০০ পর্যন্ত অঙ্কিত আছে।

রেখার উত্থান পতনে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কোন সময়ে বায়ুর উষ্ণতা কত ডিগ্রি ছিল। রাত্রি বারোটার সময় উষ্ণতা প্রায় ৭৫ ডিগ্রি ছিল. ক্রমশ কমিয়া রাত্রি ৪টার সময় ৬০ ডিগ্রির নীচে নামিয়াছে। আবার ক্রমশ উঠিয়া বেলা ৯টার সময় ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়াছে। হয়তো সেইসময় একটু মেঘ করিয়াছিল, একটু ঠান্ডা হাওয়া দিয়াছিল। উষ্ণতা সেইরূপ কোনও একটা কারণে বেলা ১২টার সময় আবার কমিয়া যায়। আবার ৪টা বেলার সময় উষ্ণতার মাত্রা ১০০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। এইরূপ অহোরাত্র মধ্যে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি চিত্রস্থিত বক্র রেখাটির উত্থান-পতনের দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইতেছে।

যে-কোনও ঘটনার পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি এইরূপ রেখা দ্বারা দেখানো যাইতে পারে।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এইরূপ কতিপয় রেখা দ্বারা ধাতুপদার্থের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই রেখাগুলির অর্থ কী, বুঝাইবার জন্য একখানি ভূমিকা আবশ্যক হইল। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন, তাঁহাদের নিকট ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। যাঁহারা এই প্রণালীর অর্থ জানেন না, তাঁহাদের জন্য এই ভূমিকা আবশ্যক। নতুবা জগদীশচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাগুলি তাঁহাদের নিকট অর্থশূন্য বোধ হইবে।

মাংসপেশিতে আঘাত করিলে উহার সংকোচ ঘটে। আঘাতের ফলে একটু খাটো হয়। কতটুকু খাটো হয়, মাপিয়া দেখা চলে। আবার কতটা আঘাতে কতটুকু খাটো হয়— তাহাও মাপিয়া দেখা চলে। এই সংকোচন চিরস্থায়ী হয় না; আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে সংকোচ ঘটে; আবার একটু পরে মাংসপেশি স্বভাবে ফিরিয়া আসে। একটা ধাক্কা, সঙ্গে-সঙ্গে সংকোচবৃদ্ধি, আবার কিছুক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি। শরীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা যাহাদের ব্যবসায়, তাঁহারা এই সকল ব্যাপার পর্যবেক্ষণে দিন কাটান। একটা ধাক্কায় কতক্ষণে কতটুকু সংকোচ ঘটিল, আবার কতক্ষণ পরে স্বভাবপ্রাপ্তি হইল, ঘড়ি ধরিয়া ও মাপকাঠি লইয়া মাপিয়া থাকেন; এবং যাহা দেখেন, তাহা রেখা টানিয়া অন্যকে দেখান।

একখণ্ড মাংসপেশিতে একটা ধাক্কা দিলে, কতক্ষণে কতটুকু সংকোচ ঘটে ও কতক্ষণে আবার স্বভাবপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা নিম্নের ৫ক চিত্রে দেখানো গেল। এই চিত্র Brodie's Experimental Physiology পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই চিত্রে ও পরবর্তী চিত্রসকলে লম্বরেখা দুইটি আর অনাবশ্যক বোধে দেওয়া যায় নাই। পাঠকগণ মনে-মনে কল্পনা করিয়া লইবেন, সেই রেখাদ্বয় যেন চিত্রে অদৃশ্যভাবে রহিয়াছে। একটি রেখা ভূমিগত—উহা কালনির্দেশক। অপরটি উহার উপর লম্বরূপে দণ্ডায়মান—উহা সংকোচের মাত্রানির্দেশক।

এ চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ধাক্কা পাইয়া সংকোচ ক্রমে বাড়িতেছে; পূর্ণমাত্রায় ওঠার পর আবার সংকোচ কমিয়া গিয়াছে। মাংসপেশি ক্ষণিকের জন্য বিকৃতিলাভের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, তড়িৎ-তরঙ্গের ধাক্কা বা তদনুরূপ একটা ধাক্কা পাইলে, ধাতুপদার্থ বিকৃতি লাভ করে; উহার তড়িৎ-পরিচালনশক্তি সহসা বাড়িয়া যায়। একটা ধাক্কায় ক্ষণেকের মতো বাড়ে মাত্র; আবার কিয়ৎক্ষণ পরে উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। এই পরিচালনশক্তির বৃদ্ধি ও হ্রাসও রেখার উত্থান-পতন দ্বারা দেখানো যাইতে পারে। জগদীশচন্দ্রও তাহা দেখাইয়াছেন। ৫ খ চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল।


৫ ক চিত্র


৫ খ চিত্র

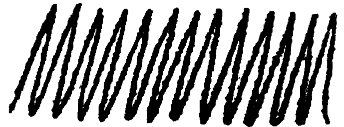
মাংসপেশির অবস্থার উত্থান-পতন, আর ধাতুপদার্থের অবস্থার উত্থান-পতন, উভয়ের সাদৃশ্য কত অদ্ভুত, তাহা ৫ (ক) ও ৫ (খ), দুই চিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পরবর্তী চিত্রগুলির বোধ করি, বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক হইবে না। পাঠক মহাশয় আপনি বুঝিয়া লইবেন। কয়েক জোড়া চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার মধ্যে প্রথম চিত্র ক-চিহ্নিত ও দ্বিতীয় চিত্র খ-চিহ্নিত করা গেল। ক-চিহ্নিত চিত্রগুলি শরীরবিজ্ঞান শাস্ত্রের গ্রন্থ হইতে গৃহীত; এই সকল চিত্রের কোনটায় মাংসপেশির, কোনটায় বা স্নায়ুসূত্রের বিকারপ্রাপ্তি দেখানো হইয়াছে। খ-চিহ্নিত চিত্রগুলি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের অঙ্কিত। ধাতুচূর্ণে, ধাতুর তারে ধাক্কা দিয়া, মোচড় দিয়া, তড়িৎ-তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহাতে বিকার উৎপাদন করিলে, সেই বিকারের কীরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, কীরূপ উত্থান-পতন ঘটে, তাহা এই সকল চিত্রে দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক জোড়ার ক-এর সহিত খ-এর সাদৃশ্য কত বিস্ময়কর! মাংসপেশি বা স্নায়ুসূত্রের মতো জীবন্ত দ্রব্য যে নানাবিধ বিকার লাভ করে, তাহা সকলেই জানিত; কিন্তু নির্জীব ধাতুচূর্ণ বা ধাতুতন্ত্রীতে যে এমন বিকার উৎপন্ন হয়, তাহা কেহ জানিত না। এবং মাংসপেশির বা স্নায়ুসূত্রের বিকারলাভ ও স্বভাবপ্রাপ্তির সহিত নির্জীব ধাতুপদার্থের বিকারলাভের ও স্বভাবপ্রাপ্তির এত সাদৃশ্য আছে, তাহাই বা কে জানিত? সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য এই, যে দ্রব্য পেশির পক্ষে বা স্নায়ুর পক্ষে মাদক বা উত্তেজক, তাহাই আবার ধাতুপদার্থের পক্ষেও মাদক ও উত্তেজক; যাহা সজীব পদার্থের পক্ষে অবসাদক, নির্জীবের পক্ষেও তাহাই অবসাদক।

এখন আমরা এক-এক জোড়া চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিব ও উহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিব। ক চিত্রের সহিত খ চিত্রের সাদৃশ্য দেখিয়া, সজীবের ও নির্জীবের সাদৃশ্য পাঠক বুঝিয়া লইবেন।


৬ ক চিত্র

৬ ক।—এক খণ্ড মাংসপেশিতে পুনঃপুন ধাক্কা পড়িলে উহার সংকোচ কীরূপে বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখানো হইতেছে।

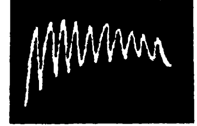

৬ খ

৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে পুনঃপুন ধাক্কা পড়িলে উহার তাড়িত-পরিচালন-শক্তি কীরূপ বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, বাড়ে কমে, দেখানো হইতেছে।


৭ ক চিত্র

৭ ক।—পুনঃপুন আঘাতে মাংসপেশি যেন ক্রমশ ক্লান্ত হইয়া আসিতেছে। প্রথম-প্রথম আঘাতে যতটা সংকোচ হইতেছিল, পরের আঘাতে আর ততটা সংকোচ ঘটে না। সংকোচের মাত্রা পরপর আঘাতে কমিয়া আসিতেছে। রেখার উত্থান পতনের মাত্রা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে; তাহার অর্থ—পুনঃপুন উত্তেজনায় মাংসপেশিরা ক্রমশ যেন শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।

৭ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনা পাইয়া ধাতুপদার্থও ক্রমশ শ্রান্ত ও অবসন্ন হইতেছে।


৭ খ চিত্র

৮ ক।—পুনঃপুন উত্তেজনায় পেশির ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ ক চিত্রেরই অনুরূপ।

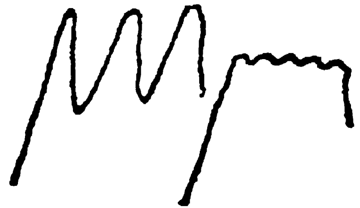
৮ খ।—পুনঃপুন উত্তেজনায় ধাতুদ্রব্যের ক্রমশ অবসাদপ্রাপ্তি—৭ খ চিত্রের অনুরূপ।

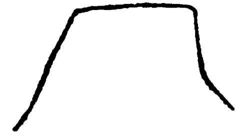

৮ ক চিত্র


৯ ক চিত্র

৯ ক।—প্রথমেই প্রবল আঘাত পাইয়া মাংসপেশি যেন একই আঘাতে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছে। তার পরের আঘাতে যেন অতি ক্ষীণভাবে সাড়া দিতেছে। আর পূর্বের মতো প্রতিক্রিয়ার যেন ক্ষমতা নাই। তারপর আঘাত থামিলে, ক্রমশ স্বভাবপ্রাপ্তি ও অবসাদলোপ।

৯ খ।—ধাতুদ্রব্যের অবস্থাও তদনরূপ—প্রবল আঘাতে ধাতুপদার্থও যেন কাতর ও অবসন্ন; পরের আঘাতগুলিতে তাহার আর পূর্বের মতো সতেজে প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা নাই।


৮ খ চিত্র ৯ খ চিত্র


১০ ক চিত্র

১০ ক।—প্রথম আঘাত এত প্রবল যে, সেই আঘাতে মাংসপেশি একবারে সম্পূর্ণভাবে অবসন্ন; এবার অবসাদের মাত্রা পূর্ণ; আর আঘাতে সাড়া দেয় না। সংকোচ-নির্দেশক, রেখাটি চরম উন্নতি লাভ করিয়া একবারে সোজা চলিয়াছে; আঘাত সত্ত্বেও, উত্তেজনা সত্ত্বেও, কিছুকাল উহার আর উত্থান-পতন নাই। মাংসপেশির এই পূর্ণ অবসাদের অবস্থায় ধনুষ্টংকার ঘটে। ধনুষ্টংকারে মাংসপেশির সংকোচনমাত্রা চরম সীমায় উপস্থিত হয়; তখন উহা এরূপ কাঠিন্য ও জড়তা লাভ করে যে, আর কোনওরূপে কোনও উত্তেজনায় উহাকে কোমল করা যায় না; উহার জড়তার অপনোদন হয় না। আবার কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভের পর এই শ্রান্তি দূর হয়; তখন উহা স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ইহাকে রোগমুক্তি বলা যাইতে পারে। উত্তাপপ্রয়োগ, ঔষধপ্রয়োগ প্রভৃতি রোগমুক্তির অনুকূল।

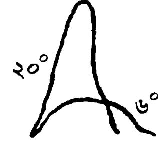
১০ খ।—ধাতুদ্রব্যের পূর্ণ অবসাদ। প্রবল আঘাতে ধাতুদ্রব্যেরও আর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। উহার পরিচালনশক্তি একবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত হইয়াছে। এখন নূতন

উত্তেজনায় সে শক্তির আর হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তাড়িতোর্মি প্রদর্শনের জন্য নির্মিত Coherer যন্ত্রে ধাতুদ্রব্যের এই অবসাদপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। বিশ্রাম লাভের পর, অথবা উত্তাপ প্রয়োগে এই অবসাদের দশা আবার দূর হয়।



১০ খ চিত্র

১১ ক।—উত্তাপে অবসাদ নষ্ট করে, উত্তাপ রোগমুক্তির অনুকূল। ১১ ক চিত্রের অন্তর্গত উভয় রেখায় ইহা দেখানো হইয়াছে। ৩০ ডিগ্রি উষ্ণতায় মাংসপেশি যেন সতেজে সাড়া দিতেছে; উত্তেজনা পাইবামাত্র অমনি সংকুচিত হইতেছে; আবার ক্ষণমাত্রেই স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। আর ৬ ডিগ্রি মাত্র গরমে মাংসপেশি যেন দুর্বল ও ক্ষীণ; উত্তেজনা তেমনই; কিন্তু উহার সংকোচমাত্রা কত কম। ধীরে-ধীরে কিঞ্চিৎ সংকোচ লাভ করিয়া আবার ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতেছে।



১১ ক চিত্র

উত্তাপের এই অবসাদ-নাশক শক্তি সকলেই জানেন। দারুণ শীতে শরীর অবসন্ন হয়; উত্তাপে স্ফূর্তি লাভ করে। পরিশ্রমে মাংসপেশি শ্রান্ত ও অবসন্ন হইলে, উষ্ণতাপ্রয়োগে উহার অবসাদ দূর হয়। মাংসপেশির স্ফূর্তিলাভের জন্য ডাক্তারদের ফোমেন্টেশন প্রয়োগের ব্যবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ।



১১ খ চিত্র

১১ খ।—এখানেও দুইটি রেখা; একটিতে ধাতুদ্রব্য গরম—২১ ডিগ্রি, অন্যটিতে ধাতুদ্রব্য ঠান্ডা—২ ডিগ্রি মাত্র। উভয় রেখায় কত তফাত। গরমে কত তেজ; ঠান্ডায় কত অবসাদ।

১১ খ খ।—এই চিত্রের তিনটি রেখা ধাতুদ্রব্যের উষ্ণতার মাত্রাভেদে ত্রিবিধ অবস্থা দেখাইতেছে। প্রথম রেখায় ০ ডিগ্রি, দ্বিতীয়টিতে ৪০ ডিগ্রি ও তৃতীয় রেখায় ১০০ ডিগ্রি গরমে ধাতুর অবস্থা কীরূপ থাকে, বুঝা যাইতেছে। ০ ডিগ্রির অপেক্ষা ৪০ ডিগ্রিতে উত্তেজনা যেন কিছু বাড়িয়াছে; আবার ১০০ ডিগ্রিতে যেন একটু অবসন্ন হইয়াছে; অল্প উত্তাপে উত্তেজনা বাড়ে; কিন্তু উত্তাপের আতিশয্য আবার উত্তেজনার বদলে অবসাদ উৎপন্ন করে।



১১ খ খ চিত্র

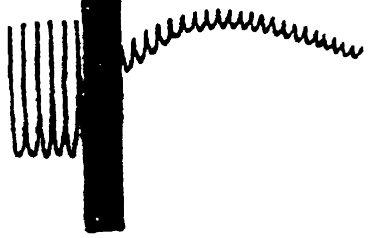
১২ ক।—এই চিত্র দেওয়া গেল না। অ্যামোনিয়া অতি পরিচিত উগ্রগন্ধি বাষ্পীয় পদার্থ। অ্যামোনিয়া প্রয়োগে শরীরের কীরূপ অবসাদনাশ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়, তাহা সকলেই জানেন।

১২ খ।—এই চিত্রে ধাতুদ্রব্যের ওপর অ্যামোনিয়ার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। বামের রেখার উত্থান-পতনে অ্যামোনিয়া প্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা ও ডাহিনের রেখার উত্থান পতনে অ্যামোনিয়া প্রয়োগের পরবর্তী অবস্থা দেখানো হইতেছে। নির্জীব ধাতুপদার্থ আমোনিয়া প্রয়োগে যে এমন উত্তেজিত হইয়া ওঠে, তাহা কে জানিত!



১২ খ চিত্র

১৩ ক।—বিষপ্রয়োগে স্নায়ুসূত্রের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি এই চিত্রে দেখানো হইতেছে। যাহাতে অস্বাভাবিক অবসাদ উৎপাদন করে, তাহাই বিষ। ক্লোরোফর্মের অবসাদক ক্রিয়া সকলেই জানেন। অতিমাত্রায় প্রয়োগে স্নায়ুযন্ত্র অবসন্ন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় জীবনহানি পর্যন্ত ঘটে। এই চিত্রের বামাংশে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের পূর্বে স্নায়ুসূত্রের স্বাভাবিক উত্তেজিত অবস্থা ও দক্ষিণের অংশে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের পরে অবসন্ন অবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।



১৩ ক চিত্র

স্নায়ুসূত্রে আঘাত করিলে উহাতে তড়িৎ প্রবাহ জন্মে; দ্রুত প্রবাহে স্নায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার ও ক্ষীণ প্রবাহে উহার অবসন্ন অবস্থার সূচনা করে। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে স্নায়ু ক্রমে অবসন্ন হয়; উহার আর দ্রুত প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে না। চিত্রে তাহাই দেখানো হইতেছে।

১৩ খ।—ধাতুপদার্থে বিষের ক্রিয়া। বামাংশে বিষ প্রয়োগের পূর্বের ও দক্ষিণের অংশে বিষ প্রয়োগের পরের অবস্থা দেখানো হইতেছে।



১৩ খ চিত্র

১৪ খ।—এই চিত্রে তিনটি রেখা ধাতুর ত্রিবিধ অবস্থার জ্ঞাপক। প্রথম রেখায় বিষ প্রয়োগের পূর্বতন অবস্থা—ধাতুপদার্থ এখন স্বভাবস্থ; উত্তেজনা পাইলেই সতেজে সাড়া দেয়। দ্বিতীয় রেখায় বিষ প্রয়োগের পরবর্তী দশা—নির্জীব ধাতু এখন সজীবের মতো অবসন্ন—উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ। তৃতীয় রেখা ঔষধ প্রয়োগের পর—ঔষধ প্রয়োগে অবসাদ দূর হইয়াছে; ধাতু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তেজনায় সাড়া দিতেছে। ১৪ ক চিত্র দেওয়া আবশ্যক হয় নাই।

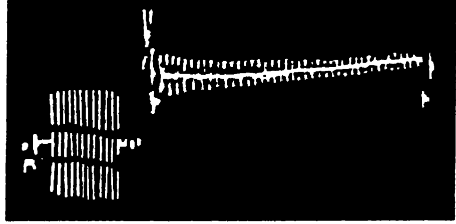


১৪ খ চিত্র

১৫ খ।—এখানেও তিনটি রেখা। প্রথম রেখা ধাতুদ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থার জ্ঞাপক। অল্পমাত্রায় উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োগে ধাতুদ্রব্য কীরূপে উত্তেজিত হয়, তাহাও দ্বিতীয় রেখায় বুঝা যাইতেছে। অধিক মাত্রায় প্রয়োগে ঔষধও কীরূপে অবসাদে পরিণত হয়, তাহা দেখা যাইতেছে। আফিম, বেলাডোনা, ইপিকাকুয়ানা প্রভৃতি দ্রব্য কীরূপে মাত্রাভেদে স্নায়ু-যন্ত্রের উপর, কখনও ঔষধের, কখনও বিষের কাজ করে, তাহা সর্বজনবিদিত; স্বতন্ত্র চিত্রে তাহা দেখানো গেল না।



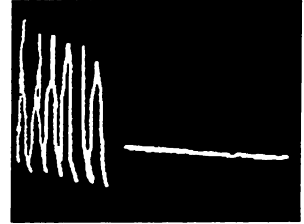
১৫ খ চিত্র



১৬ ক চিত্র

১৬ ক।—স্নায়ুযন্ত্রের উপর আফিমের ক্রিয়া দেখানো হইয়াছে। বামাংশে প্রয়োগের পূর্বতন, দক্ষিণাংশে পরবর্তী ক্রিয়া দেখানো হইয়াছে।

১৬ খ।—ধাতুদ্রব্যে আফিমের তদনুরূপ ক্রিয়া।



১৬ খ চিত্র

জড়দেহে ও জীবদেহে যে কতটা সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত চিত্রগুলি দেখিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। এই সাদৃশ্যের বিষয় এতদিন কেহ জানিত না। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র এই সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটা নূতন রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই। এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা কোনও নূতন দেশে উপস্থিত হইবেন, তাহা এখন কেহই বলিতে পারে না। জীবদেহের মতো জড়দেহ বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, জীবদেহের ন্যায় জড়দেহ বিষপ্রয়োগে অবসন্ন হয়, আবার ঔষধে তাহার অবসাদ নষ্ট হয়, এই সকল নূতন তত্ত্ব অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের পূর্বে কোনও বৈজ্ঞানিকেরই কল্পনায় আসে নাই। জড়েরও জীবন আছে কি না, এই দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানশাস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অনেক বড়-বড় পণ্ডিত মীমাংসা অসাধ্য বলিয়া একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন পথে চলিলে এই সমস্যার পূরণ হইতে পারে, তাহার নির্দেশেও এ পর্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া পরম্পরা সেই সমস্যার পূরণে কত দূর সফল হইবে, তাহার নির্দেশে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তিনি যে নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে অজ্ঞানের তমোময় রহস্যাবৃত প্রদেশাভিমুখে একাকী অগ্রণী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় ও কৃতিত্ব বিস্ময় উৎপাদন করিবে, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাতৃভূমির বিষাদক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে তিনি আনন্দের রেখাপাতে সমর্থ হইয়াছেন;—তাঁহার জননীর আশীর্বচন তাঁহার জয়যাত্রার রক্ষাকবচ হউক।

'বঙ্গদর্শন', আশ্বিন ১৩০৮

চরিতকথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা-মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ওই নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাঙালি জাতির প্রাচীন ইতিহাস কেমন ছিল, ঠিক স্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনঘটিত প্রাচীন কিংবদন্তিটা অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পলাশির লড়াইয়ের কিছু দিন পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত বাঙালির চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষায় এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া পবিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগযত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মতো বাকসর্বস্ব সাধারণ বাঙালি, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধহয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সহৃদয়তার এত অভাব ও মৌখিকতার এত প্রভাব যে, অদ্য যে আমরা তাঁহার স্মৃতির উপাসনার জন্য একত্র হইয়াছি, এই উপাসনা ব্যাপারটাই একটা ভণ্ডামি নহে, তাহা প্রমাণ করা দুষ্কর। আমরা তাঁহার তর্পণোদ্দেশে যে বক্তৃতাময় বারির অঞ্জলি প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার প্রেতপুরুষ যদি অবজ্ঞার সহিত তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষসমর্থনে বলিবার কথা কী আছে, সহজে খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার অনধিকারের কথা আসে বলিয়া প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজির আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়তো অসম্ভব। তথাপি এই সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে-বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন, বোধহয়, আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ওই সকল অনুষ্ঠানসাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও, আমরা স্বার্থের অনুরোধে ওই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

কিন্তু প্রথমেই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিব কি না, সেই ঘোর সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। সেই প্রকাণ্ড মানবতাকে সংকীর্ণ বাঙালিত্বের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে যাওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতে তাঁহার স্বজাতি

তাঁহার নিকট আপনার যে মূর্তি দেখাইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনকাহিনি পাঠে কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণের সম্পর্কে আসিয়া তাঁহাকে পদে-পদে লজ্জিত ও প্রতারিত হইতে হইয়াছে, ইহার ভূরি উদাহরণ তাঁহার জীবনের আখ্যায়িকা মধ্যে সংকলিত আছে। যদি কোনও বৈদেশিক আমাদের জাতীয় চরিত্রের ছবি আঁকিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাকে মসীবর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিতলেখকগণ প্রচুর পরিমাণে ওই সকল সামগ্রী একাধারে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোটো জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট, থাকিলেও, ওই উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনও যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ওই গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙালিত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, অনর্থক আত্মগ্লানির অবতারণা আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আপনার বলিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইতে তুলনায় আত্মগ্লানি আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভর শক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙালি-চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

একটা কথা আজকাল অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান রাজকীয় শাসনে চারিদিকে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে যখন হিন্দু রাজা হিন্দুরাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তখন আমাদের জাতীয় অবস্থা সমধিক উন্নত ছিল, অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন না; অন্তত হিন্দুজাতির পুরাবৃত্তের অভাবে এ কথা লইয়া তর্কবিতর্ক যতক্ষণ ইচ্ছা চালানো যাইতে পারে। কিন্তু গত কয় শত বৎসরে আমাদের দুর্দশার যে একশেষ ঘটিয়াছিল, এবং বর্তমানকালে আমাদের সামাজিক জীবন সংকটাপন্ন মুমূর্ষু অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা একরকম সর্ববাদীসম্মত সত্য। এই নবজীবনসঞ্চারের কয়েকটা বড়-বড় লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা প্রধান লক্ষণ, আমাদের জাতীয় রুচির পরিবর্তন ও জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ। বেহুলার নাচ দেখিয়া স্বর্গের দেবগণ যতদূর তৃপ্তিলাভ করিতেন, আমরা মর্ত্যদেহ ধরিয়াও কোনওরূপেই ততটা পারি না। এখন বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথের হাতে মানবজীবনের উৎকট সমস্যাগুলার আলোচনা কবিতাকারে দেখিতে চাই। দ্বিতীয় একটা লক্ষণ, আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপন এবং তৎসহকারে স্বায়ত্বশাসন লাভের প্রয়াস।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিতেও আমরা উন্নতির সোপানে উঠিতেছি,

এই বাক্য নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে আমি প্রস্তুত নহি। একশত বা দেড়শত বৎসরের মধ্যে কলির প্রকোপ সহসা এত দূর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে যে, বাঙালির পরমায়ু একবারে পঁচানব্বই হইতে পঁয়ত্রিশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ধর্মের চারি পায়ের মধ্যে তিনটি একবারে চিরদিনের মতো খঞ্জ হইয়া গিয়াছে, অবশ্য এরূপ বিশ্বাস করিতে আমি বাধ্য নহি। কিন্তু আবার আমাদের সামাজিক গগনের পূর্বাকাশে তরুণ সূর্যের উদয় হইয়াছে, এবং অরুণ সারথি হস্তধৃত হরিদশ্বগণের রশ্মিগুচ্ছ আর যে ঘুরাইয়া দিবেন না, ইহার স্বীকারেও আমার সাহস হয় না। বঙ্গ-সাহিত্যের অভ্যুদয়সম্বন্ধে কোনও কথা এখানে বলিতে চাহি না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বঙ্কিমের প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু আশা করি, নবীনচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের তূলিকা অক্ষয় হইয়া আমাদের চিত্তবিনোদনে ও সন্তাপহরণে নিযুক্ত থাকিবে।* কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রিক অবস্থা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। শ্রোতৃবর্গ অনুগ্রহ করিয়া মার্জনা করিবেন।

বস্তুতই শতাধিক বর্ষব্যাপী সুশাসনে আমরা নিতান্ত আদুরে ছেলে হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের পরিণামও বোধ করি আদুরে ছেলের পরিণামের অপেক্ষা অধিকতর আশাপ্রদ নহে। পালঙ্কের উপর সুখশয্যাশায়ী শিশুকে যখন আরামের সহিত তূলিযোগ চুমুকে-চুমুকে দুগ্ধপান করিতে দেখা যায়, তখন বয়স্ক লোকের মুখ হইতে "আহা মরি শিশুকাল" ইতি কবিতাবাণী সনিশ্বাসে নির্গত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে এই শিশুকেই আবার কিছু দিন মধ্যে সেই বয়স্কের স্থান গ্রহণ করিয়া জীবদ্বন্দ্বে নিযুক্ত হইতে হয়। আমাদের স্নেহময়ী গভর্নমেন্টজননীর অনুগ্রহের মাত্রা ও আমাদেরও আবদারের মাত্রা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর আমরা সেই আরামের পালঙ্ক ও তূলির দুধ সহজে ছাড়িতে চাহিতেছি না এবং আমাদের সচ্ছন্দতার অণুমাত্র ক্রটি ঘটিলেই, শৈশবসুলভ সানুনাসিক কণ্ঠধ্বনি বাহির করিয়া জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াসী হইতেছি। বাস্তবিকই আমাদের মতো সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী কোনও জাতির উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসে লেখে না।

আমাদের মেরুদণ্ডের সনাতন কোমলতা হইতেই এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে; আবার সেই অবস্থা হইতেই মেরুদণ্ডের কোমলতা বাড়িয়া যাইতেছে। আমরা কথায়-কথায় আমাদের চরিত্রসংশোধনের প্রস্তাব করি; এবং এই চরিত্রসংশোধন না হইলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এই মর্মে মহতী ঘটা করিয়া বক্তৃতা করি। চরিত্রসংশোধন না হইলে যে উন্নতি ঘটিবে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু চরিত্র সংশোধন ব্যাপারটাই কি এত সহজ জিনিস? যেন ইচ্ছা করিলেই চরিত্রটা আপনা-আপনি শোধিত হইয়া যাইবে। কিঞ্চিলিকা যেন ইচ্ছামাত্রেই আপনাকে কুম্ভীরে পরিণত করিবে! ডারউইনবাদীরা বলেন, কুম্ভীরেরও পূর্বপুরুষ এককালে কেঁচোর মতো ছিল। কিন্তু সেই কুম্ভিরত্বে পরিণতির পূর্ব পর্যন্ত তাহাকে কত যুগব্যাপী জীবনদ্বন্দ্বে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে! ইচ্ছামাত্রেই চরিত্রশোধন ঘটে না; এবং প্রস্তাব দ্বারাও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের সম্মুখীন হইলে, আমাদের ক্ষুদ্রত্বের উপলব্ধি জন্মিয়া যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, এইরূপে সেই আত্মগ্লানির কতকটা ওজন মিলিতে পারে।

আমরা যে বিদ্যাসাগরের সম্মুখে দাঁড়াইতে সংকুচিত হই, এইরূপে তাহার কতকটা সান্ত্বনা মিলিতে পারে বটে, কিন্তু এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মতো

* যখন এই প্রবন্ধ প্রথম পঠিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কীরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙতে পারিত, কখনো নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনো ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মতো যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে, ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কীরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্যজাতিসুলভ বিবিধগুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালির চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মতো সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কন্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলোকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালি ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধহয় না। তাঁহার চরিত্র পূর্বেই সম্যগভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নূতন মশলা-সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরেব ক্ষেতে যবের শিষ খাইতে গিয়া কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেকভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

বিদ্যাসাগর যদি ইংরেজি একবারে না শিখিতেন, বা ইংরেজের স্পর্শে না আসিতেন; চিরকালই যদি তিনি সেই নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা শহরের অবস্থাটা ঠিক এমনি না হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লিগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন, সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালিটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালিটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখনো প্রয়োজন হয় নাই; এমনকী, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে-সময়ে এমন উগ্র মূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্বক এই পরত্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণস্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোনও মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতাস্থাপন না ঘটিলে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজমধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্য আচারের পক্ষপাতী, তাঁহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপন ও বিদেশের আচার-গ্রহণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কী ফল ঘটিত, বোধহয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাঁহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সে দর্প।

আচারবিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই-একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

পাশ্চাত্যদেশে ফিলানথ্রপি নামে একটা পদার্থ আছে, তাহার বাংলা নাম মানবপ্রীতি। এই মানবপ্রীতি কোনও সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে আবদ্ধ নহে; সমস্ত মানবসমাজ এই হিতৈষণার বিষয়ীভূত এবং ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই হিতৈষণা পলিটিকাল ইকনমি শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। এই লোকহিতৈষণা ইউরোপ হইতে বাহির হইয়া দিগদিগন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে যে কত অলৌকিক ঘটনার, কত অসাধারণ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ মিলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই লোকহিতৈষণার প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, প্রাচ্যদেশে তাহার তুলনা মিলে না। আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার ভিতর এমন একটা স্ফূর্তি রহিয়াছে যেন তাহা আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া আপনা হইতে উছলিয়া বাহির হয়, এবং অন্য কোনও মূর্তিধারণের সুবিধা না পাইলে এই

মানবপ্রীতির ও বিশ্বহিতৈষণার আকৃতি পরিগ্রহ করে। যে স্ফূর্তির বশে ইংরেজের ছেলে সাঁতার দিয়া নায়গ্রা পার হইতে গিয়া জীবনকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দেয়, এই হিতৈষণাও যেন সেই অমানুষিক স্ফূর্তি হইতেই উদ্ভূত। এই পরার্থপরতার মূলে যেন ব্যক্তিগত স্ফূর্তি বর্তমান রহিয়াছে। আপনার ব্যক্তিত্ব যেন নিজের ভিতর স্থান না পাইয়া অপরের উপর সবেগে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। প্রাণের প্রবাহ যেন আপনার বেগ আপনি সহিতে না পারিয়া পরের দিকে ধাবিত হইতেছে। পরের উপকার যেন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; আপনার নিজত্বের অভিব্যক্তিই যেন তাহার প্রণোদক।

বিদ্যাসাগরকে এইরূপ ফিলানথ্রপিস্ট বলা চলে না। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনওরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমনকী, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনও স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্বঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ব্যক্তির কী উপকার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা একরকম অসম্ভব। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকরা যেগুলো সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই পড়িতে-পড়িতে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শ্রোতৃবর্গ ভয় পাইবেন না; আমি সেই ফর্দ এক্ষণে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নাহি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুদীর্ঘ ফর্দের মধ্যে প্রায় শতকরা নব্বইটা কার্য অর্থনীতির অনুমোদিত নহে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতির উপরে আর একটা নীতি আছে, তাহা উচ্চতর মানবনীতির অঙ্গীভূত।

ইউটিলিটির হিসাবে ভালো মন্দ নির্ণয় করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ইউটিলিটির হিসাবটা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সমাজের স্থিতির ও গতির নিয়মগুলো এতই জটিল যে, সেই নিয়মগুলোকে যতই আয়ত্ত করিতে যাওয়া যায়, তাহারা ততই যেন হাত হইতে পিছলিয়া পড়ে। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আজকাল আলোচনা যতই অধিক হইতেছে, সমাজের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অনভিজ্ঞতা ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটা অকর্মণ্য, অলস, কুচরিত্র ব্যক্তির আহার দিয়া প্রাণ বাঁচাইলে আমাদের পরিমিত খাদ্যসমষ্টির পরিমাণ অকারণে হ্রাস করা হয়, এবং মনুষ্যজাতির জীবনসংগ্রামকে কিয়ৎপরিমাণে আরও তীব্র করিয়া তোলা হয়, এই হিসাবে এইরূপ দয়াপ্রকাশ গর্হিত কর্ম বলিয়া আজিকালকার অনেক সমাজতাত্ত্বিক নির্দেশ করেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দয়াপ্রকাশ ব্যাপার

কত দিকে কত উপায়ে গৌণভাবে ও পরোক্ষভাবে শুভফলের আনয়ন ও উৎপাদন করে, তাহা আমাদের স্থূল হিসাবে ধরা পড়ে না; কাজেই ইউটিলিটির জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে শূন্য পড়িয়া যায়। রাজশাসন ও সমাজশাসন ও ধর্মের শাসন, লোকাচার ও দেশাচার, নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র, বিদ্যার বিস্তার ও জ্ঞানের বিস্তার, সহস্র উপায় অবলম্বণ করিয়া সহস্র গির্জাঘর ও সহস্র কারাগার ও সহস্র বিদ্যালয় ও সহস্র ধর্মাধিকরণ মনুষ্যের জীবনসমরের উৎকটতার লাঘবসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমান সমাজতত্ত্ব দুঃখের সহিত বলিতেছে, এই যুগযুগান্তরব্যাপী মনুষ্যের সমবেত চেষ্টার একমাত্র ফল নিস্ফলতা। মনুষ্যচরিত্রে স্বার্থপরতার মাত্রা কোনরূপে কমাইতে না পারিলে, বোধ করি, এই দ্বন্দ্বের ভীষণতার কোনওরূপ লাঘব হইবে না। সন্তানকে দেখিলে জননীর স্নেহের উৎস আপনা হইতে উথলিয়া উঠে; কোনওরূপ ক্ষতিলাভগণনার বা কর্তব্যনির্ণয়ে সংশয়ের অবকাশমাত্র উপস্থিত হয় না। মনুষ্যের চরিত্র যদি কখনও এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, সেই স্নেহাকৃষ্ট জননীর মতো দুঃখক্লেশাতুর মনুষ্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য সে আপনা হইতেই বাধ্য হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যজাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। অনেক হিসাবনিকাশ জমাখরচ বিচারের পর কর্তব্যনির্ণয় একরূপ ব্যাপার; আর আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত ও তাড়িত হইয়া কর্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়া আর একরকম ব্যাপার। এই শেষোক্ত স্থলে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্তিটা স্বভাবের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যায় যে, উহাকে স্বভাব হইতে আর পৃথক করিয়া লওয়া চলে না; পৃথক করিতে গেলে সমগ্র স্বভাবটাই ভাঙিয়া যায়। সমাজের বর্তমান অবস্থায় সাধারণত মানুষে পরের কাজ করে; কেন না, পরের কাজটা ভালো কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ; উহাতে নিজেরও লাভ আছে, সমাজেরও লাভ আছে। ইহলোকে, এবং হয়তো ইহলোকের পর আর একটা যে লোক আছে শোনা যায়, সেইখানে, এই কাজের জন্য বিশেষ প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে; কিন্তু মানুষ যেমন ক্ষুধার উত্তেজনায় খাইতে চায়, পিপাসার উত্তেজনায় জলার্থী হয়; শারীর-বিজ্ঞানঘটিত কোনও তত্ত্ব তখন তাহার মনে স্থান পায় না; এমনকী, ক্ষুধার ও পিপাসার তাড়নায় এমন খাদ্য ও এমন পানীয় সে উদরস্থ করিয়া ফেলে, শারীরবিজ্ঞান তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ পরার্থপরতা তখনই স্বাভাবিক প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইবে, যখন মনুষ্য সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের মুখে আপনা হইতে ধাবিত হইবে। তাহার এই কার্যের দ্বারা সমাজের মঙ্গল হইবে, কি অমঙ্গল হইবে, তাহা চিন্তা করিতে সে সময় পাইবে না। মনুষ্যের ইতিহাসে যদি কখনও এইরূপ দিন আইসে, যখন মনুষ্যের প্রবৃত্তি এইরূপে মনুষ্যকে পরের কাজে প্রেরিত করিবে, তখন হয়তো রাজ্যশাসন ও সমাজশাসনের প্রয়োজন হইবে না; তখন নীতিপ্রচারক ও ধর্মপ্রচারকের পরিশ্রমের প্রয়োজন হইবে না; এবং কারাগার ও গির্জাঘরের ভগ্নাবশেষ চিত্রশালিকায় একত্র রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের অতীত ইতিহাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের সাক্ষ্য দিবে। মনুষ্যের ইতিহাসে এমন দিন আসিবে কি না জানি না; কিন্তু মনুষ্যের এই পরম ধর্মের কল্পনা অন্তত একটা দেশের মানবমস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইয়াছিল। যে দেশের সর্বপ্রধান মহাকাব্যের নায়ক ভগবান রামচন্দ্র এই নিষ্কাম ধর্মপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় আপনার প্রাণসমা ধর্মপত্নীকে কর্তব্যবোধে নির্বাসিত করিয়াছিলেন, যে দেশের সর্বপ্রধান ধর্মপ্রচারক ভগবান সিদ্ধার্থ সংসারের দুঃখ-যাতনা হইতে মানবমণ্ডলীর পরিত্রানার্থ রাজ্যসম্পত্তি পরিত্যাগ না করিয়া পারেন নাই,

যে দেশের উপাস্য মানবদেব শ্রীকৃষ্ণ এই নিষ্কামধর্মের প্রচারকর্তা বলিয়া ইতিহাসে কীর্তিত, সেই দেশে এই ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত প্রবৃত্তির ঐতিহাসিক উদাহরণও নিতান্ত বিরল হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত বর্তমান যুগের বঙ্গসন্তানগণের অধিক সাদৃশ্য না থাকিতে পারে; কিন্তু সেই চরিত্র আমরা যে আদৌ দেখিতে পাই, তাহা সম্ভবে। কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য ও অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোনও একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনও দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোনও বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা প্রবহমানা; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তাচ্ছিল্য করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শন তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোক তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না। বায়ুপ্রবাহে দ্রুমসানুমানের মধ্যে দ্রুমেরই চাঞ্চল্য জন্মে, সানুমান চঞ্চল হয় না। এ ক্ষেত্রে বোধ করি দ্রুমের সহিতই তাঁহার সাদৃশ্য। কিন্তু আবার সানুমানেরই শিলাময় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে বারিপ্রবাহ নিঃসৃত হয়, তাহাই বসুন্ধরাকে উর্বরা করে ও জীবকুলকে রক্ষা করে। সুতরাং সানুমানই বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত পক্ষে তুলনীয়। ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্যধারায় যে ভূমি যুগ ব্যাপিয়া সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃতপ্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

ঈশ্বর এবং পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের কীরূপ বিশ্বাস ছিল, তাঁহার চরিতলেখকেরা সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বলেন না। তবে সংসার হইতে দুঃখের অস্তিত্ব এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া সুখের এবং মঙ্গলের রাজ্য কল্পনার বলে প্রতিষ্ঠা করা বোধ করি দয়ার সাগরের পক্ষে অসাধ্য ছিল। সমুদ্রতলে সার জন লরেন্স* ডুবাইয়া দিয়া দুনিয়ার মালিক কীরূপ করুণা প্রকাশ ও মঙ্গল সাধন করিলেন, এক নিশ্বাসে তিনি তাহা আবিষ্কার

*এই নামে একখানা জাহাজ ৭০০ যাত্রিসহ কলিকাতা হইতে পুরী যাইবার সময় বাতাবর্তে পড়িয়া সমুদ্রে মগ্ন হয়।

করিতে পারিতেন না। বস্তুতই দুঃখদাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেই জন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কর্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যসম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গন্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না। এমন দিন কবে আসিবে, যে দিন মনুষ্যসমাজ সাম্প্রদায়িক কোলাহলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; যে দিন আপামর সাধারণ চিন্তা ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী হইয়া মনুষ্যের প্রতি কর্তব্যনির্ণয়ে মন দিতে অবকাশ লাভ করিবে।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন। সমাজসংস্কারের কথাটা উত্থাপন করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে যদি নিতান্ত আতঙ্ক জন্মে, তাহাতে শ্রোতৃবর্গের নিকট মার্জনার ভিখারি হইতেছি। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া কথাটা একবারে না তুলিলেও চলে না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহে পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানবনির্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর, মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের তো আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বালবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দকিনীর ধারা বহিল। সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে! বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটিভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

কিন্তু এই সমাজসংস্কার ব্যাপারেও বিদ্যাসাগরের একটু অসাধারণত্ব দেখা যায়। প্রথমত, বিধবাবিবাহে হস্তক্ষেপের পূর্বে তিনি পিতামাতার অনুমতি চাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে তিনি প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই দুইটাই আমাদের পক্ষে চিন্তানীয় বিষয়। সম্প্রতি আমরা নীতিশাস্ত্র হইতে 'মরাল কারেজ' নামক একটা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি।* কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় স্বার্থবিসর্জন ব্যাপারটা যে-কোনও দেশের একচেটিয়া নহে, তাহা সদাসর্বদা আমরা ভুলিয়া যাই। আমাদের প্রাচীনা ভারতভূমিতেও এই কর্তব্যের জন্য স্বার্থ-বিসর্জনের উদাহরণ ভূরি-পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয় যে, অন্যত্র যেসব ঘটনায় ঢক্কানিদাদ হইয়া থাকে, এ দেশে তাহার অধিকাংশই নীরবে সম্পাদিত হয়।

* Moral courage.

কিন্তু এই মরাল কারেজটা এ দেশে নূতন আমদানি এক অপূর্ব জিনিস। আরও দুঃখের বিষয় যে, একালের শিক্ষার সহিত এই মরাল কারেজের কী একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকের বয়োবৃদ্ধি সহকারে সংসারের হাইড্রোলিক প্রেসের চাপ পড়িয়া ইহা অনেকটা সংকুচিত ও শীর্ণ হইয়া পড়ে; কিন্তু শিক্ষানবিশ বালকগণের নৈতিক সাহসের আক্রমণটা নিরীহ পিতামাতার উপর দিয়া, নিরীহতর প্রতিবেশীর উপর দিয়া ও নিরীহতম মাস্টার মহাশয়ের উপর দিয়াই নিক্ষিপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই মরাল কারেজের প্রতি বিশেষ রাজি ছিলেন না। স্বাধীন আত্মাকেও কোন স্থানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের বুদ্ধি এবং নিজের প্রবৃত্তির মুখে বলগা লাগাইয়া কোথায় তাহাদিগকে নিয়মিত রাখিতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বর্গের দেবতায় তাঁহার কীরূপ আস্থা ছিল, জানি না; কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়ান জীবন্তদেবের তুষ্টির জন্য সময়বিশেষে আপনার ধর্মবুদ্ধিকে পর্যন্ত বলিদান দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ বঙ্গদেশে তখন ছিল না। কিন্তু মানবজীবনে এমন সময় আসিতে পারে, যখন সেই মুক্তবায়ুমার্গে বিহারপ্রয়াসী স্বাতন্ত্র্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; ইহা তিনি মানিতেন। সেই শৃঙ্খলকে কপটাচারের আয়স নিগড় মনে করিবার প্রয়োজন নাই। উহা প্রেমের শৃঙ্খল ও ভক্তির শৃঙ্খল;—মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের যে প্রেমের বন্ধন প্রকৃতি আপন হাতে নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, যে ভক্তির বন্ধন ব্যক্তিনিহিত ক্ষুদ্র সমাজরূপী বিরাটপুরুষের ঐতিহাসিক জীবনের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই প্রেমের শিকল ও ভক্তির শিকল গলায় পরিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়; "মণিমুক্তার মোহন মালা" ইহার নিকট স্থান পায় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয় লইয়া আমরা সকলেই কিছু ধরাতলে অবতীর্ণ হই নাই। বালবিধবার অশ্রুজল আমাদের পাষাণহৃদয়ে রেখাঙ্কন করে না; তাই আমরা ভণ্ড ব্রহ্মচর্যার মলিন পাংশুবিক্ষেপে সেই অশ্রুজল মুছিতে যাই। ঈশ্বরচন্দ্রের বীরত্ব বিধবার দুঃখমোচনে সমর্থ হয় নাই। দেশাচারের জয়লাভ ঘটিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, ইহাই প্রকৃতির নির্বন্ধ। স্বাভাবিক, সরল, ছদ্মবেশহীন মনুষ্যত্ব ইহাতে ম্রিয়মাণ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখপ্রকাশ নিষ্ফল;—কেননা, ইহা বিধিলিপি।

এই দেশাচারগুলির সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীনকালে একদিন জন কয়েক ব্রাহ্মণ পরামর্শ করিয়া লাভের প্রত্যাশায় এই জঘন্য দেশাচার সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং জনসমাজ ভয়ে হউক বা নির্বুদ্ধিতায় হউক, সেই সকল ব্যবস্থা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের সহিত আমি একমত নহি। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণিবিশেষের চেষ্টায় সমাজের ধারাবাহিক জীবন যে এইরূপে বিপর্যস্ত হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। আজকাল সমাজ-শরীরের সহিত জীব-শরীরের তুলনা করা এবং সমাজের অন্তর্গত দেশাচারকে জীবশরীরোদ্গত ব্যাধিজনক বিস্ফোটকের সহিত তুলনা করা একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীববিদ্যার অন্তর্গত আধুনিক নিদানশাস্ত্রে বিস্ফোটকের উৎপত্তির যে কারণ নির্দেশ করে, তাহাতে এই তুলনা সঙ্গত বলিয়া বোধহয় না। বাহির হইতে রোগের বীজ শরীর মধ্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। কিন্তু সমাজ-শরীরের অন্তর্ভুক্ত পুরুষপরম্পরাগত প্রথাগুলিকে সকল সময়ে বাহির হইতে

আগত বলিতে পারা যায় না। সমাজ-শরীরের বয়ঃক্রমানুসারে তাহার জৈবিক নিয়ম মতেই আপনা হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও লয় পায়। সমাজ-শরীরকেও ঠিক জীব-শরীরের মতো দুরন্ত প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া সহস্র প্রতিকূল শক্তি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হয়; এবং সেই আত্মরক্ষার প্রয়াসফলে তাহাতে বিবিধ অঙ্গ ও বিবিধ অবয়ব ও বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ হয়। জীব-শরীরের মধ্যে কতকগুলা অবয়বের চিহ্ন দেখা যায়। শরীরবিজ্ঞানে তাহাদিগকে vestigial organ আখ্যা দেয়। এই ক্ষুদ্র অবয়বগুলোয় জীবনধারণে ও জীবনরক্ষণে কোনরূপ উপকার দেখা যায় না; বরং সময়ে-সময়ে জীবনের সংহারক হইয়া উঠে। সাধারণত তাহারা তাহাদের নিরর্থক, অনাবশ্যক অস্তিত্বরক্ষার জন্য সমগ্রদেহের নিকট হইতে পুষ্টির ভাগ ও শক্তির ভাগ গ্রহণ করিয়া জীবনের প্রতিকূলতাই সাধন করে। ইহারা জীবনযাত্রার প্রতিকূল হইলেও আধুনিক জীববিদ্যার মতে বিস্ফোটকের বা ব্যাধির স্থানীয় নহে। জীবের ইতিহাসে এমন সময় ছিল, তখন তাহারা জীবনের পক্ষে আবশ্যক ছিল, তখন তাহারাও জীবনের আনুকূল্যসাধনে নিযুক্ত রহিত। তদানীন্তন বহিঃপ্রকৃতির সহিত যুদ্ধব্যাপারে জীবদেহকে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের আপনা হইতে বিকাশ হইয়াছিল। বহিঃপ্রকৃতির পরিবর্তনসহ তাহাদের আবশ্যকতা অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনে কাজেই তাহাদেব অস্তিত্বও বিলোপের অভিমুখে ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। সমাজ-শরীরে দেশাচারগুলাও কতকটা যেন সেইরূপ। সমাজের অতীত ইতিহাসে বিশেষ প্রয়োজনসাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল; এখন সেই প্রয়োজনের অভাব হওয়ায়, তাহারা অনাবশ্যক ও জীবনের যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচন বিনা অন্য কোনও প্রণালী নাই, যাহাতে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সময়সাপেক্ষ; এবং সেই দিনের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত। সমাজ-শরীরের চিকিৎসক তুমি বিস্ফোটকভ্রমে যেখানে সেখানে ছুরিকা চালাইলে সর্বত্র সুফল নাও হইতে পারে।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গের অনুগ্রহবশে আজি আমি বিদ্যাসাগরের চরণোপান্তে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের অবকাশ পাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহারে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের দেশে জীবনচরিত লেখা প্রচলিত নাই, এবং কোনও ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাহার উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত রচনা করিয়া যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা বোধহয় এই অভাবের ও অসুবিধার বিশেষ ভুক্তভোগী। এরূপ স্থলে বিদ্যাসাগরের মতো মহাশয়গণের স্পর্শে যিনি কখনও আসিবার সুবিধা পাইয়াছেন, যিনি কোনও-না-কোনও সূত্রে তাঁহার চরিত্রের কোনও একটা দোষ দেখিতে পাইয়াছেন, তৎসমস্ত সাধারণের নিকট ব্যক্ত করা তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য। এই কর্তব্যের অনুরোধে আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, ব্যক্তিগত হইলেও তাহা বলিতে সাহসী হইতেছি। বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট-বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোনও-না-কোনও প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফস্সলের পল্লিগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর। মহাকবির বাক্যে আছে, যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে। মহতের আসনভূমি তীর্থস্বরূপ। বঙ্গদেশের পল্লিতে-পল্লিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে সময়ে বিদ্যাসাগরের কর্মবহুল জীবনের অন্যতম

ব্যবসায় ছিল, সেই সময়ে আমার পিতামহের ক্ষুদ্র কুটির একদিন বিদ্যাসাগরের পাদস্পর্শে তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবকালে সেই গৌরবান্বিত দিবসের প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে নানা কথা অন্তঃপুরবাসিনীগণের মুখেও শুনিতে পাইতাম। পাঠশালায় প্রবেশলাভের পর বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পুস্তক পরম্পরার শুভ্র মলাটের উপর একই নাম অঙ্কিত দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পাঠশালা, ও লেখাপড়া ও ছাপার বহি ও পণ্ডিতমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের কীরূপ একটা অনির্বচনীয় সম্বন্ধ কল্পনায় স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের আকৃতি ও পরিচ্ছদ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যে সকল গল্প শুনিতাম, তৎসমুদয় সেই কল্পনার সহিত বিজড়িত করিয়া অন্তঃকরণ একটা বিদ্যাসাগরমূর্তি গড়িয়া ফেলিয়াছিল। বটতলার পুস্তকের বোঝা মাথায় করিয়া চটিজুতাধারী রুক্ষবেশে পুরুষমূর্তি এক ব্যক্তি আমাদের পল্লিগ্রামে মাঝে-মাঝে দেখা দিত। শ্রোতৃগণ মার্জনা করিবেন, সেই লোকটাই যে নিশ্চিত বিদ্যাসাগর, এই ধারণা হইতে অব্যাহতি পাইতে আমাকে উত্তরকালে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আমার মনস্তত্ত্ববিৎ বন্ধুগণের উপর এই বিষম সমস্যার মীমাংসার ভার থাকিল। ১২৮৮ সালের ২১ মাঘ তারিখে আমি কলিকাতা শহরে আসি; এবং ২৩ তারিখে তীর্থযাত্রীর আগ্রহের সহিত পিতৃব্যদেবের সমভিব্যাহারে চিরাকাঙ্ক্ষিত বিদ্যাসাগরদর্শনলালসা তৃপ্ত করিয়া জীবন ধন্য করি। শৈশবকালের কাল্পনিক বিদ্যাসাগরের সহিত প্রকৃত বিদ্যাসাগরের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলাম কি না, সে কথা উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই দিবস তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটি বাক্য শুনিতে পাইয়াছিলাম, আজি পর্যন্ত তাহা আমার কর্ণবিবরে ধ্বনিত হইতেছে। আশা করি, সেই উদার প্রশস্ত স্নেহপূর্ণ হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর বঙ্গের যে সকল পুত্রকন্যার শ্রবণপথে প্রবেশলাভ করিয়া হৃদয়ের ভিত্তিমূলে আঘাত দিয়াছে, তাঁহারা চিরদিন সেই কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারের কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন। সেই প্রাচ্য মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁহাদের জীবনকে যুগপৎ প্রণোদিত ও সংযমিত রাখিবে। আমাদের এই দুর্দিনেও যদি মনুষ্যত্বের সেই আদর্শের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীনা পূজনীয়া জননীর দেহে নবজীবনসঞ্চারের আশা কি কখনোই ফলিবে না! কিন্তু ভবিষ্যতের ঘনান্ধকার ভিন্ন করিয়া দীপবর্তিকা আনয়ন করিবে কে? কে 'বলিবে, আমাদের পরিণতি কোথায়? মহাপুরুষের আবির্ভাব ভারতভূমিতে নূতন ঘটনা নহে। আশা যে, মহাপুরুষের আবির্ভাবই ভারতের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতের সেই মহাপুরুষ কোথায়? দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃতজাতির শবদেহে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বারো বৎসর অতীত হইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শ্যামাঙ্গিনী জননীর অঙ্কদেশ শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এতদিনে আমরা তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ কোনওরূপ আয়োজন আবশ্যক বোধ করি নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি যে এতদিন জাগে নাই, তাহা আমাদের অবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক। বারো বৎসর পরে যদি সেই কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া থাকে, সেই প্রবুদ্ধিসাধনে আমাদের কৃতিত্ব বিচার্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোনও তপোলোকে বা সত্যলোকে অবস্থিত হইয়াও মর্ত্যলোকে তাঁহার দুঃখিনী জননীকে আজও ভুলিতে পারেন নাই;—সেইখানে বসিয়া "তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে" বলিয়া কাতরকণ্ঠে গান গাহিতেছেন;—আর মানবের অশ্রুতিগোচর সেই সঙ্গীত সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকলনিনাদ উত্থাপিত করিয়া বঙ্গভূমিকে জাগ্রত করিয়াছে। আমাদের কর্তব্যবুদ্ধি আজ যদি জাগিয়া থাকে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে জাগাইয়াছেন, আমাদের উহাতে কোনও কৃতিত্ব নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উপাসনার জন্য আজিকার সভা আহূত হইয়াছে; এবং যাঁহারা এই উপাসনার আয়োজন করিয়াছেন এবং এই উপাসনাকর্মকে সম্ভবত সাংবৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা, কী কারণে জানি না, আজিকার অনুষ্ঠানের প্রধান ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই অহৈতুকী শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তিপ্রকাশের অবসর লাভ করিয়া আমি যুগপৎ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু যোগ্যতর পাত্রে এই ভার অর্পিত হইলে উপস্থিত ভদ্রমন্ডলীকে বঞ্চিত হইতে হইত না। কেবল যে সময়োচিত বিনয়প্রকাশের জন্য আমি এ কথা বলিতেছি, তাহা নহে; বঙ্কিমচন্দ্র যে বিস্তীর্ণ বঙ্গীয়সাহিত্যের ক্ষেত্রের নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া তাঁহার সহবর্তী ও পরবর্তী অনুচরগণের পথপ্রদর্শক-হইয়া গিয়াছেন, আমিও সেই বঙ্গীয়সাহিত্য ক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক সঙ্কীর্ণপথ আশ্রয় করিয়া মন্দগতিতে ধীরে-ধীরে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছি; ইহাই আমার জীবনের কাজ ও ইহাই আমার জীবিকা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হস্তে করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রের যে-যে অংশ প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই-সেই অংশে আমার "প্রবেশ নিষেধ"। আমি দূর হইতে সেই আলোকের উজ্জ্বলদীপ্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি মাত্র, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগ্যবান সহচরগণের ও অনুচরগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও আমি অধিকারী নহি। আজিকার আয়োজনের অনুষ্ঠাতাদিগের অনুগ্রহজন্য অকপট কৃতজ্ঞতাস্বীকারে আমি বাধ্য আছি; কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনারা তাঁহাদের পাত্রনির্বাচনে বিষয়বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না।

বাঙালির জীবনের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কত দিকে কত উপায়ে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি; কিন্তু বাংলার বাহিরে সম্ভবত তিনি বাংলার সার ওয়ালটার স্কট মাত্র। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় অতি অল্পবয়সেই ঘটিয়াছিল, সে বয়সে উপন্যাসগ্রন্থের

সহিত আমার পরিচয় বড় একটা স্পৃহনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। আমার যখন আট বৎসর বয়স, তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল এবং আমি বঙ্গদর্শনের কয়েক সংখ্যা হইতে বিষবৃক্ষের দুইচারিটা পরিচ্ছেদ আত্মসাৎ করিয়াছিলাম। সেই বয়সে বিষবৃক্ষের সাহিত্যরসের কীরূপ আস্বাদ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই; তবে এ কথা বেশ মনে আছে যে পাঠশালায় গিয়া তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ভূগোলবিবরণের ভারতবর্ষের অধ্যায়ে গঞ্জাম-গঞ্জাম চত্বরপুর, মসলিপটম-মসলিপটম, আর্কট-আর্কট, মদুরা-মদুরা, টিনিভেলি-টিনিভেলি প্রভৃতি অপরূপ সুশ্রাব্য নামাবলি আবৃত্তির ত্রুটি ঘটিলে পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট বেত্রাঘাত উপহার পাইয়া বাঙলাসাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ দাঁড়াইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা ও কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন নিতান্তই তাহার সমর্থন ও পোষণ করে নাই। আমার বেশ মনে আছে যে, 'পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে' এই পরিচ্ছেদের সহিতই আমার তাৎকালিক বিষবৃক্ষপাঠ সমাপ্ত হয় এবং ওই পরিচ্ছেদের শীর্ষস্থিত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি মনের মধ্যে বিস্ময় ও কৌতূহলের উদ্রেক করিয়া কিছুদিনের জন্য একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। কিছুদিনের জন্য মাত্র, কেন না পরবৎসর আমি পাঠশালার পরীক্ষায় যে পুরস্কার পাইয়াছিলাম, বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, তাহার রাঙাফিতার বন্ধনের শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও বিষবৃক্ষ নামক দুইখানি পুস্তক রহিয়াছে। এই সভাস্থলে যাঁহারা পিতার বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবকের গৌরবযুক্ত পদবি গ্রহণ করেন, তাঁহারা শুনিয়া আতঙ্কিত হইবেন যে, ওই পুরস্কারবিতরণে গ্রন্থনির্বাচনের ভার আমার পিতৃদেবের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনিই আমার গঞ্জাম-গঞ্জাম চত্বরপুর প্রভৃতি সূক্ষ্ম ভৌগোলিকতত্ত্বে পারদর্শিতার পুরস্কারস্বরূপ ওই দুইখানি গ্রন্থ নির্বাচন করিয়া তাঁহার নবমবর্ষের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পুরস্কারহস্তে বাড়ি আসিয়া রাত্রিটা একরকমে কাটাইয়াছিলাম,পরদিনে বিষবৃক্ষ ও তার পরদিনে দুর্গেশনন্দিনী টাইটেলপেজের হেডিং মায় মূল্য পাঁচসিকা হইতে শেষ পর্যন্ত একরকমে উদরস্থ করি। ওই দুই গ্রন্থের কোনও অংশ সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি এখন অকপটে বলিয়া ফেলি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্যরসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল "হীরার আয়ি বুড়ী হাঁটে গুড়িগুড়ি" বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধা ইষ্টিরসনামক ব্যাধির প্রতিকারবিষয়ে কেষ্টরসনামক ঔষধের উপযোগিতাসম্বন্ধে প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম। গজপতি বিদ্যাদিগ্গজকেই দুর্গেশনন্দিনীর মধ্যে সর্বপ্রধান পাত্র স্থির করিয়াছিলাম, ইহাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আশমানির ঘরে বিমলার আকস্মিক প্রবেশের সহিত বিদ্যাদিগ্গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া আত্মগোপন করিলেন, এবং তাঁহার শীর্ষরক্ষিত হাঁড়ি হইতে অড়হরের ডাল বিগলিত হইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মন্দাকিনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ করিলাম, তখনই বুঝিলাম, যে, বাঙলাসাহিত্য অতি উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে বিদ্যাদিগ্গজের মতো শতদলকমল যখন বিদ্যমান আছে, তখন গঞ্জাম-গঞ্জাম চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠেলিয়াও সেই কমলচয়নের চেষ্টা অনুচিত নহে।

ঔপন্যাসিক-বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত লোকে এত কথা কহিয়াছেন যে, আর সে বিষয়ে কোনও কথিতব্য আছে কি না, আমি জানি না। কথিতব্য থাকিলেও আমি কোনও কথা বলিতে সাহস করিব না। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয়তো দাবি করিবেন যে আমি যখন

বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠে উদ্যত হইয়াছি, তখন অমি সূর্যমুখীর ও ভ্রমরের চরিত্র আর একবার সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিয়া উভয় চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনে বাধ্য আছি। যদি কেহ এইরূপ দাবি রাখেন, তাঁহার নিকট আমি ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। বাঁকনল আর টেস্টটিউব হাতে দিয়া নানাজাতি কিম্ভূতকিমাকার দ্রব্যের বিশ্লেষণ আমার ব্যবসায় বটে, কিন্তু মানবচরিত্র বা মানবীচরিত্র বিশ্লেষণে আমার কিছুমাত্র শিক্ষা বা দক্ষতা নাই; কেন না, নভেলবর্ণিত মানবচরিত্র বিশ্লেষণে সালফারেট হাইড্রোজেনের কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই; ওই মানবচরিত্র নমনীয়ও নহে, দ্রবণীয়ও নহে এবং জলে দ্রব করিয়া উত্তাপপ্রয়োগে উহার ভাসুরতাপাদনও অসম্ভব। আর আমার কাব্যরসগ্রাহিতার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতে আপনারাও আমার নিকট সে আশা রাখেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্বন্ধে একটা স্থূল কথা আমার বলিবার আছে, সেই কথাটা সংক্ষেপে বলিয়াই আমি আপনাদিগকে রেহাই দিব।

এক শ্রেণির সমালোচক আছেন, তাঁহারা বলেন, মানবসমাজের সুখ-দুঃখ, রেষারেষি, দ্বেষাদ্বেষি এবং ভালোবাসাবাসি যথাযথরূপে চিত্রিত করাই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহাতে কল্পনার খেলার অবসর নাই। ইঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপব সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। আর এক শ্রেণির সমালোচক বলেন, পাপপুণ্যের ফলাফলের তারতম্য দেখাইয়া সমাজের নীতিশিক্ষার ও ধর্মশিক্ষার বিধানই নবেলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফলতা দেখিয়াই নবেলের উৎকর্ষ বিচার করিতে হইবে। ইঁহারাও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন নহেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে যেমন ভট্টিকাব্য, ইঁহাদের মতে ধর্মনীতিশাস্ত্রে তেমনি নবেল, কাব্যের ছলনা করিয়া পাঠকগণকে কাঁদানোই নবেলরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের যথাযথ চিত্র আঁকিতে নৈপুণ্যের প্রয়োজন, আর নীতিশাস্ত্র অতি সাধুশাস্ত্র, ইহা স্বীকার করিয়াও আমরা মনে করিয়া লইতে পারি—নবেল এক কাব্য এবং সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রাণ। কেবল নীতিশাস্ত্র কেন, যদি কেহ দর্শনশাস্ত্র বা রসায়নশাস্ত্রকেই নবেলের বিষয় করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করিব না। কিন্তু বিষয়টি যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হয় না।

সৌন্দর্যেরও প্রকারভেদ আছে; গাছপালার ছবি সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হরিদাসও সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎসংসারের গোড়ার কথাগুলি যিনি সুন্দর কবিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রথমশ্রেণির কবি। গোড়ার কথা দেখাইলেই কবি হয় না; সেটা দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের ও ধর্মতত্ত্ববিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিলেই কবি হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই একটা সুন্দর করিয়া দেখানো হইয়াছে; এইজন্য কবির আসনে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা এই যে, উহা আগাগোড়া একটা সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টামাত্র। শুধু মানবজীবনের কথাই বা বলি কেন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন। যাঁহারা হার্বার্ট স্পেন্সার-প্রদত্ত জীবনের এই পারিভাষিক সংজ্ঞা জানেন, তাঁহারা আমার কথায় সায় দিবেন। জীবনের উহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সংজ্ঞা আমি দেখি নাই। যাহার জীবন আছে, তাহাকে দুই দিকের টানাটানির মধ্যে বাস করিতে হয়। ধবলগিরিপর্বত বহুকাল হইতে বরফের বোঝা মাথায় করিয়া ভারতবর্ষের পুরুষপরম্পরা অবলোকন করিতেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার সজীবতায় সন্দেহ করেন। ধবলগিরি এত

মহান হইয়াও শীততাপের ও জলবৃষ্টির ও তুষারবৃষ্টির উৎপাত অকাতরে সহিয়া আসিতেছেন, এবং শত স্রোতস্বিনীর সহস্র ধারা তাঁহার কলেবরকে শীর্ণ ও বিদীর্ণ ও ক্ষীণ করিয়া তাঁহার অভ্রভেদী মস্তককে সমভূমি করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই আপন্নিবারণের জন্য তাঁহার কোনও চেষ্টাই নাই। কিন্তু সামান্য একটি পিপীলিকা ক্রমাগত আহারসংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষয়শীল দেহের পূরণ করিয়া থাকে এবং যদি কেহ তাহাকে দলিত করে, সে দংশন করিয়া আত্মরক্ষণে সাধ্যমতো ত্রুটি করে না। একদিকে বহিঃপ্রকৃতি তাহাকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে টানিতেছে; অন্যদিকে সে ধ্বংস হইতে আত্মরক্ষার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে। তাহার কীটজীবন এই চেষ্টার পরম্পরামাত্র। যেদিন সেই চেষ্টার বিরাম, সেইদিন তাহার মৃত্যু। মানুষও ঠিক পিঁপীড়ার মতোই জীবন ব্যাপিয়া আপনাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার জন্য ব্যাপৃত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতির আক্রমণনিবারণে সমর্থ করিয়া মৃত্যুনিবারণের ধারাবাহিক চেষ্টাই তাহার জীবন। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে পণ্ডিতলোকে অর্ধত্যাগে বাধ্য হন; তাই মৃত্যু অনিবার্য জানিয়া পণ্ডিত-জীব আপনার অর্ধেককে অপত্যরূপে রাখিয়া অপরার্ধকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে জীবনের কিয়দংশরক্ষার জন্য এই অপত্যোৎপাদন। আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি প্রবৃত্তির একমাত্র উদ্দেশ্য যেন-তেন-প্রকারেণ জীবনরক্ষা। জীবনরক্ষার দুই উপায়, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। পশুর সহিত নরের প্রভেদ এই স্থলে সামান্য; কাজেই ওই প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা পাশবপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি।

কিন্তু মানুষের একট বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্বল পশু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে; সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশবপ্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশবপ্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। সহজাত সংস্কারের অভাবে অতীতের অভিজ্ঞতায় ভর দিয়া, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বুদ্ধিপূর্বক পাশব-প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হয়। এইজন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্মবুদ্ধি; ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজরক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই তো দুই টানাটানির ব্যাপার; উহার উপর এই সামাজিক জীবন আর একটা নূতন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি, তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি, যাহা মুখ্যত সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণত আত্মরক্ষার অনুকূলমাত্র, তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্যবিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্যস্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিকজীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাহার অন্তরের অন্তর হইতে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে। এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। এইখানেই মানুষের গোড়ায় গলদ; Original sin; এইখানেই অমঙ্গলের মূল; সংসার-বিষবৃক্ষের বীজ। Origin of evil; মানবজীবনের উৎকট রহস্যে ইহাই গোড়ার কথা। খোদার সঙ্গে শয়তানের চিরন্তন বিবাদের মূল এইখানে। মনুষ্যের হৃদয় সেই জীবনব্যাপী মহাহবের কুরুক্ষেত্র;—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চারিখানি উপন্যাসে এই গোড়ার

কথাটায় আলোচনা করিয়াছেন। সেই মহাযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া মানবহৃদয় কীরূপ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হইয়া থাকে, তাহা তিনি সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন. তাহাতেই তিনি উচ্চশ্রেণির কবি।

বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, আর কৃষ্ণকান্তের উইল, এই চারিখানি উপন্যাসের কথা আমি বলিতেছি। এই চারিখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমরনাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন; ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই। বীর্যবন্ত প্রতাপ সারাজীবন প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর ও নীরব সাধনার বিষয় জগতের লোকে জানিতে পারিয়াছিল। মোহমুগ্ধ অমরনাথ আপনার পিঠের উপর আকস্মিক পদস্খলনের স্থায়ী চিহ্ন ধারণ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক দম্ভের বলে পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসী সাজিয়া বেড়াইয়াছিলেন; পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ আপনার আত্মাকে ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ করিয়া অনাথা পিতৃহীনা বালিকার প্রতি দয়াপ্রকাশের ফলভোগ করিয়াছিলেন; আর সর্বাপেক্ষা কৃপাপাত্র গোবিন্দলাল সর্বতোভাবে আপনার অনধীন ঘটনাচক্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া আপনাকে কলঙ্কহ্রদে নিমগ্ন করিয়া অবশেষে অপমৃত্যুদ্বারা শান্তিলাভে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই চারিটি মনুষ্যের বিভিন্ন দশার চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমরা কখনও মানবচরিত্রের মহিমা দেখিয়া স্পর্ধিত ও গর্বিত হইতে পারি, কখনও বা জাগতিক শক্তির সম্মুখে মানবের দৌর্বল্য দেখিয়া ভীত হইতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের ও জগদ্বিধানের এই সমস্যা—এই গোড়ার কথা—অতি সুন্দর চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন এবং এইজন্য তিনি উচ্চশ্রেণির কবি।

আজিকার দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের অদৃশ্যহস্ত আমাদের জাতীয়জীবনকে যেরূপে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে, তাহাতে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যতই উচ্চস্থানে অবস্থান করুন, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য মূর্তির পদপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে আজ ব্যগ্র হইব, ইহা স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র কতদিক হইতে আমাদের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তাহার গণনা দুষ্কর। ইংরেজিতে একটা বাক্য চলিত হইয়াছে, যাহার মূলে গ্রিক নাই, সে জিনিস জগতে অচল। বলা বাহুল্য, এখানে জগৎ অর্থে কেবল পাশ্চাত্যদেশ বুঝায়। আমরা যদি ওই বাক্যকে ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া বলি যে, যাহার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাংলাদেশে অচল, তাহা হইলে নিতান্ত অত্যুক্তি হইবে না। ইংরেজি গতিবিজ্ঞানে একটা শব্দ আছে, মোমেন্টম্; বাঙলায় উহাকে 'ঝোঁক'শব্দে অনুবাদ করিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়েকটা জিনিসকে ঝোঁক দিয়া ঠেলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই কয়টা জিনিস বাংলাদেশে চলিতেছে। সেই জিনিসগুলা গতি উপার্জনের জন্য যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণার অপেক্ষায় ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলেন, আর উহা চলিতে লাগিল, তাহার পর আর উহা থামে নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমে নবেলের কথাটাই ধরা যাক। বঙ্কিমবাবুর পূর্বেও অনেকে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন; তাহাতে কীসের যেন অভাব ছিল। ইংরেজিনবিশ অনেক লেখক ইংরেজি নবেলের অনুকরণে বাঙলা নবেল লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কী একটা অভাবের জন্য উহা বাংলা সাহিত্যে লাগে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নবেল লিখিলেন, আর একদিনেই বাংলায় সাহিত্যের একটা

নূতন শাখার সৃষ্টি হইল। স্রোতস্বতীর যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল, এখন উহা নূতন পথ পাইয়া বিপুলকায় গ্রহণ করিয়া শত উপশাখার সৃষ্টি করিয়া দেশ ভাসাইয়া জলপ্লাবন উপস্থিত করিল। সকলেই জানেন যে, এই জলপ্লাবনে সাহিত্যক্ষেত্র ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাংলার অধিকাংশ নবেলই অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য; কিন্তু ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। ইহাতে দেশের দারিদ্র্যের ও দুরবস্থারই পরিচয় দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বের ইহাতে অঙ্গহানি হয় না। এখন হয়তো বাঁধ বাঁধিয়া দেশকে এই প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার দিনে সেইরূপ বাঁধ বাঁধিবার কোনও উপায় দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পর যাঁহারা নবেল লিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিতেন, তাহা হইলে আমাদের এতটা আতঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা এদেশে মাসিকপত্রের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। বঙ্গদর্শনের পূর্বেও অনেক মাসিকপত্রিকা বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কী-যেন-কী একটার অভাব ছিল, তাই তাহারা সাহিত্যসমাজে প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে নাই। বঙ্গদর্শনই প্রথমে ভবিষ্যতের মাসিকপত্রের রচনারীতি ও সঙ্কলনরীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিল; তদবধি সেই রীতি মাসিকপত্রের সম্পাদকগণকর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বে মাসিকপত্র দাঁড়াইয়া ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তের প্রেরণা পাইয়াই মাসিকপত্র বঙ্গসাহিত্যে চলিতে লাগিল।

নবেলের মতো এই মাসিকসাহিত্যও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি। এক দেশের গাছের বীজ আনিয়া অন্য দেশে উহার চাষের চেষ্টা বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। আজ ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ বিদেশের দ্রব্য গ্রহণ করিব না বলিয়া আস্ফালন করিতেছে, কিন্তু বিদেশি জিনিসকে স্বদেশে স্থান দিতে ভারতবর্ষের কোনকালে আপত্তি ছিল না। আলুর বীজ ও পেঁপের বীজ বিদেশ হইতেই এদেশে আসিয়াছিল; এবং আফিমের জন্য ও তামাকের জন্য ভারতবাসী বিদেশের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ আছেন। অজ্ঞাতকুলশীল অতিথিকে আপন ঘরে স্থান দিতে ভারতবাসী কস্মিনকালে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বিদেশের সামগ্রী গ্রহণ করিতে আমাদের কোনওকালেই ঔদার্যের অভাব ছিল না। বিদেশের সকল বীজ এদেশের খেতে ধরে না, কিন্তু কোনও-কোনওটা বেশ ধরিয়া যায়। কোনও-কোনও বীজ ফলাইবার জন্য চাষের প্রণালীকে খেতের অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। নবেলের বীজ ও মাসিকপত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই আসিয়াছিল;—যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল; এখন উহার শস্যসম্পত্তিতে সুজলা সফলা বঙ্গধবিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অফিম এবং তামাক, এই দুই উপাদেয় ফসল এদেশের জমিতে যেমন লাগিয়া গিয়াছে, নবেলের এবং মাসিকপত্রিকার শস্যসম্পৎ কিছুতেই তাহার নিকট ন্যূনতম স্বীকার করিবে না।

বাংলার নবেলসাহিত্যের ও মাসিকসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি তার অপেক্ষাও বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁহার কোন কাজ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব, তিনি সাহিত্য উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে আপন ঘরে ফিরিতে বলিয়াছেন এবং সে বিষয়ে তিনি যেমন কৃতকার্য

হইয়াছেন, অন্য কেহই সেরূপ হন নাই। বিদেশের ভাষা অবলম্বন করিয়া আমরা যে বড় হইতে পারিব না, বিদেশের ভাষার সাহায্যে সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া বড় হইবার চেষ্টা যে অস্বাভাবিক ও উপহাস্য, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপূর্বে মহাত্মা রামমোহন রায় দেশের লোকের সঙ্গে কথা কহিবার জন্য দেশের ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন; তিনি বাংলায় সাময়িকপত্র প্রচার করেন, বাংলায় বেদান্তশাস্ত্র প্রকাশ করেন; দেশের লোকের মতিগতি ফিরাইবার জন্য দেশের লোকের অবোধ্য ভাষায় দেশের লোককে সম্বোধনের অদ্ভুত প্রণালী তাঁহার স্থিরবুদ্ধি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে নাই। এমনকী তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলাভাষায় প্রথম ও শেষ ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী বাঙালিরা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দুকলেজে-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, হিন্দুসন্তানের আশ্রয় বা আলম্বন, হিন্দুসন্তানের জ্ঞাতব্য ও রক্ষিতব্য কিছুই নাই। বর্বর জাতির প্রাচীন সাহিত্যে ক্ষীর-সমুদ্র ও দধিসমুদ্রের কথা ভিন্ন আর কোন কথা নাই সিদ্ধান্ত করিয়া লর্ড মেকলে এদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা আনয়ন করিলেন। বিদেশের এই নূতন আমদানি শিক্ষাকে এদেশের লোকে সমাদরে গ্রহণ করিল ও তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিল, যে এই বর্বরের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইবে। ইংরেজিশিক্ষার প্রথম ধাক্কায় আমাদিগকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া পরের দ্বারে ভিক্ষার্থীবেশে স্থাপিত করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে ডাকিয়া আনেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বাংলাভাষাকে সংস্কৃত করিয়া উহাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র উহাকে পুনঃসংস্কৃত করিয়া বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি লিখিয়া যশস্বী হইবার অস্বাভাবিক দুরভিলাষের বন্ধন হইতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদিগকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিস বাংলাদেশে চলে না। রামমোহন রায় বাংলাভাষার সাহায্যে বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন. কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙালি সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাংলাভাষাকে স্নান করাইয়া তাহার দীপ্তকলেবর শিক্ষিতসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ কর্তব্য বোধ করে নাই। রামমোহন রায়ের ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল।

আমার প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহোদয় সেদিন রাগের মাথায় তাঁহার বহুপরিশ্রমে উপার্জিত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত ডিপ্লোমাখানিকে চোতাকাগজ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধলেখকেরও ওইরূপ একখানি কাগজ আছে; কিন্তু যখন উহার উপর নির্ভর করিয়াই জীবিকা অর্জন করিতেছি এবং উহার বলেই আজি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিতেছি, তখন ওই কাগজখানির প্রতি ওরূপ অপভাষা প্রয়োগ করিতে চাহি না। এ বৎসর অনেকে বিলাতি লবণ খাইব না এই জেদ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের রক্তবিন্দুর রাসায়নিক বিশ্লেষণে এখনও ওই দ্রব্যের অস্তিত্ব ধরা পড়িবে। এতদিন ধরিয়া

বিলাতি লবণ হজম করিয়া তাহার গুণ গাহিব না পণ ধরিয়া বসিলে নিমকহারামি হইবে। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে আমরা কোনও উপকারই পাই নাই, এ কথা পুরাদমে বলিতে পারিব না। পাশ্চাত্যশিক্ষা হইতে কিছু লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের সকলকেই অল্পবিস্তর মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল, ইহাও ততোধিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রও এই আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই।

তবে বঙ্কিমের সহিত অন্যের এ বিষয়ে প্রভেদ আছে। নীর বর্জন করিয়া ক্ষীরগ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহাঁসেরই আছে। বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্যনীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ কবিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়েছেন, আমাদের মতো দাঁড়কাকের দ্বারা ততটার সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মাহাত্ম্য এই যে, তিনি কেবল ক্ষীরসংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু 'প্রচারে'-র পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো দীপ্তিমান দেখি। তিনি তখন গীতার উক্তির আশ্রয় লইয়া স্বদেশবাসীকে ভয়াবহ পরধর্ম হইতে স্বধর্মে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আহ্বান করিতেছিলেন। ভয়াবহ অভিধান দিয়া পরধর্মকে নিন্দা করা আমার অভিপ্রেত নহে; ধর্মের একটা সার্বভৌমিক এবং সনাতন অংশ আছে, তাহা সকল ধর্মেই সমান; সে অংশটুকুতে কাহারও ভীত হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ধর্মের আর একটা অংশ আছে, তাহা দেশভেদে ও কালভেদে মূর্ত্যন্তর গ্রহণ করে। ধর্ম যখন লোকস্থিতির সহায়, এবং লোকস্থিতির নিয়ম যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন, তখন ধর্মের এই অংশ দেশকালের অপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন দেশেই মানবসমাজের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। একটা মানবসমাজ পার্শ্ববর্তী মানবসমাজের সংস্পর্শে বা সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ধর্মের এই অংশ দেশকালানুরূপ না হইলে উহা তদ্দেশে ও তৎকালে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। তত্তৎদেশ ধর্মের এই অংশের সহিত তত্তৎদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীনের সহিত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিলে কোনও সামাজিক ব্যবস্থাই কোন দেশে লোকস্থিতির অনুকূল হয় না। যখন বিভিন্ন সমাজের ইতিহাস বিভিন্ন পথে চলিয়াছে, তখন লোকস্থিতির অনুরোধে ধর্মকেও আত্মসমাজের অনুকূলমূর্তি গ্রহণ করিতে হয়। এইখানেই আত্মধর্ম ও পরধর্মে ভেদ আসিয়া পড়ে। যে ধর্ম এক সমাজে লোকস্থিতির অনুকূল, সে ধর্ম অন্য সমাজে অনুকূল না হইতে পারে। এইখানে এ কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্মশব্দের লক্ষ্য রিলিজন নহে। আমাদের শাস্ত্রে ধর্মশব্দের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক; মানুষের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম,—দাঁতনকাঠির ব্যবহার হইতে ঈশ্বরোপসনা পর্যন্ত সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই হিসেবে যাহা বিদেশির ধর্ম, তাহা ভারতবাসীর ধর্ম হইতেই পারে না। ইউরোপের প্রাচীন ইতিহাস ও ইউরোপের আধুনিক সমাজতন্ত্র যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও ভারতবর্ষের আধুনিক সমাজতন্ত্রের সহিত এক নহে, তখন ইউরোপীয়দের ধর্ম

আমাদের পক্ষে পরধর্ম। উঁহাদের খ্রিস্টানির কথা বলিতেছি না, উঁহাদের আইনকানুন, আহারবিহার, চালচলন, আদবকায়দা সমস্তই আমাদের নিকট পরধর্ম; আমাদের ধর্মও তেমনি উঁহাদের নিকট পরধর্ম; এবং বিনা বিচারে ও বিনা কারণে একের পক্ষে অন্যধর্মগ্রহণ প্রকৃতপক্ষেই ভয়াবহ। সৌভাগ্যক্রমে এই পরধর্মবাৎসল্যের মোহ শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার স্বজাতিকে আপন ঘরে ফিরিবার জন্য ডাক দিলেন, তখন আমরা আগ্রহের সহিত সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আজি আমরা যে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, বিশবৎসর পূর্বেই সেই প্রত্যাবর্তনের ডাক পড়িয়াছিল; এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পথভ্রষ্ট স্বদেশবাসী সেই ডাকে সাড়া দিতে ঔদাসীন্য দেখায় নাই। আজ সেই ডাক আরও উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়াছে, এবং তপস্বী বঙ্কিমচন্দ্র মর্ত্যলোকের তপস্যার সমাধান করিয়া অদৃশ্য তপোলোক হইতে আমাদিগকে সেই পরিচিতস্বরে আবার ডাকিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ-কেহ apostle of culture বলিয়া থাকেন। ধর্মের সার্বভৌমিক অংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সমুদয় বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ সমাঞ্জস্যবিধানকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা ধর্মের এই সংজ্ঞা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি। পূর্বেই বলিয়াছি, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অবিরত সামঞ্জস্যসাধনচেষ্টার নাম জীবন, এবং যখন সমুদয় বৃত্তিব সর্বাঙ্গীন সামঞ্জস্যবিধান না ঘটিলে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ধর্মই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়—"ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"। ধর্মই মানবজীবনকে রক্ষা করে, কেবল ব্যক্তির জীবন বা বংশের জীবন কেন, সমাজের জীবনও ধর্মই রক্ষা করে; এবং যদি কেহ ঐহিক জীবনের উপর পারত্রিক জীবনের রক্ষাকেও ধর্মের উদ্দেশ্য বলিতে চাহেন, তাঁহারও সহিত আমি আজ বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্রপ্রযুক্ত ধর্মের এই বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে উহা culture অপেক্ষা ব্যাপক হইযা উঠে। এই ধর্মের অন্বেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপন ঘরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গীতাশাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপক অর্থে ধর্মশব্দ প্রয়োগ করিলে সার্বভৌমিক ও প্রাদেশিক উভয় ধর্ম উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে; এবং বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই সার্বভৌমিক ধর্মের বা প্রাদেশিক যুগধর্মের অন্বেষণের জন্যও আমাদিগকে পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে না। আজ গীতার সুলভ্ সংস্করণ লোকের পকেটে-পকেটে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরেজিশিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে; বাংলাদেশে সে জিনিস অচল থাকে না, তাহা প্রচলিত হয়; তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে দিন "নব জীবন" ও "প্রচার" আশ্রয় করিয়া বঙ্গবাসীকে তাহার আপন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত করিলেন, সেইদিন হইতে সেই শাস্ত্রকথা বাংলাদেশের শিক্ষিতসমাজে চলিতে লাগিল। তদবধি উহা আর থামে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে শিক্ষিত বাঙালির সম্মুখে স্বদেশের শাস্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার পূর্বে বঙ্গজননীর আর এক সন্তান বিশ্বজগতে পুরাণকবির চতুর্মুখনিঃসৃত এবং ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের শ্রুতিপ্রবিষ্ট বাণীর মধ্যে সার্বভৌমিক ধর্মের সন্ধান পাইয়া পুলকিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার পরে বঙ্গজননীর আর একজন সন্তান ঈশোপনিষদগ্রন্থের পরিত্যক্ত পাতার মধ্যে সেই ধর্মের সন্ধান পাইয়া আপনাকে ধন্য মানিয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বকীয় সামর্থ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আহ্বান করিয়া ভারতবাসীর যে জ্ঞানান্ধতা অপনোদন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের স্বদেশে জন্মিয়া ধন্য হইয়াছি। এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই যে, ওই দুই মহাপুরুষের অনুবর্তীরা ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য বিদেশে যাত্রা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন এবং অন্য দেশের অন্য জাতির শাস্ত্র হইতে সার্বভৌমিক ধর্মের সারসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্মপিপাসুর পিপাসা যদি তাঁহাদিগকে পানীয় অন্বেষণে পৃথিবীভ্রমণে বাধ্য করে, তাহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই বিদেশে যাত্রীদিগের পরিশ্রমের জন্য আমরা তত দুঃখিত নহি, কিন্তু বিদেশের আকর্ষণে তাঁহারা স্বদেশীসামগ্রীর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার জন্য ক্ষোভ করিবার হেতু আছে। যাহাই হউক, ধর্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে বিদেশপর্যটন অনাবশ্যক হইলেও আমরা ওই অনাবশ্যক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে আপন ঘরে প্রত্যাবর্তনের জন্য ডাক দিলেন। শিক্ষিত বাঙালি সেই আহ্বান শুনিল ও মাতৃমন্দিরে আনন্দমঠে ফিরিয়া আসিতে সংকোচবোধ করিল না।

গীতাশাস্ত্র ধর্মের কেবল সার্বভৌমিক সনাতন অংশের উপদেশ দিয়ে নিরস্ত হন নাই, প্রাদেশিক ধর্ম ও যুগধর্মের তত্ত্বও ওই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। কয়েকসহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী গীতাশাস্ত্রে যে সহস্রশীর্ষা পুরুষের মুখনিঃসৃত অভয়বাণী শুনিয়া আসিতেছে, তাঁহার সহস্র অক্ষি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম অংশে নিবদ্ধ আছে। অতএব ওই শাস্ত্রের উক্তির মধ্যে প্রাদেশিক ধর্মের ও যুগধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে না।

যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে-যুগে সম্ভূত হন, তিনি ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহাহবের যুগে কোনও মূর্তিতে সম্ভূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের মহাসাগর মন্থন করিয়া ভারতবাসীর নিকট লুপ্তপ্রায় সেই মূর্তির উদ্ধারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যত্নপর হইয়াছিলেন। লুপ্তপ্রায় বলিলাম, তাহার একটু তাৎপর্য আছে। ভারতবর্ষের বৈষ্ণবসম্প্রদায় ভগবানের যে মূর্তিকে পূজার জন্য আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রে সংশপ্তক সেনার সম্মুখীন পার্থসারথির মূর্তি নহে, তাহা বৃন্দাবনবিহারী গোপীজনবল্লভ বংশীবদনের মূর্তি; তাহা নবনীতচোর উদূখলবদ্ধ বালগোপালের মূর্তি; তাহা বৎসকুলের সহিত কেলিপর যমুনাপুলিনবিহারী গোপসখার মূর্তি;—যে মূর্তিতে ভগবান শ্রী-করধৃত মোহনমুরলীর প্রত্যেক রন্ধ্র শ্রীমুখমারুতে পূর্ণ করিয়া তদুদ্গত স্বরস্রোতে বিশ্বপ্রকৃতির মর্মস্থলে আনন্দের ধারা সঞ্চার করেন, উহা সেই মূর্তি। ঈশ্বরের ঐশ্বর্যমণ্ডিত মূর্তি ভারতবর্ষের উপাসকসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মাইতে পারে নাই; ভারতবাসী ঐশ্বর্যের অপেক্ষা মাধুর্যের উপাসনার পক্ষপাতিত্ব দেখাইবে, ইহাতেও বিস্মিত হইব না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতসাগর মন্থন করিয়া যে মূর্তিকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা যুগধর্মপ্রবর্তকের মূর্তি; তাহা ধর্মরাজ্যসংস্থাপকের মূর্তি—ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া তিনি সম্ভূত হন, উহা সেই মূর্তি; রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়া যিনি রাষ্ট্ররক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি; জীবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস করিয়া যিনি জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্তি; লোকস্থিতির অনুরোধে যিনি নির্বিকার ও নিষ্করুণ হইয়া বসুন্ধরাকে শোণিতক্লিন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহারই মূর্তি।

যিনি বিশ্বজগতের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সঞ্চারিত করুণাপ্রবাহের একমাত্র উৎস, তিনি যে কী কারণে ও কী উদ্দেশ্যে এই নিষ্করুণমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবরক্তে বসুধা সিক্ত দেখিতে বাধ্য হন, তাহা তিনিই জানেন; মনুষ্যের শাস্ত্র এখানে মূক; অথবা এই মূর্তিগ্রহণ সেই সনাতনী মায়ার সহিত অভিন্ন,—যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের জন্মাদি, যাহা হইতে জীবের জীবন, যাহা হইতে জীবনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির নিরন্তর সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা ঘটিতেছে, যাহা হইতে মানবের সকল দুঃখের নিদান সেই খ্রিস্টানকথিত পাপপ্রবণতার উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা কবির ভাষায় বলিতে পারি,—ইহা সেই আধ-সত্য, জ্ঞানী যখন তাঁহার আত্মার মধ্যে জগৎকারণের সন্ধান পাইবেন, যখন তিনি আপনাকেই এই জগদ্ভ্রান্তির কারণ বলিয়া জানিতে পাইবেন, যখন তাঁহার অপূর্ণ জগৎস্বপ্ন উদ্বোধনে বিলীন হইবে, তখন সেই মহাস্বপ্নভাঙা দিনে যে আধ-সত্য—

সত্যের সমুদ্রমাঝে হয়ে যাবে লীন।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে আর বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আমরা এই যুগধর্মপ্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট চেষ্টা দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রত্যেক কার্যই বোধ করি এই উদ্দেশ্যের অভিমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে আমাদিগের নিকট যুগধর্মের আবশ্যকতা নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং যুগধর্মের সংস্থাপনের জন্য যিনি যুগে-যুগে সম্ভূত হন, তাঁহার মহৈশ্বর্যমণ্ডিত মূর্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গজননীর প্রত্যেক সন্তানের হৃদয়ভূমি মাতৃভক্তির জাহ্নবীজলে মার্জিত করিয়া তাহাকে তাঁহার সিংহাসনস্থাপনের উপযোগী করিতে হইবে। তিনি যে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইবেন, তাহা পুণ্যতোয়ে অভিষিক্ত করা আবশ্যক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

আমরা যাঁহার বরণীয় স্মৃতির উপাসনার জন্য আজ এই সভাস্থলে* উপস্থিত হইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের সহিত ও ব্রাহ্মধর্মের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করা কঠিন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য-পরিষদের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া আমাদিগকে সেই কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তবে পারিভাষিক হিন্দুধর্ম বা পারিভাষিক ব্রাহ্মধর্ম অপেক্ষা যে সনাতন ধর্মের ভিত্তি প্রশস্ততর, সেই ভিত্তির আশ্রয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যসমুজ্জ্বল মূর্তির প্রতি অকুতোভয়ে দৃষ্টিপাত করিতে পারি। আরও আহ্লাদের বিষয় এই যে, সেই সনাতন ধর্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্বাসিত করিয়া,—সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া,—দেখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অন্য দেশে ধর্মের পারিভাষিক সংজ্ঞা যাহাই হউক, আমাদের এই ভারতবর্ষে ধর্মের সংজ্ঞা আয়ত ও প্রশস্ত। যাহা ধরিয়া আছে, তাহাই ধর্ম; যাহা মানবের ব্যক্তিগত জীবনকে ধরিয়া আছে, যাহা মানবের সামাজিক জীবনকে ধরিয়া আছে ও আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া আছে, আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশক্রমে তাহারই নাম ধর্ম। সাহিত্য তাহার অঙ্গীভূত। ধর্মরূপ সনাতন অশ্বত্থের মূল রহিয়াছে ঊর্ধ্বে দেবলোকে। ইহার শাখাপ্রশাখা অবাঙ্মুখে প্রসারিত হইয়া মানবসমাজের কর্মরূপ ফুল-ফলে ও পত্রপল্লবে স্ফূর্তি পাইতেছে। মানবজীবনের যাহাতে স্ফূর্তি, ধর্মের তথায় অধিকার; সাহিত্যে মানবজীবনের স্ফূর্তি, অতএব সাহিত্য ধর্মের অধিকারবহির্ভূত নহে। লোকস্থিতি ধর্মের অভিপ্রায়—সাহিত্য লোকস্থিতির সহায়—অতএব সাহিত্যকে ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেখিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের সহিত মানুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, মানুষকে মানুষের সহিত করিযা, ভবিষ্যৎকে অতীতের সহিত করিয়া লোকস্থিতির আনুকূল্য করাই সাহিত্যের একমাত্র ব্যবসায়। অতএব সাহিত্যকে ধর্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই। যে চতুষ্টয়ী বাণী বিশ্ববিধাতার চতুর্মুখ হইতে সমীরিত হইয়া আমাদের পূর্বপিতামহ মহর্ষিগণের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ও তাঁহাদের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভারতসমাজে আদর্শসাহিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহারসম্পাদনার্থ যে কিছু লৌকিকসাহিত্য বর্তমান আছে বা ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবে, তাহা সেই অপৌরুষেয় বাণীর স্মৃতি ও অনুস্মৃতি ও প্রতিধ্বনি বলিয়া আমরা ভারতবাসী যুগ ব্যাপিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি; পুরাতনী বাগ্বাদিনীর বীণার তন্ত্রীতে তাহাই বিবিধ মূর্ছনায় যুগ ব্যাপিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার করধৃত পুস্তক মধ্যে তাহাই মসীলেখে অঙ্কিত ও নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রলয়কালে মহাবরাহের দ্রংষ্ট্রার উপর যখন বসুন্ধরা অবস্থান করেন, ধর্ম তখন মূর্তিমান হইয়া সেই সনাতন সাহিত্যকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। এই পুরাতন সমাজতরণী যখন স্বদেশের অজ্ঞানে ও বিদেশের অনাচারে বিপ্লুত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকস্থিতির আনুকূল্যের

* মহর্ষির মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক জেনারল এসেমব্লি কলেজে যে শোকসভায় অধিবেশন হয়।

জন্য সেই প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন; সেই পুরাতনী বাণীর বৈদেশিক বিকৃত প্রতিধ্বনিতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

যাহার নাম ধর্ম, তাহাই স্বভাব এবং স্বভাবের নামান্তর স্বাস্থ্য। স্বভাবের অতিক্রমের নাম ব্যাধি, এবং আমার বিবেচনায় আমাদের বর্তমান অবস্থায় বিদেশের প্রবল আক্রমণে আমাদিগকে যে অস্বাভাবিকতায় উপনীত করিয়াছে, তাহাই আমাদের একমাত্র ব্যাধি। এই অস্বাভাবিকতারূপ মহাব্যাধি আমাদিগের পক্ষে নানা উৎকট লক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা বৈদেশিকের পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণ করিতে লজ্জাবোধ করি না, আমরা স্বদেশিকে বিদেশির ভাষায় বিকৃত উচ্চারণে আহ্বান করিতে লজ্জিত হই না। এই সকল অস্বাভাবিক আচরণ আমাদিগকে সর্বত্র অশোভন ও অসমঞ্জস করিয়া তুলিয়াছে। মহর্ষি নিজজীবনে এই অস্বাভাবিকতাকে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। যাঁহারা তাঁহার জীবনের আখ্যান জানেন, তাঁহারাই বলিবেন, এই অস্বাভাবিকতার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কী উৎকট ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। সে দিন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় পড়িতেছিলাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মপ্রচারকালে ইংরেজি বাগ্মিতার প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। এই একটি আচরণেই আমরা তাঁহাকে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার বিরোধীরূপে দেখিতে পাই; অন্য উদাহরণের সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহর্ষিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবকরূপে প্রতিপন্ন করিতে গেলে তাঁহাতে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি সমাজমধ্যে যে ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, যে আন্দোলনে আমাদের শিক্ষিতসমাজ এককালে ক্ষুব্ধ ও তরঙ্গিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রভাব বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে বর্তমান থাকিবে। সেই বর্ষাকালের ঝটিকা-দুর্যোগ এখন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তখন যে সকল ভাবের উৎস খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার ধারাপ্রবাহে যে কলনাদিনী স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বঙ্গের সাহিত্যভূমিকে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্যকভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন,স্বাতন্ত্র্যের সহকারে সংযমই ভারতসমাজের প্রধান লক্ষণ। আমরা যাঁহারা তিরোভাবে শোকপ্রকাশের জন্য অদ্য এই সভ্যস্থলে সমবেত হইয়াছি, তিনি সেই ভারতসমাজের নেতা মহর্ষিগণেরই সন্তান ছিলেন, ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমই তাঁহার মহনীয় চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। ভগীরথের ন্যায় শঙ্খধ্বনিপূর্বক তিনি যে অভিনব সাহিত্যের ভাগীরথী বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্যের সহিত সংযমকেই তাহার প্রধান লক্ষণস্বরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার অসামান্যক্ষমতাশালী পুত্রগণ বঙ্গসাহিত্যে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পুত্রগণের সেই কৃতিত্ব পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কোনও উপায় নাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণে' যে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাই, সার সত্যের আলোচনায় তাহা সংযমদ্বারা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে; রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'মানসী'-র স্বাতন্ত্র্য 'স্বদেশী সমাজ'-এর কল্যাণপ্রদ সংযমে পরিণত হইয়াছে। তিনি একাধারে যে স্বাতন্ত্র্য ও সংযমের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, প্রার্থনা করি, সেই মহাদর্শ বঙ্গীয় সমাজকে ও বঙ্গীয় সাহিত্যকে কর্তব্যপথ প্রদর্শন করুক। তিনি যে মনস্বী পুত্রগণে তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট স্মরণচিহ্ন আমাদিগকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা চিরজীবী হইয়া বঙ্গভারতীর ক্রোড়দেশ অলঙ্কৃত করুন।

হর্মান হেলমহোলৎজ

চারিমাস মাত্র হইল,* হেলমহোলৎজের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন জানে যে, পৃথিবী হইতে একটা দিকপাল অন্তর্হিত হইয়াছে। হেলমহোলৎজের জন্য শোক করিবার অবস্থা আমাদের এখনো হয় নাই। কখনও হইবে কি?

জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ; কিন্তু হেলমহোলৎজের মতো লোক ধরাধামে কয়টা জন্মিয়াছে? হেলমহোলৎজ মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্য যতটুকু অমরতার দাওয়া করিতে পারে, তাহা তাঁহার প্রাপ্য।

ছোটখাটো পাহাড় পর্বত যথেষ্ট সংখ্যায় বর্তমান থাকিয়া ধরাতলের বন্ধুরতা সম্পাদন করিতেছে। কিন্তু গৌরবে ও মহিমায় ধবলগিরি অধিক স্থানে স্পর্ধিত হয় না। হেলমহোলৎজ নরসমাজে এইরূপ একটা ধবলগিরি ছিলেন।

ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে-যুগে যদি অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করা যায়, এবং জ্ঞানের বিস্তার যদি ধর্মসংস্থাপনের একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে হেলমহোলৎজ নরসমাজে 'অবতীর্ণ' হইয়াছিলেন।

হেলমহোলৎজ জ্ঞানের পরিধি কতদূর প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বিবৃত করিতে পারি, এমন স্পর্ধা করি না। সৌভাগ্যক্রমে লন্ডন রয়াল সোসাইটির গত অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড কেলবিন এবিষয়ে আপনার অক্ষমতা স্বীকার করিয়া, সম্প্রতি ভূপৃষ্ঠে বর্তমান অন্যান্য প্রাণীকে তজ্জন্য লজ্জার দায়ে অব্যাহতি দিয়াছেন। মহাজনের নামকীর্তনের যদি কিছু পুণ্য থাকে, কিঞ্চিৎমাত্রায় সেই সুলভ পুণ্যসঞ্চয়ের প্রয়াসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জার্মানির পতসদাম নগরে ১৮২১ সালে হেলমহোলৎজের জন্ম হয়। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভবিষ্যতে যিনি মানবের বিজ্ঞানেতিহাসে লিপিবদ্ধ করিবেন, এই তেয়াত্তর বৎসর বিস্মৃত হইলে তাঁহার চলিবে না।

আমাদের দেশের বালকগণের প্রবল বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, ইংরেজি ব্যাকরণ, ইংরেজি ভূগোল, ইংরেজি ইতিহাস, কিছুমাত্র দন্তস্ফুট করিবার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও, গলাধঃকরণ করিবার সনাতন নিয়ম প্রচলিত আছে। আমনুপ্রচলিত নিয়মচক্রের নেমি ভারতবর্ষেও ক্ষুণ্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারে; এমনকী, জগৎচক্রের নিয়মগ্রন্থিও দুই একটা শিথিল হইবার সম্ভব; কিন্তু আমাদের পাঠশালামধ্যে এই প্রাচীন নিয়মগুলির রেখামাত্র ব্যভিচারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে একটা ভরসা, আমাদের ভারতবর্ষে ইংরাজি সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচলিত, ইউরোপেও গ্রিকলাতিনের অধ্যাপনাসত্ত্বেও অদ্যাপি তাহা বর্তমান। সুতরাং আমাদের ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু, 'মহাজনো যেন গতঃ' ইত্যাদি।

যাহাই হউক, সনাতন নিয়মানুসারে হেলমহোলৎজকেও ক্লাসে বসিয়া গ্রিক লাতিন

* ১৮৯৪ অব্দে পঠিত

গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। শুনা যায়, প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই কৃষ্ণনামস্মরণে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং ষণ্ডামার্কের প্রচণ্ড শাসনও সরস্বতীর নিকট তাহার মাথা নোয়াইতে সমর্থ হয় নাই। হেলমহোলৎজের সম্বন্ধে সেরূপ কোনো নিন্দাবাদ প্রচলিত নাই; তবে তিনি যে ক্লাসে বসিয়া ক্লাসিকের মাস্টারকে ফাঁকি দিয়া জ্যামিতির আঁক করিতেন, তাহা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই নীতিবিরুদ্ধ অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য কখনও তাঁহাকে মাস্টারের বেত্রাঘাত লাভ করিতে হইয়াছিল কি না, জানি না। জানিলে, অন্তত আমরা কিছু সান্ত্বনা লাভ করিতাম।

পাঠাবস্থায় পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার একটু অনুরাগ ও ঝোঁক ছিল; এমনকী, জ্যামিতি ও বীজগণিতের অপেক্ষাও তিনি জড় ও জড়ের গুণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ভালোবাসিতেন। সাংসারিক অবস্থার অনুরোধে পিতার আদেশে তাঁহাকে ডাক্তারি শিখিতে হয়। "ফ্রেডরিক উইলিয়ম ইনস্টিটিউটে" ডাক্তারি শিখিয়া সৈনিকবিভাগে কর্ম লইয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। তবে ডাক্তারি ব্যবসায়ে সেই মহার্ঘ জীবনের অপব্যয় হয় নাই। ডাক্তারি হইতে জীববিদ্যা, তাহা হইতে পদার্থবিদ্যা, তাহা হইতে গণিতবিদ্যা, তাহা হইতে মনোবিজ্ঞান ও দর্শন, এইরূপে ক্রমে মনুষ্যজাতির জ্ঞানমহার্ণবের এপার হইতে ওপার পর্যন্ত সাঁতার দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। কী পরাক্রম!

ডাক্তারি ছাড়িয়া তাঁহাকে নানাস্থানে অধ্যাপকতা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সহকারিত্ব, পরে অধ্যাপকতা। তিনি কনিগসবর্গ, হিদেলবর্গ, বন, এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার অধ্যাপনা করিয়া, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭১ সাল হইতে শেষপর্যন্ত তিনি এই কার্যেই নিযুক্ত ছিলেন।

আর সম্মানের কথা! রাজগোষ্ঠী, পণ্ডিতসমাজ ও জনসমাজ, দেশি ও বিদেশি, যাঁর যতদূর সাধ্য, তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে ত্রুটি করে নাই। এরূপ স্থলে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ কৃতজ্ঞতাস্বীকার ও ঋণশোধের চেষ্টা; কিন্তু এ ঋণ কি শোধিবার?

শরীরবিদ্যাবিষয়ে হেলমহোলৎজ জোহান মূলরের ছাত্র ছিলেন। যেমন গুরু, তেমনি শিষ্য; কাহাকে দেখিবে বলো? আমাদিগকে দৃষ্টিমাত্রেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের স্বদেশে গুরুও নাই; শিষ্যও নাই; এখানে কাহাকে দেখিব? হায় আমাদের অদৃষ্ট! চিরদিনই কি আমাদের এমনি ছিল! এমন দিন কি আসিবে না যে, শিষ্যের মতো গুরু ও গুরুর মতো শিষ্য এই ভারতবর্ষেও আবার দেখা যাইবে?

গুরুর প্রবর্তনায় হেলমহোলৎজ অজ্ঞানের তামস রাজ্যে দিগ্বিজয়ার্থ প্রবেশে সাহসী হয়েন। সে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বের কথা; তারপর সেই তামস রাজ্যের কতটা তাঁহারই অধ্যবসায়ে আলোকিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কীরূপে জানাইব?

সেই সময়ে হেলম্‌হোলৎজ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েন। জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহার দ্বারা তিনি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করেন। আজকাল শিক্ষার্থীর ঘরে-ঘরে অণুবীক্ষণ রহিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে জার্মানিতেও তাহা ছিল না। অণুবীক্ষণ অনেকের ঘরে দেখা যায় বটে, কিন্তু হেলম্‌হোলৎজ তাহার মধ্যে কয় জন?

যাহা হউক, সেই অণুবীক্ষণ ক্রয়ের পর তাঁহার হাতে যে দুই-একটা প্রকাণ্ড কাজ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ব্যাকটেরিয়ার নাম আজ লোকের মুখে-মুখে;—বিশেষ সম্প্রতি কলিকাতা শহরে

ওলাওঠা ও বসন্তের এই প্রকোপকালে। সম্প্রতি কলিকাতার অর্ধেক লোক বসন্তের টিকা লইল; বাকি অর্ধেক হয়তো দুই দিন পরে ওলাওঠার টিকা লইবে। যেরূপ হাওয়ার গতি দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন পরে কুক্কুরদংশনেও টিকা লইতে হইবে, ইহা বোধ করি বিধাতার বিধান,—ভবিতব্য। বস্তুত শ্বাপদসমাকুলা অরণ্যানী আর মানুষের ভয়বিধায়িনী নহে; শয্যাতলে লুক্কায়িতা কালভুজঙ্গিনীও আর যমদূতী নহে; এখন স্থূলদৃষ্টির অগোচর কমা-বাসিলাস অথবা দাঁড়ি-ভিব্রিও কখন কোন অলক্ষিতে দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অকস্মাৎ অন্তরাত্মাকে তাহার প্রিয়তম আধার হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে, এই আশঙ্কাতেই অন্তরাত্মা এক রকম পূর্ব হইতেই ওষ্ঠপ্রান্তে অবস্থিত থাকেন। প্রকৃতই আজকাল শঙ্কাভিঃ সর্বমাক্রান্তম্। জীবিতব্য কীরূপে, ভাবিবার দরকার নাই; জীবন যে এ পর্যন্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য।

জীববিদ্যাঘটিত এই নূতন তত্ত্বের সহিত মহাত্মা পাস্তুরের নাম চিরকালের জন্য গ্রথিত রহিয়াছে; কিন্তু সকলে হয়তো জানেন না যে এই নূতন মন্ত্রের হেলমহোলৎজই পুরাতন ঋষি।

জৈব পদার্থ কীরূপে পচিয়া যায়, ইহা একটা রসায়নশাস্ত্রের সমস্যা। পচিবার সময় জৈব পদার্থের অঙ্গারভাগ বায়ুস্থিত অম্লজানের সহযোগে ধীরে-ধীরে পুড়িয়া যায়, ইহা অবশ্য রাসায়নিকগণের পুরাতন আবিষ্কার। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রায়-অতীন্দ্রিয় জীবাণু যে এই অবকাশে অপ্রতিহতপ্রভাবে আপনাদের শরীরপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি সাধিত করিয়া লয়, এই গুপ্ত বার্তাটুকু কিছুদিন পূর্বে কেহই জানিতেন না। আজকাল অবশ্য টিণ্ডাল প্রভৃতির প্রসাদে এইরূপ দুই চারিটা কথার সংবাদ রাখা বড়ই সুকর হইয়াছে; এবং যে জানে না, সে কতকটা ত্রেতাযুগের জীব বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ফলে হেলম্‌হোলৎজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁহার নূতন ক্রীত অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পচনশীল দ্রব্যে এই জীবাণুর অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কার করেন। শুধু অস্তিত্বের আবিষ্কার নহে; এই জীবাণুর অবস্থিতিই যে পচনক্রিয়ার একমাত্র কারণ; যেখানে জীবাণুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ, সেখানে জৈব পদার্থ সহস্র বৎসর অম্লজানের স্পর্শে রক্ষিত হইলেও পচিবে না। শর্করায় মাদকত্বের উৎপত্তি ঠিক এই পচনক্রিয়ারই অনুরূপ; ইহাতেও জীবাণু বিশেষের অবিস্থিতি আবশ্যক; এ সমুদয়ই হেলমহোলৎজ সপ্রমাণ করেন। একটা আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা ছিল—হয়তো সেই-সেই জীবাণুর শরীর হইতে এরূপ কোনও রস বা বিষ নিঃসৃত হয়, যাহা শুদ্ধ রাসায়নিক ক্রিয়াবলে জৈব পদার্থকে বিকৃত করে ও শর্করাকে সুরায় পরিণত করিয়া থাকে। হেলমহোলৎজ শর্করা ও জীবাণুর মাঝে একখানি সূক্ষ্ম পরদা রাখিয়া দেখাইলেন যে, পরদাখানি নিঃসৃত রসের সঞ্চার বোধ করিতে পারে না, জীবাণুগণেরই সঞ্চার রোধ করে মাত্র। কিন্তু এরূপ স্থলে চিনিরও মদ্যে পরিণতি ঘটে না। সিদ্ধান্ত হইল, এই ব্যাপারটা জৈব প্রক্রিয়া; রাসায়নিক প্রক্রিয়া নহে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কীরূপ বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলে না জানিতে পারেন; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখও অসম্ভব। পাস্তুরের মহিমান্বিত আবিষক্রিয়াপরম্পরায় ইতিবৃত্ত লিখিতে বসিয়া হেলমহোলৎজের নাম উল্লেখ না করিলে চলিবে না।

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়; নির্জীব জড় হইতে কখনো জীব জন্মিতে দেখা যায় নাই; এই তথ্যের আবিষ্কার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতেই আসিয়াছে। যাঁহারা বানর হইতে

মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে মনে আনিতেও একটা নৈতিক মহাপ্রলয়ের আশঙ্কা করিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাঁহাদের অনেকে অবলীলাক্রমে নির্জীব জড়পদার্থ হইতে অকস্মাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীরী জীবের উদ্ভব স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। স্বেদ, মল, আবর্জনা হইতে বিধাতার মর্জিতে বড়-বড় কীটের বা পতঙ্গের উৎপত্তি আপনা হইতে হয়, ইহাতে আমাদের দেশের অনেক বড়-বড় পণ্ডিতেরও ধ্রুব বিশ্বাস। তবে শুধু আমাদের দেশেই নহে।

শরীরবিদ্যায়, স্নায়ুযন্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াসম্বন্ধে হেলমহোলৎজ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ও উদ্ভাবনশক্তি কীরূপে জটিল সমস্যার তথ্যোদ্ভেদে সমর্থ হইত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

জীবদেহে স্নায়ুসূত্রগুলি টেলিগ্রাফের তারের সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। তাহারা বাহিরের খবর ভিতরে পৌঁছাইয়া দেয় ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনে। সংবাদবহন তাহাদের কাজ। তড়িৎ-শক্তি যেমন কয়েকটি সংকেত আশ্রয় করিয়া এক প্রান্তের বার্তা অন্য প্রান্তে উপস্থিত করে, ইহারাও সেইরূপ সংকেতের আশ্রয় করিয়া বাহিরের বার্তা ভিতরে প্রেরণ করে ও ভিতরের আদেশ বাহিরে আনয়ন করেন। মস্তিষ্ক অর্থাৎ হেড অপিস কতকগুলি সংকেত পাইয়া তাহার অর্থ আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত থাকে ও অর্থ আবিষ্কারের পর তদনুযায়ী কার্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

স্নায়ুসূত্রের কার্য সংবাদপ্রেরণ; তবে এই সংবাদপ্রেরণে সময় আবশ্যক হয় কি না? তড়িৎ-প্রবাহযোগে বার্তাপ্রেরণেও কিছু-না-কিছু সময় দরকার; আলোকেরও সুদূরস্থ নক্ষত্র হইতে পৃথিবী পৌঁছিতে সময় দরকার হয়। স্নায়ুসূত্রের ভিতরে এই স্রোত কি বেগে প্রবাহিত হয়? হেলমহোলৎজ প্রথমে দেখান, এই স্রোতের বেগ সেকেন্ডে ষাট হাত মাত্র; তড়িৎ প্রবাহ বা আলোকতরঙ্গের তুলনায় নগণ্য। অর্থাৎ কি না, একটা ষাটি হাত লম্বা তিমি মাছের লেজে বল্লমের খোঁচা বিঁধিলে মস্তিষ্কে তাহার খবর পৌঁছিতে অন্তত এক সেকেন্ড সময় লাগিবে; অথবা এক সেকেন্ড পরে সে বুঝিবে যে, এত বড় একটা প্রাণঘাতক ব্যাপার উপস্থিত। আবার, আঘাতের পর মস্তিষ্ক হইতে আদেশ আসিয়া তাহার লেজ সরাইয়া লইতে অন্তত আর এক সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হইবে।

শুনা যায়, ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক হইতে কর্ণ দুই ক্রোশ তফাতে অবস্থিত ছিল। হে ত্রৈরাশিকজ্ঞ মানব, বলো দেখি, কপিরাজ সুগ্রীবকর্তৃক উক্ত রক্ষঃপ্রবীরের কর্ণচ্ছেদন ব্যাপার সংঘটনের কতক্ষণ পরে তিনি টের পান?

বলিতে গেলে আধুনিক শব্দবিজ্ঞান হেলমহোলৎজেরই গঠিত; তাঁহারই "হাতে মানুষকরা" ছেলে। হেলমহোলৎজের পূর্বে শব্দবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞান সম্বন্ধে গোটা কতক মোটা কথা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র। তিনিই সঙ্গীতবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কীরূপে একটি বিশুদ্ধ স্বরের সহকারে তাহার ঊর্ধ্বতনগ্রামবর্তী স্বরাবলি সমবেত ও জড়িত হইয়া ওই মূল স্বরটিকে বিবিধ নাদে ধ্বনিত করে। কখনও সুরের সহিত সুরের মিল ঘটিয়া প্রীতি জন্মে। কখনও মিলের অভাবে প্রীতির ব্যাঘাত হয়; নরকণ্ঠ-নিঃসৃত বিবিধ স্বরকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কী-কী মৌলিক সুর বাহির করা যায়, কীরূপে যন্ত্রোদ্গত কতিপয় মৌলিক সুরকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বিভিন্ন নরকণ্ঠাগত স্বরে উৎপাদন করিতে পারা যায়; ইত্যাদি নানা কথা এবং এই সকল শব্দব্যাপারের সময়ে শব্দসঞ্চালক বায়ুমধ্যে ও শব্দোৎপাদক কঠিন দ্রব্যে কীরূপ আণবিক

গতি সংঘটিত হয়, হেলমহোলৎজের শব্দবিজ্ঞানসংক্রান্ত মহাগ্রন্থ প্রচারের পূর্বে এ সমুদয়ই আঁধারে ছিল। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংগঠনপ্রণালী, এবং কীরূপে বায়ুসঞ্চারী উর্মিগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন অঙ্গে কীরূপে প্রতিহত হইয়া কীরূপ কাণ্ড ঘটাইয়া দেয়; এ সমুদয় তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচার পূর্বে ছিল না। স্বরবিজ্ঞান ও সঙ্গীতবিজ্ঞানের সহকারে যে-যে মনোবিজ্ঞানঘটিত গভীর সমস্যা আপনা হইতে উপস্থিত হয়, হেলমহোলৎজের পূর্বে কে তাহার মীমাংসায় সাহসী হইত?

শব্দবিজ্ঞানের পর দৃষ্টিবিজ্ঞান। হেলমহোলৎজের আবিষ্কৃত দৃষ্টিবিজ্ঞানঘটিত তথ্যগুলির মাহাত্ম্যের উপলব্ধি করাই কঠিন। তাঁহার আবিষ্কৃত চক্ষুবীক্ষণ (ophthalmoscope) যন্ত্রের উল্লেখ বোধ করি অনাবশ্যক। চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষায় জন্য আজকাল এই যন্ত্র ডাক্তারদের একমাত্র অবলম্বন।

দৃষ্টিসম্বন্ধে অনেক রহস্য, যাহা সর্বদা আমাদের জ্ঞানের ভিতর আইসে না, তাহা হেলমহোলৎজ প্রথমে দেখাইয়া দেয়। রেটিনা নামক স্নায়বিক পরদার গঠন কীরূপ, চোখের পরকলার কোথায় কতটা বক্রতা, দর্শনেন্দ্রিয়ের গঠনে কী-কী নানাবিধ সাধারণ ও অসাধারণ দোষ বর্তমান রহিয়াছে, দূরদৃষ্টির ও নিকটদৃষ্টির সময়ে কীরূপে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশ ঘুরাইতে ফেরাইতে হয়, কীরূপে বিভিন্ন পদার্থের দূরত্বের উপলব্ধি হয়, কীরূপে দ্রব্যমাত্রকে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ, তিনগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ জন্মে; বর্ণের উজ্জ্বলতায় কীরূপে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়; কীরূপে তিনটিমাত্র মূল বর্ণের বোধ স্বীকার করিয়া লইলে সেই তিনটি মৌলিক অনুভূতিরই বিবিধবিধানে সংমিশ্রণদ্বারা অসংখ্য বিচিত্র বর্ণজ্ঞানের উৎপত্তি বুঝানো যাইতে পারে; কীরূপে ইহারই মধ্যে একটি মৌলিক বোধের অভাব ঘটিলে মানুষে রঙকানা হইয়া যায়; দৃষ্টিগোচর দ্রব্যমাত্রেরই কোন অংশটা বস্তুত আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর, আর কোন অংশটাই বা মানসগোচর, অর্থাৎ একটা বস্তুর কতটা আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, আর কতটাই বা মনে-মনে কল্পনা দ্বারা গড়িয়া লই; ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হেলমহোলৎজ যে সকল রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহার নামোল্লেখমাত্র দ্বারা বিবরণ দেওয়াই অসম্ভব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান কীরূপে বাহির হইতে এই দ্বারপথে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় এ পর্যন্ত নিতান্ত সংকীর্ণ ও পরিমিত ছিল। বাহিরে জড়প্রকৃতিতে নানাবিধ আনাগোনা আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ সেই সকলের বার্তা কোনও মতে মস্তিষ্কের হেডআপিসে পৌঁছাইয়া দেয়, এবং আমাদের অন্তঃকরণ সেই সংকেতগুলি বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া নানাবিধ প্রণালীতে নানাবিধ গঠন প্রস্তুত করে, কতক সুন্দর বোধে ও আবশ্যক বোধে গ্রহণ ও কতক অনাবশ্যক বোধে ত্যাগ করিয়া জীবনের স্থিতি, গতি, পুষ্টি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধানে নিরত থাকে। বাহিরে কীরূপ আনাগোনা আন্দোলন চলিতেছে, ইহা জড়বিজ্ঞান বা পদার্থবিদ্যার বিষয়; ইন্দ্রিয়গণ কীরূপে এই সকল আন্দোলনের বার্তা মস্তিষ্কে হাজির করে, ইহা জীববিদ্যা ও শরীরবিদ্যার বিষয়; এবং অন্তঃকরণ সেই বার্তাগুলি বা সংকেতগুলিকে কীরূপে গোছাইয়া ও সাজাইয়া সেই উপাদানসকলে বিশ্বজগৎ নির্মাণ করিতে বসে, তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। স্থূলত, এই তিন ছাড়িয়া আর কোনও বিজ্ঞান নাই। পণ্ডিতগণের মধ্যে এক-এক ব্যক্তি ইহার একটিমাত্র অথবা একটিরই কোনও সংকীর্ণ অংশমাত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। জ্ঞানসাম্রাজ্যের তিন মহাদেশে একই সময়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে

পারেন, হেলমহোলৎজ এইরূপ কৃতকর্মা পুরুষ ছিলেন; বোধ করি এবিষয়ে তিনি তাৎকালিক মনুষ্যমধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

শ্রুতি ও দৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে সর্বপ্রধান; সূক্ষ্মতায় অথবা প্রভাবে অন্য ইন্দ্রিয় এই উভয়ের সমকক্ষ নহে। প্রধানত শ্রুতি ও দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই আমরা এই বিচিত্র সুন্দর জগৎ নির্মাণ করিয়া লইয়াছি। অন্যান্য ইন্দ্রিয় ইহাদের সাহায্য করে মাত্র। এই দুই ইন্দ্রিয়, ইহাদের গঠন, ইহাদের বিষয়, ও ইহাদের ক্রিয়া, এ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা অপর কেহ করে নাই।

জড়জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের এমনকী সম্বন্ধ আছে যে, কতকগুলি জিনিসকে আমরা সুন্দর কী, কতকগুলিকে কুৎসিত দেখি? আমাদের এই সৌন্দর্যবোধের মূল কী? এই সৌন্দর্যবোধ কোথা হইতে আইসে? এই গভীর তত্ত্বের মীমাংসার জন্য মানব বহুদিন হইতে লালায়িত। সৌন্দর্যতত্ত্বের মীমাংসা একা হেলমহোলৎজ হইতে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, অন্য কোনও ব্যক্তি হইতে তাহা হয় নাই। হেলমহোলৎজই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। জড়ের সহিত মনের কী সম্বন্ধ, এই গভীর সমস্যার মীমাংসার জন্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। যে পথে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে, হেলমহোলৎজই তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৪৭ সালে ভৌতিক শক্তির অনশ্বরতা সম্বন্ধে হেলমহোলৎজের বিখ্যাত প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। তাহার পর পদার্থবিদ্যা রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। একটা সু-কৌশল যন্ত্র বানাইয়া দিলে উহা বিনাশ্রমে বিনা ব্যয়ে চিরদিন ধরিয়া চলিতে পারিবে ও কাজ দিবে, সে কালের লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখনও যে এই বিশ্বাসের ধারা অন্তঃসলিল প্রবাহের ন্যায় বহিতেছে না, এমন নহে। জড়ের সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এই তত্ত্ব কিছুদিন পূর্বে রসায়নবিজ্ঞানের জন্মদাতা লাবোয়াশিয়ে কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছিল; কিন্তু শক্তিরও যে সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই, এ তত্ত্ব তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, সৎ অসতে পরিণত হয় না, এইরূপ একটা বাক্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে; কিন্তু ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও প্রমাণ ছিল না; এবং এই স্বতঃসিদ্ধ হইতে কী সিদ্ধান্ত হয় বা না হয়, তাহারও কেহ ধ্রুব নির্দেশে সাহস করিতেন না। শক্তির বহুরূপিতা হেলমহোলৎজের কিছু দিন পূর্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির অনশ্বরতাকে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপাদনের কার্য, হেলমহোলৎজেরই প্রতিভার অপেক্ষায় ছিল।

এক হিসেবে মনুষ্যশরীরকে যন্ত্রহিসেবে দেখা যায়। তবে সেকালে অন্য যন্ত্রের সহিত দেহযন্ত্রের কোনওরূপ তুলনা সম্ভবিত না। বাষ্পযন্ত্রে কয়লা পোড়াইতে হয়; ঘটিকাযন্ত্রে মাঝে-মাঝে দম দিতে হয়; কিন্তু দেহযন্ত্রে জীবনরূপ একটা কী-জানি-কী অতিপ্রাকৃত শক্তি বিনা ব্যয়ে, বিনাশ্রমে কার্য চালাইতেছে, এইরূপ একটা বিশ্বাস সকলেরই ছিল। হেলমহোলৎজের লিখিত উক্ত প্রবন্ধপ্রকাশের পর হইতে কথা উঠিয়াছে যে, জীবন হয়তো একটা কবিজনোচিত কল্পনামাত্র, একটা আভিধানিক শব্দমাত্র, কতকগুলি ক্রিয়াসমষ্টির অভিধানমাত্র। কয়লা না পোড়াইলে যেমন বাষ্পযন্ত্র চলে না, কয়লা না পোড়াইলে সেইরূপ দেহযন্ত্রেরও চলিবার সম্ভাবনা নাই, এবং এই উভয় কয়লাই আমাদের সেই চিরপরিচিত কৃষ্ণকায় অঙ্গার।

আমাদের সৌরজগৎ আর একটা প্রকাণ্ডতর যন্ত্র। সূর্যমণ্ডল হইতে রাশি-রাশি শক্তি বাহির হইয়া তাপরূপে ও আলোকরূপে দিগদিগন্তে আকীর্ণ হইতেছে, ও তাহারই কণিকামাত্র পাইয়া গ্রহে উপগ্রহে নানাবিধ ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীতে যে বায়ু বহে, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, বৃক্ষ, লতা, কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ পর্যন্ত জন্মে ও মরে, হাসে ও কাঁদে, খেলা করে ও নাচিয়া বেড়ায়, সূর্যমণ্ডল হইতে সমাগত কণিকাপ্রমাণ শক্তিই এই সমুদয়ের কারণ। কিন্তু এই অপরিমেয় শক্তি আসিল কোথা হইতে? হেলমহোলৎজ দেখাইয়াছিলেন, যে সূর্যমণ্ডলে এই শক্তির ভাণ্ডার, অন্যত্র নহে; ইহারও পরিমাণ আছে ও ক্ষয় আছে। কোথা হইতে এই ভাণ্ডার সংগৃহীত হইল, এবং এই ব্যয়েরই বা পরিমাণ কী, হেলমহোলৎজ তাহারও হিসেব দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই হিসাব সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। সৌরজগৎরূপ মহাযন্ত্র কীরূপে কত দিন হইতে চলিতেছে, তাহা গণিবার উপায় হেলমহোলৎজের নিকটেই মানবজাতি শিখিয়াছে।

গণিতশাস্ত্রে হেলমহোলৎজ কী করিয়াছেন, কীরূপে বুঝাইব? দীনা বঙ্গভাষা ও দীন বঙ্গসাহিত্য; অন্য দেশে যাহা সম্পাদিত হইয়াছে এ দেশে তাহার বর্ণনারও উপায় নাই।

মহামতি লর্ড কেলবিনের বিখ্যাত vortex theory-র কথা অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। জগদ্ব্যাপী আকাশে বা ইথারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আবর্তের নাম জড়পরমাণু। হেলমহোলৎজের প্রতিভা এই পরমাণুতত্ত্বের বীজ রোপণ করিয়াছিল। ঘর্ষণক্ষমতা-বর্জিত তরলপদার্থে আবর্তোৎপাদন গণিবার যে প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, বেলাভূমিতে ঊর্মিরেখার ও বায়ুমধ্যে মেঘের উৎপত্তি হইতে আকাশমধ্যে জড়পরমাণুর উৎপত্তি পর্যন্ত বুঝাইতে সেই প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেলমহোলৎজ অনেক নূতন গড়িয়াছেন, আবার অনেক পুরাতন ভাঙিয়াছেন। ইউক্লিডের সময় হইতে মানবজাতি আজ পর্যন্ত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লইয়া জ্যামিতিবিদ্যা অথবা দেশতত্ত্ব গঠন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। আজকাল সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির মূল ভিত্তি লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে। কে বলিল, আমাদের দেশের (অর্থাৎ আকাশের) সীমা নাই? কে বলিল, আমাদের দেশ সর্বত্রই সমাকার? দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে তাহারাও পরস্পর সমান, কে বলিল, ইহা অখণ্ডনীয় স্বতঃসিদ্ধ? মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে কতকগুলি বাক্যকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। মানুষের মতে ইহারা সত্য, ইহারা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষের সংস্কার যে, ইহাদিগকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া না ধরিলে জীনযাত্রা যেন চলিবে না, যেন জগৎপ্রণালী উলটাইয়া যাইবে, যেন জগদযন্ত্র বিপর্যস্ত হইবে। বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এইরূপ অধিকাংশ সত্যের স্বতঃসিদ্ধতার মূলে কুঠারঘাত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যাহা প্রকৃতিনির্দিষ্ট প্রকৃতিগত সত্য বলিয়া মানিতেছ তাহা প্রকৃতপক্ষে মানুষেরই সুবিধার জন্য মনুষ্যকর্তৃক সৃষ্ট বা কল্পিত; মানুষেরই হাতগড়া পুত্তলী। কিন্তু জ্যামিতিবিদ্যার মূল সত্যগুলির স্বতঃসিদ্ধতায় সন্দেহ করিতে ইমানুয়েল কান্টও সাহসী হয়েন নাই। হেলমহোলৎজ জ্যামিতিস্বীকৃত স্বতঃসিদ্ধের স্বরূপ উদঘাটিত করেন। তিনি প্রথমে দেখান, মনুষ্যের মনের বাহিরে সত্যও কিছুই নাই, স্বতঃসিদ্ধও কিছুই নাই। বিষয়টি বড় গুরুতর, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইল।

অধ্যাপক মক্ষমূলর

ভারতবাসীর নিকট অধ্যাপক মক্ষমূলরের নাম যতটা পরিচিত ছিল, বোধ করি আর কোনো বৈদেশিক পণ্ডিতের নাম ততটা পরিচিত ছিল না। তাঁহার অপেক্ষাও কৃতকর্মা প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিদেশে জন্মিয়াছেন এবং এখনও হয়তো বর্তমান আছেন। কিন্তু ভারতবাসীর সহিত তাঁহাদের তেমন পরিচয় নাই; শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যে ও প্রতিভায় মুগ্ধ থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও মক্ষমূলরের নাম শুনিয়াছেন, এমন উদাহরণ বিরল নহে।

মক্ষমূলরের জীবনচরিত আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে পুনঃপুন কীর্তিত হইয়াছে; সেই জীবনচরিত পুনরায় কীর্তনের সম্প্রতি আবশ্যকতা দেখি না।

কিন্তু মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্যে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং আমাদের সহিত তাঁহার এমন একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ ছিল, যে সূত্রে তিনি আমাদের মধ্যে এতটা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

মক্ষমূলর সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্যই আমাদের দেশে বিখ্যাত; প্রকৃতপক্ষে তিনি বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বর্তমানকালের ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তাঁহাকে গণ্য করিলে ভুল হইবে না। সুবিখ্যাত সার উইলিয়াম জোন্স যেদিন সংস্কৃত সাহিত্য নামে একটা অতি প্রাচীন সাহিত্য আছে, এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, সেই দিনই বর্তমান কালে ভাষাবিজ্ঞানের জন্মদিন বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তৎপূর্বে ইউরোপের পণ্ডিতেরা যেমন যাবতীয় মানবকে ইহুদিজাতি-বর্ণিত আদি মানব আদমের সন্তান বলিয়া স্থির করিতেন, সেইরূপ সভ্যজাতির কথিত ভাষাসমূহকে ইহুদিজাতির ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য পাশ্চাত্যদেশে আবিষ্কৃত হওয়ার পর সহসা প্রতিপন্ন হইয়া গেল, যে ইহুদি ভাষার সহিত বিবিধ ইউরোপীয় ভাষার কোনও সম্পর্ক নাই; এবং ইহুদিজাতির সহিত ইউরোপীয় জাতিসমূহের কোনওরূপ নিকট শোণিতসম্পর্কও নাই। বরঞ্চ সংস্কৃত ভাষার সহিত ওই সকল ভাষার অত্যন্ত সম্পর্ক রহিয়াছে; এবং সংস্কৃতভাষী ভারতবাসীর সহিত পাশ্চাত্য জাতিগণের শোণিতসম্পর্কও রহিয়াছে। মক্ষমূলরের পূর্বেই এই সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও এই নূতন জাতিতত্ত্বের আবিষ্কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর হইতেই তিনি এই নূতন ভাষাতত্ত্ব ও নূতন জাতিতত্ত্বের তথ্যানুসন্ধানে ও সাধারণের সমক্ষে প্রচারে আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আর্যভাষাসমূহের সম্বন্ধ নিরূপণে ও আর্যজাতিগণের সম্বন্ধ-নির্ণয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বর্তমান রহিয়াছে; ইংরেজের ভাষার সহিত আমাদের ভাষার সম্পর্ক আছে, সুতরাং ইংরেজের সহিত আমাদের শোনিতগত সম্পর্ক আছে, আমরা উভয়েই আর্যবংশধর, এই মোটা কথাটা আজকাল সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আছেন, যাঁহারা ইংরেজদিগকে আর্যনাম প্রদান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন, এবং বিশুদ্ধ আর্যনামটা কেবল আমাদের নিজস্ব মনে করিয়া আনন্দ বোধ করিবেন। তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আমার ইচ্ছা নাই, তবে আমরা যে আর্যবংশধর, সে কথা আমরা বহুশত বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এবং আমরা যে সেই অতি পুরাতন সত্যটা পুনরায় জানিতে পারিয়াছি, ও আমাদের আর্যত্বের জন্য স্থানে অস্থানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছি, তজ্জন্য আমরা আর্য মক্ষমূলরের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রচার মক্ষমূলরের জীবনের সর্বপ্রধান কার্য, এবং ঋগ্বেদসংহিতার মাহাত্ম্য তিনিই পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করেন। ঋগ্বেদসংহিতাকে তিনি আর্যজাতির প্রাচীনতম ও মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন, এবং ঋগ্বেদসংহিতার কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি আর্যজাতির ভারতবর্ষ প্রবেশের কালনির্ণয়েরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সাহায্যেই তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশের প্রাককালীন পুরাতন আর্যসমাজের অবস্থানির্ণয়েও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এইরূপে মানবজাতির অতীত ইতিহাসের একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ তিনি নূতন করিয়া আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তৎকৃত কালনির্ণয় এবং তদুদ্‌ঘাটিত ইতিহাস সকলে হয়তো নির্বিবাদে গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন না; জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে এই ইতিহাস হয়তো সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকার ধারণ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও মক্ষমূলর যে অসাধারণ রিশ্রম, চিন্তাশীলতা ও অধ্যবসায়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সযত্নে লিপিবদ্ধ হইবে।

আমাদের মধ্যে এক অতি বিজ্ঞ সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা বৈজ্ঞানিকগণের পুনঃপুন মত পরিবর্তন দেখিয়া বিজ্ঞানকে উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিজ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের এইখানেই প্রভেদ। বিজ্ঞান দিন-দিন আপনাকে সংশোধিত ও উন্নত করিয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের মূর্তি চিরকালই একরূপ। তথায় কোনওরূপ বিকারের সম্ভাবনা নাই। আলোকেরই নীল ও পীত ও হরিৎ এবং উজ্জ্বল ও তীব্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ আছে; কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আঁধার; তাহার অন্য বিশেষণ নাই।

অধ্যাপক মক্ষমূলর কর্তৃক প্রচারিত ঐতিহাসিক তথ্যসকলে ভ্রম বাহির হইতে পারে এবং তৎকৃত বৈদিক শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় কালক্রমে ভ্রান্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু এ কথা সকলেরই জানা উচিত, যে ব্যক্তি কাজ করে তাহারই ভ্রান্তি ঘটে, যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয়, তাহার ভ্রান্তির আবিষ্কার বিধাতার অসাধ্য।

মক্ষমূলরের প্রতিভা কেবল ভাষাতত্ত্বেই আবদ্ধ ছিল না; ভাষাতত্ত্বের পরিধি ছাড়াইয়া অন্যান্য শাখাতেও তিনি যে সকল কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে সময়ে-সময়ে তুমুল আন্দোলন ঘটিয়া গিয়াছে। ভাষাগত সম্পর্কের মূলে জাতিগত সম্পর্ক বিদ্যমান, এই হিসাবে ভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ philology মানববিজ্ঞানের বা anthropology-র যথেষ্ট

সাহায্য করিয়াছে, পূর্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু মানবের মধ্যে শোণিত সম্পর্কের নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে জীবতত্ত্বের বিষয়। তোমার সহিত আমার শোণিতগত সম্বন্ধ আছে কি না, উভয়ের কথিত ভাষা ধরিয়া বিচার করিতে গেলে অনেক সময় এ বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। কিন্তু উভয়ের শরীরগত সাদৃশ্য, উভয়ের গায়ের রঙ, মাথার চুল, হাতের গঠন, চোখের চাহনি প্রভৃতি ধরিয়া বিচার করিতে গেলে সিদ্ধান্ত অনেকটা নির্ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিছুদিন পূর্বে মক্ষমূলর-প্রমুখ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল ভাষাগত সাদৃশ্য ধরিয়া বিবিধ মানবজাতির শোণিতসম্পর্ক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাঁহাদের এই আবদার সহ্য করিতে পারিতেছেন না; এবং তাঁহাদিগকে স্বকীয় গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করিতে উপদেশ দিয়া শরীরতত্ত্বের সাহায্যে মানবগণের জাতিনির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের সমালোচনায় ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত বহুস্থলে সংশোধন-সাপেক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং কালে আরও সংশোধনের প্রয়োজন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানের মীমাংসা একবারে উলটাইয়া যাইবে, এরূপও বোধ হয় না।

আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও তৎসহ গ্রিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির প্রাচীন শাস্ত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক মক্ষমূলর একটা অভিনব দেবতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের স্থাপনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, অতি প্রাচীনকালে পুরাতন আর্যজাতি যখন মধ্য-এশিয়ায় বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের একটা বিশিষ্ট ধর্মপ্রণালী ও উপাসনাপ্রণালী ছিল। আর্যগণের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দেশে উপনিবিষ্ট হইলে সেই প্রাচীন ধর্মপ্রণালীই ক্রমশ প্রাদেশিক বিকার ও পরিবর্তন সহকারে বিবিধ আর্যধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুজাতির দেবদেবীগণের সহিত প্রাচীন গ্রিক ও জার্মান জাতির দেবদেবীগণের পুরাতন সম্বন্ধ নির্ণয় অসাধ্য নহে; আর্যজাতির প্রাচীন দেবতাগণের সম্বন্ধে বিবিধ উপাখ্যান কীরূপে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া বিবিধ জাতির পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে, তাহার নির্দেশও সম্পূর্ণ অসাধ্য নহে। আর্যজাতির দেবতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া মক্ষমূলর বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির ধর্মতত্ত্বের ইতিবৃত্ত নির্ণয়ে প্রয়াস করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অন্য যে-কোন শাখার আলোচনাতেই তিনি হাত দিতেন, তিনি তাহাতে ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। রঙিন চশমা চোখে দিলে যেমন জগৎ শুদ্ধুই রঙিন দেখায়, তিনি সেইরূপ ভাষাবিজ্ঞানের রঙিন পরদার অন্তরাল হইতে জগতের দিকে চাহিতেন। কাজেই অন্যান্য বিজ্ঞানে তাঁহার সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত হয় নাই; তাঁহার প্রণীত ধর্মতত্ত্বও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে নির্বিবাদে গৃহীত হয় নাই। ইংরেজগণের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সর, এডওয়ার্ড, টাইলর, এণ্ড্রুল্যাং প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অন্যবিধ ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের বিরোধী মতের সহিত মক্ষমূলরের মতের বিসংবাদ প্রায়ই ঘটিত। ধর্মতত্ত্বের ভবিষ্যৎ কী তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু মক্ষমূলরের প্রতিভা কীরূপ সর্বতোমুখিনী ছিল, তাহা দেখাইবার পক্ষে ইহা একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

মনুষ্যের ভাষার সহিত মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ;—আমাদের চিন্তা-ক্রিয়াটাই ভাষাসাপেক্ষ বটে কি না, তাহা লইয়া বিতণ্ডা চলিতে পারে। অন্তত ভাষার

সাহায্য না পাইলে মনুষ্যের চিন্তাপ্রণালী কীরূপ হইত, তাহা গভীর আলোচনার বিষয় বটে। মক্ষমূলর মনোবিজ্ঞানের এই দুরূহ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট কীরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা বর্তমান প্রসঙ্গে উপস্থিত করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না।

যাহাই হউক, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক সমাজে মক্ষমূলরের স্থান অতি উচ্চে ছিল,—কত উচ্চে ছিল, তাহার নির্ধারণে সম্প্রতি প্রয়োজন নাই, এবং সম্ভবত সম্প্রতি তাহার নির্ধারণের সময়ও উপস্থিত হয় নাই। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস প্রণয়নে তাঁহরা কৃতিত্বও ভবিষ্যৎ সমালোচনার বিষয়।

প্রাচ্যবিদ্যায় মক্ষমূলরের পাণ্ডিত্য অতি উচ্চশ্রেণির ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা অন্যান্য পণ্ডিতের নাই, এবং যাহার গুণে তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি পাইবার অধিকারী ছিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ। তিনি ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসীকে মনের সহিত ভালোবাসিতেন; বলা বাহুল্য যে পণ্ডিত মাত্রেই—প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমাত্রেই সেরূপ ভালোবাসেন না। ভারতবাসীর প্রতি এই আন্তরিক অনুরাগ তাঁহার নানা কার্যে প্রকাশ পাইত। ভারতবর্ষের সাহিত্য লইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস লইয়া অনেক বড়-বড় পণ্ডিত মাথা ঘামাইয়াছেন ও উৎকট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু What India can teach us, ভারতবর্ষ ইউরোপকে কী শিক্ষা দিতে পারে, এই বিষয়ের আলোচনায় অন্য কাহারও লেখনী এত ব্যাকুল হয় নাই। অধম ভারতবাসীর জীবনচরিত লিখিয়া সময় ব্যয় করা বোধহয় তৎশ্রেণিস্থ আর কোনও পণ্ডিত কর্তব্যকর্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই। মক্ষমূলরের সহিত যে সকল আধুনিক কৃতী ভারতসন্তানের পরিচয় ছিল, অথবা পরিচয় না থাকিলেও যাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, তিনি তাঁহাদের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। বর্তমানকালে ও আমাদের বর্তমান অবস্থায় ইহা ফেলিবার কথা নহে। ভারতবর্ষের হিতচিন্তায় তাঁহার জীবৎকালের অনেকটা অংশের ব্যয় হইয়াছে। ছোট-ছোট কাজেও তাঁহার এই আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের কারাবাসকালে স্বপ্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতা তাঁহাকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া তিনি এই সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। কাজটা ছোট; কিন্তু এইরূপ ছোট কাজেই আত্মীয় চেনা যায়; বিশেষত বন্ধুবর্গের আত্মীয়তার সারতা আপন্নিকষপাষাণেই ধরা পড়ে। গল্প শোনা যায় যে মক্ষমূলর ভারতবর্ষের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াও ভারতভূমিতে পদার্পণে সাহসী হন নাই; তাঁহার আশঙ্কা ছিল, মনঃকল্পিত ভারতবর্ষের যে আদর্শ বহুদিন হইতে তাঁহার মনের মধ্যে বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষ চোখের সম্মুখে আসিলে কোথায় তাহা ভাঙিয়া যাইবে। এত মিষ্ট কথা আমরা বড় শুনিতে পাই না। ভারতবর্ষের লোকেও তাঁহার অনুরাগ অনুভব না করিত এমন নহে। বিলাতপ্রবাসী ভারতবাসীর অনেকেই মক্ষমূলরেব সহিত আলাপ করিয়া আসা একটা কর্তব্যমধ্যে বিবেচনা করিতেন; এই আলাপসূত্রে অনেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। অনেক তরুণবয়স্ক ছাত্র তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শরণাপন্ন হইত। একবার শুনিয়াছিলাম, কলিকাতায় কোনও ধনীসন্তান

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যাপক বিদায় স্বরূপে মক্ষমূলরকে এক জোড়া শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এদেশের অনেক পণ্ডিতলোকে তাঁহাদের গ্রন্থের জন্য মক্ষমূলরের প্রশংসাপত্র না পাইলে যেন তৃপ্তিবোধ করিতেন না। এদেশের অনেকের সহিতই তাঁহার চিঠিপত্র চলিত। ফল কথা, মক্ষমূলর আমাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; আমরা সেই বন্ধু হারাইয়াছি। পণ্ডিতপ্রসূ পাশ্চাত্যভূমিতে আরও কত বড়-বড় পণ্ডিত জন্মিবেন। কিন্তু আর একজন মক্ষমূলরকে আমরা কবে পাইব, কে বলিতে পারে?

শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তীক্ষ্ণ ছুরিকার সাহায্যে মনুষ্যের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার কোথায় কী আছে সন্ধান করিয়া দেখেন; এবং সেই অনুসন্ধানে কত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সেই শবদেহের প্রতি তাঁহাদের যে বিশেষ একটা অনুরাগ জন্মে তাহা বলা যায় না। আপনার কাজটা সারিয়া ফেলিলেই তাঁহারা বিবিধ 'ডিসইনফেক্টান্ট' প্রয়োগে আপনার শরীরের অশুদ্ধি ও ছুরিকার অশুদ্ধি ও টেবিলের অশুদ্ধি তাড়াতাড়ি শোধনের জন্য ব্যস্ত হয়েন। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাস লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকের কার্যকে কতকটা এইরূপ শবব্যবচ্ছেদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এই মৃতজাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া যথেষ্ট আনন্দ বা কৌতুক বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিকর হয়, তাহা বলিতে পারি না। আচার্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক শবদেহ বলিয়া ভাবিতেন না। অন্তত, এই দেহের ধমনিগুলার মধ্যে এককালে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইত, এবং ইহার হৃৎপিণ্ড এক কালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন; এবং বাক্যের দ্বারা এবং কার্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি যাঁহারা ইহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের সময় উপদেশ যাচ্ঞা করিয়া মক্ষমূলরকে পত্র লেখা হইয়াছিল। মক্ষমূলর সেই পত্রের উত্তরে নবীন পরিষৎকে কয়েকটি ছোটখাটো উপদেশ দিয়াছিলেন। একটা উপদেশ এইরূপ। বাংলাদেশের প্রত্যেকে গ্রামের ও প্রত্যেক নদ, নদী, বিল, খাল প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়া সেই-সেই নামের উৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিষদের একটা কর্তব্য হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, কাজটা অতি ছোট; এবং আমাদের পরিষৎ এ পর্যন্ত এত ছোট কাজে হস্তার্পণ করিয়া আপনার মহত্ত্বকে সংকুচিত করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু পরিষদের জানা উচিত ছিল যে, ছোট বীজ হইতে বড় গাছ হয়; এবং ছোট কাজের মাহাত্ম্য যাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই বড় কাজের সম্পাদনে সমর্থ হয়েন। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস-লেখক যদি কেহ না থাকিত, তাহা হইলেও বর্তমান ইংল্যান্ডের গ্রামগুলির ও নগরগুলির নামতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই দেশে রোমের প্রভুত্বের কথা আবিষ্কৃত হইতে পারিত। সেই রূপ এই ছোট কাজে বাংলাদেশের বিস্তৃত অতীত ইতিহাসের কোন অংশ উদ্ঘাটিত হইতে পারে না পারে, তাহা আমরা কীরূপে বলিব? মক্ষমূলর স্বয়ং ছোট কাজকে অবজ্ঞা করিতেন না। কোথায় দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে না, মক্ষমূলর বিভিন্ন ভাষায় বিড়ালের নামের ইতিবৃত্ত অতি গম্ভীরভাবে আলোচনা

করিতেছেন। প্রাচীন গ্রিসের ও প্রাচীন ইউরোপের প্রাচীনতম সাহিত্যে নাকি বিড়ালের কোনও উল্লেখ নাই। আমাদের সংস্কৃত প্রাচীনতম সাহিত্যেও অনেক জন্তুর নাম আছে, বিড়ালের নাকি নাম নাই। বৈদূর্যনামক রত্ন, ইংরেজিতে যাহাকে cat's eye বলে, উহাকে বিড়ালশব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বৈদূর্য রত্নেরও নাকি অতি প্রাচীন সাহিত্যে নাম নাই। কাজেই অনুমান হইতে পারে যে, প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে এবং আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা যে সকল দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল সেই সকল দেশে, বিড়াল ছিল না। তার বহুদিন পরে কোনও সময়ে আলুর মতো ও তামাকের মতো কোন অনার্য বিদেশ হইতে বিড়াল আসিয়া আর্যদেশমধ্যে ও আর্যগৃহমধ্যে ও আর্যসাহিত্যমধ্যে চিরস্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছে। সেই বিদেশি বিড়ালজাতির স্বর্গাদপি গরীয়সী আদি মাতৃভূমি কোন দেশ? সম্ভবত উহা মিশরদেশ; মিশরদেশে অতি প্রাচীনকালে বিড়াল-দেবতা পূজা পাইতেন; এবং সম্ভবত প্রাচীন মিশরদেশে, ব্যাঘ্রজাতীয় কোন আরণ্যজন্তু গ্রাম্যতা-পাদিত হইয়া বিড়ালরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে কালক্রমে মিশর হইতে বিড়ালের আধিপত্য অন্যান্য স্থলে বিস্তৃত হয়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের নিকট আর একটা ঋণগ্রহণ করিবেন। মক্ষমূলরের অনুমান সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা বিচার করিবার এই স্থান নহে; আমি কেবল একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চাহি যে বড় লোকে ছোটো কাজকে অবজ্ঞা করেন না; তাঁহাদের যত্নে ছোটো বীজ হইতে বড় গাছ উৎপাদিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মকালে ভারতবাসীর হিতৈষী জার্মানদেশোদ্ভব আচার্য মক্ষমূলর নবীন পরিষৎকে ক্ষুদ্রকার্যে অবজ্ঞা না করিতে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই পরলোকগত মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্ষুদ্র কার্যের মাহাত্ম্য বুঝিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাত্মার উপদেশ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রকাশার্থ আহূত অদ্যকার এই সভা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

আমার যখন পঠদ্দশা, তখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম ছাত্রসমাজে অপরিচিত ছিল না; কিন্তু তিনি তখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে বোধহয় অপরিচিত ছিলেন। "সাহিত্য" পত্রে "বৈদিক কালে গোহত্যা" বিষয়ক যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়, বোধহয়, তাহাই তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা। বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রাচীন ইতিহাস-ঘটিত গবেষণাপূর্ণ যে সকল প্রবন্ধ সর্বদা বাহির হয়, সাধারণ পাঠকের অন্তঃকরণে তাহা কীরকম একটা ভীতির সঞ্চার করে; বোধ করি, সেই ভীতির বশবর্তী হইয়াই আমি তখন সেই বৈদিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে সাহস পাই নাই। "সাধনা" পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা তাঁহার লেখনী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে আমি তাঁহার রচনায় আকৃষ্ট হই, এবং তখনই বুঝিতে পারি, বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে একজন মহারথের আবির্ভাব হইয়াছে। তদবধি বাংলা সাময়িক পত্রে তাঁহার যত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, প্রায় সকলই আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি, এবং পড়িয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। অথচ, এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশই ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিপূর্ণ।

ইহাও স্বীকা করিতে দোষ দেখি না যে, "সাহিত্য" পত্রের মলাটের উপর উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম মুদ্রিত দেখিলেই মনে একটা হর্ষ উপস্থিত হইত। আশা হইত যে, এমন একটা কিছু তাঁহার রচনা মধ্যে দেখিতে পাইব, যাহা অন্যত্র দুর্লভ। কখনোই সে আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

কিন্তু তখন জানিতাম না যে, এত শীঘ্র এই আনন্দের জনয়িতা বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইবেন, এবং যে আকাঙ্ক্ষার সহিত মাসের পর মাস উমেশচন্দ্রের নাম মাসিক পত্রের মলাটে অঙ্কিত দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহা এত শীঘ্র চিরদিনের জন্য নির্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার স্মৃতির প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের কৃতজ্ঞতার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও কখনও মনে করি নাই।

বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই; এবং তিনি সাহিত্যের যে অংশের প্রধানত আলোচনা করিতেন, তাহাও সর্বতোভাবে আমার অধিকার বহির্ভূত। এই অবস্থায় তাঁহার জীবন বা কর্ম সম্বন্ধে সমালোচনায় আমি কোনওক্রমেই যোগ্য নহি। তথাপি যখন "সাহিত্য" পত্রের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রতি এই ভার অর্পণ করিলেন, এবং তজ্জন্য আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, তখন এই অনধিকার চর্চায় প্রবৃত্ত হইতে আমি দ্বিধাবোধ করি নাই। দূর হইতে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অত্যধিক অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা প্রকাশের অবসর লাভ করিয়া সেই লোভের সংবরণ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

উমেশচন্দ্রের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি, যোগ্যতর ব্যক্তি এই কার্যের ভার গ্রহণ করিবেন। উমেশচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার জীবন-

চরিত লিখিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার ভূমিকা মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন। সেই অসম্পূর্ণ ভূমিকা হইতে ও তাঁহার পুত্রগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবনের স্থূল ঘটনা কয়টির উল্লেখ করিতেছি।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুলের অন্তর্গত রামনগর গ্রাম উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্মস্থান। ১২৫৯ সালের ভাদ্রমাসে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৫ সালের ১ শ্রাবণ তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। ছেচল্লিশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই এই কৃতী বঙ্গসন্তানের অকালমরণ কেশবচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল ও অন্যান্য বঙ্গসন্তানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবে।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামও অন্যান্য কৃতী বঙ্গসন্তানের জীবনের সহিত সম্পর্কসূত্রে সাহিত্যসমাজে অপরিচিত নহে। এই গ্রামের অন্তর্গত অন্যতর পল্লি রাধানগর রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রামমোহন রায়ের ও উমেশচন্দ্র বটব্যালের পূর্বপুরুষেরা স্থানীয় সমাজের উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ছিলেন, ও এই সম্পর্কে রামমোহন রায়ের সময়েও উভয় দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।

রামমোহন রায়ের সমকালবর্তী রামকানাই বটব্যাল উমেশচন্দ্রের বৃদ্ধপিতামহ। রামকানাই-এর পিতৃ-পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন; রামকানাই আপন পরিবার মধ্যে স্বকল্পিত-যন্ত্র-সহকারে অভিনব পদ্ধতিতে শক্তিপূজা প্রচলন করিয়া যান। তাহা এখনও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। উমেশচন্দ্র সেই শক্তি উপাসনার তাৎপর্য বর্ণনা করিতে প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতেন। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ বটব্যাল, মাতার নাম প্রসন্নকুমারী দেবী।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারি-প্রতিষ্ঠিত রাধানগর ইংরেজি স্কুলে ১৮৬৮ অব্দে উমেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসেন; ১৮৭২ অব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ. উপাধি লাভ করেন; ১৮৭৪ অব্দে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম.এ. এবং পরবৎসর বি.এল. উপাধি লাভ করিয়া শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনন্তর ১৮৭৬ অব্দে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়ট পদক পুরস্কার পান। পাঠদ্দশার অন্য পরিচয় অনাবশ্যক।

উমেশচন্দ্র ১৮৭৭ অব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে গভর্নমেন্টের কাজে নিযুক্ত হয়েন; কয়েক স্থানে ওই কার্যের পর দশ বৎসর পরে স্ট্যাটুটারি সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযা সিভিলিয়ানি লাভ করেন; শেষে বিভিন্ন জেলায় প্রশংসার সহিত ম্যাজিস্ট্রেট কার্য সম্পাদন করেন। গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়ায় অবস্থান কালে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। চিকিৎসায় বা স্থান পরিবর্তনে কোনও উপকার হইল না। ১ শ্রাবণ তারিখে কলিকাতার বাটিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রাজকীয় কার্যে তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন; নম্রতা, রসজ্ঞতা, গর্বাভাব ইত্যাদি গুণে সকলের প্রিয় ছিলেন; সর্ববিধ কর্তব্যসাধনে সর্বদা উপদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র বর্তমান লেখককর্তৃক যথোচিত বর্ণিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গার্হস্থ্যজীবনে বা রাজকীয় কর্ম সম্পর্কে তিনি বৃহৎ সমাজের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন; সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি বৃহত্তর সমাজের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই সমাজেই তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ। আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে তিনি এই বৃহত্তর সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া যাইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

বাস্তবিকই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার রচনা অপূর্ব সামগ্রী ছিল। এই দুর্ভাগ্য দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায় সমগ্র প্রদেশটা যে সেনা-কর্তৃক অধিকৃত, সেই সেনাভুক্ত বীরপুরুষগণের বীরত্বের আস্ফালন যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহাদের শরীরে মেরুদণ্ডের ও অস্থিকঙ্কালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর প্রমাণাভাব। রামায়ণের আমলে ও হোমারের আমলে বীর পুরুষেরা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বাগ্‌যুদ্ধটাকে একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া জানিতেন না; তবে বাহুযুদ্ধটা একবার আরম্ভ হইলে তাহার ফল শত্রুর পক্ষে বড় বিষম হইত। কিন্তু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রের বীরেরা যে বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন, তাহার তীক্ষ্ণতা কখনও অনুভবের বিষয় হয় না; এবং তাঁহারা যে অস্ত্রের আস্ফালন করেন, তাহা কাহারও পৃষ্ঠে কখনও কাটিয়া বসে না। এক শ্রেণির লেখকের অত্যাচারে মনে হয়, কী অশুভক্ষণেই এদেশে কমলাকান্তের দপ্তর ও উদভ্রান্ত প্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল। আর এক শ্রেণির লেখক নিতান্ত পুরাতন জীর্ণ সত্যকে জীর্ণতর বেশভূষায় কথঞ্চিৎ সতি ও আবৃত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তাহার প্রতিও কোনরূপ অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহিশস্য বর্ষে-বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা, শুনিতে পাই, একান্ত নাইট্রোজেনবর্জিত; আর বঙ্গের বাগদেবতা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করেন, তাহার "ধূম-জ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ"; বঙ্গদেশে কাঠিন্য-ধর্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন, তাহা সুধীগণের আলোচ্য।

উমেশচন্দ্র বটব্যালে বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। উচ্ছ্বাসের হাওয়া ও বাক্যের কুয়াশা কাটাইয়া উন্মুক্ত আলোকে ও কঠিন মৃত্তিকায় দুই দণ্ড দাঁড়াইবার অবসর দিয়া তিনি আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। তাঁহার উদ্যত অস্ত্রে কেবল ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষমতা ছিল না; তাহাতে ধার ছিল; যে-বাহুতে তিনি সেই অস্ত্র ধারণ করিতেন, তাহাতে অস্থি ও পেশি বর্তমান ছিল। কেবল পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিরক্তি জন্মাইতেন না। তিনি প্রায়ই নূতন কথা বলিতেন, ও পুরাতন কথাকেও নূতন ভাষায় বলিতেন। নূতন সামগ্রীর আস্বাদনে আমাদের রসনা নিত্য-নিত্য পরিতৃপ্ত হইত; নূতন-নূতন তথ্যের আভাস পাইয়া আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় বহির্মুখে আসিত ও তন্দ্রাত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিত। এদেশে লেখকের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসা নহে; এবং এদেশে পাঠকের পক্ষে ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে।

উমেশচন্দ্র প্রধানত স্বদেশের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিলেন। সম্প্রতি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা যেন একটু জাগিয়া উঠিয়াছে বোধ হইতেছে। এটা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে বিদ্যা বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে দেশে ইতিহাস জানিবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়াছে, এ পর্যন্ত এরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা ইতিহাসের গৌরব বুঝিতেন না, এইরূপ একটা বিলাপধ্বনি সচরাচর শুনা যায়; কিন্তু আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের কৃতবিদ্যেরাও যে ইতিহাসের গৌরব বুঝিয়াছেন, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ। পরন্তু নব্য-সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আচরণ অনেক সময় স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনাজনক। পাশ্চাত্য হিসাবে স্বদেশানুরাগ যাহাকে বলে, তাহা বোধহয় প্রাচীনকালেও আমাদের ছিল না, এবং একালের শিক্ষাও তাহা হয়তো জন্মাইতে পারে নাই। মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে-জাতির আপনার পুরাতন কাহিনি জানিবার প্রবৃত্তি

নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্প-সমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশ-প্রিয়তার স্পর্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।

আধুনিক কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যে দুই চারিজন সুধী পুরুষ আপনার জাতিকে চিনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহাদের অন্যতম। আমাদের শিক্ষিত সমাজে তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। সত্য কথা, উমেশচন্দ্র তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ও ক্ষমতানুরূপ কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারেন নাই; সে আমাদের দুর্ভাগ্য। এক একবার মনে হয়, যদি তিনি রাজকার্য জীবিকার উপায়স্বরূপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বোধহয় আরও অধিক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু সেও বুঝি মনের ভ্রম। কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহাদিগকে পরাধীন বৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় না, যাঁহাদের শক্তির বা অর্থ-সামর্থ্যর বা অবকাশেরও অভাব নাই, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন উমেশচন্দ্রের মতো দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের জন্য অনুরাগ দেখাইতেছেন?

আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবেন, এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের শিক্ষায় বা আলোচনায় কোনও লাভ নাই, তাঁহাদের কথা ধরিলাম না। যাঁহারা প্রাচীন কালের জন্য কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, তাঁহাদের পরিতাপও স্বদেশানুরাগের দৃঢ়তার অভাব প্রকাশ করে মাত্র। এই অবস্থায় যিনি অন্য কার্যে লিপ্ত হইয়াও দেশের অতীত স্মৃতি জাগরিত করিবার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র উদ্যম দেখাইয়াছেন, তিনি সার্থকজন্মা।

উমেশচন্দ্র এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলির সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। তিনি কালস্রোতে নীয়মান যে দুই একটি চিহ্ন মাত্র অবলম্বন করিয়া অতিদূরস্থ বিস্মৃতপ্রায় অতীত দেশের চিত্রাঙ্কনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন;—তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহার নির্ণয়ে আমি সমর্থ নহি। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলি জনসমাজে তেমন সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাও বোধহয় না। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যে সকলেই আস্থা স্থাপন করিবেন, তাহাও মনে করি না। অল্প প্রমাণ আশ্রয়ে, অধিকাংশ স্থলে কল্পনার সাহায্যে, যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়, তাহার যাথার্থ্যে সন্দেহ চিরকালই থাকিবে।

অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধসমূহ আমার নিকট অয়স্কান্তের কাজ করিত। একটা অনিবার্য মোহের আবেগে আমি সেই রচনাবলির প্রতি আকৃষ্ট হইতাম। তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন; কিন্তু কেবল বৈদেশিক মতের অনুসরণ করিয়া যাইতেন না, স্বাধীনভাবে নূতন পথে চলিতে চাহিতেন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহাকে যে পথে লইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। তাঁহার এক-একটি প্রবন্ধ বৈদিক কালের আর্যসমাজের এক-একটি পট মানস-চক্ষুর নিকট উজ্জ্বল আলোকে ধরিয়া দিত। সেই পট যে সর্বত্র প্রকৃত তথ্যের অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমিও বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু সেই পটের অভিনবত্ব, তাহার স্পষ্টতা, তাহার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। কল্পনার তুলিকা যে স্থানে অস্থানে বিবিধ বর্ণের বিন্যাস করিয়া

তাহাকে মূর্তি প্রদান করিত, তাহা বুঝিতাম। অতিরঞ্জনই হয়তো তেমন ঔজ্জ্বল্যের হেতু, ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে। তথাপি সেই পট এক-এক খানা যখন দৃষ্টি-পথ হইতে সরিয়া যাইত, তখন সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো মনের মধ্যে স্থায়ী রেখা অঙ্কিত কারিয়া যাইত। ইহা ভারতবর্ষের অতীত সমাজের অন্যান্য ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত চিত্র হইতে কত বিভিন্ন! হয়তো ইহা কল্পনাকৃত অতিরঞ্জনে বিকৃত ও অসত্য, হয়তো আত্যন্তিক স্বজাতিপ্রিয়তার উৎপাদক বলিয়া বৈজ্ঞানিকের নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার অনধিকারী। কিন্তু ইহার মূল্যনির্ধারণ অন্যরূপে করিতে হইবে। ইহা যে অস্পষ্ট স্মৃতি জাগাইয়া দিত, যে আকাঙ্ক্ষার, যে অতৃপ্তির উদ্দীপনা করিত, তদ্দ্বারা ইহার মূল্যের পরিমাণ করিতে হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তির উদ্বোধনই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের অলস, জড় ও সুপ্ত চিত্তবৃত্তি-সমূহকে প্রবোধিত করিতে এই আকাঙ্ক্ষার ও অতৃপ্তিরই এখন প্রয়োজন। কর্মসম্পাদনে আমাদের এখন শক্তি নাই, সত্যাবিষ্কারে আমাদের ক্ষমতা নাই। এখন কর্মের প্রতি ও সত্যের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কালে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে।

এই আকাঙ্ক্ষার ভাব ও অতৃপ্তির ভাব উমেশচন্দ্রের রচনার প্রত্যেক ছত্রে প্রকাশ পাইত। তিনি একটা পিপাসার উত্তেজনায় পানীয় আহরণে উদ্যত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝিতে পারিতাম। শুষ্ক মরুভূমি মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রাণের চেষ্টায় যেন জলের অন্বেষণ করিতেন এবং সময়ে-সময়ে মরীচিকাদর্শনেও যেন তৎপ্রতি ধাবিত হইতেন। অন্ধকূপস্থিত জীব নূতন জ্যোতির দেখা পাইয়া যেন তাহার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইত। এই জন্য উমেশচন্দ্রের বৈদিক রচনা আমার নিকট এত ভালো লাগিত। বাংলায় আরও কতিপয় মনস্বী ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন, অনেকেই বৈদেশিকের পদাঙ্ক অনুসরণ ও বৈদেশিকেরই অনুবৃত্তিতে নিরস্ত হইয়াছেন। কেহ-কেহ বৈদেশিক প্রণালী ক্রমে নূতন সত্যাবিষ্কারেও সমর্থ হইয়াছেন। উমেশচন্দ্রের সম্পাদিত কর্মের অপেক্ষা তাঁহাদের সম্পাদিত কর্ম এক হিসাবে অধিক মূল্যবান। কিন্তু উমেশচন্দ্রে যে চিত্ত-প্রবৃত্তির স্ফূর্তি দেখিয়াছি, যে অনুরাগের, পিপাসার উত্তেজনা দেখিয়াছি, তাহা অন্যত্র দেখিয়াছি, বোধহয় না। কোথাও দেখি নাই বলিলে হয়তো ভুল হয়। অক্ষয়চন্দ্র দত্তে এই অনুরাগ ও পিপাসা পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান ছিল। বিধাতার নিগ্রহ তাঁহার সেই পিপাসা তৃপ্ত করিতে দেয় নাই। বিধাতার নিগ্রহে উমেশচন্দ্রেও সেই পিপাসার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তির অবসর ঘটিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র এক কালে বাংলার একখানি ইতিহাস রচনার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণ তখনও সংগৃহীত হয় নাই; এখনও সংগৃহীত হইতে অনেক বিলম্ব। তিনি বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগকে পথপ্রদর্শনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন; সে চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশানুরাগ হইতে প্রসূত। উমেশচন্দ্রেরও একখানি বাংলার ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা ছিল। কোনও বন্ধুকে তিনি পত্রদ্বারায় ইহা জানাইয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি উপাদানেরও সংগ্রহ করিতেছিলেন। উপাদানসংগ্রহ অনেকেরই সাধ্য; কিন্তু এদেশে সেই সাধ্যসাধনেও সকলে পরাঙ্মুখ। উপাদান একত্র করিয়া তাহাকে যথাবিধানে সজ্জিত ও যথাস্থানে বিন্যস্ত করা সকলের সাধ্য নহে। সংগৃহীত উপাদানের মূল্য নির্ধারণ, তাহার অর্থ আবিষ্কার, পুরাতন জিনিসকে নূতন চোখে দেখা, এ সকলই

দুরূহ ব্যাপার। উমেশচন্দ্রে এ শক্তি প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। কিন্তু এই অনন্যসাধারণ শক্তির কার্যে বিনিয়োগ ঘটিল না। দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে থাকিয়াই লয় পায়। আমাদের জাতীয় দারিদ্র্য কি চিরদিনই এইরূপ ফলোৎপাদনের প্রতিহর্তা থাকিবে?

উমেশচন্দ্রের দার্শনিক মত তাঁহার সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যত্রও তাহার আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা মধ্যে তাঁহার দার্শনিক মতের বিশদ উল্লেখ আছে। তিনি সাংখ্যমতানুবর্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন; প্রকৃতি ও পুরুষ, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে এই দুই স্বতন্ত্র অনির্বচনীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। ইংরেজি দর্শনে যাহাকে noumenon বলে বা যাহাকে substance বলে, প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখ্য মতে সেইরূপ noumenon, এবং বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের অন্তস্তলে অবস্থিত substance; কোনও অজ্ঞেয় কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মিলনে বা সম্বন্ধস্থাপনে এই প্রতীয়মান বিশ্বজগতের অর্থাৎ phenomenon-সমষ্টির উৎপত্তি। এই সম্বন্ধ স্থাপনেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এই সৃষ্টিব্যাপারকে তিনি "দার্শনিক সৃষ্টি" আখ্যা দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনকে এভলুশনিষ্ট বা অভিব্যক্তিবাদী বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য ঠিক বুঝিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইংরেজি দর্শনে যে এভলুশন শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাতে জড়জগতের অভিব্যক্তি বুঝায়, তাহাতে ব্যবহারিক প্রতীয়মান জগতের বা ফেনোমেনাল জগতের ব্যবহারিক অভিব্যক্তি বুঝায়। সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তি বা দার্শনিক পারমার্থিক অভিব্যক্তি ওই ব্যবহারিক বা বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতির, এই কথাটা বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যায় যেমন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমন অন্য কোথাও হইয়াছে কি না, জানি না; অন্তত, আমার জ্ঞানের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে কোথায়ও দেখি নাই। ভবিষ্যতের দর্শন ব্যাখ্যাতৃগণ যদি এই পার্থক্যটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে, হিন্দুজাতির দর্শনশাস্ত্র অনেক অপব্যাখ্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

উমেশচন্দ্রের সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যাপাঠে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি কিন্তু তাঁহার দার্শনিক দ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। পুরুষের বাহিরে বহির্জগতের অন্তস্তলে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব একটা অনুমান বা হাইপথেসিস বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই অনুমানের পক্ষে স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও জাগতিক রহস্য ও দার্শনিক সৃষ্টি বুঝা যাইতে পারে। সে বিষয়ের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক। পুরুষ অর্থে স্থূলত যদি আত্মা ধরা যায়, তাহা হইলে, আমার মতো অন্যান্য মানবেরও আত্মা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে উমেশচন্দ্র গণ্য করিতেন। এ কথাটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধহয় না। আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ হইলেও অপরের আত্মা আমার নিকট অনুমানগম্য ও কল্পিত পদার্থ। জড়জগৎ যেরূপ আমার অনুমান-লব্ধ কল্পিত পদার্থ, জড়জগতে বিচরণশীল জড়শরীরধারী জীবগণের অজড় আত্মাও আমার নিকট সেইরূপ অনুমান-লব্ধ কল্পিত পদার্থ; ইহার অধিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে আসে না। বৈদান্তিক সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র "অহম্" পদার্থে পরিণত করিয়াছিলেন; এবং সেই "অহম্"-কেই ব্রহ্ম উপাধি দিয়া বিশ্বের হর্তাকর্তা-বিধাতার স্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। সাংখ্যমতে যেমন অনির্দেশ্য কারণে প্রকৃতি ও পুরুষের, জ্ঞ ও জ্ঞেয়েব সম্মিলনে জ্ঞানের

উৎপত্তি, অর্থাৎ বিশ্বের দার্শনিক দৃষ্টি; বেদান্তমতে সেইরূপ "অহম" বা ব্রহ্ম নামধেয় পদার্থ হইতে কোনো অনির্দেশ্য কারণে বা অবিদ্যাযোগে বিশ্বের উৎপত্তি। উভয়ত্রই একটা অনির্দেশ্য কারণ বর্তমান আছে। জ্ঞ ও জ্ঞেয়ের সম্মিলন কীরূপে ঘটিল, অথবা "অহম"-এর কীরূপে বিকার ঘটিয়া বিশ্বজগতে পরিণতি হইল, তাহার প্রণালী নির্দেশ করিতে গেলেই এই অনির্দেশ্য হেতুর অবতারণা আসিয়া পড়ে। প্রচলিত ঈশ্বরবাদ সগুণ অথচ বচনাতীত, অনুভবগম্য অথচ অনির্দেশ্য, ঈশ্বর নামক সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করিয়া সেই অনির্বচনীয় হেতুর স্থান পূরণ করে। উমেশচন্দ্র অন্তত শেষবয়সে সাংখ্য মত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এই শেষোক্ত ঈশ্বরবাদের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বৈদান্তিক "সোহহং"-বাদটিই কিন্তু বিজ্ঞানদৃষ্টিতে সমীচীন বলিয়া বোধহয়।

পঠদ্দশায় ইংরেজি শিক্ষার হাওয়ায় উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি ও হিন্দুর প্রচলিত উপাসনাপদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনাস্থা কখনও তাঁহাকে শাস্ত্রবিরোধী আচারে প্রবর্তিত করিয়াছিল, বোধহয় না। তাঁহার কোনও বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি এককালে ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। শেষপর্যন্ত তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্তিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। উপরেই বলিয়াছি, সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতিপুরুষের সম্মিলনের অনির্দেশ্য কারণের স্থলে তিনি ঈশ্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অর্থে তাঁহার নিজ ভাষায় "An intelligent being to whose intelligent action the present form and arrangement of the world of matter and the concection between human souls and that world are owing." এই ঈশ্বর কিন্তু অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনি অমঙ্গল হইতে মনুষ্যকে উদ্ধার করেন। এই অমঙ্গল আবার জগৎ-প্রকৃতির অংশমাত্র। তাঁহার স্বভাষায় "Evil is a part of nature and the energy of God is directed to the purging of our nature from evil and to the raising of us to a higher state." এই মতের সহিত তাঁহার সাংখ্যমতের সামঞ্জস্য ঠিক বুঝা গেল না। অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় তিনি বেদের বহুদেব-বাদের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলির মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালের উপাস্য দেবতার তত্ত্বনির্ণয়ে নানা মতভেদ প্রচলিত আছে। কোন মত সমীচীন, তাহা জানি না। অন্তত জৈমিনিপ্রমুখ যে মীমাংসক সম্প্রদায় বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া বেদের প্রভুত্ব হিন্দুজাতির সমাজতন্ত্রের মূলে স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং শ্রৌত ও স্মার্ত আচারের ব্যবস্থাপনে যাঁহাদের নির্দেশ সমস্ত হিন্দুসমাজ শিরোধার্য করিয়া আসিতেছে, তাঁহারা প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতেন না, এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সামাজিক ধর্ম সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দুর কোন পন্থা অবলম্বনীয়, এ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে কোনওরূপ অস্পষ্টতা ছিল না। প্রথম বয়সে "পৌত্তলিকতা" সম্বন্ধে তাঁহার মত যাহাই থাক, জীবনের শেষ ভাগে তিনি যন্ত্রযোগে উপাসনার সমর্থন করিতেন, এবং যন্ত্রযোগে উপাসনা ও স্তুতিমাত্র বা ধ্যানমাত্র অবলম্বনে উপাসনার মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা-মধ্যে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিলাম। সমাজধর্ম পালনে তিনি চাতুর্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

বেদমূলক ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত সামাজিক ব্যবহারের অনুরাগী ছিলেন। কালভেদের সহকারে ব্যবস্থাভেদের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতেন না; এবং শত বৎসর পূর্বে আচার বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বর্তমান ছিল, বর্তমান কালে তাহার সকলগুলির উপযোগিতা না থাকিতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেও সম্ভবত কুণ্ঠিত হইতেন না। ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট পথই যে সমাজভুক্ত ব্যক্তির অবলম্বনীয় পথ, এই স্থূল সিদ্ধান্তের সহিত ওইরূপ পরিবর্তন প্রিয়তার বস্তুত কোনও অসামঞ্জস্য নাই। ভগবান শাক্যমুনির সময় হইতে আজ পর্যন্ত যে সকল নূতন-নূতন বেদবিরোধী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তৎপ্রতি কটাক্ষপাত করিতে বোধ করি এই জন্যই উমেশচন্দ্র দ্বিধা বোধ করেন নাই।

প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের চরিত-সমালোচন কালে উমেশচন্দ্র যে ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার আমি অনুমোদন করিতে পারিব না। কিন্তু যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম কর্মপরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার পুনঃপুন চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত

॥ ১ ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। অদ্যকার সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা এই সাত বৎসরের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই জানেন, আমি পরিষদের অধিবেশনে আহূত হইয়া যদি কোনওদিন একমকী সভাগৃহে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে চারিদিক হইতে আমার প্রতি প্রশ্ন হইত, "রজনীবাবু কোথায়, রজনীবাবু কোথায়?" আজিকার অধিবেশনেও আমি আহূত হইয়া একাকী এই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছি; কিন্তু আজি কেহই জিজ্ঞাসা করেন নাই, রজনীবাবু কোথায়? ছয় বৎসর পূর্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম; যে দিন কোনও কারণে তাহার সঙ্গ না পাইয়া আমাকে একা আসিতে হইত, সে দিন কোথায় যেন কিছু ফাঁক পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইত। ছয় বৎসর মাত্র অতীত না হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সহসা তাঁহার জনয শোকপ্রকাশার্থ আমাকে আহ্বান করিবেন, তাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই। Bengal Academy of Literature যখন বিজাতীয় নাম ও বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-রূপে প্রথম আবির্ভূত হয়, সেই দিন হইতেই রজনীবাবুর সহিত পরিষদের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। রজনীবাবুর সহিত পরিষদের কত নিকট সম্পর্ক ছিল, তাহা পরিষদের প্রাচীন সদস্যমাত্রই অবগত আছেন। পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধুস্বরূপে তিনি সদস্যমণ্ডলীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরক্ত ভৃত্যস্বরূপে তিনি বঙ্গের সাহিত্যিক সমাজের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত আমার অন্যরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল; কলিকাতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় আত্মীয় আমার দ্বিতীয় ছিল না; এবং সেই স্থানে আমি পরিষদের সদস্য ও পরিষদের প্রতিনিধিরূপে দণ্ডায়মান হইলেও আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক পরিহারপূর্বক কোনও কথা বলা নিতান্ত কঠিন। আমার উক্তির অধিকাংশই আমার ব্যক্তিগত কথা; আশা করি, পরিষদের সভ্যগণ তজ্জন্য অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।

আমার বয়স যখন ৮/৯ বৎসর, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠাশালার নিম্ন শ্রেণিতে যখন আমি অধ্যয়ন করিতাম, তখন একদিন আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা উপলক্ষে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতে dictation দেওয়া হইতেছিল। কয়েকদিন পরে দেখিলাম, সেই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আমাদের বাড়িতে তক্তপোষের উপর পড়িয়া আছে। পুস্তিকাখানির নাম "জয়দেবচরিত"; গ্রন্থকারের নাম দেখিলাম, শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত। বইখানি পড়িবার চেষ্টা করিয়া ভালো বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু উহার বিজ্ঞাপনটা পড়িয়া মনের মধ্যে কীরূপ একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, তাহা আজ প্রায় ২৭/২৮ বৎসর পরে মনে ঠিক আসিতেছে না।

এই ঘটনার ৫/৬ বৎসর পরে যখন আমি ইংরেজি স্কুলের নিম্ন শ্রেণিতে পড়িতাম, তখন বাংলা বহি, বাংলা কাগজ পড়া আমার রোগের মধ্যে ছিল। সেই সময়কার একখান' বান্ধব পত্রিকায় একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করি। সেই প্রবন্ধের শেষ ভাগে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,—যাঁহার নামের সহিত পূর্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছিল, সেই রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহি যুদ্ধের বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাংলা ভাষায একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইবে, এই চিন্তায় আমার বালকহৃদয় আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছিল। একদিন সহসা দেখিলাম, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসের খণ্ডশ প্রকাশিত প্রথম ভাগ রজনীবাবুর অন্যতম বন্ধু বাঁকিপুরের বর্তমান গভর্নমেন্ট উকিল শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ কর্তৃক পিতাঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রেরিত হইয়াছে। আগ্রহ সহকারে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম; একবার পড়িয়া তৃপ্তি হইল না, পুনঃপুন পাঠ করিলাম। গ্রন্থের ওজস্বিনী ভাষা ও বিষয়-বর্ণনায় গ্রন্থকারের এরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ কোনও বাংলা গ্রন্থে ইহার পূর্বে দেখি নাই। সত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিয় বালকহৃদয় পুলকিত হইল।

গ্রন্থপাঠ করিয়া যেন গ্রন্থকারের চরিত্র চোখের উপরে দেখিতে পাইলাম; গ্রন্থপাঠে যে গ্রন্থকারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার পূর্বে আমার ধারণা ছিল না। কতবার আমার বাল্যবন্ধুকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস পড়িয়া শুনাইতাম; আমি স্বয়ং যে আনন্দ পাইয়াছিলাম, সেই আনন্দভোগে অপরকে অধিকাবী করিয়া আরও আনন্দ পাইতাম।

তাহার পর তিন-চাি: বৎসর অতীত হইল। আমি যেবার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিই, রজনীবাবু সেবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া আমি সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইয়াছে কি না, অনুসন্ধানে বাহির হই। আর কোনও বাংলা পুস্তকের আমি তাহার পূর্বে অনুসন্ধান লই নাই। সে দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। কলেজ স্ট্রিট ৯৭নং বাড়ি দোকানের বাহিরে ফুটপাতের উপর সন্ধ্যার পর গুরুদাস বাবু মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। আমি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন আশাপ্রদ উত্তর পাইলাম না। তখন নিতান্ত নিরুৎসাহ ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বাসায় ফিরিলাম। এই সময়ে চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনের উপবে, বঙ্গবাসীর কার্যালয় ছিল। রজনীবাবু তাঁহার চাঁপাতলা বাসা হইতে মাঝে-মাঝে চাঁপাতলা সেকেন্ড লেন দিয়া বঙ্গবাসী কার্যালয়ে যাইতেন। ওই লেনে আমার বাসা হইতে আমি রজনীবাবুকে মাঝে-মাঝে দেখিতে পাইতাম। বঙ্গবাসী কাগজে তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ যাহা কিছু বাহির হইত, যত্নের সহিত তাহা পাঠ করিতাম। এই সকল প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে শুনিবামাত্র একখানা কিনিয়া আনিয়া পাঠ করি। রাজপুত ও শিখ ও মারাঠার কাহিনি রজনীবাবুর স্বাভাবিক ভাষায় বর্ণিত হইয়া মনের মধ্যে নানা ভাবের উদ্দীপনা করিত। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার পঠদ্দশার শেষ সময়ে রজনীবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। অখিল মিস্ত্রির লেনে পরলোকগত গিরিজাপ্রসন্ন বায়চৌধুরির বাসায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁহার রচনা পাঠ করিয়া বাল্যাবধি আমি তাঁহার নামে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। পরিচয়ের পর তাঁহার চরিত্র-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া আমি ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই চরিত্রের সৌন্দর্যে,

মাধুর্যে ও ঔদার্যে এই সভাস্থলের অনেকেই মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাব বাগবাহুল্যের কোনও প্রয়োজন নাই।

রিপন কলেজে কর্মগ্রহণ করিয়া অবধি আমি রজনীবাবুর প্রতিবেশী ছিলাম। পরিচয় ক্রমশ বন্ধুতায় এবং বন্ধুতা ক্রমশ আত্মীয়তায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তাঁহার মধুর প্রকৃতির কোনও অংশ আমার অজ্ঞাত ছিল না; তাঁহার সহিত অবস্থান আমার বিদেশ-প্রবাসের সর্বপ্রধান আনন্দ ছিল। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্তিম রোগের সঞ্চার হয়, অন্তত তাঁহার মনের ভিতর ওইরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ওই রোগের বাহ্য লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় নাই; স্বাস্থ্যভঙ্গের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। তিনিও দুই এক জন নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমনকী তাঁহার নিজ পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তিই এই আশঙ্কার কথা জানিতেন না। কিন্তু তদবধি তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে-মাঝে গঙ্গাস্নান করিতেন। গত শীতকালের অবসানে বাইসাইকেল অভ্যাসের চেষ্টা করিতেন। ক্বচিৎ বা শিয়ালদহ স্টেশনে যাইয়া ওজন লইয়া আসিতেন।

এই সময়ে রজনীবাবু তাঁহার জীবনের কর্তব্যসকল সম্পূর্ণ করিবার কিছু ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গৃহের লাইব্রেরিটির পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি অকাতরে পুস্তকসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; গত বৎসর পূজার পর গয়াধামে গিয়া পিতৃকৃত্য সমাধান করিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসখানি শেষ করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। তিনি কথায়-কথায় হাসিতে-হাসিতে প্রায়ই বলিতেন, পরিবারবর্গের জন্য একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই কাশীবাসী হইবেন। বিগত ২রা বৈশাখ তারিখে তিনি পরিষদের অপর চারিজন সদস্যের সহিত পরিষদের গৃহ-নির্মানার্থ ভূমি প্রার্থনায় কাশিমবাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুরের সমীপে যাত্রা করেন। তৎপূর্বে তাঁহার হাতে সামান্য একটি ব্রণ হইয়াছিল। আমার সহিত প্রায় প্রত্যহই তাঁহার দেখা হইত। কিন্তু সেই ব্রণের বিষয় আমিও জানিতাম না। কাশিমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে আরও কয়েকটা ব্রণ হয়; তৎপরে পৃষ্ঠে একটা ব্রণ দেখা দেয়। ২১ বৈশাখ ও ৩১ বৈশাখ তিনি সেই পৃষ্ঠ-ব্রণের সংবাদ দিয়া আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে পত্র লেখেন। ৩২ বৈশাখের পর আর তাহার পত্র পাই নাই। ওই পত্রের দুই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"উহা সাধারণ ফোড়া বলিয়া বোধ হয় না, ডাক্তার বলেন, carbuncular boil; কার্বংকলের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে আমার বড় চিন্তার কারণ হইয়াছে। ঘা ভালো হইলে একবার বাড়ি যাইব, কারণ সর্বাগ্রজ মহাশয় বাড়িতে বড় পীড়িত অবস্থায় আছেন। ১০/১২ দিনের পর বাড়ি হইতে ফিরিব। তখন তোমাকে চিঠি লিখিব। শরীর ভালো থাকিলে তোমাদের ওখানে যাইবার বন্দোবস্ত করিব।"

ইহার পর সিপাহিযুদ্ধের শেষ ভাগের শেষ ফর্মা ছাপাখানায় দিয়া তিনি বাটি গমন করেন এবং কার্বংকলের পরিণত অবস্থা লইয়া ২৫ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না।

রজনীবাবু ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ি আসিবেন, আমি ও আমার বন্ধুগণ যে সময়ে ব্যগ্রভাবে এই প্রতীক্ষায় ছিলাম, সেই সময়ে সংবাদ আসিল, আমাদের সেই আশা আর পূর্ণ হইবার নহে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় রজনীবাবু ইহজগৎ হইতে

বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল। সাহিত্যসমাজে রজনীবাবুর স্থান কোথায় তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সম্পাদিত কার্যের সমালোচনা আমার সাধ্য নহে। অন্যে সেই ভার গ্রহণ করিবেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার একান্ত অনুগত সুহৃদকে হারাইয়াছে। পরিষদের জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, সেরূপ বোধহয় সে সময়ে অপর কেহ করেন নাই। তিনি যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, শ্রদ্ধার সহিত ও অনুরাগের সহিত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম অনুরাগ পৃথিবীতে অতি বিরল সামগ্রী। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই সেই শ্রদ্ধার ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছেন। আমি অনর্থক বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব না।

॥ ২ ॥

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মতুগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত দাসগুপ্ত তেওড়া গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্বকনিষ্ঠ। রজনীকান্তের তিন ভ্রাতা অদ্যাপি বর্তমান আছেন; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস মহাশয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি পেনশন ভোগ করিতেছেন।

সাত আট বৎসর বয়সে রজনীকান্তের কঠিন পীড়া হয় ও তাহার ফলে তাঁহার শ্রবণশক্তি চিরদিনের জন্য দুর্বল হইয়া যায়; এই দৌর্বল্যের জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ে অধিকদূর পর্যন্ত অধ্যয়ন ও উপাধিলাভাদি ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভরতি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কলেজে তিনি এন্ট্রাস ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয়-ত্যাগের পরবর্তী কালে তিনি কিছু দিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গভর্নমেন্টের অধীন চাকরি গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরি কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায় তিনি ওই পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাংলা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাংলা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পূর্বে ওই পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে প্রধানত গোল্ডস্টুকারের পাণিনি অবলম্বন করিয়া 'পাণিনি' পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না; কলিকাতার খরচ অতি কষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোস্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্তী কালে সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোনও উপাধি লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্বল্য তাঁহার জীবিকার্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সংকল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগে এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে আমাদের মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই তিনি সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে ওই সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণির মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ওই বৎসর পরলোকগত রেবরেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এন্ট্রাস পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর বৎসর তাঁহার সংকলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এন্ট্রাস পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি নিবদ্ধ হইয়া 'আর্য্যকীর্ত্তি' প্রকাশিত হয়। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্সবুক কমিটির অনুমোদিত হইয়াছিল; কোনও-কোনও খানি ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপেও নির্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য কষ্ট করিতে হয় নাই। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয়বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। তিনি প্রায় সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্য রজনীকান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিতজনকর্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অপকট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকাল মরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও

প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণকার্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্যন্ত সমস্ত কার্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোনও কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কীরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কীরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া তিনি সর্বদাই আলোচনা করিতেন। সাহিত্য-পরিষৎ যে-যে প্রধান কার্যে এপর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্যেই প্রধান উদযোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনাসমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট আর্টস ও বি.এ. পরীক্ষায় বাংলা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতে ছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ-কর্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টায় আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। রজনীকান্ত কোনওরূপ সংকীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদিগকেও শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন। রাজনীতি বিষয়ে তিনি উদারমতাবলম্বী ছিলেন। কটন সাহেবের নিউ ইন্ডিয়া প্রচারিত হইবামাত্র তিনি ওই গ্রন্থের অনুবাদ বঙ্গসমাজে প্রচার করেন।

বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমত প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি উহা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমত তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল; এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।

বাঙালির পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল নহে। প্রথমত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহিযুদ্ধের মতো নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্তমান আছেন,

তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোনও ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরেজিতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরি হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরিতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোনও সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে স্বদেশের ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের অনুবর্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে সকল সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপবে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবত প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। বাংলা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না; অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাংলা লেখকগণের মধ্যে দুই-এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবল ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্য-মধ্যে তাহার আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাংলায় লিখিত অন্য কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ স্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন, এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোনও কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্যের সহিত তৎকৃত কার্যের তুলনায় কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের, অতএব বঙ্গমাতার, সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদযাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন সংশয় নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালক বলেন্দ্রনাথ[৪১] যখন 'বালক' ও 'ভারতী ও বালক' অবলম্বন করিয়া বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত বা তাঁহার রচনার সহিত আমার পরিচয় ছিল না। 'সাধনা' বাহির হইলে তাঁহার রচনা আমাকে আকৃষ্ট করে; তারপর হইতে তিনি যখন যাহা লিখিয়াছেন, প্রচুর আনন্দপ্রাপ্তির আশা লইয়া তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কোনবারেই যে সেই আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা মনে হয় না। সেই আনন্দের উৎস এত শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে এবং বলেন্দ্রনাথের রচনাসংগ্রহকে পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার ভার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কখনও ভাবি নাই।

এই কার্যে কিন্তু আমার অধিকারও নাই, যোগ্যতাও নাই, তৎসত্ত্বেও যখন তাঁহার স্বজনগণ আমাকে এই ভার দিলেন, তখন অধিক বাক্যব্যয় না করিয়াই ভার লইলাম। কেন লইলাম ঠিক বলা কঠিন। বোধ করি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রতি আমার অনুরাগপ্রকাশের এই অবসর আমি ত্যাগ করিতে চাহি নাই।

বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গিই আমাকে এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল; এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তার পূর্বে আমি দেখি নাই। শুনিয়াছি বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল। শিক্ষানবিশি অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। তিনি অলংকারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না; কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোনটি বসিলে ভালো মানাইবে, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিগরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন; তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্যবুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ। অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসেবে দেখেন না। কবিতারচনায় ছন্দের আবশ্যকতা আছে; বলেন্দ্রের গদ্যরচনাতেও সেই ছন্দের ঝংকার শুনিতে পাওয়া যায়; এই ছন্দ ভাবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অপরূপ কলাকৌশলের উৎপত্তি করিয়াছে। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ-কোমল-প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝলসাইয়া দেয় না, কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে। সেই তৃপ্তি কিন্তু কখনও মাত্রা ছাড়াইয়া পরিতৃপ্তিতে দাঁড়ায় না। স্রোতস্বতীর মতো ইহা স্থির গতিতে আপন নির্দিষ্ট পথে চলে; ইহার পূর্ণতা কখনও উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া কূল ভাসাইয়া জলপ্লাবন ঘটায় না। ইহার মধ্যে কোথাও ফেনিল আবর্ত নাই; কোথাও ইহা জলপ্রপাতের কোলাহল উপস্থিত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের ভাষা তাঁহাদের বশংবদ ভৃত্য; তাঁহারা উহাকে যখন যে কাজে বিনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আদেশে বা ইঙ্গিতমাত্রে ভাষা তদনুযায়ী পরিচ্ছদ বা অস্ত্রশস্ত্র বা ঐশ্বর্য

লইয়া তখনই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের ভাষায় যে বল আছে, যে বেগ আছে, যে তীব্রতা আছে, যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন-মুখতা আছে, এবং প্রয়োজনমতো ঐশ্বর্য আছে, বলেন্দ্রের-ভাষায় সে সকল না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার স্থিরতা ও দৃঢ়তা ও স্বচ্ছপ্রাঞ্জলতা ও সরস-কোমলতা তাঁহার রচনাকে কাব্যের সীমামধ্যে রাখিয়া দিয়াছে।

লেখকের ভাবুকতা ও লিপিকৌশল উভয়ের মূলস্থ শক্তি সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম। এই দুইটি না থাকিলে সুরুচি থাকে না। বলেন্দ্রের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল; কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানবসমাজ, ও মানবজীবন, এইরূপ নানাবিধ বিষয়ের তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কোথায় কী দেখিবার, বুঝিবার, আস্বাদনের ও উপভোগের আছে, তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে ও দেখাইতে হইয়াছে। তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্তটা দেখিয়াছেন;—ফুলের ভিতর হইতে মধু আহরণ করিতে গিয়া বাহির হইতে ফুলের শোভাটা দেখিয়া লইতে ভুলেন নাই; কোনও একটা অবয়বের অস্বাভাবিক স্ফীতি বা হীনতা বা অযথা সন্নিবেশ যেখানে তাঁহার সামঞ্জস্য-বুদ্ধিকে আহত করিয়াছে, সেখানে মৃদু হাস্য ও শ্লেষের দ্বারা সেই ত্রুটি দেখাইতে পরাঙমুখ হন নাই। তৎকর্তৃক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় ইহার ভূরি প্রমাণ আছে। কিন্তু কেবল বিশ্লেষণের দ্বারা দোষ-দর্শন ও হীনতার আবিষ্কার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; সৌন্দর্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। যে সৌন্দর্য অন্যের চোখে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার গ্রন্থাবলির অধিকাংশ প্রসঙ্গ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

বৈজ্ঞানিকের সহিত সাহিত্যিকের একটি স্থানে মিল আছে। ইতর সাধারণ সকলেই সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সেই কয়টা জিনিসকে জীবনের কাজে লাগাইয়া যেন-তেন-প্রকারেণ তাড়াতাড়ি জীবনযাত্রায় দৌড়িয়া চলিতেছে; আশেপাশে যাহা আছে, তাহার প্রতি মনঃসংযোগের অবকাশ পাইতেছে না। কিন্তু কয়েকজন লোক এই আশেপাশে চাহিয়া অন্যে যাহা দেখে না, তাহাই দেখেন এবং ইতর সাধারণকে যখন দেখান, তখন তাহারা নূতন কী দেখিলাম বলিয়া চমকিয়া উঠে। বৈজ্ঞানিক বলেন, দ্যাখো, এত বাস্তবিক সত্যটা তুমি এতদিন দ্যাখো নাই; ইহা হইতে জীবনের কত প্রয়োজনসিদ্ধি, জীবনযুদ্ধে কত সাহায্য ঘটিতে পারে। সাহিত্যিক বলেন দ্যাখো, এত সুন্দর দৃশ্যের প্রতি, তুমি এতকাল তাকাও নাই; ইহা হইতে কত আনন্দ মিলিতে পারে, জীবযুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ কত কমাইতে পারা যায়। একজন যেখানে সত্যের, অন্যজন সেখানে সুন্দরের আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানের ও সাহিত্যের দৃষ্টি একই দিকে; আবার উভয়েই যখন সেই সত্যকে ও সুন্দরকে শিবরূপে প্রতিপন্ন করেন, তখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই তত্ত্ববিদ্যার পরম প্রকোষ্ঠে উপনীত হয়।

এই আবিষ্কারেব জন্য যে যোগ চাই, তাহা সকলের নাই; কিন্তু একদেশদর্শিতা, দৃষ্টিবিভ্রম ও দৃষ্টিবিকার এখানেও সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়ের কর্তব্যসাধনের প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে সাধনা আবশ্যক ও সংযম আবশ্যক; নহিলে উভয়েরই কর্মে প্রমাদ ঘটে। সমালোচকের পথ যে বৈজ্ঞানিকের পথ হইতে বহুদূরে বা ভিন্ন মুখে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

বলেন্দ্রনাথের এই সংযম যে প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা তাঁহার ভাষাতেও যেমন

বুঝা যায়, তাঁহার ভাবগ্রাহিতাতেও তেমনই বুঝা যায়। তিনি ভাবের রাজ্যে বিচরণ করিতেন ও ভাবের বায়ুভরে উড়িয়া বেড়াইতেন; অথচ আপনাকে একান্ত পরবশ করিয়া, মেরুদণ্ডহীনের মতো ভাবের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া, আপনাকে শোচনীয় ও কৃপাপাত্র করিয়া তুলেন নাই। এ বিষয়ে তিনি আধুনিক বাংলায় বহু সাহিত্যসেবীর ও বহুতর সাহিত্য-জীবীর অনুকরণীয় আদর্শস্থল বা শিক্ষাস্থল।

বাংলা দেশের আধুনিক সাহিত্যের দূষিত হাওয়ায় থাকিয়াও তিনি অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার সংক্রামক ব্যাধি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার সংযম ও নিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন স্বাস্থ্যের ও বলবত্তার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আপনার উপর তাঁহার প্রভুত্ব ছিল; ভাবের বিকারে তিনি আত্মহারা হইয়া যান নাই।

বয়সের সহিত তাঁহার রচনা যেমন গাঢ়তা পাইতেছিল, তেমনি তাঁহর অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা বিকাশ পাইতেছিল। বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিন প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষদিকের রচনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বালকের চাঞ্চল্য বালকের রচনাতেও অধিক ছিল না; কিন্তু বিদেশি শিক্ষার মোহ হইতেও এই অল্পশিক্ষিত বালক অনেক অতিশিক্ষিত বৃদ্ধ অপেক্ষা মুক্ত ছিলেন। 'সাধনা' পত্রে প্রকাশিত 'বারাণসী', 'কণারক', 'খণ্ডগিরি' ও 'প্রাচীন উড়িষ্যা' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বদেশি সৌন্দর্যে অনুরাগ ও প্রীতি আমাকে বলেন্দ্রনাথের যে পরিণতি দেখিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, অনতিবিলম্বে প্রকাশিত 'প্রাচ্য প্রসাধন কলা' ও 'নিমন্ত্রণ সভা' সেই পরিণতির দ্রুতত্বে যে আমাকে চমকাইয়া দেয় নাই, তাহা বলিতে পারিব না। এই শোষোক্ত প্রবন্ধটির মধ্যে আমাদের বাঙালি হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃপুরের 'শ্রীহস্ত' ও 'শুভদৃষ্টি', গৃহিণীর 'লক্ষ্মীশ্রী' ও 'কল্যানমূর্তি', আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মূলে 'শুভ সংকল্প' প্রভৃতি কয়েকটি নূতন কথা পাইলাম, যাহা ইতিপূর্বে আর কোনও শিক্ষিত স্বদেশীর মুখে এমনভাবে শুনি নাই। জোড়াসাঁকোর যে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙালি সমাজ এতদিন ধরিয়া সমায়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমনকী নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল,—মনের কথা গোপন নাই বা করিলাম—সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে, তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত সকলকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখন শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালির অন্তঃপুরে, বাঙালির গৃহস্থালিতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা সম্মুখে আনিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বলেন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনে যে বিশিষ্টতা ছিল, সেই বিশিষ্টতার গঠনকর্মে, তাঁহার পিতৃব্যের কতটুকু কৃতিত্ব ছিল, আমরা বাহির হইতে ঠিক তাহা বলিতে পারি না। তবে রবিরশ্মির প্রভাব হইতে আপনাকে আচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। অথবা বাংলার সাহিত্য-জগতের বহু গ্রহ, উপগ্রহ ও বহুতর উল্কাপিণ্ড যাঁহার নিকট হইতে স্থায়ী বা ক্ষণিক প্রভা সংগ্রহ করিয়া দীপ্তি লাভ করিতেছে, বলেন্দ্রের মত অনুগামী ও অনুচরে তাঁহার জ্যোতির

আংশিক প্রতিফলনে ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু নাই। বরং এত সন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তিনি যে তাঁহার নিজস্ব প্রতিভা প্রচুর পরিমাণে দেখাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার সামর্থ্যের বিশিষ্টতা। গদ্য অপেক্ষা পদ্য রচনায় তাঁহার এই নিজস্ব শক্তির স্পষ্টতর পরিচয় মিলে। তাঁহার রচিত কবিতাগুলির মূল্য তাঁহার গদ্য রচনার সমান না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যের অধিক স্ফূর্তি আছে। অন্তত আধুনিক বঙ্গের অধিকাংশ কবির মতো তিনি রবি প্রতিভায় অভিভূত হন নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, সেই সাহিত্যের প্রভাবে তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া তিনি আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বলেন্দ্রনাথের জীবনের স্বল্প কাহিনি লিপিবদ্ধ করা আমার কাজ নহে। তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভাবে চিনিবার সুবিধা বা অবকাশ আমার ঘটে নাই। কয়টা দিনের জন্য আমি তাঁহার সম্পর্কে আসিয়াছিলাম। তাঁহাকে মিতভাষী ও মিষ্টভাষী দেখিতাম। তাঁহার রচনায় যে কোমল, স্নিগ্ধ, প্রশান্ত শ্রী ছিল, তাঁহার মুখে চোখে ও কথাবার্তায় তাহা আরও স্পষ্ট দেখা যাইত। এখানে যেন তাহা সমস্ত তারল্য ও চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া আরও ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বালকের মূর্তির ভিতর প্রৌঢ়ের গাম্ভীর্য দেখিতে পাইতাম; তাঁহার পরিমিত স্বল্পাক্ষরবদ্ধ উক্তিপ্রত্যুক্তির ভিতর যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব দেখিতাম। তিনি যেন পর্যবেক্ষকমাত্র; সংসারের চক্রে তাঁহাকে যেন কেহ বাঁধিয়া দিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন মাত্র; উহাতে আগ্রহের সহিত যোগ দিতেছেন না। উহার উন্মত্ত কোলাহলে যোগ দিতে তিনি যেন অক্ষম। সংসারের বিচিত্র সৌন্দর্যকলার উপভোগের জন্য হয়তো তিনি উপস্থিত আছেন, কিন্তু সেই সৌন্দর্যকে দৃঢ় স্পর্শে আঁকড়াইয়া ধরিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

তাঁহার গদ্য রচনায় তিনি নিজের উপর যতটা কর্তৃত্ব রাখিয়াছিলেন, কবিতাগুলিতে তাহার কিছু অভাব দেখা যায়। ইহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে, বিশেষত, মানসিক সৌন্দর্যের দিকে একটা ভাবপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মাত্র বলিব, তৃষ্ণা বা লালসা বলিব না। কিন্তু তাহার যেন তৃপ্তিতে পর্যবসান হইতেছে না। সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যেন থাকিয়া গেল, যেন মধ্যপথ হইতে সহসা কোনও অদৃশ্য হস্ত আসিয়া তাঁহাকে নিঃশব্দে সরাইয়া লইয়া গেল।

অ্যানি বেসান্ট

বৈরাগ্যপ্রবণ আর কর্মপ্রবণ বলিলে, প্রাচ্য জীবন ও প্রতীচ্য জীবনের মূলগত পার্থক্য কতক বুঝা যায়। প্রতীচ্য জীবনের অপেক্ষা প্রাচ্য জীবন উৎকৃষ্ট, এই ভাবের একটা হাওয়া কিছু দিন হইতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি অ্যানি বেসান্ত আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া, হাওয়ার গতিটা আর একটু প্রবল করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা অসাময়িক না হইতে পারে।

বৈরাগ্য অর্থে জীবনে অনাসক্তি, এবং এই অর্থে বৈরাগ্য আধুনিক হিন্দুর মজ্জাগত, এরূপ নির্দেশ করিলে সম্পূর্ণ ভুল না হইতে পারে। কর্ম এদেশে নাই, এমন নহে; কেন না, কর্মই জীবন। কর্মলোপে জীবনের অস্তিত্ব টিকে না। তবে বৈরাগ্য-ধর্মের এতটা প্রাদুর্ভাব, অন্য কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

তবে চিরকাল এমন ছিল না। বৈদিক সময়ে আর্য মানবের জীবন সংসারে বীতস্পৃহ হয় নাই। তখন কর্মই জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। নতুবা আর্যাবর্তে আর্যনিবাস ও আর্যধর্মের অভ্যুদয় হইত না। যখন চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হয়, তখন জীবনে সহসা অনাসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে জীবনযাত্রা বড়ই সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। বৈরাগ্য ছিল না, তৎপরিবর্তে ছিল আশা আর উদ্যম, অধ্যবসায় আর পরিশ্রম, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্বার্থময়তা।

আজিকাল যাহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সুরে সুর মিলাইয়া বৈদিক ধর্মের স্তুতিগান ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা 'ধর্ম' শব্দটার কীরূপ অর্থবিপর্যয় করিয়া ফেলেন,—দেখিয়া একটু ব্যথিত হইতে হয়। ইংরাজি ভাষায় রিলিজন (religion) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের পুরাতন ধর্ম শব্দটার সে অর্থে ব্যবহার করিতে আমরা বড়ই নারাজ। রিলিজনের প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় ঠিক পাওয়া যায় না; কেন না, ভারতবর্ষে, সুতরাং বঙ্গদেশে রিলিজন নামক একটা কিছু গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে ছিল না। খ্রিস্টানের রিলিজন কতকটা খ্রিস্টানের জুতা, টুপি প্রভৃতি পরিচ্ছেদের স্থলীয় একটা কিছু; কতকটা শোভার জন্য, কতকটা লোক দেখানোর জন্য এবং হয়তো শরীরটা একটু গরম রাখিবার জন্য উহার আবশ্যকতা।

কিন্তু আমাদের ধর্ম আমাদের জীবনের সহিত সর্বতোভাবে সহবর্তী ও সহব্যাপী; জীবনের প্রধান লক্ষণ ও বিশেষণ। মনুষ্যের সম্পাদিত ক্রিয়ার সমষ্টিকে যদি জীবন বলা যায়, মনুষ্যের সম্পাদ্য কর্তব্যের সমষ্টিকে ধর্ম বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে এক ডিউটি (duty) ভিন্ন ইহার সমার্থসূচক সমকক্ষ প্রতিশব্দ আর পাওয়া যায় না।

মানুষ্যের কর্তব্য সমষ্টিকে স্থূলতর তিন ভাগ করিতে পারা যায়; নিজের প্রতি কর্তব্য, আপনার লোকের প্রতি কর্তব্য, এবং পরের প্রতি কর্তব্য। এই তিন কর্তব্যের সমষ্টিতে ধর্ম। ধর্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস মনুষ্যজাতির ইতিহাসের সহিত আলোচনা করিলে

দেখা যায়, নিজের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানটারই উৎপত্তি সকলের আগে। মানুষকে প্রাণী হিসাবে দেখিলে দেখা যায়, আত্মপ্রীতিই তাহার স্বভাবগত ধর্ম। সমাজবন্ধনের সহকারে পরপ্রীতি আত্মপ্রীতির অনুকূল হয়, তাই ক্রমশই প্রীতিটা আপনার সংকীর্ণ পরিধি ছাড়িয়া বাহিরের অপরের অভিমুখে প্রসার লাভ করে। পরপ্রীতি কতকটা আত্মপ্রীতির প্রতিকূল, কিন্তু সামাজিক মানুষের নিকট সর্বতোভাবে প্রতিকূল নহে, কতকটা অনুকূল। পরকে ক্রমশ আপনার করিয়া না নিলে সমাজবন্ধন চলে না। তাই পরপ্রীতি ক্রমশ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমনকী, কোনও-কোনও বিচক্ষণ শাস্ত্রকারের মতে পরার্থপরতাই ধর্ম; এবং স্বার্থপরতাই অধর্ম। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের সামঞ্জস্যে ধর্মের স্থিতি।

আপনার প্রতি কর্তব্য ও পরের প্রতি কর্তব্য ছাড়িয়া দিয়া আর একটা কর্তব্য মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জগতের খানিকটা বুঝে, খানিকটা বুঝে না। খানিকটা তাহার জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত; খানিকটা সেই পরিধির বাহিরে। এই সীমাবিভাগ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকিবে। মানুষ যেটুকু বুঝে, তাহার আবার কতকটাকে ভালোবাসে; কতকটা ভালোবাসে না; অথবা অগত্যা ভালোবাসে। আর যেটুকু বুঝে না, সেইটুকুকে ভালোবাসিতেও পারে না, না বাসিতেও সাহস করে না; সেইটুকুকে ভয় করে। জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশটুকু মানুষের চক্ষে বিভীষিকাময়। অকস্মাৎ, অতর্কিতে, এমনভাবে মানুষের জীবনের উপর ইহা প্রভাব বিস্তার করে যে, মানুষের জীবন-শৃঙ্খলা সহসা ছিঁড়িয়া যায়। ইহা মানুষের শক্তির অধীন নয়। মানুষের ক্ষমতার আয়ত্ত নহে, তাই মানুষ বড়ই সাবধানে, অসহায়ভাবে, কাতরনেত্রে জগতের এই জ্ঞানাতীত অংশের প্রতি চাহিয়া থাকে; স্তুতি করে, তোষামোদ করে, এবং সময়ে-সময়ে নিতান্ত ক্ষীণপ্রাণ দুর্বল অসহায়ের মতো উৎকোচ দিয়া বশ করিতে চায়। এই স্তুতিবাদ, এই তোষামোদ দুর্বলের একমাত্র গতি, অসহায়ের একমাত্র বল, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এই একমাত্র অবলম্বন। অসহায় মানুষ জগতের সেই জ্ঞানাতীত পরাক্রান্ত শক্তি হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছে, ইহাকে আপনার জীবনের প্রধান কর্তব্যমধ্যে গণ্য করিয়াছে। উপায়টাকে হীন বলো, কাপুরুষোচিত বলো, আর যাহাই বলো, রুদ্ধশ্বাসে ভয়ে-ভয়ে বলিও। মুক্তকণ্ঠে বলিলে মনুষ্যসমাজের সমবেত শক্তি বজ্রের ন্যায় তোমার উপর আপতিত হইবে।

সুতরাং স্বার্থ ও পরার্থ ছাড়িয়া মনুষ্যজীবনের আর একটা অর্থ আছে, আর একটা কর্তব্য আছে; সেইটা মানুষের রিলিজন। জগতের অজ্ঞেয় শক্তিকে যেনতেন সন্তুষ্ট রাখিতে পারো, তোমারই মঙ্গল; তবে কীসে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যাইবে, তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। বোধ করি—যত মানুষ, তত মত। সন্তুষ্ট রাখা বড় সহজ নহে। ইহজীবনে সকল সময়ে ফললাভ হয় না। না হউক, পরলোক আছে। সেখানে ফল পাইবে। দুর্বলের এইরূপ সান্ত্বনা, অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা।

বৈদিক সময়ে মানুষের জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি ও অনুরাগ ছিল; আপনার শ্রীবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রভূত চেষ্টা ছিল, এবং আত্মরক্ষণের কামনায়, শত্রু নিপাতের কামনায়, ইন্দ্রের প্রতি, বরুণের প্রতি, রুদ্রের প্রতি স্তুতি প্রয়োগ ও উৎকোচ প্রয়োগেরও অভাব ছিল না। পরার্থে আত্মোৎসর্গ বৈদিক সময়ে ধর্মের অন্তর্গত হয় নাই।

হয় নাই—তাই ভারতবর্ষ-ভারতবর্ষ হইয়াছে, আর্যাবর্ত আর্যাবর্ত হইয়াছে। জাতি মাত্রেরই অভ্যুদয়ের এই ইতিহাস। বেদের পর উপনিষদ ও দর্শন। এখন আর শত্রুভয় নাই, জীবন-সংগ্রামে কঠোরতা নাই, বসুন্ধরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা; অন্নকষ্ট নাই। প্রচুর অবকাশ, আর্যজাতির ধীশক্তি জীবনের রহস্যের, জগতের রহস্যের তন্ন-তন্ন বিশ্লেষণে নিযুক্ত। বিশ্লেষণে স্থির হইল, জীবন দুঃখময়, এত সুখেরও পরিণাম দুঃখ, দুঃখময়তাই জীবন। নিরপেক্ষ সুখ অসম্ভব; দুঃখনিবৃত্তিই সুখ; দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। দুঃখনিবৃত্তির উপায় শুদ্ধ জ্ঞানে। তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ ও সত্যজ্ঞানে মোক্ষ। সত্যজ্ঞান কী? না জগৎ কল্পনা; আমি মাত্র আছি; জগৎ আমার কল্পনা, আমার সৃষ্টি, আমার অংশ। এই জ্ঞান লাভ হইলে বুঝিতে পারিবে, দুঃখ জীবনের সহচারী হইলেও আমারই কল্পিত পদার্থ। সুতরাং দুঃখ আর দুঃখ থাকিবে না। ফল হইল সংসারে বিরক্তি—বৈরাগ্য। সকলেই যে বিরাগী হইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা নহে; তবে সেই অবধি হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-শোণিতের সহিত একটা সংসারে বিরক্তি, কর্মে অনাসক্তির রস মিশিয়া গিয়াছে, তাহা আজ পর্যন্ত বর্তমান।

তাহার পর বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব জগতে দুঃখ ভিন্ন সুখ দেখিতে পাইলেন না। কর্মবশ জীব কেবল দুঃখের চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, ইহাই দেখিলেন। বুদ্ধদেব আদশে দিলেন, এই দুঃখ নিবৃত্তির আর কোনও উপায় নাই। স্বার্থ বিসর্জন করো, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করো। ভোগবিলাস, সুখ ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া সর্বজীবে প্রীতি বিতরণ করো। ইহাই মনুষ্যের কর্তব্য, ইহাই মনুষ্যের ধর্ম, ইহাই মনুষ্যের কর্ম। এমন মহতী বাণী ইতিপূর্বে নরকণ্ঠ হইতে কখনও নির্গত হয় নাই; পরেও হইয়াছে কি না সন্দেহ। বৈরাগ্য হইতে কর্ম প্রসূত হইল; কর্ম 'ধর্ম' আখ্যা প্রাপ্ত হইল; শত্রু মিত্র হইল, পর আপনার হইল। আর্য অনার্যের সহিত মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বৈষম্য দূরে গেল। বৌদ্ধ প্রচারক এই অপূর্ব উপদেশ লইয়া দেশে বিদেশে বাহির হইল। হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া ভারতসাগর পার হইয়া বুদ্ধ-প্রচারিত প্রীতিধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইতে চলিল। ভারতবাসী ঐশ্বর্যপিপাসায় বা শোণিততৃষ্ণায় কখনও স্বদেশের সীমা পার হয় নাই, ধর্ম প্রচারের নামে জীবরক্তে ধরাতল অভিষিক্ত করে নাই। ধর্মপ্রচার ভান করিয়া পরস্বাপহরণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই। ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরেই তাহার অধ্যবসায় চিরকাল আবদ্ধ আছে। একবার মাত্র সেই চতুঃসীমা পার হইয়াছিল; কটিতে তরবারি ও করপুটে ধর্মপুস্তক তাহার সঙ্গে যায় নাই। সঙ্গে ছিল কেবল মনুষ্যত্ব—ললাটে জ্ঞানের প্রতিভা ও কণ্ঠে প্রীতির অমৃতময়ী বাণী।

প্রাচীন আর্যাবর্তে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা ছিল না; তথাপি জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়িয়াছিল। কেন, ঠিক বলা যায় না। বোধ করি, ইহাই প্রাকৃত নিয়ম। অন্য দেশে এমন নয়। ইউরোপে জীবন-সমরের কঠোরতার মাত্রা পূর্ণ। অথচ জীবনের সেখানে আসক্তি প্রবল। যে কারণেই হউক, আর্যাবর্তে জীবন দুঃখদুর্ভর হইয়া পড়ে। দুঃখমুক্তি পরমপুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। ফলে দাঁড়ায় বৈরাগ্য। বৈরাগ্য দুই মূর্তি গ্রহণ করে; দুই পথে চালিত হয়। কেহ বলেন—মুক্তি জ্ঞানে; কেহ বলেন—মুক্তি কর্মে। জ্ঞানের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান, কর্মের অর্থ প্রীতি ও মৈত্রী। বৈরাগ্যের স্রোত দুই মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। এখনও বোধ করি, দুই মুখেই দুই প্রবাহ চলিতেছে। দুই স্রোত মিলিবে কি না, জানি

না। যেদিন মিলিবে, মানবজাতির ইতিহাসে সেই দিন পুণ্য দিন। যে স্থানে মিলিবে, ধরাতলে সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগসঙ্গম।

তবে ভারতবাসী বুদ্ধের উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই। অন্য জাতি যে মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে, এই পর্যন্ত। চিনে, তিব্বতে, অসভ্য জাপানে বৌদ্ধধর্ম বর্তমান, বুদ্ধের জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্মের সমাদর নাই, এই বলিয়া একটা হাহাকার আজি কালি প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই হাহারবের ভিত্তির ঠাহর পাওয়া যায় না। ভিন্ন দেশে বৌদ্ধ রিলিজন নামে একটা কিছু প্রচলিত থাকিতে পারে; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মোপদেশ ভারতবর্ষে যে রূপে যেভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহা কুত্রাপি হয় নাই, ইহা অকুতোভয়ে নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই নিরীহ, দান্ত, শান্ত, ধীর, ক্ষমাশীল, নিষ্ঠাবান প্রকাণ্ড হিন্দুজাতির ইহাই প্রমাণ।

ভালোর মন্দ আছে। আর্যাবর্তে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের ফল যে সর্বতোভাবে সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বুদ্ধদেব পরার্থপরতা শিখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ মাত্রই পরার্থপর হইয়াছিল, বলা যায় না। মনুষ্যচরিত্র এইরূপ। শুনা যায়, যিশুখ্রিস্ট উপদেশ দিয়াছিলেন—এক গণ্ডে চপেটাঘাত পাইলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে। কিন্তু নির্বিঘ্নে চপেটাঘাত সহিষ্ণুতা খ্রিস্টানের লক্ষণ বলিয়া কোনও কালে গণ্য হইয়াছে, ইতিহাসে এরূপ কথা লেখে না। বিনা বাক্য ব্যয়ে নিরীহের গণ্ডে চপেটাঘাত দ্বারা পরম সুখের অনুভবলিপ্সু যদি কেহ থাকেন, তিনি খ্রিস্টান।

যাহাই হউক, ভারতবাসী মাত্রই বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করে নাই। তবে মিলিয়া মিশিয়া বুদ্ধের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিল। মন্দির গড়িয়া বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ধূপ ধুনা আরতি দ্বারা প্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছিল। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রের সৃষ্টির দ্বারা নানা কৌশলে অতিপ্রাকৃত অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্বার্থরক্ষণের চেষ্টা পাইয়াছিল। বড়-বড় রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। জ্ঞানচর্চার খরস্রোত প্রতিহত হইয়াছিল। শূদ্র ও অন্ত্যজ সমাজ-সোপানে উঠিয়াছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ব্রাহ্মণের অধোগতি হইয়াছিল। আর্য অনার্য মিশ্রিত হইয়া বর্তমান হিন্দুজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু শোণিতের বিশুদ্ধতার সহিত আর্যপ্রতিভার খর জ্যোতি মলিনত্ব পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক ধর্মের নূতন ভাবে পুনরভ্যুদয়ের সময়, ব্রাহ্মণ-মহিমায় পুনঃস্থাপনের সময়, দুই একবার সেই প্রতিভা, নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মতো, বৃষ্টিশেষে তড়িল্লতার মতো দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রীতিমত স্থায়ী হয় নাই, সুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসে না; মলিন প্রতিভা পূর্বের মতো উজ্জ্বল হয় নাই।

বৈদিক কালের অতিপ্রাকৃতের নিকট অসহায় স্তুতিবাদের সহিত দর্শনোপনিষৎ-প্রচারিত জ্ঞান ও বুদ্ধ-প্রচারিত প্রীতি ও বৌদ্ধগণ-প্রচারিত যন্ত্র মন্ত্র উপাসনা সম্মিলিত করিয়া বর্তমান হিন্দুধর্মের উৎপত্তি। আধুনিক হিন্দু সংসার মিথ্যা ও স্বপ্ন বলিয়া জানে, আপনাকে কর্মবশে দুঃখবর্ত্মে ভ্রাম্যমাণ বলিয়া স্বীকার করে, এবং জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, সর্বদা মুখে কহিয়া থাকে। হিন্দু পরোপকারে কুণ্ঠিত নহে, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রীকে পরাভব করে, সংযম ব্রতোপবাস একমাত্র কর্ম বলিয়া নির্দেশ করে। হিন্দু রাজার নিকট দণ্ডসহিষ্ণু প্রজা, গুরুর নিকট বিনীত শিষ্য, পরিবারের নিকট কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য। অত্যাচারী

রাজপুরুষের নিকটে হিন্দুর বাক্‌স্ফূর্তির ক্ষমতা নাই, উপদেষ্টা গুরুর নিকট হিন্দুর স্বাধীন চিন্তার অবসর নাই। জীবন ধারণের উপযোগী অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইলেই সে পরিতুষ্ট; কঠোর জীবন-সমরে লিপ্ত হইতে পরাঙমুখ, শ্রমসাধ্য জ্ঞানার্জনে কাতর। সংসার মায়াময়, জীবন মোহময়, সুত-পরিবার ভাববন্ধনের শিকল; এমনকী স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। বাহির হইতে কী একটা অনির্দেশ্য শক্তি তাহাকে কাজ করায়, তাই সে কাজ করে; তাহার সৃষ্টিকর্তাকেও সেই অনির্দেশ্য শক্তি সৃষ্টিকার্যে প্রবর্তিত করে, তাই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন। মানুষও যেমন পরাধীন, মানুষের দেবতাও তেমনই পরাধীন। তথাপি হিন্দু বিরাগী হইয়াও গৃহী; এবং সংসার মিথ্যা জানিয়াও, কর্মফল অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, হিন্দু পুত্রকামনায় দেবতার নিকট বলি মানস করে, পরকালে সুখের কামনায় গঙ্গাস্নান করে, ইহকালে স্বাস্থ্যকামনায় গাছতলে মাথা ঠুকে, এবং সময়ে-সময়ে শত্রুনিপাত কামনায় গুপ্তভাবে আগুনে ঘি ঢালে।

মোটের উপর ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। অন্য জাতির তুলনায় ভারতবাসী দুঃখী বলা যায় না। অন্যের তুলনায় ভারতবাসী দরিদ্র; কিন্তু সন্তুষ্টস্য সদা সুখম্। ভারতবাসী পরপীড়িত, কিন্তু পর কর্তৃক পীড়িত হইলে তাহার প্রতিবাদ যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ভারতবাসী ঠিক বুঝে না। তাহাতে ভারতবাসী নিতান্ত অসন্তুষ্ট নহে; কেন না, সে তো বিধিলিপি, তাহা নিবারণের বোধ করি কোনও উপায় নাই। ভারতভূমির শস্যসম্পত্তি কখনও অপ্রচুর নহে; সুতরাং জঠরজ্বালা কখনো বেশি তীব্র হয় নাই। অথবা কোনও বৎসর ফল না জন্মিলে ভারতবাসী দল বাঁধিয়া মরিয়া যাইতে কোনও মতে পশ্চাৎপদ নহে। ভারতবাসীকে এ বিষয়ে কখনও কাপুরুষ বলিও না। জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই, তাহা ভারতবাসী ঋষিমুখে শুনিয়াছে; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান আহরণের দরকার নাই; তাহা তাহার পূর্বপুরুষের ভাণ্ডার খুলিলেই যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। কর্মে মোক্ষলাভ হয়, তাহাও সে জানে, তাই সন্ধ্যা বন্দনা তাহার নিকট ফাঁক যায় না, এবং মাসের মধ্যে উনত্রিশটা একাদশীর ব্যবস্থা হইলেও তাহার লোমহর্ষের সম্ভাবনা নাই। এর চেয়ে মহত্তর কর্ম আর কি হইতে পারে? আর সংসারে অনাসক্তি তাহার শাস্ত্রের উপদেশ। যদিও গৃহীরূপ অবস্থানকালে এই উপদেশটার সম্যক্ প্রতিপালন সহজ হয় না; তবে একটু গোলযোগ উপস্থিত হইলেই দারা সুত পরিবার বিধাতার মর্জিতে সমর্পণ করিয়া গৃহাশ্রম হইতে দূরে পলায়ন করিয়া কুম্ভক রেচক অভ্যাস করিয়া হাঁপ ছাড়িবার পথ পায়।

ভারতবর্ষ হিন্দুজাতির ইতিহাস এইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমেই হউক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, যে প্রতীচ্য জাতিদের সহিত ভারববর্ষের সম্প্রতি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস মূলত বিভিন্ন। হিন্দুস্থানের ইতিবৃত্তে মূলকথা— তৃপ্তি আর তৃপ্তি। পাশ্চাত্য দেশের ইতিবৃত্তে মূলকথা—অন্ন আর অন্ন। ইউরোপে যত দিন লোক-সংখ্যা অন্নসংস্থানের সীমা ছাড়াইয়া উঠে নাই, তত দিন ইউরোপের লোকে পরস্পর রক্তারক্তি করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু চিরদিন এমন চলে নাই। স্থান অল্প, ভূমি অনুর্বর, লোকসংখ্যা বর্ধমান, সকলের অন্ন জোটে না; জঠরজ্বালার তীব্র উত্তেজনায় ইউরোপের লোক স্বদেশ ছাড়িয়া বাহির হইল। প্রথমে বাহির হয় স্পানিয়ার্ড। দেখাদেখি পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরাজ ক্রমশ বাহির হইতে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে সেই

এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।ইউরোপ হইতে দলে-দলে বাহির হইল; সঙ্গে ছিল জঠরজ্বালা ও তজ্জনিত অমানুষিক উত্তেজনা, অর্থতৃষা ও রক্তপিপাসা। আর তার সঙ্গে ছিল ধর্মপ্রচারের ভান। এই ভান ও এই পিপাসা লইয়া দুস্যর দল লোকোপপ্লবের জন্য পূর্বে পশ্চিমে যেখানে সেখানে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়, ধূমকেতুর আবির্ভাব অচিরস্থায়ী; আর এই নৃশংস দস্যুর দল যেখানে একবার প্রবেশ করিল, সেখান হইতে আর বাহির হইল না। প্রাচীন রাজ্য ছারখারে গেল, প্রাচীন সভ্যতা লুপ্ত হইল; প্রাচীন মানববংশ ভবিষ্য কালের ভূতত্ত্ববিদের জন্য ভূপঞ্জরে অস্থিকঙ্কাল রাখিয়া ধরাধাম হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। একমাত্র ভারতবর্ষে এই ধ্বংস-দাবানল সম্যকভাবে জ্বলিতে পায় নাই; অন্তত ভারতবাসী ধরাতল হইতে উচ্ছিন্ন হয় নাই। সে ভারতবাসীর পূর্বপুরুষের সঞ্চিত পুণ্যফলে বলিতে হইবে।

যাহা হউক, ইউরোপ পরস্বাপহরণ ও পরের সর্বনাশ চারি শত বৎসর ধরিয়া করিতেছেন বটে, কিন্তু ইউরোপের জঠরজ্বালার তীব্রতা তাহাতে কমে নাই। জীবনের কঠোরতা, অতৃপ্তির তীব্রতা দিন-দিন বাড়িতেছে। ইংরেজের, রুশের, ফরাসির ঐশ্বর্য দেখিয়া জার্মানি ইটালি প্রভৃতিও বহিঃ-সাম্রাজ্য-স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। অন্নচেষ্টায় অধ্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, জ্ঞান-বৃদ্ধি বিপুল বেগে ঘটিয়াছে। যশোগৌরবে, জ্ঞানগৌরবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মহিমাময়ী মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

কিন্তু হইলে কী হয়। ধরাপৃষ্ঠ অসীম নহে; খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণেরও সীমা আছে। লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর এখানে ওখানে, সেখানে যে একটু আধটু খালি জায়গা আছে, তাহা কিছু দিনের মধ্যে জনপূর্ণ হইবে। তখন আর ইউরোপ সেখান হইতে অন্ন পাইবে না। তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিণাম কী হইবে? এই এখন প্রধান সমস্যা।

ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বর্তমানের চাকচিক্য শোভার অন্তরেও গোলযোগ দেখা যায়। ইউরোপে যেন একটা মহাকুরুক্ষেত্র ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় জাতিই তাহার উদ্যোগপর্বে ব্যতিব্যস্ত ও উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন। হয়তো সেই মহাকুরুক্ষেত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার বিপুল সৌধ চূর্ণীকৃত হইয়া ধূলিস্তূপে পরিণত হইবে। সমাজের অভ্যন্তর হইতেও একটা অতৃপ্তির ও অশান্তির ও যাতনার তীব্র নিনাদ উঠিতেছে। সমাজ প্রতি ক্ষণেই বিপ্লবোন্মুখ। দরিদ্রের প্রতি ধনীর দৃষ্টি নাই। দরিদ্র ধনীর কণ্ঠশোণিত পানে ক্ষুৎযন্ত্রণা মিটাইতে প্রস্তুত। উপরে জ্ঞান বিজ্ঞান শোভা সৌন্দর্য ঐশ্বর্য লোকনয়ন ঝলসিতেছে। অভ্যন্তরে মূর্তিমতী দরিদ্রতা ক্ষীণ চর্মে কঙ্কাল আচ্ছাদন করিয়া ত্রাহিস্বরে ডাকিতে-ডাকিতে পৈশাচিক বদন ব্যাদান করিয়া সমাজ-শরীর গ্রাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। রাজপুরুষগণ রাক্ষসীকে শাসনে রাখিবার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু শাসন আর মানে না।

ইউরোপের রাজনীতি, ধর্ম-নীতি, সমাজ-নীতি, এই জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া বিব্রত। কিন্তু মীমাংসা খুঁজিয়া মিলিতেছে না। অ্যানি বেসান্তের বিচিত্র জীবনের বিবিধ বিপর্যয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলাসূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্যা পূরণের জন্যই এই অসামান্যা নারীর জীবনের প্রধান ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। লন্ডনের দরিদ্রতার সহিত বহু দিন ধরিয়া তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তা ছিলেন। অবশেষে নিরাশ হইয়া ক্লান্ত শরীরে

তিনি এই শান্তরসাস্পদ পুরাতন পুণ্যতপোবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধা স্থির ক্ষমাশীল সহিষ্ণু সংযত জাতির প্রতি চাহিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, এমন আর হয় না; ইহার আর তুলনা নাই।

ইউরোপ কর্মপ্রবণ, আর ভারতবর্ষ বৈরাগ্যপ্রবণ। কর্ম হইতে ঐশ্বর্য, জ্ঞান, গৌরব ইউরোপ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। আর বৈরাগ্য হইতে ভারতবর্ষ তৃপ্তি, শান্তি, অনাসক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য, জ্ঞান, গৌরব বিসর্জন দিতে বসিয়াছে। তাই হিন্দুজাতির তৃপ্তি ও শান্তি স্থিতিশীলতায় হিমাচলের স্পর্দ্ধা করে। অক্ষুব্ধতায় প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনীয় হয়। আর ইউরোপের জ্ঞান গৌরব পরাক্রম হয়তো আকাশবাহী উল্কার মতো, অগ্নিগিরির উদ্গীরিত বহ্নির মতো ক্ষণস্থায়ী শোভা বিস্তার করিয়া নির্বাণ হইতে পারে।

আমাদের সম্মুখে ভিন্নমুখবর্তী দুই পথ বর্তমান। কোন পথ অবলম্বনীয়, ইহাই হিন্দুসন্তানের প্রধান বিচার্য।

'সাহিত্য', আষাঢ় ১৩০১

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান; বেশ কথা। আমরা কেহই একদিন থাকিব না, সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান থাকিবে; ইহা আমি প্রার্থনা করি; আপনারাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্যোমকেশহীন সাহিত্য-পরিষৎকে আমি দাঁড়াইয়া দেখিব, পরিষৎ-মন্দিরে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের মরণসংবাদ আমাকে ঘোষণা করিতে হইবে, ইহা আমি মনে করি নাই। চারি বৎসর পূর্বে যখন আমি পীড়িত হইয়া পরিষদের কর্মভার ত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন বরং ইহার বিপরীতই আমার মনে ছিল। যাহা মনে করি নাই, তাহা কাজে করিতে হইল, ইহা নিয়তি। নিয়তির জয় হউক।

সাহিত্য-পরিষৎ আর ব্যোমকেশ যে অভিন্ন ছিল, তাহা আপনাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে না। যাহা অভিন্ন থাকে, তাহাও ভিন্ন হয়। সর্বশক্তিমানের ইহা খেলা, ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না।

সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল,—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতামুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যত অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। আমিও দেখিয়াছি, আপনারাও দেখিয়াছেন—ইহার প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

সূতিকাগৃহে যাঁহারা পরিষদের ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ-কেহ আজ উপস্থিত আছেন। ব্যোমকেশ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। প্রথম দুই বৎসর ব্যোমকেশকে পরিষদে দেখিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে নাই। পরিষৎ সেই শৈশব কালে হামাগুড়ি দিতেছিলেন, তখনও পরিষদের মুখ ফোটে নাই, পরিষৎ তখন আধ-আধ ভাষায় কথা কহিতেছিলেন মাত্র। কী বলিবেন, কী করিবেন, তাহাও স্থির ছিল না। ব্যোমকেশ তখন পরিষদে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না।

পরিষদের তৃতীয় বর্ষে একদিন 'কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল' নামে একটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। প্রবন্ধপাঠক ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। প্রবন্ধটি আমি অবহিত হইয়া শুনিয়াছিলাম। প্রবন্ধ শুনিয়াই আমার বোধ হইল, পরিষদের এইবার কথা ফুটিয়াছে; পরিষদের এইবার কাজ জুটিয়াছে। বাংলার প্রাচীন লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার করিতে হইবে,—ইহা পরিষদের একটা প্রধান কাজ। কাহারও-কাহারও মনে এই কথাটা অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল; ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ তাহা স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিল। আমি বুঝিলাম, পরিষদের কাজ জুটিয়াছে, একজন কর্মীও জুটিয়াছে।

পরিষদের ষষ্ঠ বৎসরে ব্যোমকেশ সহকারী সম্পাদকের কর্মে নিযুক্ত হন; সেই বৎসরই 'পরিষৎ-পত্রিকা' সম্পাদনের ভার আমার উপর পড়ে। সেই অবধি তাহার সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়। পাঁচ বৎসর কাল পত্রিকা সম্পাদনের পর আমি পরিষদের

সম্পাদকের কর্মভার পাইয়াছিলাম; সেই সূত্রে ব্যোমকেশের চরিত্রের অন্তস্তলটা পর্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার যতটা সুযোগ ঘটিয়াছিল, এতটা বোধ করি, আর কাহারও ঘটে নাই। ব্যোমকেশের সমস্ত ভিতরটা আমি দেখিয়াছিলাম; দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্তব্ধ হইয়াছিলাম।

একটি লোকের আমি সন্ধান পাইলাম, যে সাহিত্য-পরিষৎকে ইষ্টদেবতাস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি, দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—শয়নে স্বপনে জাগরণে, অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতোহপি, বা সাহিত্য-পরিষদের ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে। বাস্তবিকই এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে—সর্বতোভাবে—ইষ্টদেবতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—ইহার তুলনা নাই।

আত্মসমর্পণের বড়-বড় দৃষ্টান্ত পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম, ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম—জীবনে অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ মুস্তফী সামান্য ব্যক্তি, নগণ্য ব্যক্তি, অতি দরিদ্র গৃহস্থ, ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।

পরিষৎকে আপনারা ভালোবাসেন, আমিও ভালোবাসি। আমরা অধিকাংশই 'অবসরমতো' ভালোবাসি। জীবনে অন্যান্য কাজ সমাপন করিয়া অবসবমতো ভালোবাসি। তাহাতে আমাদের দোষ নাই। আমাদের অনেককেই সংসারচিন্তা করিতে হয়, অন্নচিন্তা করিতে হয়, সংসারের সহিত লড়াই করিতে হয়। সেগুলাও আমাদের কর্তব্যমধ্যে। সেই কর্তব্য সমাপন করিয়া যখন অবসর পাই, তখন পরিষৎকে আমরা ভালোবাসি। ব্যোমকেশের ভালোবাসার বিশিষ্টতা এই যে, ব্যোমকেশ পরিষৎকে অবসরমতো ভালোবাসিত না। ব্যোমকেশকেও সংসারের সহিত লড়াই করিতে হইত; সে বড় নিদারুণ লড়াই—একতরফা লড়াই। সংসার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, কিন্তু সে আত্মরক্ষায় অবসর পায় নাই। তাহার সমস্ত জীবনটা পরিষদের কর্মে নিযুক্ত ছিল; পরিষদের কাজ করিতেই,—পরিষৎকে ভালোবাসিতেই তাহার সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গেল; অন্য চিন্তার সে অবসর পাইল না—জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার তাহার অবসর ঘটিল না।

কত বার তাহাকে বলিয়াছি,—নিজের জন্য একটু চিন্তা করো, আপনার পোষ্যবর্গের জন্য একটু চিন্তা করো; বলিয়াছি—এমনকী, সাধাসাধনা করিয়াছি। জোর করিয়া প্রতিশ্রুতি লইয়াছি—এইবার নিজের জন্য কিছু করিব—অবসর পাইলেই করিব। কিন্তু সেই অবসর ঘটিল না। আমার অভিজ্ঞতা সংকীর্ণ; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার সীমানামধ্যে এমন আর আমি দেখি নাই। অথচ জীবনযুদ্ধে ব্যোমকেশের ক্ষমতার অভাব ছিল না। দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু অন্য দিকে বিশেষ অভাব ছিল না; সমাজিক প্রতিপত্তির অভাব ছিল না—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। সে বিষয়ে অভাব হইবার উপায়ই ছিল না;—সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ, সেই অকপট হৃদয় লইয়া ব্যোমকেশ একবার যাঁহার নিকট গিয়াছে, তিনিই তাহার প্রীতির বন্ধনে পড়িয়াছেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী,—কলিকাতার শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে সর্বত্রচারী, সর্বত্রবিহারী, সর্বত্র অবারিতদ্বার,—ব্যোমকেশ মুস্তফীকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্মান না করিলে কাহারও উপায় ছিল না। তাহার উপরে ব্যোমকেশের সাহিত্যসাধনা ছিল; ব্যোমকেশ সাহিত্যরসে রসজ্ঞ ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতেন—সরস রচনাদ্বারা অন্যকে সে

রসের আস্বাদন দিতে পারিতেন। এমনকী, "রোগাতুর শর্ম্মা"-র প্রলাপবাক্যেও সেই রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরিচয় কেবল রসজ্ঞতায় কেন, ব্যোমকেশের চিন্তাশীলতা ছিল, গভীরতা ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সকলের উপরে বৈজ্ঞানিকতা ছিল—পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলা ব্যাকরণের আলোচনায় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফলে, সাহিত্যব্যবসায়ীরূপে সাহিত্যচর্চা করিলে, জীবনযুদ্ধে তাহার সফলতা হইতে পারিত; সাহিত্যসেবীরূপে সাহিত্যচর্চা করিলে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর যশ থাকিতে পারিত; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। কোনও কাজেই ব্যোমকেশের অবসর ঘটিল না। কেন না, ব্যোমকেশ অন্য দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এই আত্মসমর্পণই যজ্ঞ। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ব্যোমকেশ সেই যজ্ঞে যজমান হইতে পারে নাই; যজ্ঞীয় পশুর মতো আত্মদান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যজ্ঞার্থ সে স্বয়ম্ভু কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; যজ্ঞেই সে নিহত হইল। আপনারা প্রার্থনা করুন, সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ—আপনারা প্রার্থনা করুন, তাহার রক্তপাতে সাহিত্য-পরিষদের বৃদ্ধি হইবে, তাহার আলম্ভনে সাহিত্য-পরিষদের নবজীবন লাভ হইবে। মনুষ্য থাকে না; তাহার কর্ম থাকিয়া যায়। ব্যোমকেশের কর্ম অক্ষয় হইয়া সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান থাকিবে।

সাহিত্য-পরিষৎ খাঁটি স্বদেশি জিনিস নয়—ইহা বিলাতি জিনিসের অনুকরণে গঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ একটা যন্ত্র; সর্ববিধ সাহিত্যের উপকরণ ঘানিতে পীড়িয়া রস নিষ্কাশনের জন্য ইহার নির্মাণ হইয়াছে। বাংলা দেশের সমুদয় ধুরন্ধরদিগকে ইহার যুগবহনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক যন্ত্র চালাইতে অনভ্যস্ত; যন্ত্রচালনা আমাদের ধাতুর সহিত মেলে না। ভারতবর্ষের লোক স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্নে পরিতৃপ্ত হইতে চায়;—বসুন্ধরা আপনা হইতে যাহা দেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে চায়। ভারতবর্ষে আপনা হইতে যাহা জন্মে। তাহাই থাকিয়া যায়, টিকিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমাজে আপনা হইতে যাহার উৎপত্তি হয় ও বৃদ্ধি হয়, সমাজিকেরা তাহাই গ্রহণ করে; তাহাই তাহাদের রক্তমাংসমজ্জার সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। অন্য দেশে বসুন্ধরা এমন উর্বরা নহেন; মানুষ সেখানে যন্ত্রপ্রয়োগে বসুন্ধরার নিকট আদায় করিতে বাধ্য হয়। অন্য দেশের অনুকরণে আমরা সাহিত্য-পরিষদের যন্ত্র গড়িয়াছি—যন্ত্র দ্বারা কাজও পাইতেছি; কিন্তু যন্ত্রপ্রয়োগে অভ্যাস না থাকায় চাকায় মরিচা ধরিতেছে, সময়মতো আমরা তেল যোগাইতে পারিতেছি না; চাকার ঘরঘরানিতে কাজের অপেক্ষা কর্ণপীড়া অধিক হইতেছে। যন্ত্রের কাজ করিবার ক্ষমতা খুব বেশি; পঞ্চাশটা ঘোড়ায় যে কাজ করে, একটা ছোট যন্ত্রে তাহার চেয়ে অধিক কাজ করিতে পারে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণির যানবাহী ঘোড়ার ভিতরে এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা কোনও যন্ত্রের ভিতরে নাই, সেই পদার্থটার নাম প্রাণ। যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে আমাদের বশে চলে; চালক যখন যে দিকে চালাইতে ইচ্ছা করেন, যন্ত্র তখনই সেই দিকে চলে। কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ টাট্টু ঘোড়াকেও সর্বদা ইচ্ছামতো চালাইতে পারা যায় না,—সে সর্বদা বাগ মানে না—সময়ে-সময়ে বিদ্রোহী হয়। পরিষদ্-যন্ত্রের যানবাহী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ভিতর এইরূপ একটা প্রাণ ছিল। ব্যোমকেশের সহিত যাঁহারা একত্র কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানেন।

ব্যোমকেশ সর্বদা যন্ত্রমধ্যে ধরা দিতে চাহিত না। আপনারা হৃদয় নামে একটা অবয়বের কথা শুনিয়াছেন। অভিধানে এই শব্দটি না থাকিলে আজকালকার বাংলা সাহিত্য বোধ করি অচল হইত। ব্যোমকেশের ভিতরে এই হৃদয়টা অত্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল। ব্যোমকেশের ক্ষয়রোগশীর্ণ বক্ষের ভিতরে একটা বৃহৎ হৃৎপিণ্ড ছিল—সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উষ্ণ রক্ত বিদ্যমান ছিল; মাঝে-মাঝে তাহা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। বাহিরে তাহার কোনও উপদ্রব, কোনও উৎপাত দেখা যাইত না; কিন্তু যাঁহারা ব্যোমকেশের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই উষ্ণ রক্তধারা সময়ে-সময়ে কীরূপ বেগে প্রবাহিত হইত। এই কারণে ব্যোমকেশকে যন্ত্রমধ্যে আটকাইতে পারা যাইত না। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সকলেই ইহার সাক্ষী। সাহিত্য-পরিষদের কমিটি, সব-কমিটি, আইনকানুন, নিয়মাবলি, বিধিনিষেধ, কিছুতেই ব্যোমকেশকে শাসনে আনিতে পারে নাই। ব্যোমকেশের একটা গোঁ ছিল,—পরিষদের হিতার্থ নিজে যাহা ভালো বুঝিবে, ব্যোমকেশ তাহা করিবেই—আইনকানুনে, বিধিনিষেধে ব্যোমকেশকে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যোমকেশের কল্পনাশক্তি অসাধারণ ছিল—কীসে সাহিত্য-পরিষৎ বড় হইবে, কীসে ইহার কাজের প্রসার হইবে, কীসে ইহার প্রতিপত্তি বাড়িবে, ব্যোমকেশের মগজের মধ্যে দিবানিশি তদ্বিষয়ে কল্পনার খেলা চলিত। অধিকাংশ কল্পনাই খেলা মাত্র; সেই খেলা কাজে পরিণত করিতে হইলে কত বিঘ্নবিপত্তি আছে, ব্যোমকেশ সে দিকে দৃষ্টিপাতই করিত না। কেজো লোকে সে বিষয়ে আপত্তি করিতে গেলে ব্যোমকেশকে আঘাত লাগিত,—ব্যোমকেশের হৃদয়ে বেদনা লাগিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কোনও কাজে কেন যে অক্ষম হইবে, ব্যোমকেশ তাহা মনে করিতেই পারিত না। এই জন্য ব্যোমকেশের সহিত পরিষদের যন্ত্রচালক অন্যান্য সহকারীদের সর্বদা ঠোকাঠুকি ঘটিত, বাদ-বিসংবাদের অভাব থাকিত না। তাঁহারা পরিষদের যন্ত্র সুষ্ঠভাবে চালাইতে চাহিতেন, ব্যোমকেশের সহিত তাঁহাদের সর্বদা বনিত না—আমার সহিতও সর্বদা বনিত না। আকাশবিহারী পাখির মতো ব্যোককেশের কল্পনা সর্বদাই উধাও হইয়া ঊর্ধ্বে উড়িতে চাহিত;—আমরা স্থলচর জীব, তাহাকে কখনো খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে পারি নাই। ব্যোমকেশকে খাঁচায় পুরিতে পারি নাই; কিন্তু বুঝিয়াছি যে, ব্যোমকেশের মতো হৃদয়বান পুরুষকে যন্ত্রাঙ্গরূপে গণ্য করিলে চলিবে না। বুঝিয়াছি এবং তাহার মহাপ্রাণতার সম্মুখে প্রণত হইয়াছি।

ব্যোমকেশ যন্ত্রমধ্যে আপনাকে ধরা দেয় নাই বটে, কিন্তু যন্ত্রে যেখানে কুলায় না, যেখানে প্রাণের আবশ্যকতা, সেখানে ব্যোমকেশ নহিলে পরিষদের চলিত না। যেখানে রাত্রি জাগিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে ধনীর দরজায় দ্বারবানকে অতিক্রম করিয়া ভিক্ষার জন্য চিৎকার করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে আপিস কামাই করিয়া আপিসের অধ্যক্ষের বিরক্তিভাজন হইতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ। ব্যাধিক্লিষ্ট, অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ দেহ লইয়া, সদাপ্রফুল্ল, হাস্যপূর্ণ মুখ লইয়া, ব্যোমকেশ মুস্তফী সর্বদা অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত—সর্বদা অসাধ্য সাধনে সমর্থ। ইহা যন্ত্রে কুলায় না, ইহার জন্য প্রাণের টান চাই; ইহার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে হয়।

পরিষদের সেরেস্তায় দুইখানি খাতা ছিল। একখানি আমার, একখানি ব্যোমকেশের। এই খাতা দুইখানি আশ্রয় করিয়া ব্যোমকেশের সহিত আমার কথাবার্তা, তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ চলিত। উভয়ের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে ভাষার ব্যবহার হইত, তাহা ছোট-বড় কোনও পার্লামেন্ট, এমনকী, কোনও ভদ্রসমাজে উপস্থাপিত করিবার যোগ্য নহে। ব্যোমকেশের প্রতি আমি যেরূপ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতাম, তাহা অন্য কেহ হয়তো সহিত না—এক রামকমল ভিন্ন অন্য কেহ বোধ করি, এখনও সহিবে না। ব্যোমকেশ তাহা অবলীলাক্রমে সহিয়া যাইত; সে এত সহজে সহিয়া যাইত যে, আমার পক্ষে ওই ভাষাপ্রয়োগে একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি ওই ভাষাপ্রয়োগে কখনও সংকুচিত বা লজ্জিত হই নাই। ইহা বোধহয়, আমার কাপুরুষতা—কিন্তু আমার এই কাপুরুষতার জন্য ব্যোমকেশ আমাকে কখনও দৈন্য অনুভব করিতে দেয় নাই বা লজ্জা অনুভব করিতে দেয় নাই। আমার তিরস্কারের উপহার ব্যোমকেশের নিকট জয়মাল্য হইত, ব্যোমকেশ তাহা সাদরে ধারণ করিত। খাতা দুইখানি এখনও বোধ করি, কার্যালয় খুঁজিলে মিলিতে পারে;— উহা রাখিয়া দাও বা পোড়াইয়া ফেলো, এখন তাহাতে ক্ষতি নাই। আমাদের দত্ত তিরস্কারে জয়মাল্য সে সাদরে গ্রহণ করিত; সে আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছে, তাহা রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন।

"দিয়ে যায় যত যাহা, রাখ তাহা ফেল তাহা,
যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচা-কেনা, ফিরিবে না ফেরাবে না,
জন্ম-উপহার।"

কেন আমার সংকোচ বোধ হইত না? ব্যোমকেশের সহিত আমার সম্পর্ক আপিসের সম্পর্ক ছিল না—আপিসের সম্পর্কে ভদ্রলোকের মধ্যে ওরূপ ব্যবহার চলে না। ব্যোমকেশ আমাকে অগ্রজের মতো দেখিতে শিখিয়াছিল,—আমার গুণে নয়, নিজের গুণে। ব্যোমকেশ আমাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। এটা ব্যোমকেশের বিশিষ্টতা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যোমকেশের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও জানেন, ব্যোমকেশের নিকট কীরূপ একটা পরশপাথর ছিল,—তাহার স্পর্শমাত্রে আপিসের সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্কে দাঁড়াইত।

আজি ব্যোমকেশ নাই, কিন্তু ব্যোমকেশের সাহিত্য-পরিষৎ আছে। ব্যোমকেশের সাহিত্য-পরিষৎ ব্যোমকেশের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন—হয়তো একখানা চিত্রপট বা আর কিছু স্থাপন করিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাহা করুন; আমি তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল নহি। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেকে নথিতে, প্রত্যেক লাল ফিতায় ব্যোমকেশের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ যে প্রাণের ধারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাই সঞ্জীবনী সুধারূপে সাহিত্য-পরিষৎকে সঞ্জীবিত রাখিবে ও সাহিত্য-পরিষৎকে জীবিত রাখিয়া ব্যোমকেশের স্মৃতি রক্ষা করিবে। আমি ব্যোমকেশকে পরিষদের সহকারী সম্পাদকরূপে দেখিতে চাহি না। আমি তাহাকে আপনার স্বজনরূপে দেখিতে চাহি।

আপনাদিগকেও ব্যোমকেশকে স্বজনরূপে দেখিবার জন্য আজ আমি অনুরোধ করিতেছি। আপনাদের স্বজনবিয়োগ হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে যে আপনার লোক মনে করিত, সেই প্রিয়বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।

"আর পরিচিত মুখে, তোমাদের দুখে সুখে,
আসিবে না ফিরে।
তবে তার কথা থাক, যে গেছে সে চলে যাক,
বিস্মৃতির তীরে।।"

ব্যোমকেশ গিয়াছে; কিন্তু তাহার বৃদ্ধা জননীকে, অনাথা পত্নীকে, নিঃসহায়ে পুত্রগণকে আপনাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ, স্বজনগণ, বন্ধুগণ। ব্যোমকেশ জীবিত থাকিতে তাহার সাংসারিক দুঃখের লাঘবার্থ আমরা কিছুই করি নাই;—আমরা কিছুই করি নাই। এখন আমাদের সময় উপস্থিত। সাহিত্য-পরিষৎ আজ তাহার দুঃস্থ পরিজনবর্গের জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া আপনাদের দ্বারস্থ। সেই ভিক্ষাপাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দিবার জন্য আপনাদিগকে আমি সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি; ইহাতে সংকুচিত হইবেন না, তর্কবিতর্ক করিবেন না; সমস্ত সংকীর্ণ বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই ভিক্ষাপাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দান করুন। পরকে ভালোবাসিতে গিয়া ব্যোমকেশ আপনার পরিজনকে ভালোবাসিবার অবসর পায় নাই। তাহার কর্তব্যসাধনে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আমি চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রেত আত্মা লোকান্তরে শান্তি পাইতেছে না। আপনারা তাহার প্রেত আত্মার কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করুন।

"সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বল শান্তি, বল শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই।।"

'মানসী ও মর্মবাণী', বৈশাখ ১৩২৩

বিবিধ প্রসঙ্গ

সৌন্দর্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য-বোধ মানব-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়িকলসি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকাহিনি বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মতো সেই অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক ছুটিতে থাকে, এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত তাহার উদভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ আচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।

সৌন্দর্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করি; এবং যাহার সৌন্দর্যপিপাসা একেবারে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিতে এখনো বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দেশ করিতে পারি। নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনি শুনিতে-শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মতো বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বারুণী পুষ্করিণীতীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া বৃদ্ধ গৃহস্থ কৃষ্ণকান্তের সংসারে যে নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে মনুষ্য-সংসারে অসাধারণ ঘটনা, তাহা সহজে বিশ্বাস করিব না। অতএব সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; অতএব সৌন্দর্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য চায় ও সৌন্দর্য পায়; অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকি অংশ অসুন্দর বা কুৎসিত বলিয়া বোধহয়। খানিকটা কুৎসিত, কেন না, বাকিটা সুন্দর। খানিকটা সুন্দর, কেন না, বাকিটা কুৎসিত; অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সাহচর্যে, তাহার সহিত তুলনায়, তাহা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকিটা সুন্দর হইত না, অথবা সমস্তই সুন্দর হইলে সৌন্দর্য শব্দ নিরর্থক হইত। অতএব সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোনটা সুন্দর, আর কোনটাই বা কুৎসিত, এটাই বা সুন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে-সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে

চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, অথবা তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কী? মানুষ এমন করে কেন? মনুষ্যের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কী উদ্দেশ্য? কীসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতই কি জগতের দুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবের পক্ষেও সেইরূপ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনওরূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে।

স্থূল-সূক্ষ্ম হিসেবে সমুদায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যায়। এইরূপ শ্রেণিবিভাগের পূর্বে সৌন্দর্য শব্দটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মনুষ্যের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখের অনুভব করে, সুখ বলো, তৃপ্তি বলো, আরাম বলো, আনন্দ বলো এই রকম একটা অনুভব যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ, ঘৃণা, ক্লেশ বা তাদৃশ কোনওরূপ অনুভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সুন্দরের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বলো, তাহা হইলে সৌন্দর্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ ও মধুর দর্শনে সঙ্গে-সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্য মাত্রই তাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ; এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়। সুখাদ্য ভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে; ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মনুষ্যত্বের জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী; ইহা জীবন মাত্রেরই, অন্তত অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন মাত্রেরই নিত্য ভোগ্য। ইহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে উহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড়জগৎ হইতে কতকগুলো মালমশলা বাছিয়া গ্রহণ করিতে হয়; কতকগুলোকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলো প্রাকৃত শক্তি দেহের ও জীবনের স্থিতির পুষ্টির ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলো প্রতিকূল। এই জন্য কতকগুলো আমরা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলো দূরে পরিহার করি; নতুবা জীবন চলিত না।

অতএব মিষ্ট রস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণকালেই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণিতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভালো লাগে; এই জন্য মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের এই সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহাও বুঝা যায়। লংকা অথবা আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণির সৌন্দর্য আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্যভোগের শক্তি আছে কি না, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্যের উপভোগ করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধ্যেও

সকলে সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকা-নির্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে, তাহা বলা চলে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবি নামক মনুষ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি নামক মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধহয়। ইংরেজিতে যাহাকে আর্ট বলে, বাংলায় যাহাকে ললিতকলা বলা যাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। মানব-মনের যে-যে ভাগের সহিত ইহার কারবার, তাহার ইংরেজি নাম ইস্‌থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বৃত্তিটা কীরূপে ও কী উদ্দেশ্যে জন্মিল, ভালো বুঝা যায় না। এই সৌন্দর্যই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য কীসের ধর্ম? ইহা কি বস্তুবিশেষেরই প্রকৃতিনিহিত ধর্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি কল্পনা বা কারিগরি? অর্থাৎ, যাহাকে আমরা সুন্দর বলি, তাহার প্রকৃতিগত কোনও বিশিষ্টতা নাই, আমরা তাহাতে সৌন্দর্য আরোপ করি মাত্র? বস্তুত এমন দেখা যায় শ্যাম যাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয়তো তাহা কুৎসিত। বপ্রক্রীড়ারত মদস্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে মারুতপূর্ণ-রন্ধ্র কীচকধ্বনি শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, সকলেই তাহার উপভোগে সমর্থ হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আবার সৌন্দর্য বিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাশা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাশা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্ধ্বমুখে ধাবিত হইত: স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; এবং তাঁহার মানস লোচন কিম্পুরুষাঙ্গনার নগ্ন দেহের দিকে বিবর্তিত হইত। আবার বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদভ্রান্ত জরাক্রান্ত অসহায় রাজা লিয়রকে আঁধারে প্রান্তরমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎরূপী পেষণযন্ত্রের আবর্তনপ্রণালীর উদ্দেশ্যের ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের যাহা সৌন্দর্য, তাহা যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য ভোগ করিবেন, তাঁহার সৌন্দর্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। তুমি যদি কুৎসিত দ্যাখো, কাহারও সাধ্য নহে যে, প্রতিপন্ন করিতে পারেন, উহা সুন্দর। যে কবির কাব্য আমার ভালো লাগে না, তোমার ভালো লাগে, তুমি লাঠি মারিলেও আমার তাহা ভালো লাগিবে না। আমার নিকট উহা যে অর্থে সুন্দর; তোমার নিকট ঠিক সেই অর্থেই উহা কুৎসিত। এ বিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিবার কোনও আইন নাই। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, সুস্থপ্রকৃতি মানুষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন পাখি, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই,—কী গুণে ইহারা সুন্দর; ইহাদের সৌন্দর্য আমাদের লাভ কী?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস খুলিলেই বিশ রকম সৌন্দর্যতত্ত্বে পঞ্চাশ পাতা বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোনও একটা কিছুর উৎপত্তির ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারউইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারউইনও এখানে বড় ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল সূত্র একটা মাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোনও-না-কোনও রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতিকর্তৃক নির্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু নাই। কেন না, সংসারযাত্রায় কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। মলয়ানিলে অনুরাগ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জীবনবর্ধনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোকিলকূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কি বা শীতে, কি বসন্তে, কোনও কালেই কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না।

ডারউইন বলেন, ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয়; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা পক্ষে ততই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রু-সংখ্যা অনেক; এই সকল শত্রুর সৌন্দর্যবৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা মূর্তিমান সৌন্দর্যকে একেবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালায়িত; এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখ-সমরে দাঁড়ানোও দুর্বল প্রজাপতির পতঙ্গ জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের রূপ লুকাইয়া, শত্রুকে ফাঁকি দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল এক দিকে যেমন বিচিত্রবর্ণ সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনই অন্য দিকে বিচিত্রবর্ণ ও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির রূপের সৃষ্টিকর্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইযা তুলিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের রূপে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনই রূপমুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং জাতির সৌন্দর্যবুদ্ধির এতটা তীক্ষ্ণতা স্বীকার বড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি একঘেয়ে ফিকে রঙের চেয়ে রঙের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, তা সে রঙ সার্ জন লবকের কাচেই থাক, আর কেরোসিন দীপের শিখাতেই থাক; এই পর্যন্ত বুঝা যায়। অপিচ রঙদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চারটাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরি দিতে পারি। ডারউইন-মতে পুষ্প দেহে আর প্রজাপতি-দেহে বর্ণ বৈচিত্র্যবিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার অধিকও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, মানুষের ইহাতে লাভ কী, এ কথার কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

আর একটা কথা আছে—যৌন-নির্বাচন। ডারউইন এই মতেরও প্রবর্তক। সিংহের কেশর, পাখির কাকলি, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর; এবং ডারউইনের মতে এ সমস্তই

যৌন-নির্বাচনে অভিব্যক্ত। স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; কাজেই সুন্দর পুরুষেরই বংশরক্ষা ঘটে; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীল কণ্ঠ আনম্র উন্নম্র করিয়া, চারু পুচ্ছ নর্তিত করিয়া, কান্তাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌন-নির্বাচন মানিয়া লইলে জীবদেহে সৌন্দর্যের উদ্ভব অনেক স্থলে বুঝা যায়। কিন্তু যৌন-নির্বাচন সকলে মানিতে চাহেন না; ওয়ালাস সাহেবই যৌন-নির্বাচনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। কাজেই ডারউইনের মত এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূল কথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূরপুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে; কিন্তু মানুষের তাহাতে কী আসে যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে এমনকী মাহাত্ম্য আছে যে, মানুষের তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে?

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এইরূপে সৌন্দর্যতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ। সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরায় চৈতন্য ফুটিত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরম্পর যত পার্থক্য, বিচিত্রতা বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকশিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের চৈতন্য যে অস্তিত্বযুক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, মানুষের অনুভূতিগুলা একরকম নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে-ক্ষণে বদলাইয়া নূতন-নূতন শব্দ, নূতন-নূতন স্পর্শ, নূতন-নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে; তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত এক টানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অনুভব বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক বিকশিত; সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য। যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্তিমান। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; ধীরে-ধীরে ক্রমে-ক্রমে পরিবর্তন ঘটিলেই কল্যাণ; নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। আপনার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনী হইতে হঠাৎ সরাইলে জীব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। পরিবর্তনের ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আলগা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভালো লাগে না। কাজেই সৌন্দর্যের এক হেতু অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার ও আতিশয্যের অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনওরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবত আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভালো লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন যুবতীর আরক্ত গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়াবিস্তারী মহীরুহ; যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্যের আর একটি হেতু সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভালো লাগে, তাহা সুন্দর; আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে, অপরের চোখেও ভালো লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখ ও আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত।

কতকগুলো সমাজপুষ্টির অভিমুখ ও তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর। দয়া, মমতা, স্নেহ, প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেইজন্য যে সকল পদার্থ দয়া, মমতা, প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক, তাহারা অতি সুন্দর। গান গাইয়া সুখ হইতে পারে; পরকে শোনাইয়া বুঝি আরও সুখ। কবিতা কবির হৃদয় হইতে উথলিয়া জনসঙ্ঘের মুখে ছুটিয়া চলে।

আর বাগবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহকে স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে, তাহা সুন্দর; যাহাতে জীবনে ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর; আর যাহাতে অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে-মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজ-জীবনকে অগ্রসর করে, তাহা আরও সুন্দর। এই হিসেবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজ-জীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন উভয়ের বর্ধনেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের হাত আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সৌন্দর্যবুদ্ধির জনক ও বিকাশক বলিতে আপত্তি ঘটে না।

এইরূপে ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। এখনৌ মনে করা যায়, সৌন্দর্য জীবনরক্ষক বা জীবনবর্ধক, সে জীবন, ব্যক্তির জীবনই হউক আর সমাজের জীবনই হউক, তখনই নিতান্ত ইউটিলিটির বা ক্ষতি-লাভ গণনার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং সৌন্দর্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তি মাত্র, সুখ মাত্র; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি চিন্তা, ক্ষতি লাভ চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবন মরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্মল উদ্দেশ্যহীন আনন্দের উৎপাদক বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্বাচনে অন্যরূপ প্রাকৃতিক কারণে কীরূপে এই অনাবশ্যক আনন্দভোগ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল, তাহা সমস্যাই থাকিয়া যায়। সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি এক ভাবে আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,—অকরুণা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশ-বিবর্জিতা; আবার প্রকৃতি অন্যভাবে আমাকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা। কেন এমন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইহা সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশ শিখিতেছি; প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই আমার জ্ঞানবিকাশ বুদ্ধিবিকাশ ধর্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি-হস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাঘাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবন সমরে আত্মরক্ষার সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই। শঙ্কার হেতু যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহার এই আশঙ্কা

প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছুদিন বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রবল শশকের ন্যায়, শত্রু হইতে পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র। অতএব জীবনে দুঃখানুভূতির বিকাশ; অতএব জীবন দুঃখময়। জীবপর্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত দুঃখী, জীবেরই দুঃখ আছে, কাঠ-পাথরের দুঃখ নাই। জীবের মধ্যে আবার মানুষের মতো দুঃখী কেহ নাই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটিকে নিষাদ-শরাহত দেখিয়া যাঁহার বদন হইতে প্রথম শ্লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছিল, মনুষ্যমধ্যে তিনিই রামায়ণী গাথার রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনি ইহার সাক্ষী।

প্রাকৃতিক শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তি জীবনের উপরে বিদ্যমান, তাহা নহে, সমাজ-জীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজরক্ষা না হইলে ব্যক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সমবেদনা মূলত ব্যক্তি-জীবন রক্ষার অনুকূল।

জীবন দুঃখময়; কেন না, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা! আবার জীবন দুঃখময়; সেই জন্যে জীবনে সুখের আবশ্যকতা। নইলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। প্রকৃতির এ কীরকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া প্রকৃতি ভালো করে; ভালো করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশত প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কী বলা যায় না; বন্ধুশোকার্ত টেনিসন দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না; কেন না, এখনও দেখি ভালো, তখনই পরক্ষণেই দেখি মন্দ। সুতরাং উহা বিধাতার খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক, কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর নাই। তবে ইহা স্বীকার্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে। অন্তত মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এইটা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ; এবং অগত্যা সে সুখের সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত, তাহার তত দুঃখ; তাহার তত সুখের দরকার; না হইলে তাহার জীবন চলে না; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ, তাহার নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলা সামগ্রী জগতের মধ্যে নির্দিষ্ট আছে, তাহা নহে। অমুক-অমুক পদার্থই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন কোনও বিধান নাই। মানুষ সম্মুখে যাহা পায়, তাহা হইতে সুখ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বিচার করে না; যেখানে-সেখানে, যখন-তখন সুখের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, যাহাতে সাধারণ মানুষ মাত্রেই কিছু-না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোনও-না-কোনও রূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল ও আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার; তাই যাহা-তাহা, যে-সে পদার্থ হইতে তাহারা সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী, কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ পায় না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের মতো গড়িয়া লয়; তাহাতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে-চলিতে দু-চোখে যাহা দেখে, তাহাই রঙিন চশমা পরিয়া রঙিল করিয়া দেখিয়া লয়; কেন না, সৌন্দর্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক; বিশুদ্ধ সৌন্দর্যই তাহার

অবলম্বন; বিশুদ্ধ সুখই তাহার লক্ষ্য। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাতে আনন্দ পায়; যাহা বুঝে না, তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না, তাহাতে আনন্দ অধিক হয়। স্থূল হিসেবে এটা সমস্যা। বিজ্ঞানবিদ জগদযন্ত্রের জটিলতা উদ্‌ঘাটন করিয়া যতই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্য জীবনের সহায় করিয়া তুলেন এক কথায় জগতের রহস্যকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন বা বুঝেন, ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের যে ভাগটা কোনও মতে আয়ত্ত হয় না, কোনও মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে, যেটা বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম পাই; আবার যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। যাহা আপাতত নিয়মের বাহির, ইংরেজিতে যাহাকে মিরাকল বলে, তাহার প্রতি মানব-মনের প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এই জন্য। অনির্দেশ্য অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্য সৌন্দর্যে মহীয়সী। অনেকের মতে বৈজ্ঞানিকগণ জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া সৌন্দর্যের বিনাশে নিযুক্ত আছেন।

রাম-চরিত্রে সীতা নির্বাসন অনেকের চোখে ভালো লাগে না, বিশেষত আমাদের মতো ইংরেজিওয়ালাদের কাছে। রাম-চরিত্রের এইটুকু ভালো বুঝা যায় না; এবং বোধহয়, এই জন্যই ইহা সুন্দর। সমাজশক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে-সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য, অতএব সুন্দর রহস্য। বাসন্তী দেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া নিরপরাধা সীতার নির্বাসনের অপরাধে বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার রাম-চরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া অথচ রাম-চরিত্রের লোকোত্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, বজ্র হইতে কঠোর, কুসুম হইতে কোমল, লোকোত্তর চরিত্র কে বুঝিতে পারে?

যাই হউক, সৌন্দর্য ও তদনুভবজাত আনন্দ না হইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে।

সৌন্দর্য-তত্ত্বের আলোচনায় এই কয়েকটি কথা পাওয়া গেল—

১। ইতর জীবের মধ্যে সৌন্দর্যবুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের সৌন্দর্যবুদ্ধির সহিত তাহার তুলনা হয় না। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যভোগের শক্তি মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ মনে করা যাইতে পারে।

২। মনুষ্যমধ্যে আবার সকলের এই শক্তি সমান নহে। এই শক্তির তারতম্যে মনুষ্যত্বের মাত্রা নির্দিষ্ট হইতে পারে।

৩। প্রকৃতির বহুরূপিতার সহিত জীবের চেতনার গূঢ় সম্পর্ক আছে; প্রকৃতি বহুরূপী না হইলে জীবের চেতনা ফুটিত না। উন্নতচেতন জীব মনুষ্য বিচিত্র ও বহুরূপী প্রকৃতিকে আদর করে। একঘেয়ে জিনিস সুন্দর হয় না।

৪। যাহাতে মানুষের কিছু-না-কিছু লাভ আছে, তাহা মানুষ ক্রমশ প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উপার্জন করিয়া থাকে। সৌন্দর্যবোধে কোনওরূপ লাভ আছে দেখাইতে পারিলে

সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি বুঝা যাইবে। কতকগুলি পদার্থ কোনও-না-কোনও রূপে স্বাস্থ্যের ও জীবনের অনুকূল। আর কতকগুলি পদার্থ জীবন সংগ্রামে আশঙ্কা দূর করিয়া আশা আনে; নৈরাশ্য দূর করিয়া প্রফুল্লতা আনে। আরও কতকগুলি পদার্থ ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্যভাবে আনুকূল্য না করিলেও সামাজিক জীবনে বা জাতীয় জীবনে আনুকূল্য করিয়া থাকে; পরের প্রতি সমবেদনা জাগাইয়া পরার্থবৃত্তির উদ্দীপনা করে। এই সকল পদার্থ মানুষে পাইতে চায় এবং পাইলে আনন্দিত হয়; অতএব ইহারা সুন্দর।

৫। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনওরূপ আনুকূল্য করে না অথচ মনুষ্যের নিকট অতি সুন্দর, এমন পদার্থেরও অভাব নাই। এমনকী, যাহা অকারণে সুন্দর, তাহার মতো সুন্দর অন্য কোনও জিনিস নহে। যাহাতে কোনও লাভ নাই, সেই সৌন্দর্যের বুদ্ধি কীরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

৬। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির সহিত মনুষ্যের দুঃখবৃত্তি ক্রমশ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতেছে। ইহা সত্য কথা। মানুষের উন্নতির ইহা একটা লক্ষণ। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের জন্য আশঙ্কা এবং জাতীয় জীবনে আত্মীয় লোকের জন্য আশঙ্কা হয়তো মনুষ্যের এই দুঃখপ্রবণতার মূলে বিদ্যমান। এই দুঃখবৃত্তি জীবনের রক্ষা বিষয়ে অনুকূল। যেখানে-সেখানে এই আশঙ্কা না থাকিলে মনুষ্য জীবনরক্ষায় উদাসীন হইত, এবং এই আশঙ্কা হইতেই দুঃখবৃত্তির উৎপত্তি।

৭। কিন্তু কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি ঘটিলে মানবজীবন দুর্বহ হইত। উন্নত মানব ধরাধামে টিকিত না। মনুষ্য যেমন যেখানে-সেখানে দুঃখ পায়, সেইরূপ যেখানে-সেখানে আনন্দ কুড়াইবার ক্ষমতা না পাইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না; কোথা হইতে দুঃখ আসিবে, তাহা যেমন সর্বত্র স্থির করা চলে না, সেইরূপ কোথা হইতে কখন আনন্দ পাওয়া যাইবে, তাহাও সর্বদা নির্দেশ করা চলে না। যেখানে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দব এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেই জন্যই অতি সুন্দর। সাধারণত যাহাদের দুঃখবৃত্তি প্রবল, সৌন্দর্য কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা তাহাদেরই তত প্রবল। দুঃখের মতো সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই। কাব্যে এই জন্য করুণ রসের স্থান সর্বোপরি।

৮। সৌন্দর্যবুদ্ধি মানুষের মনে, অপিচ সৌন্দর্যও মনুষের মনঃকল্পিত। কোনও দ্রব্য স্বভাবত সুন্দর নহে, মানুষ তাহাকে স্বার্থের জন্য সুন্দর করিয়া লয়। মানুষই সৌন্দর্য রচনা করে। সৌন্দর্য রচনাতেই মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ। দুঃখ-বহুল সংসারে বিচরণকালে আনন্দ রচনা না করিলে তাহার চলে না। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আনন্দরচনাশক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্যবুদ্ধি ক্রমশ উপার্জন করিয়াছে। যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে।

সৌন্দর্য বুদ্ধি

মনুষ্যের সৌন্দর্য বুদ্ধির বিকাশ হইল কীরূপে, ইহা একটা সমস্যা। বড়-বড় পণ্ডিতে এই সমস্যা মীমাংসা করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোনও চেষ্টা হইবে না। বহু মানবধর্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরেজিতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তাহাই দেখিয়া চলে। ইউটিলির বাংলা অর্থ হিতকারিতা, উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা। যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন সংগ্রামে অনুকূল, কোন-না-কোনরূপে জীবন-সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জন করে। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুইখানা অস্ত্রনির্মাণের ও অস্ত্রপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবন রক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। অতএব প্রাকৃতিক নির্বাচনে এ সকল ধর্মই মানুষ ক্রমশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়া লয়; কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন। মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; দলের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয়; বর্তমান কামনা, বর্তমান লালসা, বর্তমান প্রবৃত্তি দমন রাখিতে হয়; এই জন্য মনুষ্যমধ্যে ধর্মবুদ্ধির উদ্ভব। ইহাও প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ। কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষার সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় সাহায্য না করিলেও জাতিগত জীবনরক্ষায় বা বংশরক্ষায় সাহায্য করিতে পারে; অতএব বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার অনুকূল ধর্মসকলও প্রাকৃতিক নির্বাচনেই অভিব্যক্ত হয়।

এইরূপে যাবতীয় মুখ্য মানবধর্ম প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ ষোলো আনা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তখন নরে বানরে প্রায় অভিন্ন ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবিধ মানবধর্ম অভিব্যক্তি হইয়া সে মানব পদবিতে উন্নত হইয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দর্য বুদ্ধি মানবধর্ম। মানব-ধর্ম এই হিসেবে যে, মানবেতর জন্তু এই সৌন্দর্য বুদ্ধিতে হয়তো একেবার বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দর্যবোধ আছে কি না, বলা কঠিন। ইংরেজিতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাংলাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা হইতেছে, সেই ফাইন আর্টের যে সৌন্দর্য লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্যের কথা বলিতেছি। ইংরেজিতে যাহাকে ইস্থেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্যের কারবার। ইতর জীবের মধ্যেও একরকম সৌন্দর্যপ্রিয়তা আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ জীবধর্ম; তাহাকে বিশিষ্ট মানব-ধর্মের সহিত এক পর্যায়ে ফেলা চলে না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায়; কপোত

মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়; ময়ূর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকা-রব সহকারে নাচিয়া-নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়। এই শ্রেণির সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সাধারণ জীবধর্মের অন্তর্গত। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে, যৌন নির্বাচনে ওইরূপ সৌন্দর্যের উৎপত্তি হইতে পারে। ময়ূরীর সেই সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই ময়ূর সুন্দর হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপ সৌন্দর্যের ও এইরূপ সৌন্দর্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নাই। নারীদেহের সৌন্দর্য এই যৌন নির্বাচন হইতেই উৎপন্ন। চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি ও খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন। ইহা বুঝা যায়; কিন্তু জবা শেফালিকা ছাড়িয়া কেন চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি এবং পেঁচা হাড়গিলা ছাড়িয়া কেন খঞ্জন-নয়নের প্রতি অকস্মাৎ পুরুষের আকর্ষণ হইল, ইহা বুঝা যায় না। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য পাওয়া যায় না। মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য দেখিতে পায়। তুমি আমি যেখানে মুগ্ধ হইবার কোনও হেতু দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবিকুল এই জন্য বিজ্ঞসমাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচকধ্বনিতে অর্থাৎ বাঁশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতার গীতি শুনিতে পাইতেন; ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোকিলের কু-কু শুনিয়া অশরীরী বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন; এই শ্রেণির অদ্ভুত আনন্দ বোধ করি, অপর সাধারণের হৃদ্‌গত হয় না। এই শ্রেণির সৌন্দর্য-বুদ্ধির জীবনরক্ষায় কোনও কার্যকারিতা আছে, তাহাও বোধহয়, কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্যপ্রিয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্বথা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচ রকমের বর্ণের বিন্যাস করিয়া অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেন; কলাবৎ নানা রকমের স্বরবিন্যাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া আনন্দের সৃষ্টি করেন; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য কোথা হইতে কীরূপে কী উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। এই সকল বস্তুর কোথায় সৌন্দর্য রহিয়াছে তাহার আবিষ্কারেও সকলে সমর্থ হয় না; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমঝদার, তিনি এই সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাঁহার এই মোহ, তাহা বুঝানো যায় না। জীবন-সংগ্রামে এই মোহ কোনওরূপ আনুকূল্য করে, বলিতে গেলে মিথ্যা নির্দেশ হইবে। কাজেই এই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি প্রাকৃতিক হেতু-নির্দেশ একরকম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক নির্বাচনরূপ মন্ত্রের অন্যতর ঋষি আলফ্রেড রসেল ওয়ালাশ এই জন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনে বুঝানো যায় না। যৌন নির্বাচনেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধ যখন মানবত্বের একটা প্রধান লক্ষণ,—অনেকের মতে মানবত্বের সর্বপ্রধান লক্ষণ,—সৌন্দর্যবুদ্ধিবর্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন পূর্ণ মানবত্বই যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, এ কথা স্বীকারে তিনি সংকুচিত হইয়াছেন। মানবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোনও কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তির অতিরিক্ত কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তি হয়তো মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, ওয়ালাশের চরম সিদ্ধান্ত এইরূপ।

ওয়ালাশের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই।

কিন্তু সৌন্দর্য-বুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোনও কার্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন এই সৌন্দর্য-বুদ্ধি জন্মাইতে পারে, এই কথা স্পষ্টত বলিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোনও প্রাকৃতিক কারণে এই সৌন্দর্য-বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দর্শাইবার জন্য তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল চেষ্টা ফলপ্রদ হয় নাই।

জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কেহ-কেহ বলেন, এই সৌন্দর্যপ্রিয়তা একটা bye-product of evolution—জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। পাখির সৌন্দর্য পাখির ব্যক্তিগত জীবন রক্ষায় বিশেষ কোনও কাজে লাগে না, ইহা স্বীকার্য। তাহা জাতিগত জীবনরক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও প্রমাণাভাব; সুতরাং এই সৌন্দর্যে পাখির নিজের কোনও লাভ নাই, তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। ময়ূরীর কাছে বাহবা পাইবার জন্য ময়ূরকে কলাপের দুর্বহ বোঝা বহিতে হয়। কিন্তু এই বোঝার প্রতি ময়ূরীর আকস্মিক অনুরাগ জীবনদ্বন্দ্বে ময়ূর-বংশের রক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য না করিয়া বরং প্রতিকূলতাই করে; ময়ূরকে এই বোঝা বহিয়া তাহার শত্রুর নিকটে আত্মরক্ষায় একান্ত অসমর্থ করে। তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনে যখন শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে, জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ ধর্ম তাহাতে বিকাশ পায়, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে এমনও দুই একটা ধর্ম উৎপন্ন হয়, যাহার জীবনে কোনও উপযোগিতা নাই; এই সকল আগন্তুক বা আনুষঙ্গিক পরিবর্তন জীবন রক্ষার অনুকূল না হইতেও পারে। পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে তাহার নানাবিধ বিকার ঘটিয়াছে। অধিকাংশ বিকারই তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো কোনও অজ্ঞাত জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম বিকারও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবন রক্ষায় তেমন কার্যকরী না হইতেও পারে। ময়ূরের যে সৌন্দর্য লাভের কথা বলা যাইতেছে, তাহা এইরূপ আগন্তুক আনুষঙ্গিক বিকার মাত্র।

মনুষ্যের সৌন্দর্য-বুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আগন্তুক আনুষঙ্গিক লাভমাত্র; জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ মানবধর্মের বিকাশের সহকারে ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দ লাভের উপায় ঘটিয়াছে মাত্র। সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের সুখলাভ ঘটে; তাহা বেশ বুঝা যায়; কেন না, এই সুখলাভ জীবনের অনুকূল; এই সুখের জন্যই মানুষ জীবনরক্ষায় যাহা উপাদেয়, তাহা গ্রহণ করে; অতএব এই সুখলাভশক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়া তাহার নেশাতেও মানুষের একরকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের কোনও লাভ নেই; বরং হানি আছে, এই আনন্দলাভ-শক্তি জীবনরক্ষার প্রতিকূল; এবং মনুষ্য পদে-পদে এই অহিত প্রবৃত্তির জন্য অনিষ্ট ভোগ করিতেছে। অথচ আর পাঁচটা হিত প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অহিত প্রবৃত্তিটাও মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই। মানুষের সৌন্দর্যানুরাগও এইরূপ একটা নেশা; ইহার কোনও উপকারিতা নাই; বরং অন্য নেশার মতো সময়ে-সময়ে জীবনের অপকার করে। অন্যান্য নেশার মতো এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের আনুষঙ্গিক আগন্তুক ফল মাত্র। ইহার জন্য মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যাহার ছেলেখেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, যে বিজ্ঞ বুদ্ধিমান ও

বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই এবং প্রণয়িনীর বিরহবিধুর হইয়া চন্দ্রকিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রকৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বদান্যতায় কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে একটু দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী? কুক্কুটের মাথায় অনাবশ্যক শিখার মতো, পুরুষ মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোঁপ গজাইয়াছে,—ডারউইন হয়তো বলিবেন, ইহার উদ্দেশ্য নারীজাতীর মনোরঞ্জন,—তথাপি ইহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই অনর্থক সৌন্দর্য-নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে। তবু ভালো যে, সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারবার, এবং ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন সাহায্যে মনুষ্যে কবিত্বের স্ফূর্তির বা সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তির হেতুনির্দেশ পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অক্ষমতা স্বীকারের পূর্বে একটু ভাবিবার আছে। জীবন রক্ষায় সে কীসে কীরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বলা কঠিন। এই বিষয়টাতে আমার কোনও উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য-বুদ্ধিও মানবজীবনে কোনওরূপ আনুকূল্য করে না, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ; এবং যদি মানব-জীবনে ইহার কোনওরূপ উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনই ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থেই সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে সেই আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথা থাকিয়া যায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কেবল উপভোগের সামগ্রী—ইহার ফল বিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ। এই আনন্দ কোনও-কোনও কাজে লাগে, জীবনযাত্রায় কাহারও কোনওরকমে কোনও হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়; উহা যেন মলিন হইয়া যায়। কোনওরূপ লাভের, কোনওরূপ হিতের সম্পর্ক আনিতে গেলে উহার শুদ্ধতা থাকে না। কোনও প্রাকৃতিক কারণে এই আনন্দের উৎপত্তি নির্দেশই বোধহয় অসম্ভব।

জ্ঞানের সীমানা

গত শত বৎসরে জ্ঞানের পরিধি এত বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে যে, এই প্রসারে অতি সুধীর ব্যক্তিকেও আত্মহারা হইতে হয়। কেহ ভাবেন, মানুষের জানিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই; কেহ ভাবেন, এমন স্থান নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধি প্রবেশলাভে অসমর্থ; সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা বুঝি অতি শীঘ্র মানুষের বিজয়লব্ধ জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িল; শীঘ্রই বুঝি মানুষকে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারেব মতো অর্জিত ভূমির অভাব দেখিয়া অশ্রুপাত করিতে হইবে। গত কতিপয় বৎসরে মানুষের জ্ঞানের পরিধি কত দূর প্রসারিত হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রভাবে ও প্রবীণতায় জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানরাজ্যে গরীয়সী। নিউটনের অলৌকিক-ধীশক্তি সৌরজগতের জটিল শৃঙ্খল একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল; গ্রহ বলো, উপগ্রহ বলো, ধূমকেতু বলো, আর সমবেত উল্কাস্রোত বলো, সৌরজগতে এমন কিছুই নাই, যাহার গতায়াত জ্যোতির্বিদের গণনায় না আইসে। দূরবিনে দেখিবার আগে গণনাবলে নেপচুনের আবিষ্কার হইয়াছে। দূরবিন যাহা কখনও দেখিবে না, এমন নির্বাপিত নক্ষত্রের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। গ্রহ কত দূরে আছে, গণিয়া বলিতে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না। গ্রহদের কথা ছাড়িয়া দাও; আলোর বেগ সেকেন্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ হিসাবে ধরিয়া, যে সকল তারকা হইতে আলো আসিতে বিশ বৎসর, কি ত্রিশ বৎসর লাগে, তাহাদের দূরত্বও একরূপ পরিমিত হইয়াছে। আমাদের নক্ষত্রজগৎ, যাহাতে দূরবীক্ষণযোগে দৃষ্টিগোচর তারকার সংখ্যা কয়েক কোটি, তাহার আকৃতি ও আয়তন একরূপ মোটামুটি স্থির হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের এত বড় সূর্য এই বহুকোটি তারকার মধ্যে একটি ছোটখাটো তারকামাত্র। একটা তারা হইতে তাহার খুব কাছের তারায় আলো আসিতে মোটামুটি দুই-তিন বৎসর অতীত হয়। বুঝিয়া লও, এই তারকা-জগৎ কত বিশাল। তথাপি এই বিশাল দৃশ্যমান জগতের আয়তন ও পরিধি নিরূপণের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই।

এই বহুসংখ্যক তারকার মধ্যে কোনটির গঠন কীরূপ, কোনটিতে লোহা আছে, কোনটিতে দস্তা আছে, আলোকবিশ্লেষণযন্ত্র দিন-দিন তাহার নূতন-নূতন খবর আনিয়া দিতেছে। রয়টারের প্রেরিত তারের খবরে ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির কাচ কারখানায় যে সংবাদ আনিয়া দেয়, তাহা অভ্রান্ত সত্য। আমাদের সূর্যমণ্ডলের কোনখানে কোন সময়ে কত বেগে ঝড় বহিতেছে; অমুক তারকা ঘণ্টায় কত ক্রোশ বেগে আমাদের নিকট আসিতেছে বা দূরে যাইতেছে; অমুক তারকা দূরবিনের কাছে একটা দেখায়, কিন্তু বস্তুত উহারা দুইটা সহচর, পরস্পরকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; অমুক তারকায় হঠাৎ উদজান বাষ্প জ্বলিয়া উঠিয়া মহাপ্রলয় হইয়া গেল; হয়তো কত সসাগরা সদ্বীপা সমানুষা

ধরিত্রী একেবারে বাষ্পীভূত হইয়া গেল; এইরূপ কত না কত সংবাদ প্রতিনিয়ত এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটি আনিয়া দিতেছে।

নিউটনের কল্যাণে জগতের স্থিতির ও গতির ব্যবস্থা জানিয়াছি; হর্শেল হইতে আকৃতি ও আয়তন জানিবার চেষ্টা হইয়াছে; কির্কফের সময় হইতে গঠন ও উপকরণ ক্রমেই বিবৃত হইতেছে; এখন জগতের জীবনের ইতিহাস লইয়া কথা। কেলবিনের ধীশক্তি পৃথিবীর ও সূর্যমণ্ডলের বয়সনিরূপণে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোষ্ঠীগণনা অদ্যাপি সমাপ্ত হয় নাই বটে; কিন্তু আচার্যমহাশয়েরা গণনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। লকিয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বয়স অনুসারে তারকাগণের শ্রেণিবিভাগ করিয়াছেন। লাপ্লাসের পন্থানুবর্তী হইয়া হেলমহোলৎজ সৌরজগতের ভ্রূণদশা হইতে আনুক্রমিক অঙ্গবিকাশ ও শক্তিসঞ্চার নির্দেশ করিয়াছেন; এবং কেলবিন জগতের অন্তিম দশায় প্রলয়কালের চিত্র আঁকিয়া মানুষের গর্ব স্তম্ভিত করিয়াছেন। চন্দ্রমণ্ডল এককালে পৃথিবীর কুক্ষিতে নিহিত ছিল; ভূমণ্ডলও বুধশুক্রশনৈশ্চর প্রভৃতির সহিত সূর্যমণ্ডলের অঙ্গীভূত ছিল; সূর্যমণ্ডল আপনার কলেবর সৌরজগতের পরিধি পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া বাষ্পাকারে বিস্তীর্ণ ছিল; এবং বিশ্বজগতের অসংখ্যেয় তারকাসমূহ হয়তো এক বাষ্পময় মহাসাগরের মতো বিশ্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। সেই বাষ্পময় মহাসাগর কালক্রমে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ঘনীভূত হইয়া এই দৃশ্যমান জগৎ প্রস্তুত করিয়াছে। কালক্রমে সূর্যমণ্ডল নিষ্প্রভ হইবে; যে সকল তারকা গগনে দীপ্তি পাইতেছে, এক-এক করিয়া তাহারা সকলেই নিবিবে; এবং হয়তো সূর্যে-সূর্যে সংঘট্ট ঘটিয়া পরিশেষে এক বাষ্পময় মহাসাগর পুনরায় বিশ্ব ব্যাপিবে, অথবা একমাত্র শীতল মহাপিণ্ডরূপে আকাশে অবস্থান করিবে। পরিণাম কীরূপ, তাহা এখনও স্থির করা যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা হইতে পদার্থবিদ্যা আসিলে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে এই শাস্ত্র অকল্পিতবেগে প্রসার লাভ করিয়াছে। আলোকের বেগের পরিমাণ হইয়াছে। আলোকবাহী বিশ্বব্যাপী ইথরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঊর্মিগুলির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে; লাল আলো সেকেণ্ডে কত কোটি বার চোখের পরদায় আঘাত দেয়, সবুজ আলো কত বার দেয়, অতি বড় অর্বাচীনও গণিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। তাপের সহিত আলোর সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে, জড়পরমাণুর স্পন্দনসংখ্যা গণিত হইয়াছে। বাষ্পীয় পদার্থের অণুসকলের অসংযত গতির বেগ পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়াছে।

মেন্দেলিয়েফ সপ্ততিবিধ মূল পদার্থের সম্বন্ধনির্ণয়ের পথ দেখাইয়াছেন; কেলবিনের প্রতিভা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জড়পরমাণুর আয়তন পরিমাণে সাহসী হইয়া সফলকাম হইয়াছে; ফ্যারাডে জড়জগতের রহস্যের পর রহস্য উদঘাটিত করিয়া তাড়িত শক্তিকে মানুষের ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন; ক্লার্ক মাক্সওয়েলের ধীশক্তি আলোক, তড়িৎ ও চুম্বকশক্তির সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছে। অধ্যাপক হার্টজ ইথরমধ্যে ক্রোশদীর্ঘ দৃষ্টির অগোচর আলোক ঊর্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রতিভার সমরক্ষেত্রে বিজয়নিশান উড়াইয়া দিয়াছেন।

পদার্থবিদ্যার পর জীববিদ্যা। জীবশরীরে যে সমস্ত ক্রিয়াসমষ্টিকে জীবন বা প্রাণ বলি, তাহা কেবল জড়শক্তিরই বিকাশমাত্র। বিবিধ জড়শক্তিরই সুনিয়ত ক্রিয়ার পারম্পর্যে জীবের জীবনতত্ত্ব বুঝানো যাইতে পারে ও বুঝানো যাইবে, জীববিদ্যার বর্তমান কালে

এই আশা। জড়ের ও জীবের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যায়, তাহাও ভিত্তিহীন অথবা অলীক; বৈজ্ঞানিক এই ব্যবধান সম্মুখে দেখিয়া কখনই তত্ত্বান্বেষণে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

জীববিদ্যা উদ্ভিদে-উদ্ভিদে, প্রাণীতে উদ্ভিদে, প্রাণীতে-প্রাণীতে সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে; প্রত্যেক জীবকে জীবসাধারণের বংশানুক্রম তালিকায় উচিত স্থান দিতেছে; অভিব্যক্তির পরম্পরায় প্রত্যেক জাতির উদ্ভবের ধারা নির্দেশ করিতেছে। বহিঃপ্রকৃতি হইতে জীবকোশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই জীবকোশের জীবনের উদ্দেশ্য; বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জড়শক্তিনিচয়ের তদনুযায়ী সামঞ্জস্যপ্রয়াসই জীবন; সেই সামঞ্জস্যের নাশই মৃত্যু; জীবকোশের সমবেত জীবনই জীবের জীবন; জীবনরক্ষার প্রয়াসে শরীরমধ্যে অঙ্গবিভাগ ও অবয়ববিভাগ; জীবনরক্ষার প্রয়াসেই আত্মপুষ্টি; আত্মপুষ্টিরই পরিণতিক্রমে বা প্রকারভেদে বংশরক্ষা বা সন্তানোৎপাদন; ব্যক্তিগত জীবনরক্ষার উপযোগিতায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও অনুপযোগিতায় অপকর্ষ; জীবন-যুদ্ধে বিজয়চেষ্টার ফলে জাতিগত অভিব্যক্তি। বৃক্ষের কাণ্ডের পরিণতিতে শাখা, শাখার পরিণতি পত্র, পত্রের সমবায় পুষ্প, পরিণত পত্রই বীজ; জাতীয় পুষ্টি বা বংশবৃদ্ধি ব্যক্তিগত পুষ্টির বা আহারক্রিয়ারই অবান্তরভেদ; শাখা যেমন বৃক্ষশরীরের অংশমাত্র, বীজোৎপন্ন সন্তানবৃক্ষও তেমনি পিতৃবৃক্ষের অংশভূত, উভয়ত্র সম্বন্ধ একরূপ; আমার হাতপায়ের সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তোমার সহিত বা আমার পালিত কুকুরের সহিত বা আমার খাদ্য মৎস্যটির সহিতও আমার তাদৃশ সম্বন্ধ; অথবা আমি ও তুমি, কুকুরটি ও মাছটি সকলেই একমাত্র জীবের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গমাত্র। এই সকল কথা বাক্য নহে, কল্পনা নহে, বাক্যালংকার নহে, বিশুদ্ধ জ্ঞান। স্ত্রীপুরুষভেদ স্বভাবের নিয়ম নহে, স্ত্রীপুরুষভেদ বংশরক্ষার একমাত্র উপায় নহে; ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী বা ব্যক্তিমাত্রই পুরুষ, অথবা ব্যক্তিমাত্রই স্ত্রী ও পুরুষ; কাহারও স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উভয়ই অবিকশিত; কাহারও বা উভয় ভাবই সমান পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত; কোনও ব্যক্তিতে স্ত্রীভাব পুরুষত্বে লীন, কোনও ব্যক্তিতে পুরুষত্ব স্ত্রীভাবে আচ্ছাদিত।

মৃত্যু স্বভাবের ধর্ম নহে, জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে, জাতীয় জীবন বর্ধনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিজীবনে উপার্জিত, ব্যক্তিজীবনে অভিব্যক্ত ধর্মমাত্র। জীবনরক্ষার জন্য আত্মানুরাগ বা স্বার্থবৃত্তি; জাতীয় জীবনরক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার অপত্যস্নেহ; জাতির সহিত জাতির জীবনযুদ্ধে আবশ্যক বলিয়া স্বজাতির সহিত ব্যবহারে স্বার্থত্যাগ। এই হইতে সমাজশাসন, এই হইতে প্রবৃত্তি-সংযম, এই হইতে সামাজিকতা, এই হইতে ধর্মভয়। জীববিদ্যা জীবের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়া সমাজবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছে; মনোবিজ্ঞান গঠিত করিবার উপায় দেখাইয়াছে; নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছে।

জীববিদ্যার পর সমাজবিদ্যা। সমাজ শরীরী পদার্থ, অগস্ট কোমত তাহা অস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন; হর্বার্ট স্পেনসার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া জীববিদ্যার উপর সমাজবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ফলত সমাজবিদ্যা জীববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উভয় বিদ্যাই ডারউইনের প্রতিভার নিকট সমান ঋণী। যোগ্যতমের স্থিতি, অযোগ্যের বিনাশ; এই মূলসূত্র স্থাপন করিলেই জীববিদ্যার প্রধান কথা বলা হইল; সমাজবিদ্যারও মূলকথা ও প্রধান কথাও শেষ হইল। সুতরাং ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, যাহা কিছু সমাজবিদ্যার

শাখাস্থানীয়, সকলেরই ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। বলা বাহুল্য, ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র; এখনও গাঁথিয়া তুলিতে হইবে; ভরসা আছে, অচিরে সৌষ্ঠবশালী অট্টালিকা চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

ধর্মনীতি সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা আবশ্যক। ধর্মনীতি সমাজবিদ্যার অন্তর্গত বলিয়া যেমন এক দিকে জীববিদ্যার আশ্রিত, তেমনি আবার মনোবিজ্ঞান ইহার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। মনোবিজ্ঞানের কথা পরে। যে দিন হইতে সমাজ, সেই দিন হইতে ধর্মের আবশ্যকতা এবং সেই দিন হইতে মানুষের ধর্মনীতিস্থাপনে প্রযত্ন। সুতরাং প্রাচীনতায় ধর্মশাস্ত্র কোনও শাস্ত্রের অধঃস্থ নহে; ইহা জ্যোতিষশাস্ত্রের অপেক্ষাও পুরাতন। অন্য শাস্ত্রে সমাজের উন্নতিমাত্র; কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে সমাজের স্থিতি নির্ভর করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্বদেশে মনস্বীগণ ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন। কিছু দিন ধরিয়া সম্প্রদায়বিশেষ মনোরঞ্জন সাধন করিয়াছে; কিন্তু দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে নাই। ডারউইন 'ডিসেন্ট অব ম্যান' অথবা মানুষের উৎপত্তি নামক গ্রন্থে ধর্মশাস্ত্রের মূলসূত্র বিবৃত করিয়াছেন। এখন পূর্ণতালাভ ভবিষ্যতের ভরসা।

পাপ আর পুণ্য, এই দুইটি শব্দ লইয়া চিরকাল আন্দোলন চলিয়াছে। নানা যুক্তি, নানা বিতণ্ডা, পাপপুণ্যের উৎপত্তির আবিষ্কারে প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্ক, বিবাদ, রক্তপাত, কতই না এই তথ্য উদঘাটনের প্রয়াসে ঘটিয়াছে। ডারউইনের নিকট মীমাংসার পথ পাওয়া গিয়াছে; অন্তত মীমাংসার পথে তিনি যতটা আলো ফেলিয়াছেন, তৎপূর্বে তাহা পাওয়া যায় নাই। কীরূপে আলো ফেলিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা করিব না।

জীবনরক্ষার প্রয়াসে জীব পত্রপুষ্পের উৎপাদন করিয়াছে; হস্তপদ মস্তিষ্কের সৃষ্টি করিয়াছে; বুদ্ধিবলসামর্থ্য প্রভৃতি স্বার্থবৃত্তির সৃষ্টি করিয়াছে। জাতির জীবনরক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুর সৃষ্টি, স্বার্থত্যাগবৃত্তির সৃষ্টি, স্নেহমমতা দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি পরার্থবৃত্তির ও সমাজধর্মের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এইরূপেই ধর্মবৃত্তির উদ্ভব, পাপুপণ্যের উৎপত্তি। সনাতন পুণ্য নাই, সনাতন পাপ নাই। সমাজজীবন যাহাতে রক্ষা হয়, তাহাই পুণ্য; সমাজজীবন যাহাতে রক্ষা পায় না, তাহাই পাপ। সমাজজীবন রক্ষার জন্য ব্যক্তিজীবন উৎসর্গ করিতে হয়, করো। এই উৎসর্গ ধর্ম; এই উৎসর্গ না করিলে অধর্ম হয়। ধর্মসাধন কর্তব্য কর্ম। তোমার সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, সমাজজীবন রাখিতে হইবে; ধর্মসাধন করিতেই হইবে। স্বর্গের প্রলোভন আছে; নরকের বহ্নিশিখার বিভীষিকা আছে; রাজার দণ্ড আছে; পুরোহিতের শাসন আছে; সমাজের সাধারণী শক্তির প্রবল পেষণ আছে। ধর্মসাধন করিতেই ইহবে। কিন্তু প্রলোভনে বা নিপীড়নে ধর্মসাধন করিলে তোমাকে ধার্মিক বলিব না। যশোলুব্ধ হইয়া বদান্য সাজিলে দাতা বলিব না। তোমার মনোবৃত্তিসমূহ যদি আপনা হইতে ধর্মপথগামী হয়. তোমার প্রবৃত্তি যদি সমাজরক্ষার অনুকূল পথে আপনা হইতে চলে, তবেই তুমি ধার্মিক; কেন না, ধার্মিকতাই তোমার স্বভাব; ধার্মিক না হইলে তোমার চলে না; ধর্মাচরণ ভিন্ন তোমার আত্মা সুস্থ হয় না।

তারপর মনোবিজ্ঞান। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ ক্রমেই নির্ধারিত হইতেছে। গল-সাহেবের মস্তিষ্কবিদ্যার বুজরুকির স্থল বিশুদ্ধ জ্ঞানকর্তৃক ক্রমেই পূর্ণ হইতেছে। তারপর

জগতের স্বরূপনির্ণয়। জড়বাদী উপহাস্যাস্পদ হইয়াছে; আত্মাবাদীর মিথ্যা জল্পনা নিরস্ত হইতে চলিয়াছে। বার্কলি, হিউম এবং ক্যান্টের স্থাপিত ভিত্তিকে আচার্য হেলমহোলৎজ পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যলব্ধ মশলা দিয়া জমাট বাঁধিয়া দৃঢ় করিয়াছেন। চিৎ কি, তাহা জানি না; আবার জড় কী, তাহাও জানি না। বিজ্ঞান নিজের অজ্ঞান স্বীকার করিয়া তত্ত্বদর্শিকতার পরিচয় দিয়াছে। একই পদার্থের দুই ভাব; এক দিকে জড়, অন্য দিকে চিৎ। সংকেত লইয়া কারবার। টেলিগ্রাফের কেরানি যেমন সংকেত লইয়া কারবার করে, বিদেশের সংবাদ-প্রেরকের মনের কথা টানিয়া আনে, চৈতন্য তেমনি কতকগুলা সংকেত লইয়া কারবার চালাইতেছে। জড়জগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পনা জীবরক্ষার একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই যথানিযুক্তবৎ করিতেছি।

আর্যজাতি

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইরূপ একটা কিংবদন্তি আছে যে, বিধাতা আপন মস্তক হইতে ব্রাহ্মণের, বক্ষোদেশ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীতে এই চারি ভিন্ন আর পঞ্চম জাতি নাই; এবং এই পুরাতন চারি জাতি মনুষ্য হইতে বর্তমান সহস্রজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক কথা, এই চারি জাতি মনুষ্যের মধ্যে, ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ ও মাথার বলে শ্রেষ্ঠ; ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ ও বাহুবলে শ্রেষ্ঠ; বৈশ্য পীতবর্ণ ও কৃষি বাণিজ্যাদি কার্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রের দাসত্বই জীবনের একমাত্র অবলম্বন। জাতিভেদের মূলে এই বর্ণভেদ; এবং ভারতবর্ষের ভাষায় অদ্যাপি জাতিশব্দের পর্যায়ে বর্ণ।

কৌতুক এই যে, প্রকৃত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলে এই পৌরাণিক আখ্যানের কতকটা সমর্থন পাওয়া যায়। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে মোটামুটি চারি জাতিতে বিভাগ করিবার প্রথা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। ককেশীয় জাতি, আর্যজাতি যাহার প্রধান শাখা, সেই জাতি আপনার সাদা চামড়া ও মোটা মাথা লইয়া অদ্যাপি পৃথিবী আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। আদিম আমেরিকা তাম্র বা রক্তবর্ণের জন্য ভূগোল বিবরণে বিখ্যাত; তাহাদের বাহুবলের জন্য সম্যক খ্যাতি আছে কি না জানি না, তবে মহাভাগ খ্রিস্টানদিগের শুভ পদার্পণের পূর্বে, আমেরিকার লোকে মিশর, কালডিয়া ও গ্রিস হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক রহিয়াও বড়-বড় সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাই। মোগলজাতীয় চিনামানের প্রধান পরিচয় পীতবর্ণ; এবং শুনা যায়, এই চিনামানই প্রথমে দিগ্‌দর্শন শলাকার তথ্য আবিষ্কার করিয়া সমুদ্রযাত্রা সুগম করিয়াছিল। আর মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি নিগ্রহের ও উৎপীড়নের ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যতই ব্যথিত হউক না, কৃষ্ণকায় কাফ্রি শ্বেতাঙ্গের দাস্যে জীবন অতিবাহিত কেন না করিবে, বর্তমান শতাব্দীতেও সেটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রাচীন পৌরাণিক আখ্যায়িকার যে এইরূপ একটা সঙ্গত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে কোন সংশয়ের কারণ দেখি না। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সে আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, চারি বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক্লবর্ণ মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা কত দূরে আসিয়াছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

বাল্যকাল হইতে আমরা মুখস্থ করিয়া আসিতেছি যে, ইংরেজ গ্রিক ও জার্মান, পারসি ও হিন্দু, একই মানববংশে উৎপন্ন ও পরস্পর জাতিত্বসূত্রে সম্বন্ধবান। এই প্রাচীন মানববংশ একটি বিশেষ সুগঠিত সুন্দর ভাষায় কথাবার্তা কহিত, একই দেবতার আরাধনা করিত, এবং কাস্পীয়সাগরের ধারে অথবা পামির মালভূমির নিকটবর্তী কোনও দেশে অধিবাস করিত। কালক্রমে বংশবিস্তার সহকারে বা খাদ্যাভাবে বা পার্শ্বস্থ জাতির আক্রমণে আদিম বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কেহ পশ্চিমে, কেহ বা পূর্বে যাত্রা করে, এবং কালক্রমে

পশ্চিমে ব্রিটিশ দ্বীপ হইতে পূর্বে যবদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ছাইয়া ফেলে। সেই-সেই প্রদেশের আদিম অধিবাসীরা এই বৈদেশিক অতিথির পদার্পণানুগ্রহে সর্বত্র সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনাদের গরু ভেড়া ও বাস্তুভিটা পর্যন্ত অতিথিসৎকারে নিয়োজিত করিয়াও নিষ্কৃতি পায় নাই। এমনকী, অধিকাংশ স্থলে আপনাদের অস্তিত্ববার্তা পর্যন্ত এত দূর নিষ্কামভাবে লুপ্ত করিয়াছে যে, বর্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিস্তর আক্ষেপ ও গবেষণা সত্ত্বেও তাহার উদ্ধার হইতেছে না। যাহাই হউক, শ্বেতকায়গণের এই আতিথ্যগ্রহণ স্পৃহাটা অদ্যাপি পূর্বের ন্যায় বলবতী রহিয়াছে; এবং এই ক্ষুদ্র ধরাখানার মধ্যেও অত বড় সাহারা দেশকে মরুভূমি ও মরুপ্রদেশকে হিমভূমি করিয়া বিধাতা তাঁহাদের বাসস্থানের পরিধিও নিতান্ত সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, বিধাতার এই কার্পণ্যেরও সুচারু কৈফিয়ৎ পাওয়া যাইতেছে না।

আমাদের পঞ্চনদবাসী পূর্বপুরুষেরা আপনাদিগকে আর্য নামে অভিহিত করিতেন, এবং সার উইলিয়ম জোন্সের পর হইতে ইউরোপীয়েরাও আপনাদিগকে আমাদের জ্ঞাতি সাব্যস্ত করিয়া সেই নামে পরিচিত করিতেছেন। আমাদের মধ্যে কেহ-কেহ ইংরেজদের জ্ঞাতিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত; এবং অপরের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরেজরা যে নিশ্চয়ই বানরের বংশধর, ডারউইনের মতের এইটুকু গ্রহণ করিতে আনন্দসহকারে প্রস্তুত আছেন। তথাপি বর্তমান প্রস্তাবে ইংরেজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয়ের আর্যত্ব স্বীকৃত হইবে ও আর্য শব্দ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রদত্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

এই স্থলে ইউরোপীয়দের আর্যত্বে অধিকারবিষয়ক যুক্তির একটু আলোচনা আবশ্যক। প্রধানতম ও প্রবলতম যুক্তি ভাষাগত ঐক্য। ফলে ইংরেজ ও জার্মান ও পাঞ্জাবি ও বাঙালি একই ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; এবং ভাষাগত ঐক্যের মূলে শোণিতগত বা জাতিগত ঐক্য না থাকিলে এত বড় হেঁয়ালিরও কোন অর্থ হয় না। অপিচ, ইংরেজের ভাষার ও বাঙালির ভাষার সাদৃশ্য ও ভেদ পর্যালোচনা করিয়া, যখন ইংরেজ ও বাঙালি উভয়েরই পূর্বপুরুষ একত্র পাশাপাশি অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কীরূপ ছিল, তদ্বিষয়েও কতকটা স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। এমনকী, এই ভাষাবিচার হইতে তাঁহাদের আদিম বাসস্থান পর্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে। তবে যেমন কোনও সিদ্ধান্তেই সকল পণ্ডিতকে কখনও এক মত গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই, এখানেও সেইরূপ দুই মত রহিয়াছে। আর্যভাষাসমুদয়ের ব্যবচ্ছেদ ও তুলনায় আলোচনা করিয়া কোনও-কোনও পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আর্যজাতির প্রথম বাসস্থান ছিল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে; আর কোনও-কোনও পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, সুইডেনের উত্তরে। কাস্পীয়সাগর আর সুইডেন;—পুরাতত্ত্বে এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ মতদ্বৈধ দেখিয়া বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কাজ।

এই ভাষাগত সাদৃশ্য ও পার্থক্য আলোচনা করিয়া বর্তমান আর্যজাতির মনুষ্যগণকে ছয় প্রধান শাখায় বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ছয়ের মধ্যে চারি শাখা ইউরোপে, ও দুই শাখা এশিয়া মহাদেশে বসতি করিতেছে। ইউরোপে কেল্ট, টিউটন, গ্রিক-রোমান ও স্লাব, এবং এশিয়া মহাদেশে পারসিক ও হিন্দু। এই ছয় শাখা লইয়া আর্যজাতিরূপ মহাবৃক্ষ। ইহার মূল কাস্পীয়সাগরের দক্ষিণে বা সুইডেনের উত্তরে কোনও স্থানে সংস্থিত ছিল। ইহার শাখাপ্রশাখা সমস্ত ইউরোপ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে সমস্ত ধরাতল ছাইয়া

ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ধরাতল ইহার ছায়ার আশ্রয়ে "সুশীতল" হইতেছে; ইহার শোভা, ইহার ঐশ্বর্য, ইহার সমৃদ্ধি, পৃথিবীতে তুলনাবিরহিত; তবে ইহার আওতা ক্ষুদ্র আগাছার পক্ষে ভয়ঙ্কর।

এই সিদ্ধান্তটা স্থূলত সর্ব্বাদিসম্মত; ইহার যথার্থে সন্দিহান হইবার সম্যক কারণ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কয়েকটা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

অতি প্রাচীন কালে কোনও দেশবিশেষ একটা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত মানববংশ বসতি করিত; সেই বংশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে শোণিতগত ও জন্মগত সম্বন্ধ ছিল, অর্থাৎ তাহারা পীতবর্ণ মোগল ও কৃষ্ণকায় কাফ্রি ও তাম্রবর্ণ আমেরিকা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত জীব ছিল;—সেই জাতির নাম হউক "আর্যজাতি"। তাহারা একটা বিশেষ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত; সেই ভাষা সর্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় সম্পত্তি, তাহাদের নিজস্ব ছিল;—তাহার নাম হউক "আর্যভাষা"। তদ্ভিন্ন আচার ব্যবহার, নীতি ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের একটা স্থূল ঐক্য ছিল; অতএব সেই প্রাচীন ধর্মের নাম হউক "আর্যধর্ম"। সেই আর্যভাষাভাষী আর্যধর্মাশ্রয়ী আর্যজাতি কালে সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে, এবং অধুনাতন পৃথিবীর সর্বপ্রধান মনুষ্যগণের অনেকে অদ্যাপি সেই প্রাচীন আর্যগণেরই বংশে জন্মিয়াছে; কালসহকৃত পরিবর্তন সত্ত্বেও সেই প্রাচীন আর্যভাষাতেই কথাবার্তা কহিতেছে, এবং হয়তো সেই প্রাচীন আর্যধর্মকেই রূপান্তরিত করিয়া আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; এ পর্যন্ত স্থূলত সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচারে কয়েকটা নূতন প্রশ্ন আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উত্তরের দরকার হয়। সম্প্রতি যাহারা আর্যভাষায় কথা কহে ও আপনাদিগকে আর্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, সকলেই প্রকৃতপক্ষে আর্যনামে অধিকারী বটে কি না? প্রাচীন আর্যজাতি পৃথিবী ছাইবার পূর্বে কোনও—না-কোনও স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিত; —সে কোন স্থান? প্রাচীন আর্যজাতি কোনও-না-কোনও সময়ে প্রাচীন বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দিগন্তে বাহির হয়;—সে কোন সময়?

এ কয়টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যেভাবে উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে কিছু সন্দেহের কারণ জন্মে।

ভাষাগত ঐক্য ধরিয়া জাতিগত ঐক্য স্থাপন করিতে গেলে অনেক সময় ভুল হয়। ভাষাপরিবর্তন পৃথিবীর ইতিহাসে নিত্য ঘটনা। আধুনিক ইতিহাসে পুনঃপুন দেখা যায়, সময়ে-সময়ে এক-একটা কুল অথবা এক একটা জাতি অকস্মাৎ আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া পরের ভাষায় কথা কহিত আরম্ভ করিল। বিজিত জাতি বিজেতৃজাতির ভাষা গ্রহণ করিয়া অনেক সময়ে আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করে। আধুনিক ফরাসি ও স্পানিশ ভাষা লাটিন হইতে উৎপন্ন। কিন্তু ফরাসি ও স্পানিশ জাতি রোমক জাতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তত্তৎপ্রদেশের অধিবাসীগণ রোম সাম্রাজ্যের অধীনতার সময়ে রোমকদের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। উত্তর অঞ্চল হইতে আগত খাঁটি জার্মান নর্মানেরা ফরাসি দেশে বাস করিয়া ফরাসি ভাষা গ্রহণ করে। ওয়েলশ ও আইরিশগণ ক্রমে আপন ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজি ভাষা গ্রহণ করিতেছে। কাফ্রি অনেক স্থলে শাদা প্রভুদের নিকট হইতে খ্রিস্টানির সহিত ভাষাপর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকা দেশে লাল, সাদা ও কালা, এই ত্রিবিধ বর্ণসমন্বয়ে যে সকল অপূর্ব সংকর বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা ইউরোপীয় ভাষায় কথা

কহে। অথবা অধিক দূর যাইবারই বা প্রয়োজন কী, যখন আমাদের মধ্যেই অনেকে বাংলা ভাষায় লিখিতে ও কথা কহিতে লজ্জা অনুভব করেন?

এই সকল দেখিয়া কেবল ভাষার সাহায্যে জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ঠকিতে হয়। অমুক ব্যক্তি সংস্কৃতমূলক বাংলা ভাষায় কথা বলে, অতএব সে আর্যসন্তান; অমুক ব্যক্তি ইংরেজি কহে, অতএব সে আর্য টিউটন, এরূপ বিচার অযুক্ত ও অসঙ্গত।

সুতরাং জাতিবিচারে প্রবৃত্ত হইলে অন্য পন্থার অবলম্বন আবশ্যক। মানুষে কোন ভাষায় কথা কহে, কেবল ইহা দেখিলে চলিবে না। গায়ের রংটা কেমন, মুখখানা গোল না দীঘল, চুলগুলা কোমল না কর্কশ, চোখ কালো না কটা, নাক উঁচু না বসা, এই সকল দেখা দরকার হইয়া পড়িবে এবং এই সকল দেখিয়া মানবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সমস্ত মানব জাতিকে কয়েকটি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপের সকল লোকেই আর্যভাষায় কথা কহে। কেবল পিরিনিস পর্বতের নিকট বাস্ক নামে ক্ষুদ্র জাতি ও উত্তর-রুশিয়ার লাপ জাতির ও ফিন জাতির কেহ-কেহ যে-যে ভাষায় কথা কহে, তাহা আর্যভাষা নহে। স্থূলত ইউরোপের সকলেই আর্যভাষাভাষী ও এই কারণে সকলেই আর্যজাতীয় বলিয়া গৃহীত হয়; কিন্তু আকার অবয়বের তুলনা করিলে বিভিন্ন প্রদেশে এত বিভিন্ন গঠনের লোক দেখা যায় যে, তাহাদের সকলকেই এক বংশে উৎপন্ন বলিতে জীববিদ্যা রাজি নহেন। ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে ভূমধ্যসাগরের তটবর্তী দেশের লোকের আকৃতি কিছু খর্ব, চুল কালো, চোখ কালো, বর্ণ অপেক্ষাকৃত ময়লা, মুখের অবয়ব কাহারও গোলাকার, কাহারও বা ঈষৎ দীর্ঘ। উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের গঠন অনেকাংশে পৃথক; তাহাদের আকৃতিতে শালপ্রাংশুত্ব ও মহাভুজত্ব বর্তমান, বর্ণ শাদা; বদনকে মণ্ডল বলিলে ভুল হয়; চুল পিঙ্গলবর্ণ অথবা ইংরেজি কাব্যের অনুরোধে সুবর্ণবর্ণ, আমাদের বিচারে কটা; চক্ষু নীল। আবার অনেক লোক দেখা যায়, তাহাদের গঠনে উভয় জাতির লক্ষণই কিছু না কিছু বিদ্যমান; ইহারা উভয় বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহার সন্দেহ নাই এবং এই মিশ্রজাতীয় লোকের সংখ্যা ইউরোপের মধ্যভাগেই অধিক।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয়, ইউরোপের বর্তমান অধিবাসীগণ তিনটা অথবা অন্তত দুইটা বিভিন্ন বংশ হইতে উৎপন্ন। অনুমান হয়, উত্তর অঞ্চলের লোকেই স্থূলত আর্য। সর্বত্রই আর্যে অনার্যে অল্প বিস্তর মিশিয়া গিয়াছে। সর্বত্রই অল্প বিস্তর সংকর জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। খাঁটি অমিশ্র আর্যের বা খাঁটি অমিশ্র অনার্যের সংখ্যা অধিক আছে কি না, সন্দেহের স্থল।

ইংরেজেরা আপনাদিগকে আর্য টিউটন বলিয়া পরিচয় দেন। ওয়েলস, কর্ণওয়াল, স্কটল্যান্ডের উত্তর ভাগ ও আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম ভাগের লোকে কেল্টিক ভাষায় কথা কহে ও আপনাদিগকে কেল্টিক আর্য বলিয়া পরিচয় দেয়। কেল্টিক ও টিউটনিক উভয়ই আর্য ভাষা; তবে উভয় ভাষায় কালক্রমে যতটা পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, কেল্ট ও টিউটনের শারীরিক গঠনে অবশ্যই ততখানি পার্থক্য জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। ভাষা যত শীঘ্র পরিবর্তিত হয়, শরীরের গঠন তত শীঘ্র বদলায় না। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও

আয়ারল্যান্ড, তিন প্রদেশেরই অধিবাসীদের একই রকম গঠন হওয়া উচিত; নতুবা উহাদের আর্যত্বে সন্দেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, তিন প্রদেশেরই অনেক অধিবাসীর গঠনে আর্যেতর লক্ষণ বিদ্যমান আছে। অনেক খাঁটি ইংরেজ অথবা আইরিশ, যাঁহারা বিশুদ্ধ আর্যভাষায় কথা কহেন, তাঁহাদের শরীর খাটো, মুণ্ড গোল, চুল ও চোখ কালো;—দেখিলেই তাঁহাদের আর্যত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ইংল্যান্ডের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই কয়টা কথা পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে,—কত পূর্বে তাহা সম্প্রতি সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা চলে না,—ইংল্যান্ডের সহিত ইউরোপের যোগ ছিল; মাঝে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল না। তখন ইউরোপে অতএব ইংল্যান্ড, খর্বাকৃতি জাতিবিশেষ বাস করিত। তাহারা পাথর ছুঁড়িয়া শিকার করিত ও লড়াই করিত। কালে সমস্ত ইউরোপ এক বিশাল হিমানিস্তরে আবৃত হয়। এই আকস্মিক হিমোৎপত্তির কারণ কী, তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইউরোপের তদানীন্তন মনুষ্য এই হিমের দৌরাত্ম্যে অনেকাংশে লুপ্ত হয় বা স্থানত্যাগী হইয়া দক্ষিণমুখে ক্রমে পলায়ন করে। কালে হিমের আচ্ছাদন গলিতে থাকে; কালে সেই মহাদেশব্যাপী বরফের আস্তরণের পরিধি সংকীর্ণ হইতে থাকে। এখনও সেই হিমরাশি সর্বত্র গলে নাই। এখনও আলপস পর্বতের উর্ধ্বভাগে সেই হিমরাশি পূর্বের মতো বর্তমান। এখনও ইউরোপের উত্তরে মেরুপ্রদেশ সারা বৎসর সেই হিমস্তরে আবৃত থাকে। এখনও সমস্ত গ্রিনল্যান্ড দেশ হিমে আচ্ছাদিত। ক্রমশ শীতের অপগমে ইউরোপ সেই হিমাবরণ হইতে মুক্তিলাভ করে; আবার জীবজন্তুর অধিবাসের উপযোগী হয়। প্রাচীন খর্বকায় মনুষ্য হিমস্তরের পরাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ উত্তরমুখে অগ্রসর হয়। ম্যামথের অস্থির সহিত তাহাদের অস্থিপঞ্জর ভূস্তরমধ্যে নিহিত রাখিয়া যায়। এই সময়ে আর একটি জাতি আসিয়া দক্ষিণ ইউরোপ ছাইয়া ফেলে, এবং পূর্বতন খর্বাকৃতি অধিবাসীগণকে আরও উত্তরে দূরীভূত করে। সেই অবধি ইউরোপে ইহাদের আর বিশেষ চিহ্ন রহিল না; হয়তো বর্তমান খর্বাকায় এস্কিমো জাতি অদ্যাপি তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে। নবাগত মনুষ্যেরা কালো চোখ, কালো চুল ও লম্বা মাথা লইয়া দক্ষিণ ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহারাও ধাতুর ব্যবহার প্রথমে জানিত না; পাথর কাটিয়া বিবিধ সুন্দর অস্ত্র নির্মাণ করিত। আর্য গ্রিক অথবা হেলীনেরা বোধহয় ইহাদিগকেই জয় করিয়া ও দাসত্বে আনয়ন করিয়া গ্রিসের ইতিহাস আরম্ভ করেন।

ইহাদের পর আরও একটি অনার্যজাতি ইউরোপে অধিকার স্থাপন করে। সমস্ত মধ্য-ইউরোপে ইহাদের অধিকার স্থাপিত হয়। ইহাদেরও কালো চুল ও কালো চোখ; অধিকন্তু ইহাদের বদনমণ্ডল প্রকৃতই মণ্ডলাকৃতি। ক্রমশ অধিকার প্রসারিত করিয়া ইহারা সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের পূর্বতন দীর্ঘানন অধিবাসীদের আপনাদের সহিত মিশাইয়া ফেলে।

ইহাদের পর আর্যজাতির প্রবেশ। আর্যজাতির দৈহিক লক্ষণ পূর্বে বলিয়াছি। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ববর্তী সকল জাতির অপেক্ষা উন্নত ছিল। ইহারা যেখানে উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানেই পূর্বতন অধিবাসীকে পরাজিত করিয়া আপন ধর্ম, আপন ভাষা, আপন আচার অবলম্বন করাইয়াছে। আর্যেতর ভাষার, আর্যেতর ধর্মের প্রায় সর্বত্র

মূলোচ্ছেদ হইয়াছে; তবে অনার্যের দৈহিক গঠন একবারে লুপ্ত হইবার নহে। এই আর্যেরাই হয়তো বিভিন্ন দলে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা সকলেই আর্য। পূর্ব হইতে ইহারা ক্রমশ পশ্চিমগামী, উত্তর হইতে ক্রমশ দক্ষিণগামী হইয়াছে। উহাদের ধর্ম ও ভাষা বিজিত ভূখণ্ডে প্রবল হইয়াছে। প্রাচীন মানবগণের ভাষা ও ধর্ম একেবারে লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি সেই অনার্য ভাষা হয়তো দুই এক জায়গায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিরিনিস পর্বতপার্শ্বস্থ বাস্ক ভাষা সেই প্রাচীন কালের অনার্যজাতির ভাষা। বাস্কভাষী অনার্যগণ, যাহারা আর্যগণের আগমনের পূর্বে প্রায় সমস্ত মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে বিস্তৃত ছিল, তাহাদিগকে আইবিরীয় নাম দেওয়া হয়। অনার্য ভাষা লোপ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু শারীরিক গঠন ধরিয়া বিচার করিলে দক্ষিণ-ইউরোপের লোক আর্যধর্মা হইলেও স্থূলত অনার্যবংশজ। মধ্য-ইউরোপের লোক বংশে সংকর। উত্তরাঞ্চলের লোক স্থূলত খাঁটি আর্য।

ভিন্ন-ভিন্ন দেশের ইতিহাস ধরিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। ব্রিটিশ দ্বীপে পূর্বে অনার্যজাতির বাস ছিল। আর্য কেল্ট আসিয়া উহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উহাদের সহিত মিশিয়া যায়। অনার্য আর্যের সহিত মিশে নাই। আর্যই অনার্যের সহিত মিশিয়াছিল। ভাষা ছিল পূর্বে অনার্য বাস্কজাতীয়; ভাষা হইল আর্য কেল্টিক। পরে রোমানেরা এই আর্যভাষাভাষী অনার্যজাতিকে পরাস্ত করিয়া খ্রিস্টিয় ও রোমান সভ্যতা প্রদান করে। তবে তাহারা ভাষার বা শোণিতের অধিক পরিবর্তন ঘটাইতে অবসর পায় নাই। পরে জার্মানি হইতে প্রায় খাঁটি আর্য জার্মান আসিয়া ব্রিটিশ দ্বীপ ক্রমে অধিকার করে ও পূর্বতন অধিবাসীদের সহিত মিশে। পূর্বাঞ্চল হইতে কেল্টিক ভাষা সম্পূর্ণ লোপ পায়। পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অদ্যাপি কেল্টিক ভাষা লোপ পায় নাই। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীতে আর্যত্বের মাত্রা অধিক, পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীতে অনার্যত্বের মাত্রা অধিক। স্পেন দেশে ও ফরাসি দেশে বাস্কভাষী অনার্য আইবিরীয়গণ বাস করিত। ফরাসি দেশের কতক অংশে আর্য-অধিকার বিস্তারের সহিত কেল্টিক ভাষা ও রীতিনীতি চলিত হয়। রোমানেরা উভয় দেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া আর্য রোমক ভাষা প্রচলিত করে। শোণিত মূলত অনার্যই রহিয়া যায়। পরে রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও জার্মান বিপ্লবের সময়, ফরাসির পূর্বোত্তর ভাগে আর্যগণের প্রবল মাত্রায় আমদানি হয়। এক্ষণে স্পেনবাসী স্থূলত অনার্যবংশীয় আর্যভাষী। দক্ষিণ-ফরাসির পক্ষেও তাহাই বক্তব্য। উত্তর-পূর্ব ফরাসিতে স্থূলত আর্য কেল্ট ও আর্য টিউটনের অধিবাস; ভাষা সর্বত্র আর্য রোমক।

প্রাচীন রোমানদের জাতিনির্ণয় দুরুহ। প্রাচীন রোমকেরা উত্তর হইতে আগত গলজাতি দ্বারা পুনঃপুন আক্রান্ত হইত। তাৎকালিক গলদিগের যেরূপ বিবরণ আছে ও পরবর্তী ইতিহাসে জার্মানদিগের যে বিবরণ আছে, তাহাতে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বোধহয় ছিল না। গল ও জার্মান উভয়েরই প্রকাণ্ড কলেবর ও নীল চক্ষু রোমক ঐতিহাসিকের নিকট প্রশংসা অধিকার করিয়াছিল। এই গলেরা আবার পরবর্তী কালে পূর্বমুখে যাত্রা করিয়া এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গল ও জার্মান উভয়েই প্রায় খাঁটি আর্য ছিল বলিয়া বোধহয়। রোমকেরা স্বয়ং বোধ করি সংকরজাতিভুক্ত ছিল। তাহারা আর্যভাষায় কথা কহিত ও আর্যধর্মাবলম্বী ছিল। প্রাচীন অনার্য আইবিরীয় জাতি, বোধহয়, আর্যগণের সহিত কিয়দংশে মিশ্রিত হইয়া ইটালির বিভিন্ন সংকরজাতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

গ্রিস দেশে মণ্ডলানন আইবিরীয় জাতির বোধ করি বিস্তার হয় নাই। সেখানে দীর্ঘাননশালী অনার্যেরই বসতি ছিল। আর্য হেলীনেরা আসিয়া ইহাদিগকেই জয় করে ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রিসে সমাজের উচ্চতর স্তরে আর্যত্ব ও নিম্নতর স্তরে অনার্যত্ব প্রবল ছিল। পরবর্তী কালে খ্রিস্টানির বিস্তারে উভয়ে মিশিয়া গিয়াছে।

জার্মানির দক্ষিণ ভাগে সংকরজাতিরই অধিক প্রাদুর্ভাব। উত্তর জার্মানিতে ও স্কান্দিনেবিয়াতে বিশুদ্ধ আর্যের সংখ্যা বোধহয় পৃথিবীর অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক।

রুশিয়ার পার্শ্ববর্তী প্রদেশের লোকে স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে। স্লাবনিক ভাষা আর্যভাষার শাখামাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া যে-কোনও ব্যক্তি স্লাবনিক ভাষায় কথা কহে, সেই আর্যবংশধর, এমন নহে। এমনকী, রুশিয়াতে যতটা বর্ণসাংকর্য ঘটিয়াছে, ততটা অন্যত্র হইয়াছে কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও ঠিক এই ইতিহাস। দক্ষিণাপথে অধিকাংশ লোকই আর্যধর্মা, কিন্তু অনার্যভাষী ও অনার্যবংশীয়। আর্যবর্তে হিন্দুসমাজে উচ্চ স্তরে আর্যত্বের ও নিম্ন স্তরে অনার্যত্বের মাত্রা অধিক। ভারতবিজেতা আর্যগণ অনার্যগণকে শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া সমাজভুক্ত করিয়াছিলেন। শূদ্রের সহিত তাঁহারা বৈবাহিক সম্বন্ধে সহজে মিশিতে চাহিতেন না। তথাপি মিশ্রণের নিবারণও অসাধ্য ছিল। দ্বিজাতির সংখ্যা পূর্বেও অল্প ছিল, এখনও অল্প আছে। সেকালে দ্বিজাতির পক্ষে শূদ্রকন্যাবিবাহ বৈধ বিবাহের অন্তর্গত ছিল। ফলে আমরা যতই আর্যত্বের স্পর্ধা করি না, শুক্ল চর্ম ও নীল চক্ষুর প্রাদুর্ভাব আমাদের উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিক দেখা যায় না। প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ আয়তন ও উন্নত নাসা মাত্র দেখিয়াই আজকাল আমাদের মধ্যে আর্যত্বের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়। গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রখর সূর্যাতপ চর্মের বর্ণ বিকারের জন্য কতকটা দায়ী হইতে পারে, কিন্তু কতকটা মাত্র। বেদমার্গানুযায়ী হিন্দুশাস্ত্র কঠিন নিয়মের প্রয়োগ দ্বারা দ্বিজাতির বর্ণবিশুদ্ধি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধ বিপ্লব ও তৎপরবর্তী ধর্মসংস্কারক ও সমাজসংস্কারকের মিলিত প্রয়াসে সেই বিশুদ্ধির যথেষ্ট অপচয় ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম নীচকে উচ্চে তুলিয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চকেও নীচে নামাইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

এই পুরাতন প্রাচীন আর্যজাতির আদিম নিবাস কোথায় ছিল, নিরূপণ দুষ্কর। অতি প্রাচীন কালে মধ্য-এশিয়ার পশ্চিমভাগ বিশাল গভীর মহাসাগরতলে নিমগ্ন ছিল, ভূবিদ্যা এই কথার প্রমাণ দেয়। পশ্চিমে ইউরোপখণ্ড ও পূর্বে এশিয়াখণ্ড, এই মহাসাগর কর্তৃক বিচ্ছিন্ন ছিল। মধ্য-ইউরোপ ধৌত করিয়া সমুদয় জলরাশি বিশাল নদ নদীর আকারে এই মহাসাগরে পতিত হইত; ইরান ও হিন্দুকুশের মালভূমি ধৌত করিয়া বড়-বড় নদী উত্তরমুখে প্রবাহিত হইয়া এই মহাসাগরে পতিত হইত। এই মহাসাগর প্রকৃতই তাৎকালিক ভূমধ্যসাগর ছিল। বর্তমান সাইবেরিয়া ও উত্তর-ইউরোপের উত্তরাংশ তখন উত্তর মহাসাগরের গর্ভে মগ্ন ছিল। ওই উত্তর মহাসাগরের সহিত হয়তো সেই পুরাকালীন ভূমধ্যসাগরেরও সংযোগ ছিল। বোধহয়, এই ভূমধ্যসাগরের পূর্বে উপকূলে প্রাচীন পীতকায় তাতার বা তুরাণ জাতি বসতি করিয়া পূর্ব-এশিয়াখণ্ডে আধিপত্য করিত। সেই ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূলে শ্বেতকায় আর্যগণ ধীরে-ধীরে আপন গার্হস্থ্য সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন। ক্রমশ তাঁহারা

পশ্চিমগামী হইয়া ইউরোপের পুরাতন অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিতেছিলেন, বা স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া মিশ্র সমাজ স্থাপন করিতেছিলেন।

কালক্রমে সেই ভূমধ্যসাগরের তলদেশ ভূগর্ভাগত শক্তির বলে উত্তোলিত হইতে থাকে। মহাসাগরের পরিধিসীমা ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে। উহার জলরাশি উত্তরমুখে ক্রমশ প্রবাহিত হইয়া উত্তর মহাসাগরে মিশিতে থাকে। অদ্যাপি ওবি নদী সেই পথে সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত সাইবেরিয়ার প্রান্তর ভেদ করিয়া উত্তরমুখে বহিতেছে। সাগরগর্ভ ক্রমশ উত্তোলিত হইয়া মহাদেশে পরিণত হইয়াছে। মহাসাগর ক্রমশ শুষ্ক হইয়া প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জল এখনও শুকায় নাই। বৈকাল ও বালকাশ, আরাল, কাস্পীয় ও কৃষ্ণসাগর অদ্যাপি স্থানে-স্থানে সেই প্রাচীন বিশাল মহাসাগরের পুরাতন অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বলগা ও দানিউব, আমুদরিয়া ও শিরদরিয়া অদ্যাপি পূর্বের মতো পশ্চিম-ইউরোপ ও দক্ষিণ-এশিয়া ধুইয়া লইয়া সেই মহাসাগরের গর্ভদেশ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই মহাসাগরের গর্ভ উত্তোলিত হইয়া স্থলে পরিণত হইলে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ সাধিত হয়। তখনই বোধ করি, পশ্চিমবাসী আর্যগণের কেহ-কেহ সেই স্থলপথে আসিয়া ইরানের উত্তরে পামিরের নিম্নে আরাল ও কাস্পীয়সাগরের তটবর্তী ভূভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই স্থানে ইঁহাদের প্রাচ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচ্যধর্মের অভ্যুদয় হয়। সেই সময়ে বা কিছু কাল পরে এশিয়াখণ্ডের অন্যান্য প্রাচীন জাতির সহিত তাঁহাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে মানবজাতির ইতিহাসের আরম্ভ। এশিয়াদেশে তখন পুরাতন বিবিধ মানবসম্প্রদায় উন্নতির পন্থায় আরোহণের চেষ্টা করিতেছিল। পূর্বে তাতার জাতি চিন-সাম্রাজ্য ও চিন-সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের তটবর্তী উর্বর প্রদেশে কালদীয় জাতি আপন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিল। দূরে নীল নদতটে সূর্যপূজার প্রচারের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল আবিষ্কারের আরম্ভ হইতেছিল।

মধ্য-এশিয়াতে জল যত শুকাইতে লাগিল, সমুদ্রগর্ভে উত্তোলিত হইয়া কোথাও অনুর্বর প্রান্তর কোথাও বা মালভূমি বা মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, অন্নার্থী পীতকায় উগ্রস্বভাব মোগলেরা ততই স্বস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্বে ও পশ্চিমে সরিতে লাগিল। বোধহয়, তাহাদেরই পীড়নে আর্যগণ দক্ষিণবর্তী হইয়া হিন্দুকুশের ও ইরানের মালভূমি আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়েন। প্রতাপান্বিত ব্যাবিলন ও নিনেবের ভূপতিগণ বহু দিন ধরিয়া তাঁহাদিগকে পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। পূর্বমুখে খাইবার ও বোলানের গিরিসংকট পার হইয়া কেহ-কেহ সপ্তসিন্ধুতীরে উপনীত হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতভূমিতে তখন ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ কোলারীয় ও দ্রাবিড়ীয় জাতি বাস করিত। ইহারা ক্রমশ আর্যসমাজে গৃহীত হইয়া আর্যদের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাণ্ড হিন্দু জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। পশ্চিমে আর্য মীদিক ও পারসিক কিছু দিন পরে ব্যাবিলনের ধ্বংস সাধন করিয়া বিক্রান্ত পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইহার পর হইতে সমুদয় ঐতিহাসিক ঘটনা। আর কল্পনা বা অনুমানের আশ্রয় লইতে হয় না। সুতরাং তাহা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে।

ইতিহাসে লেখে, পারসিকগণের সহিত উত্তরাঞ্চলবাসী সীদিয় বা শকজাতির সংঘর্ষ

প্রায় উপস্থিত হইত। গ্রিক ঐতিহাসিকেরা সীদিয় জাতির যেরূপ বিবরণ দেয়, তাহাতে অন্তত আকার অবয়বে তাহারা আর্যজাতিরই অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধহয়। হইতে পারে, তাহারা আর্য ও মোগল উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, অথবা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ মোগল বা তাতার জাতি। সম্প্রতি এই প্রশ্নের মীমাংসার উপায় নাই। আর্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পর শক জাতি পুনঃপুন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। প্রাচীন অযোধ্যাবাসী শাক্যজাতির কুলপ্রদীপ কুমার সিদ্ধার্থের সহিত এই শক জাতির কোনও সম্বন্ধ ছিল কি না, বলা যায় না। উত্তরকালে শক জাতি বাহলিকের গ্রিকগণের স্থাপিত যবনরাজ্যের ধ্বংস করিয়া ক্রমশ ভারতবর্ষে আপতিত হয়। মহারাজ কনিষ্কের সময় শক জাতির আধিপত্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শক জাতি আর্যবংশীয় ছিল কি না বলা যায় না; কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতবর্ষের সমাজে তাহাদের বাসচিহ্ন চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

মধ্য-এশিয়া এখনও শুকাইতেছে। এখনও সময়ে-সময়ে মধ্য-এশিয়া হইতে উগ্রস্বভাব পীতবর্ণ অনার্য দলে-দলে মানবের সভ্যতা ধ্বংস করিবার জন্য বাহির হয়। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে আতলান্তিক পর্যন্ত সমস্ত মহাদেশ তাহাদের ভয়ে চকিত ও সন্ত্রস্ত হয়। খ্রিস্টিয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে হূন জাতি পশ্চিমমুখে ধাবিত হইয়া ইউরোপবাসী আর্যগণের মধ্যে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করে, ও রোম-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইউরোপের ইতিহাস নূতন করিয়া আরব্ধ করে। ঠিক সেই সময়েই উহারা দক্ষিণে ও পূর্বে যাত্রা করিয়া পারস্য হইতে উজ্জয়িনী পর্যন্ত সমুদয় প্রদেশ কাঁপাইয়া তোলে। পরাক্রান্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যে তাহাদের কর্তৃক বিনষ্ট হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের গতিরোধ করিয়া ভারতবর্ষে আপাতত নাম চিরস্মরণীয় করিয়া যান।

আরও সাত শত বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসে অতীত হইল। পুনশ্চ মধ্য-এশিয়া পৃথিবীর উপপ্লবের জন্য বর্বরপাল প্রেরণ করিল। রোম-সম্রাট ও দিল্লির সম্রাট ও চিন-সম্রাট জঙ্গিস ও তৈমুরের নামে যুগপৎ কাঁপিতে লাগিলেন। আরও পাঁচ শত বৎসর পরে দেখিতে পাই, বোমের সিংহাসনে তুর্কি বসিয়া রোম-সাম্রাজ্যে আধিপত্য করিতেছে, ও চৌহান রাজপুতের সিংহাসনে মোগল বলিয়া হিন্দুর নিকট জিজিয়া আদায় করিতেছে।

বাংলা ব্যাকরণ

সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক বাংলা ব্যাকরণ আলোচনার ফলে সাহিত্য-সমাজে অনেকের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। অনেকে ভাবিতেছেন, বুঝি বা বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিনাশই এক দল লেখকের অভিপ্রায়। বাংলা-ব্যাকবণঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষদ-সভায় পঠিত বা পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের দুই জন সহকারী সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রণী হইয়া এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাংলা শব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইয়াছে। এই শ্রেণির শব্দের একটি তালিকা, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুও এই শ্রেণির শব্দ সংগ্রহের জন্য পাঠকগণকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই সকল শব্দের অধিকাংশই চলিত ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্তার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের অনেকেরই সাধুভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় সম্প্রতি স্থান নাই। হয়তো তাহাদের মধ্যে অনেক শব্দ এরূপ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অর্থাৎ ভদ্রসমাজে কথাবার্তায় বর্জনীয়। এই সকল 'অসাধু' শব্দের আলোচনা সকলের প্রীতিকর হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান সম্পাদক ব্যাকরণবিষয়ে অব্যবসায়ী; উপস্থিত বিতণ্ডায় আমার কোনও কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যখন 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' এই আন্দোলন উপস্থিতির জন্য বিশেষত দায়ী, তখন পরিষদ-সম্পাদকেরও আত্মসমর্থণ স্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। পরিষদ-পত্রিকার দ্বারা যদি ভাষার বিশুদ্ধিহানি বা সৌষ্ঠবহানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পত্রিকার সেই দোষ মার্জনীয় হইবে না। অতএব যখন এরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাব কোনও মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক, এবং যদি মূল থাকে, সর্বতোভাবে তাহার উৎপাটন বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই আতঙ্কের কোনও মূল নাই। বাদী ও প্রতিবাদী যাঁহারা বিতণ্ডায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তির তাৎপর্য গ্রহণ করিলেই বোধ হইবে, ইহার কোনো মূল নাই। সাহিত্য-পরিষদে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে সকলেই একমত; একমত না হইয়া উপায় নাই। অথচ সম্পূর্ণ ঐকমত্য সত্ত্বেও অবান্তর প্রসঙ্গ বহু পরিমাণে উপস্থিত হইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহা আশ্চর্যের বিষয় কিন্তু শাস্ত্রীয় বিতণ্ডায় বুঝি ইহাই সনাতন নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য-সমাজের সুধীগণ স্থূলত দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী; তাঁহারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখিতে, এমনকী, সেই পার্থক্য বাড়াইতে চাহেন। লৌকিক ভাষাকে তাঁহারা কতকটা কৃপার ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; লৌকিক ভাষা নইলে সংসারযাত্রা চলে না, তাই লৌকিক

ভাষাটা চলুক। কিন্তু সাহিত্যে তাহার আক্রমণ হইতে উর্ধ্বে অবস্থান করুক, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। লৌকিক ভাষাটা গৃহকর্মে ও সংসারযাত্রায় আবশ্যক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে উহাকে প্রশ্রয় দিতে নাই। সে সকল খাঁটি বাংলা শব্দ লৌকিক ভাষার সম্পত্তি, উহা সংস্কৃতমূলক হউক আর দেশজই হউক, উহাদের যথাসাধ্য বর্জ্জন করো, নতুবা সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা হইবে না।

অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার মধ্যে এই পার্থক্য রাখিতে চাহেন না। ইঁহারা সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ। ইঁহাদের প্রধান যুক্তি যে, ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় লোকশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তাহাই সার্থক ভাষা। যে ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিবে, আর মূর্খে বুঝিবে না, সে ভাষার অস্তিত্ব অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক। কাজেই সাহিত্যের জন্য একটা দুর্বোধ্য ভাষা এবং দৈনিক ব্যবহারের জন্য আর একটা সুবোধ্য ভাষা, এই দুই ভাষা রাখিবার দরকার নাই।

উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু-না-কিছু সত্য আছে; এবং বোধ করি, উভয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই শ্রেয় হইতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসই কতকটা এইরূপ মধ্যপথ অবলম্বনের সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্য সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সর্বসাধারণের জন্যই তাঁহাদের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যও সর্বসাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। সেকালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত-সাহিত্যের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ছিলেন; প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের বিরূপ থাকা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তাঁহারা বাংলা স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু যাঁহারা বাংলা লিখিতেন, তাঁহার সাধারণের জন্যই লিখিতেন, এবং সরল লৌকিক ভাষাতেই যথাসাধ্য লিখিতেন। প্রাদেশিক শ্রোতার ও পাঠকের জন্য লিখিত হইত বলিয়া উহা প্রাদেশিকত্ববর্জিতও হইত না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদেব জন্য প্রাদেশিকত্ববর্জিত সাধু বাংলা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাংলা রচনার ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা সাধু ভাষা হইল বটে ও সর্বতোভাবে প্রাদেশিকত্বরহিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানত উহা বিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্তমান রহিল।

অতঃপর যাঁহার বঙ্গভাষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণকে অগ্রণী দেখিতে পাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম এই ব্যাপারে স্মরণীয় হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

পরবর্তী কালে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের জন্য, এই সকল মনস্বী ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্রুপ ও তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন; কিন্তু ইহা সকল অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমান গদ্য-সাহিত্যের ভাষার ইঁহারা জন্মদাতা না হইলেও ভাষার শৈশব কালে বিনয়াধান রক্ষণ

ও ভরণের জন্য ইঁহারাই সর্বতোভাবে পিতৃস্থলীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম এতন্মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতশব্দবাহুল্য সম্বন্ধে দুই মত থাকিবারই কথা; এবং এক পক্ষ অপর পক্ষ কর্তৃক তিরস্কৃত হইবেন, তাহাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই। গদ্যরচনায় বাক্যবিন্যাসের ও বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসের রীতি, ইংরেজিতে যাহাকে syntax বলে, সেই পদবিন্যাসরীতির সংস্কার এই সকল পণ্ডিতের প্রতিভা হইতেই ঘটিয়াছিল; এবং এই মার্জিত বাক্যাবিন্যাস ও পদসন্নিবেশ-রীতি ব্যতীত উত্তর কালে বাংলায় গদ্যরচনা উৎকর্ষ লাভ করিত না। ইহার ত্রুটিতেই রাজা রামমোহন রায়ের রচনা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে নাই; এবং এইজন্যই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সারগর্ভ সন্দর্ভসকলও সাধারণের নিকট স্থায়ী সমাদর পায় নাই।

পক্ষান্তরে টেকচাঁদ ঠাকুরের ও হুতোমের বাংলা লৌকিক বাংলা হইতে অভিন্ন; কিন্তু উহাও যে সর্বত্র সাহিত্যের বাংলা হইতে পারে না, তাহাও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গিয়াছে।

উত্তর কালের লেখকগণ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্যের ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্বত্র গৃহীত ও আদৃত হইয়াছে। এই মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষার ক্ষমতা যে কত দূর-প্রসারী হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছে।

ফলে সাহিত্যের ভাষা কোন পথ আশ্রয় করিয়া চলিবে, তাহা কার্যত মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে; এ বিষয় লইয়া এখন বাদবিতণ্ডা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। তবে প্রাণবানের প্রাণের স্ফূর্তি অন্য কাজ না পাইলে ক্রীড়াচ্ছলেও আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়; তাই আমাদের সুধীগণের পাণ্ডিত্য যখন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ পায় না, তখন এই ক্রীড়া-বিতণ্ডার আশ্রয় লইয়া আপনার ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ করে মাত্র। বর্তমান কালে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কীরূপে ও কী পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে, এ বিষয়ে কার্যত যে বিশেষ মতভেদ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না, উভয় পক্ষই প্রয়োগকালে এক শ্রেণির ভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সামান্য প্রভেদ থাকে, তাহা ব্যক্তিগত। তবে যে তাঁহারা মধ্যে-মধ্যে দুই দলে সাজিয়া যুদ্ধার্থ দাঁড়ান, তাহা প্রকৃত যুদ্ধ নহে, যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ছাত্র ও বর্তমান অধ্যক্ষ মহামহোপধ্যায়ী শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পূর্বগামীদের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্যই যেন সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত-শব্দ প্রয়োগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, খাঁটি বাঙ্গালা 'তেল' শব্দ ব্যবহার করিলে যখন সকলেই বুঝে, এবং লৌকিক প্রয়োগে যখন সর্বদা 'তেল' শব্দেরই ব্যবহার আছে, তখন সাহিত্যের ভাষায় 'তৈল' ব্যবহার করিয়া লেখকের ও মুদ্রাকরের পরিশ্রম অকারণে বাড়ানোতে লাভ কী?

আমরাও বলি, ঠিক কথা; অকারণে ভাষাকে দুর্বোধ্য করিয়া লাভ কী? অথবা অকারণে পরিশ্রম বাড়াইবার বা সার্থকতা কী? 'তেল' শব্দ অশ্লীলও নহে, অশ্রাব্যও নহে; ভদ্রসমাজে

উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও তেলই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে 'তৈল' শব্দেরই ব্যবহার করিয়া ফেলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইব না।

কেন না, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা হইলেও উহার আর একটা উদ্দেশ্য আছে; উহাকে রসসৃষ্টি বলা যাইতে পারে। সাহিত্যের একটা অংশ আছে, তাহা সর্বসাধারণের জন্য নহে; উহা গুণীর জন্য ও অভিজ্ঞের জন্য ও কলাবতের জন্য ও সমঝদারের জন্য। শেক্সপিয়রের কাব্য সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই; সর্বসাধারণ উহার রসবত্তা আস্বাদনে অধিকারী নহে। কালিদাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সকল তৎকালে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমঝদারের জন্য রসসৃষ্টি। কুমারসম্ভবের "ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী" ইত্যাদি শ্লোকসপ্তক যত বার পড়িয়াছি, কী কারণে জানি না, আমার অন্তরিন্দ্রিয় মোহগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ওই কয়েকটি শ্লোকে বিশেষ কোনও ভাবগাম্ভীর্য আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার ললিতগম্ভীর পদবিন্যাসজাত ধ্বনি যে এই মোহোৎপত্তির একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ করি না।

সাহিত্যের একাংশের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি; আধুনিক বাংলা লেখকগণ মুখ্যত রসসৃষ্টির জন্য সংস্কৃতশব্দসম্পত্তির সাহায্য লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সুনির্বাচিত ও সুবিন্যস্ত সংস্কৃত শব্দের যেমন উদ্মাদনা আছে, তাহা প্রচলিত বাংলা শব্দের নাই। ইহার মূল অনুসন্ধান বর্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ইহার মুখ্য কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, এমনকী, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির সহিত অন্যান্য কারণ জড়িত আছে, সন্দেহ নাই।

সুতরাং সাহিত্যের ভাষার বলবিধানার্থ ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ সংস্কৃতশব্দ-সম্পদের গৌরব আছে ও চিরকালই থাকিবে, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ কিংবা দুঃখিত হইবার কিছু মাত্র কারণ নাই। সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। অকুণ্ঠিতভাবে সেই ভাণ্ডার লুঠ করিয়া আমাদের বাংলা ভাষার শরীরে অলঙ্কার পরাও, কেহই চৌর্যবৃত্তির জন্য দণ্ডিত করিবে না।

কিন্তু এইখানে একটু তর্ক আসিয়া পড়িবে। খাঁটি বাংলা শব্দ দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য সাধিত হইতে পারে না, ইহা স্বীকারে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন। ইংরেজি দৃষ্টান্ত সম্মুখে আছে। অনেক ইংরেজি লেখক ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য মুখভরা, গালভরা বিজাতীয় লাটিন শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন; প্রচলিত দৃষ্টান্ত জনসনের ভাষা। কিন্তু অনেকে আবার খাঁটি ইংরেজি, যাহাকে নিতান্ত homely আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াও মধুর ললিত সুন্দর রচনা করিয়াছেন। ইংরেজি বাইবেলের ভাষা, যাহাতে গালভরা লাটিন শব্দের স্থান নাই বলিলেই চলে, সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্যে সেই ভাষা ইংরেজি সাহিত্যে অদ্বিতীয়। লাটিন শব্দের আড়ম্বর না থাকিলেও টেনিসনের লকসি হলের ভাষায় ছন্দের ধ্বনি কানে মেঘগর্জনের মতো বাজিতে থাকে; সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দও অনেক সময় তাহার নিকট হার মানে। যাঁহারা প্রতিভাবান, যাঁহারা ক্ষমতাবান, যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের হাতে

ঘোষবান সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন নাই; চলিত বাংলা শব্দেরই সাহায্য লইয়া তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে রসসৃষ্টি করিতে পারেন। রসসৃষ্টি কেবল যে শব্দের গুণ হয়, এমন নহে; শব্দ-নির্বাচন ও শব্দ-বিন্যাসের গুণেও হয়। ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে সকলই সম্ভব। দৃষ্টান্তও যথেষ্ট আছে। চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা রস পাইতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা কৃপাপাত্র বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা হিন্দি মারাঠি প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, বাংলায় যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ চলে; হিন্দি প্রভৃতিতে চলে না। ভাষার এইরূপ নমনীয়তা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত শব্দ লইয়া যদি সম্পত্তি বাড়ানো চলে ও তাহাতে কোনও বিঘ্ন না থাকে, তাহাতে মন্দ কী? কিন্তু অনেকে হয়তো পালটাইয়া বলিবেন, উহা বাংলা ভাষার দুর্বলতার চিহ্ন। যে ভাষা অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ না করিয়া কাজ চালাইতে পারে না, সে ভাষা সেই পরিমাণে দুর্বল। বাংলা ভাষা যে দুর্বল, তাহার নানা লক্ষণ আছে। বাংলায় রাগ করা চলে না, গালি দেওয়া চলে না। রাগ করিতে হইলেই আমরা হিন্দির সাহায্য লই; ইংরেজিনবিশ লোকে ইংরেজি চালান। ইহা বাংলার পক্ষে উৎকর্ষের চিহ্ন নহে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধহয় এরূপ আবদার করিবেন না যে, সাহিত্যের ভাষায় গালি দেওয়ার কোনও কালে প্রয়োজন হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তখন সংস্কৃতশব্দভূষিত সাধু ভাষা কতটা সফল হইবে, বিবেচ্য বটে। চোরকে ডাকিবার সময় 'ওরে চোর' না বলিয়া 'অরে চৌর' বলিতে পণ্ডিত মহাশয়েরাও কুণ্ঠিত হইবেন। বিশুদ্ধিবিচারের পূর্বে বিশুদ্ধি ব াহাকে বলে, বুঝিবার চেষ্টা কত৪ব্য। বাংলা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ াছে। সাহিত্যের ভাষাতেও আছে; কথাবার্তার ভাষাতেও আছে। এই সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ; বাংলা ভাষা তাহা সংস্কৃতের নিকট পাইয়াছে। কতক উত্তরাধিকারসূত্রে অতি পুরাকাল হইতেই দখল করিয়া আসিতেছে; কতক আধুনিক কালে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগ্রহণ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই অব্যাহত ভাবে চলিবে, অব্যাহত ভাবে—কেন-না, ইহাতে সুদও লাগে না, এবং পরিশোধেরও প্রয়োজন নাই; উত্তমর্ণের দ্বার উন্মুক্ত; অধমর্ণেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

কিন্তু এই সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় বর্তমান, এইগুলিকে খাঁটি বাংলা শব্দ বলা যাইতে পারে। এই সকল শব্দ বাংলা ভাষার শরীরে অস্থিমজ্জায় সর্বত্র বর্তমান। ইহাদিগকে বর্জনের উপায় নাই। বাংলা লিখিতেই হউক আর বলিতেই হউক, ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। বরং যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ-পদরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অনেকটা বর্জন চলিতে পারে; তাহাদিগের স্থলে সংস্কৃত শব্দ বসাইতে পারা যায়। কিন্তু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের স্থলে কোনও উপায় নাই। এখানে তাহাদের আশ্রয় লইতেই হইবে; নতুবা বাংলা, এমনকী, 'বিশুদ্ধ' বাংলাও রচিত হইবে না।

"আমি মাছ খাইতেছি," এ স্থলে 'মাছ'-কে 'মৎস্য' ও 'খাইতেছি'কে 'ভোজন

করিতেছি'তে রূপান্তরিত করিয়া ভাষাকে 'বিশুদ্ধতর' করা যাইতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু এই 'আমি' এবং 'করিতেছি' এই দুয়ের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কোনও পণ্ডিতই নির্দেশ করিতে পারিবেন না। কেবল কথাবার্তায় সময়েই নহে, বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার সময়েও অব্যাহৃতির আশা নাই। অতএব বাংলা ভাষাতে কতকগুলি শব্দ থাকিবেই, যথা, 'আমি' ও 'করিতেছি', যাহা সংস্কৃতমূলক বটে, কিন্তু সংস্কৃত নহে, যাহা খাঁটি বাংলা।

এইরূপ খাঁটি বাংলা ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে আমাদের আধুনিক ভাষা গঠিত হইয়াছে। বাংলা শব্দরাশিকে এই দুই প্রধান ভাগে সাজাইতে পারা যায়। প্রশ্ন এই যে, এই দুই শ্রেণির মধ্যে কোন শ্রেণি 'বিশুদ্ধ' বাংলা?

কেহ হয়তো বলিবেন, সংস্কৃত শব্দগুলি বিশুদ্ধ, আর খাঁটি বাংলা শব্দগুলি অবিশুদ্ধ। এক শ্রেণির শব্দগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিতে পারা যায়; এই হিসাবে উহারা বিশুদ্ধ বটে। অন্য শ্রেণির শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সাধিতে পারা যায় না; এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই হিসাবে কি উহারা অবিশুদ্ধ? কখনোই না। 'আমি' ও 'করিতেছি' সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু বাংলা ভাষায় উহাদের বিশুদ্ধিপক্ষে কেহ এ পর্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত করেন নাই; কেননা, উহাদিগকে বর্জন করিয়া কেহই এ পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাংলা লিখিতে সমর্থ হন নাই।

কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাংলায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।

আবার অন্য পক্ষ বলিবেন, 'আমি' ও 'করিতেছি' এই দুইটি শব্দই বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ; 'মাছ' ও 'খাইতেছি' এই দুইটাও বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ। কিন্তু 'মৎস্য', ও 'ভোজন' এই দুইটি বিশুদ্ধ বাংলা নহে। এমনকী, 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুই শব্দ বাংলাই নহে; উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ; বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উহাদিগকে ধার করিয়াছে মাত্র। এই যুক্তিও ফেলিবার নহে। 'মৎস্য' ও 'ভোজন' শব্দ বর্জন করিয়া বাংলায়,—বিশুদ্ধ বাংলায়,—লেখা ও কথা কহা চলিতে পারে, কিন্তু 'আমি' ও 'করিতেছি' ইহাদিগকে বর্জন করিলে কোন বাংলারই অস্তিত্ব থাকে না।

এই তো গেল সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে। তারপর আছে কথাবার্তার ভাষা। কথাবার্তার ভাষাতেও দুই শ্রেণির শব্দ বর্তমান আছে; খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি বাংলা শব্দ। খাঁটি বাংলা নইলে কথা কহা অসাধ্য হয়; এবং খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সম্পূর্ণ বর্জনও বোধ করি অসাধ্য। যদি কাহারও সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকে, একবার বাজি রাখিয়া চেষ্টা করিবেন। বস্তুত কথাবার্তায় ভাষাতেও উভয় শ্রেণির শব্দেরই প্রচলন আছে; তবে উভয়ের সংখ্যার তারতম্য স্থানভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন।

প্রভেদ এই যে, কথাবার্তায় ভাষায় সর্বত্রই খাঁটি সংস্কৃতের অপেক্ষা খাঁটি বাংলার প্রচলন অধিক। অবশ্য স্থানভেদে ও কালভেদে ইতরবিশেষের কথা মনে রাখিতেই হইবে। সেকালের অপেক্ষা বোধহয় এ-কালে খাঁটি সংস্কৃতের প্রচলন বাড়িয়াছে। বোধহয় মাত্র, কেন না, নিশ্চয় জানি না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা দেখিয়া ও কালের গতি দেখিয়াই সেকালের চলিত ভাষার অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আবার একালেও শিক্ষিতসমাজে ও

ভদ্রসমাজে কথাবার্তার ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, অশিক্ষিতসমাজে বা নিম্নসমাজে তত হইতে পারে না। আবার পরদার বাহিরে যত হয়, পরদার আড়ালে তত হয় না। আবার এক প্রদেশে যত হয়, পণ্ডিতপ্রধান স্থানে যত হয়, পণ্ডিতহীন প্রদেশে তত হয় না। স্থানভেদে ও কালভেদে ও সমাজের স্তরভেদে ও বক্তার সাময়িক অবস্থাভেদে এরূপ ইতরবিশেষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ হইবারই কথা। এ দেশেও এইরূপ, অন্য দেশেও এইরূপ। ইহা 'সার্বভৌমিক' নিয়ম।

শিষ্টসমাজে সুধীগণ যখন শিষ্ট ভাষায় শিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেন, তখনও বোধ করি, তাঁহাদের কথাবার্তায় খাঁটি সংস্কৃত অপেক্ষা খাঁটি বাংলাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অশিক্ষিতসমাজে অশিষ্ট লোকে যখন জ্ঞানত অসাধু ভাষা ব্যবহার করে, তখন যে খাঁটি বাংলারই প্রাধান্য থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। কথাবার্তার ভাষায় খাঁটি বাংলারই প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা এজন্য দুঃখিত, তাঁহারা হয়তো আশা করেন যে 'প্রাচীনা বঙ্গভূমির এই পুরাতন সমাজের ভবিষ্যতে ঈদৃশ শুভ দিন আগমন করিবেক, যখন নিরক্ষর কৃষকবালক অবাধ্য ধেনুবৎসকে তিরস্কারকালে সাধুভাষার প্রয়োগ করিবেক, হট্টমধ্যে পণ্যবীথিকাপার্শ্বে উপবিষ্টা মৎস্যজীবিনী কলহব্যপদেশে অসাধ্বী ভাষার প্রয়োগে কুণ্ঠিতা হইবেক, এবং গৌড়ীয় ভাষার কোশগ্রন্থসকল প্রাকৃত শব্দের দুর্বহভারবহনের শ্রমস্বীকারে অব্যাহতি পাইবেক।' কিন্তু যতদিন সেই 'সুদূরপরাহত' শুভদিন 'উপাগত' না হইতেছে, ততদিন আমাদিগকে ম্লানমুখে স্বীকার করিতেই হইবে, কথোপকথনের ভাষায় 'প্রাকৃত গৌড়ীয়' শব্দের প্রাধান্য থাকিবেই থাকিবে।

এই কথাবার্তার ভাষার ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা শব্দের সংখ্যা কত? কেহই বলিতে পারেন না। সংখ্যানিরূপণের চেষ্টাই এ পর্যন্ত হয় নাই। সংখ্যানিরূপণ অতি বৃহৎ ব্যাপার; কেন-না, অসংখ্য প্রাদেশিক শব্দ, যাহা দেশের সর্বত্র প্রচলিত নাই, যাহা সংকীর্ণ প্রদেশমধ্যে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্রেণির মধ্যে আসিবে। আবার অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ, যাহা চাষার ব্যবসায়ে, তাঁতির ব্যবসায়ে, মুদির ও ময়রার ব্যবসায়ে, আদালতে, জমিদারি সেরেস্তায়, এইরূপ নানা স্থানে প্রচলিত, তাহা সেই-সেই শ্রেণিবিশেষের মধ্যেই চলিত আছে; অপর সাধারণের নিকট সেই সকল শব্দরাশি পরিচিতও নহে এবং সুবোধ্যও নহে। কিন্তু সেই শব্দরাশিও এই শ্রেণির বাংলা শব্দের মধ্যেই আসিবে। এই বিশাল শব্দসমূহের সংখ্যানির্দেশ অল্প জনের বা অল্প দিনের কাজ নহে। বহু কালের ও বহু জনের সমবেত চেষ্টায় এই কার্য কতক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাংলা ভাষার ধাতু কী, মজ্জা কী, শোণিত কী, অস্থি কী, তাহার নিরূপণ হইবে না।

এই শব্দরাশির মধ্যে কতিপয় শব্দ বিদেশ হইতে বিজাতীয় লোকের সংস্রবে বাংলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও সাহিত্যের মধ্যে তুলনায় মুষ্টিমেয়। অবশিষ্ট সমস্ত শব্দ আবার দুই শ্রেণির। কতক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়া ওই সকল শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দই একবারে বিকৃত হইয়াছে, অথবা সংস্কৃত শব্দ ক্রমশ প্রাচীন প্রাকৃতে ও প্রাচীন প্রাকৃত হইতে আধুনিক প্রাকৃতে বা বাংলায় পরিণত হইয়াছে। এক শ্রেণির পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মতে

সংস্কৃত ভাষা, যাহা পাণিনি প্রভৃতি আচার্যেরা আলোচনা করিয়াছেন ও যাহা প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে শরীরবদ্ধ হইয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা কস্মিনকালে জনসমাজে লোকমুখে কথাবার্তার ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। কাজেই তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাঙিয়া প্রাকৃত বা বাংলা উৎপন্ন হয় নাই; প্রাচীন কালে প্রচলিত কোনও লৌকিক ভাষা বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত বাংলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সে বিচারে এখানে প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে একটা প্রাচীন ভাষা ছিল সন্দেহ নাই; সেই ভাষাই কালসহকারে বিকৃত হইয়া প্রাচীন প্রাকৃতে ও আধুনিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার কেহ করিবেন না। আমরা যাহাকে সংস্কৃতমূলক বাংলা শব্দ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই এইরূপে উৎপন্ন।

কিন্তু এই সংস্কৃতমূলক খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণির বাংলা শব্দ আছে, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোনও সম্পর্কই নির্ণয় করিতে পারা যায় না; সংস্কৃত কোনও শব্দের সহিতই তাহাদের জাতিগত সম্বন্ধ নাই; এই সকল শব্দকে দেশজ শব্দ বলা হয়। এই শ্রেণির শব্দের মূল কী, আমরা জানি না। হয়তো সংস্কৃত শব্দই এত বিকার লাভ করিয়াছে যে, এখন আর তাহাদের চেনা কঠিন। পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ দেশজস্বরূপে গৃহীত বহু শব্দের সংস্কৃত মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা প্রকৃতই দেশজ অর্থাৎ যাহা সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

হইতে পারে না, বাংলা দেশে অনার্য, মোগল, দ্রাবিড় বা অন্য কোনও বংশের আদিম নিবাসী যাহারা ছিল. তাহাদেরই ভাষা হইতে এই সকল শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। আর্যাধিকারের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব আর্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয়তো এখনও নিম্নশ্রেণির লোকের ভাষা ও আরণ্য ও পার্বত্য লোকদিগের ভাষা আলোচনা করিলে অনেক খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা এ পর্যন্ত কেহই করেন নাই।

কোন শ্রেণির শব্দ সংখ্যায় অধিক, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দেশজ শব্দের ব্যবহার কেবল লোকমুখেই চলিত, এমন নহে; সাহিত্যের ভাষাতেও উহারা প্রচুর পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে। সাহিত্যে উহাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু বহু দেশজ শব্দ যে সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহা সত্য কথা; এবং তাহাদের প্রবেশ নিষেধেরও উপায় দেখি না।

ফলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষা উভয়েই খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা শব্দ বিদ্যমান। কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। আবার খাঁটি বাংলা শব্দের মধ্যে কতক সংস্কৃতমূলক, এবং কতক দেশজ; এবং এই উভয় শ্রেণির বাংলা শব্দই সাহিত্যের ভাষায় ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক বাংলা শব্দের প্রাধান্য চলিত ভাষায় অধিক; সাহিত্যের ভাষায় উহাদের প্রাধান্য নাই, থাকা উচিতও নহে। আধুনিক কালের যে সকল গ্রন্থকার সাবধান, তাঁহারা সাধ্যমতো প্রাদেশিকত্ব বর্জনেরই চেষ্টা করেন। কেন না, এ-কালে সকলেই সমস্ত দেশের জন্য লিখিয়া থাকেন, প্রদেশ-বিশেষের জন্য কেহ লেখেন না।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় আর একটা পার্থক্য আছে, উহা উচ্চারণ লইয়া।

যেমন 'করিতেছি', 'খাইতেছি', এই দুইটা খাঁটি বাংলা ক্রিয়াপদ; ইহারা সাহিত্যে ওই আকারে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কথা কহিবার সময় আমরা সুবিধামতো উচ্চারণের জন্য 'করছি' 'খাচ্ছি' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। এই উচ্চারণ আবার প্রদেশভেদে বিভিন্ন; অতএব সাহিত্যের ভাষায় এই প্রাদেশিকত্বের বর্জনই প্রার্থনীয়।

দ্বিবিধ বাংলায় আলোচনা করিতেছি,—সাহিত্যের বাংলা ও লৌকিক বাংলা। লৌকিক বাংলা অর্থে লোকমুখে প্রচলিত কথাবার্তার বাংলা। দেখা গেল, উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট মিল আছে, আবার কতক পার্থক্যও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ যত ব্যবহৃত হয়, লৌকিক ভাষায় তত হয় না। সংস্কৃতমূলক ও দেশজ, উভয়বিধ খাঁটি বাংলা শব্দেরই লৌকিক ভাষায় প্রাধ্যান্য আছে। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক শব্দের ও প্রাদেশিক উচ্চারণের ভেদ লৌকিক ভাষায় যতটা বর্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নাই, এবং থাকা উচিতও নহে।

উভয় শ্রেণির শব্দ ভাষায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয় না। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ আধুনিক বাংলায় সাহিত্যের ভাষায় ও সম্ভবত কথাবার্তায় ভাষাতেও পূর্বাপেক্ষা বহুতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে ,সন্দেহ নাই। কেহ-কেহ বলিবেন, ইহা দুঃখের বিষয়। অনেকে আবার বলিবেন, ইহা সুখের বিষয়। আমিও বলি, ইহা সুখের বিষয়। যাহাই হউক, সে সুখ-দুঃখের কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক বাংলায় খাঁটি সংস্কৃতের ব্যবহার বাড়িয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা; ইহাতেও কাহারও সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের এত প্রচলন ছিল না, ইহা সত্য কথা।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ, যাহা একালে সম্মার্জনীসংস্কৃত হইয়া পরিমার্জিত বা অর্ধমার্জিত ও অমার্জিত অবস্থায় বর্তমান আছে, তাহাই তাহার সাক্ষী। সেদিন পরিষদ-সভায় কোনও সদস্য বলিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইতর সাধারণের জন্য পুস্তক লিখিতেন, পণ্ডিত জনের জন্য লিখিতেন না, সেই জন্যই তাঁহারা অসাধু শব্দের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণটা খুবই সঙ্গত; বস্তুতই চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সাধারণের জন্যই সাধারণের বোধ্য ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন; এমনকী, ভারতচন্দ্রেরও সেইরূপ অসাধু প্রবৃত্তি যে একবারেই ছিল না, এমন বলা যায় না। কারণ যাহাই হউক, প্রাচীন সাহিত্যে খাঁটি বাংলা শব্দেব প্রচুর প্রয়োগ ছিল, একালের অপেক্ষা বহুলতর প্রয়োগ ছিল। সেই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা বর্তমানে অনুকরণীয় না হইতেও পারে; কিন্তু সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা বাংলা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই অসাধুভাষাবহুল সাহিত্যের লোপ হউক, এ ইচ্ছা বোধহয় কেহই করেন না। বরং তাহার উদ্ধার বিধানের জন্যই আজকাল একটা উৎকট আগ্রহ দেখা যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষদ লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আরও একটু স্পষ্ট বলা ভালো। বাংলার প্রাচীন লেখকেরা যে পণ্ডিতসেবিত সাধুভাষা ব্যবহার না করিয়া ইতরজনসেবিত ইতরজনবোধ্য অসাধু ভাষার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা যতই পরিতৃপ্ত হই না কেন, তাঁহাদের রচনা বাংলা সাহিত্য হইতে নির্বাসিত করিতে কেহই চাহিবেন না। আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পনেরো আনা লুপ্ত হইলেও আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না; কিন্তু যদি কেহ চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের সাহিত্য হইতে নির্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আমরা তাঁহার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করিব।

ফলে আধুনিক ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা যত শব্দের ব্যবহার আছে, সকলই বাংলা। সম্পূর্ণ কোশগ্রন্থ সংকলনকালে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না।

কেহ হয়তো বলিবেন, কোশগ্রন্থের উদ্দেশ্য তো অর্থ বুঝানো। দুর্বোধ্য শব্দই অভিধানে স্থান পাইবে। সুবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে, অর্থাৎ অধিকাংশ খাঁটি বাংলা শব্দ অভিধানে প্রবেশ করাইয়া অভিধানের কলেবর অকারণে ফাঁপাইবার প্রয়োজন কী?

এ প্রশ্নেরও বোধ করি উত্তর আবশ্যক। প্রথমত সকল শব্দ সকলের নিকট সুবোধ্য নহে; আপনার নিকট যাহা সুবোধ্য, আমি তাহা হয়তো বুঝি না। এ স্থলে সকল শব্দের সমাবেশই নিরাপৎ; সংকলনকর্তার বিবেচনার উপর ভার দিলে অনেক শব্দ এড়াইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সংকলনকালে এই আপত্তি উঠে না; তখন সরল ও দুরূহ সকল শব্দই নির্বিশেষে গৃহীত হয়। সংস্কৃত কোশকারেরাও সরল সর্বজনবোধ্য শব্দগুলিকে কোশগ্রন্থে স্থান দিতে আপত্তি করেন নাই। তৃতীয়ত কেবল শব্দের তাৎপর্য বোঝানই অভিধানের উদ্দেশ্য নহে। অভিধানে অর্থবিচারে সহিত ব্যুৎপত্তিবিচারেরও প্রথা আছে। যে শব্দের অর্থ সকলেই জানে, সে শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে কীরূপে হইল, তাহা সকলে না জানিতে পারে। চতুর্থত, অভিধানের আরও একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভাষার সর্বাঙ্গ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ না করিলে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দরাশির সংকলন আবশ্যক। লোকসংখ্যাকর্মে বা সেনসাস ব্যাপারে যেরূপ রাজাধিরাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত মনুষ্য মাত্রেরই একই মূল্য, রাজচক্রবর্তীকেও যেমন এক জন লোক বলিয়াই ধরা যায় ও লোকগণনার তালিকায় তিনি তাহার অধিক স্থান পান না, এখানেও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সমান আদর।

কাজেই বাংলা সাহিত্য নামে পরিচিত সমস্ত সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলা যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই সংকলন আবশ্যক; সকলই বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত। অর্থবিচার ও ব্যুৎপত্তিবিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তালিকাসংকলন অসাধ্য ব্যাপার; তবে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কোনও শব্দকেই বর্জন করিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান।

মাইকেল অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পূর্বে কেহই তাহার ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ ব্যবহারে সাহসী হন নাই। 'ইরম্মদ' ও 'মহেষ্বাস' শব্দের অর্থ কী, প্রশ্ন করিলে অনেকেকেই স্থিরনেত্র হইতে হইবে। কিন্তু কী করা যাইবে! মাইকেল যখন মেঘনাদবধে তাহাদের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মেঘনাদবধের নাম বাংলা বহির তালিকা হইতে উঠাইতেও যখন আমরা সম্মত নহি, এবং ভবিষ্যতেও অপর কোনও লেখক কর্তৃক ওই-ওই শব্দের প্রয়োগ নিবারণের জন্য আমরা কোনও আইনই খাটাইতে পারিব না, তখন ওই দুই শব্দকে বাংলা ভাষায় গৃহীত খাঁটি সংস্কৃত শব্দস্বরূপে বাংলা অভিধানে স্থান দিতেই হইবে। সেইরূপ প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোনও লেখক যদি কোনও বাংলা পুস্তকে 'গলদ' ও 'বলদ' ও 'গতর' শব্দের ব্যবহার করিয়া ভাষাকে কলংকিত

করিয়াই থাকেন, তাঁহার এই সাধুবিগর্হিত কার্য যতই নিন্দনীয় হউক না, ওই কয়টি গ্রাম্য শব্দকে অভিধানে স্থান না দিলে উপায় নাই।

বাংলা ভাষায় এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ অভিধান সংকলিত না হইলে বলিতে পারা যাইবে না যে, কোন শ্রেণির শব্দের সংখ্যা আমাদের সাহিত্যের ভাষায় অধিক।

ফলে বিশুদ্ধ শব্দ লইয়া এইরূপ কথা-কাটাকাটি যুগ ব্যাপিয়া চালানো যাইতে পারে। 'বিশুদ্ধ' শব্দটা উভয় পক্ষ এক অর্থে প্রয়োগ করেন না। আপন-আপন অর্থে উভয় পক্ষই ঠিক। বিবাদের হেতু না থাকিলেও বিবাদ চালানো যায়। আমি 'বিশুদ্ধ' শব্দটাকেই বর্জন করিয়া 'খাঁটি' শব্দ ব্যবহার করিব। আশা করি, 'খাঁটি' শব্দটির অবিশুদ্ধির জন্য পণ্ডিতেরা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

দাঁড়াইল এই। বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ কোশগ্রন্থে দুই শ্রেণির শব্দ থাকিবে,—(১) 'খাঁটি' সংস্কৃত ও (২) 'খাঁটি' বাংলা। রচনার ভাষায় ও কথার ভাষায় দুই শ্রেণির শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে। চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাংলার সম্পূর্ণ পরিহার একবারে অসাধ্য। খাঁটি সংস্কৃতের পরিহার কতক চলিতে পারে বটে; কিন্তু সেইরূপ পরিহার কর্তব্য বটে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

তার পরের কথা, কোন শ্রেণির শব্দ ভাষামধ্যে সংখ্যায় অধিক? বলা কঠিন; বাংলা ভাষার শব্দসমূহের সংখ্যা নিরূপণে এ পর্যন্ত কেহ হঠাৎ সাহসী হয়েন নাই। বাংলার সম্পূর্ণ কোশগ্রন্থ সঙ্কলিত হয় নাই। যে সকল অভিধান প্রচলিত আছে, তাহা সংস্কৃত কোশগ্রন্থ হইতে সংকলিত; তাহাতে এমন খাঁটি সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ আছে, যাহা আজি পর্যন্ত বাংলা ভাষায়,—'বিশুদ্ধ' বাংলা ভাষার রচনাতেও ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দের যেগুলি নহিলে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা অচল হয়,—বিশুদ্ধ বাংলা রচনাও অসাধ্য হয়, তাহাদের অধিকাংশই সেই সকল কোশগ্রন্থে স্থান পায় নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি সাহিত্য-পরিষদের অনেকেরই মনে আছে, সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় একটা পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টায় কোনও ফল নাই। যে অংশের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাহা লৌকিক ভাষার নিকটবর্তী হইবে; এবং যে অংশের উদ্দেশ্য শিক্ষিতের জন্য রসসৃষ্টি, অথবা অভিজ্ঞের সহিত জ্ঞানালোচনা, তাহাও লৌকিক ভাষা হইতে দূরবর্তী হইবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কেবল এ দেশে কেন, উহা সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। সকল দেশেই এই প্রভেদ আছে ও থাকাই উচিত ও থাকিবেই। তজ্জন্য বাদানুবাদ বৃথা। লেখকগণও ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি অনুসারে কেহ বা সাহিত্যের ভাষাকে লৌকিক ভাষার অভিমুখে, কেহ বা বিমুখে লইয়া যাইবেন, সে বিষয়েও বাদানুবাদ বৃথা। সকলের ভাষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে না; কখনও হয় নাই ও হওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। তাহা হইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের নাশ হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত রুচিভেদের জন্য কোনও নিয়ম-বন্ধন চলে না। যাঁহারা নিয়মের বন্ধনে ব্যক্তিগত রুচিকে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই নিষ্ফল শ্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত প্রতিভাকে নিয়মরজ্জুতে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই মৃণালতন্তু দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধিতে চাহেন।

সুতরাং এ বিষয়ে নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, উপদেশদান নিরর্থক ও বাদানুবাদ নিতান্তই নিরর্থক। আপনার রুচি ও আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে, পাঠকের রুচি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কেহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের, কেহ বা বাংলা শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইবেন, ইহাই নিয়ম। অন্য সংকীর্ণ নিয়ম জারি কবিলে তাহা কেহ মানিবে না।

যদি কোনও সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা চলে, তাহা এই। ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করিবে, এবং নিতান্ত অকারণে ভাষাকে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য করিবে না।

আর যাহা প্রকৃতই গ্রাম্য অর্থাৎ slang, ভদ্রসমাজ যাহার উচ্চারণে কুণ্ঠিত, যাহা প্রকৃতই অসাধু অশিষ্ট ও অশ্লীল, তাহা সর্বতোভাবে বর্জন করিবে। এই নিয়মের প্রতি কোনও পক্ষেরই আপত্তি হইবে না।

এতটা বাক্যব্যয়ের পর বোধ করি, আমি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, এতটা বাক্যব্যয়ের কোনও প্রয়োজনই ছিল না; কেন না, যাহা এতটা পরিশ্রমের পর প্রতিপন্ন করা গেল, তাহা সর্ববাদীসম্মত সত্য; তাহাতে কাহারও কোনও মতভেদ নাই।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বর্তমান ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বাক্যব্যয় একবারে অপ্রাসঙ্গিক। যে মূল বিষয় লইয়া বর্তমান বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই অবান্তর কথাটার প্রসঙ্গ মাত্র তুলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কেন না, মহামহোপাধ্যায়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাংলা ভাষার ব্যাকরণের অভাব দেখিয়া সেই ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। কোন ভাষা ভালো, কোন ভাষা মন্দ, যে প্রসঙ্গই তাঁহারা উঠান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি খাঁটি বাংলা শব্দের অনুকূল, এইরূপ একটু আভাস আছে বটে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত কথা ও অবান্তর কথা। তিনি স্বয়ং খাঁটি বাংলায় অনুরাগী হইতে পারেন ও অন্য লেখককে সেই পথ অবলম্বনে উপদেশ দিতে পারেন; অন্যে সেই পথ অবলম্বন করিলে তিনি সুখী হইতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহার সহিত অন্যের মত না মিলিতে পারে। কিন্তু এই অবান্তর প্রসঙ্গের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উত্থাপিত মূল প্রসঙ্গকে বাগজালে আচ্ছন্ন করা উচিত নহে। মূল প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণের গঠনপ্রণালী লইয়া; সাহিত্যের ভাষার গঠনপ্রণালী লইয়া নহে।

অন্যতর দ্বন্দ্বী রবীন্দ্রনাথ ভাষার সৌষ্ঠব বিচারের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় তাঁহার যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার কোনও স্থলে এমন আভাস মাত্র নাই, যাহাতে সংস্কৃতের পক্ষপাতীদের মনে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে। তিনি বর্তমান ক্ষেত্রে কোনও স্থলে বলেন নাই যে, সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বর্জন করিবে বা সংস্কৃত শব্দের প্রতি বিরাগ দেখাইবে। তিনি স্বয়ং রচনাকালে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আধুনিক রচনায়—গদ্য রচনায় ও কবিতা রচনায় সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য দেখিয়া হয়তো তাঁহার অনেক বন্ধু ভীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, বর্তমান বিবাদক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ও সাহিত্য-পরিষদ-

সভায় তাঁহার যে মত এ পর্যন্ত প্রবন্ধমধ্যে বা বক্তৃতামধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কুত্রাপি এমন কোনও অনুরোধ নাই যে, তোমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিও না বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করিও না। তিনি কেবল মাত্র কতিপয় বাংলা শব্দ,—খাঁটি বাংলা শব্দ সংকলন করিয়া 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং ওই সকল শব্দের তাৎপর্য লইয়া, ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ও অপরকে সেইরূপ আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন মাত্র। ওই সকল শব্দের সকলগুলিই খাঁটি বাংলা শব্দ; কতক সংস্কৃতমূলক, কতক বা দেশজ। কতকগুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, কতক হয়তো সাহিত্যে এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই; কতকগুলি হয়তো প্রকৃতই গ্রাম্য অপশব্দ, উহাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিতও নহে। কিন্তু তিনি তাহাদের অর্থ বিচার করিয়াছেন; তাহারা কোথা হইতে আসিল, কীরূপে সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ কথাও বলেন নাই যে, তোমরা সাহিত্যের সাধু ভাষায় এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিয়ো। তাঁহার সকল প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ দুরভিসন্ধির স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চিহ্ন আমি কোথাও পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ পরিষদ-পত্রিকাতে খাঁটি বাংলা শব্দেরই ব্যাকরণবিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন। ইহাও স্বীকার্য যে, কেই সকল শব্দের মধ্যে অনেক অসাধু শব্দ রহিয়াছে, অনেক গ্রাম্য শব্দ রহিয়াছে, যাহা সাধু সাহিত্যে আদৃত হয় না ও আদৃত হইবে না। বস্তুতই তন্মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকৃতই slang, অপভাষা ও গ্রাম্য ভাষা। এই অপভাষার আলোচনাই অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা হয়তো মনে ভাবিয়াছেন, এই সকল শব্দের প্রতি লেখকের একটা আন্তরিক আকর্ষণ আছে ও অনুরাগ আছে; তিনি ব্যাকরণ আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া ওই সকল অপশব্দ সাহিত্যে চালাইতে চাহেন, এবং যদিও সম্প্রতি উহাদের ব্যবহারে সাহসী হন নাই, ভবিষ্যতে কোন দিন ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ তিনি যখন মাছের তেলের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তখন কোন দিন মাছের তেল মাখিয়াই ফেলিবেন; যখন শেয়ালের জীবতত্ত্ব আলোচনা কবিতেছেন, তখন কোন দিন শেয়াল পুষিয়া দরজায় রাখিবেন! লেখকের স্পষ্ট ও তীব্র ভাষা সত্ত্বেও যদি কাহারও এইরূপ আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কা দূর করিবার উপায় নাই। পরিষদ-সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, যাহা তৎপরে 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হইয়াছে, এবং পরিষদে বাদপ্রতিবাদের উত্তরে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর যে ওরূপ সন্দেহ কীরূপে থাকিতে পারে, তাহা আমার বুদ্ধিতে কুলায় না। অথচ দেখিতেছি, অনেকেরই সন্দেহ যায় নাই। এখনও অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তর্ক করিতেছেন, সাহিত্যের ভাষায় গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ বাঞ্ছনীয় নহে; যেন রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন। এ স্থলে কোনও উপায় দেখি না। রবীন্দ্রনাথ বিতণ্ডায় নামিয়া অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহাদের যদি অনুভূতির সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বস্তুতই উপায় নাই। ত্বগভেদাৎ শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি, আত্মনো যে ন জানন্তি, তাঁহাদের প্রতি বাক্যপ্রয়োগ নিরর্থক।

সাহিত্যে অপভাষার ব্যবহার করিব কি না, এ কথাটাই বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেন না, কেহ তাহা বলে নাই। কিন্তু অপভাষার ব্যকরণ আলোচনা করিব কি না, ইহা প্রাসঙ্গিক বটে। এতক্ষণ পরে যে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণার অবসর পাইলাম, ইহাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারতী' পত্রে বলিয়াছেন, এই সকল শব্দগুলির অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের আলোচিত শব্দগুলির অধিকাংশই অতি অকিঞ্চিৎকর; কেন না, সাধু ভাষায় ও সাধু সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার দোষাবহ; কাজেই উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তী সংখ্যার 'ভারতী'-কে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় নানাভাষাবিৎ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, চলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, ব্যাকরণ রচনা দ্বারা চলিত ভাষার স্বাধীন গতি ও উন্নতি রুদ্ধ হইতে পারে।

ফলে দুই জন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত দুই বিভিন্ন হেতুবাদ দর্শাইয়া বলিতেছেন, চলিত বাংলার অর্থাৎ লৌকিক বাংলার ব্যাকরণ আলোচনা আবশ্যক নহে। রবিবাবু যেদিন পরিষদ-সভায় কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেদিন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকটা আভাসে বলিয়াছিলেন, যে, এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনার এখনও সময় আসে নাই। ইহাকে একটা তৃতীয় হেতুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ হেতুবাদের আলোচনা অবশ্যক।

কিন্তু তৎপূর্বে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কেন না, ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কী, সেইটা নির্ধারিত হইলে বিচারের পথ অনেকটা সোজা হইতে পারে। ব্যাকরণ শব্দের অর্থেও একটু গোল আছে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ পদের বিশ্লেষণ; ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রত্যেক পদকে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখাইতে চাহেন, কীরূপে কোন মূল ধাতু হইতে পদটি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উহার উপাদানগুলি কী প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়া উহার শরীরটি গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখানোই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। ইংরেজিতে যাহাকে Etymology বলে, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। কিন্তু আজকাল ব্যাকরণ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয়; উহা ইংরেজি গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপে ব্যবহৃত হইতেছে; তন্মধ্যে Etymology ব্যতীত Syntax বা বাক্য নির্মাণ প্রকরণ, ছন্দঃপ্রকরণ, এমনকী, অলংকার-প্রকরণ পর্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে। আমরা ব্যাকরণ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিলাম। তাহাতে বক্তব্যের কোনও ক্ষতি হইবে না।

মনুষ্যের ভাষা বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, ভাষার গঠনপ্রণালীতে কতকগুলি নিয়ম আছে। শব্দের গঠনে, পদের গঠনে ও বাক্যের গঠনে এইরূপ নিয়মের আবিষ্কারই ব্যাকরণের (অর্থাৎ গ্রামারের) উদ্দেশ্য। এইরূপ নিয়ম যে ভাষা মাত্রেই বর্তমান, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কোনও নিয়ম না থাকার নাম সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা; এবং যে ভাষা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, কোনও নিয়মই যাহা মানে না, তাহা মনুষ্যের ব্যবহার্য নহে। অতি অসভ্য জাতির ভাষাকেও বিশ্লেষণ করিলে সেই ভাষার অবস্থানুরূপ নিয়মের আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অসভ্য জাতির ভাষারও ব্যাকরণ গঠিত হইতে পারে। যে ভাষায় নিয়ম আদৌ

নাই, সে ভাষা কেহ শিখিতে পারে না, কাহাকেও শিখানো যায় না; তাহা ভাষাই নহে। কোনও নিয়ম থাকিলেই সেই নিয়মের আবিষ্কার যিনি করিবেন, তিনিই সেই ভাষার বৈয়াকরণিক।

ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটি বিজ্ঞান শাস্ত্র; ব্যাপক অর্থে ইহাকে ভাষাবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশ বোধ করি সর্বপ্রধান অংশ, যাহা Etymology অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাকরণ, তাহা আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে পরাকাষ্ঠা পাইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনির হস্তে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনিই জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক; তাঁহার তুল্য আর কেহ জন্মায় নাই। মেকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে, একলিপস সকলের অগ্রণী; অন্যের স্থান বহু দূরে। পাণিনির বহু পূর্ব হইতে আচার্যেরা ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংস্কৃত-ভাষাবিজ্ঞান গঠিত করিতেছিলেন; পাণিনি সেই বিজ্ঞানকে প্রায় সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা দান করেন। তারপর যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা তাহারই বার্তিক ও ভাষ্য ও টীকা। আধুনিক বৈয়াকরণেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সেই প্রাচীন কালের ভাষাবিজ্ঞানের বালকপাঠ্য পুস্তক মাত্র।

পাণিনি প্রভৃতি আচার্যেরা ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া সে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার পক্ষে প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান; তাহাই প্রকৃত ব্যাকরণ। আমরা বালকগণকে ও অনভিজ্ঞকে ভাষা শিখাইবার জন্য যে সকল ব্যাকরণ ঘটিত পুস্তক লিখি, তাহা বৈজ্ঞানিক পুস্তক বটে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস, ব্যাকরণকারেরা যে নিয়ম বাঁধেন, ভাষা সেই নিয়মে চলে। মিথ্যা কথা। কোনও ব্যাকরণকারের সাধ্য নহে যে-কোনও নিয়ম বাঁধেন, কোনও আইন জারি করেন। ভাষার নিয়ম ব্যাকরণকারের বৃদ্ধপিতামহগণের জন্মের বহু পূর্ব হইতে বর্তমান থাকে; তিনি সেইগুলি আবিষ্কার করিয়া অন্যকে দেখাইয়া দেন মাত্র। নিয়ম বাঁধার কথা উঠিতেই পারে না।

বর্তমান কালে বাংলা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোনখানিও প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাংলা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই, কোন ভবিষ্যতে হইবে, তাহাও কেহ জানে না। উহা সংস্কৃতের আদর্শে লিখিত, এ কথার এই অর্থ যে, উহা বাংলা ব্যাকবণ নহে; উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ।

বর্তমান ক্ষেত্রে যাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল বালকপাঠ্য ব্যাকরণ লইয়াই যেন ব্যাকুল। যেন ব্যাকরণ শাস্ত্র বালক ভিন্ন বৃদ্ধের জন্য আবশ্যক নহে। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখানো নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা; ভাষার ভিতরে কোথায় কী নিয়ম প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইতে হইবে; তাহার পর উহা অন্যকে শেখানো যাইতে পারিবে। বাংলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেন-

না, বাংলা ভাষার মধ্যে কী নিয়ম আছে না-আছে, তাহা কেহই আলোচনা করেন নাই। সে সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই, তখন বাংলার ব্যাকরণ এখন বর্তমানই নাই। ব্যাংলার ব্যাকরণ কী পদার্থ, তাহা কেহই জানেন না; রবীন্দ্রনাথও জানেন না, পণ্ডিত শরৎচন্দ্রও জানেন না। কেহই যখন জানেন না, তখন অন্যকে শিখাইবেন কী? কাজেই পরকে শিখাইবার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গ এখন উঠিতেই পারে না। এখন যাহাকে বাংলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাংলা ব্যাকরণ নহে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যাহা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, উহা সেই অংশের ব্যাকরণ। সেই ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না; সে-কালের আচার্যেরা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা যদি শিখিতে চাই, তাঁহাদের পুঁথি পড়িলেই হইবে; অন্যে যদি শিখিতে চায়, সেইখানে বরাত দিলেই হইবে। বালকেরা যদি শিখিতে চায়, তাহাদিগকে মূল সংস্কৃত হইতে অথবা তাহার বাংলা অনুবাদ হইতে শিখাইলেই চলিবে। বালকদিগের উহা পড়াইয়ো না, এ কথা কেহ বলে না। কিছু পড়াইতেই হইবে; কেন না, বাংলা যখন সংস্কৃতের সম্পত্তির কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেই অংশটুকু বুঝাইবার জন্য পড়াইতে হইবে। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাংলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাংলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাংলার আলোচনা করিয়া তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্য-পরিষদের কার্য; পরিষৎ যদি তাহার কিঞ্চিৎ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন, পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।

এই কথাটা অত্যন্ত সহজ; অথচ কী কারণে ইহা পণ্ডিতগণের মাথায় আসিতেছে না, তাহা বলা কঠিন। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে থাকুক, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। অন্যের তাহাতে রুচিগত আপত্তি থাকিতে পারে; আমার সে আপত্তি নাই। অন্যের মতে সীতার বনবাসের ভাষা উৎকৃষ্ট ভাষা না হইতে পারে; আমার মতে উহা উৎকৃষ্ট ভাষা। এই উৎকৃষ্ট ভাষা সংস্কৃতবহুল; ইহা বুঝিতে হইলে ও বুঝাইতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করি। যাঁহারা এই ভাষা পছন্দ করেন না, যাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে ওইরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করিবেন না, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার ধারিতে না চাহিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম ও সমাসের নিয়ম ও পদ সাধিবার নিয়ম শিখিতেই হইবে। তাঁহারা শিখুন, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণসমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হউন, কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহারা গ্রিক লাটিনের ব্যাকরণ শিখিতে গেলে তো কেহ আপত্তি করে না; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে গেলেই বা কে বাদী হইবে? বিদ্যালয়ের বালকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে যতটা শেখানো দরকার বোধ করো, শেখাও; তাহাতেই বা আপত্তি কি? বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তজ্জন্য ব্যাকুল হইবার আমি কোনও প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন আছে।

সীতার বনবাসেও খাঁটি বাংলা পদের বহু প্রয়োগ আছে। সেই সকল পদ কোথা হইতে আসিল, সেই সকল পদ কী নিয়মের অনুসারে প্রযুক্ত হয়, তাহা কেহই জানে না। সেইগুলির আলোচনা সাহিত্য-পরিষদেরই কাজ। সাহিত্য-পরিষৎ সেই আলোচনার যোগ্য পাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে; সাহিত্য-পরিষৎ তজ্জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত নহেন। বাংলা ব্যাকরণ নাই; সাহিত্য-পরিষৎকে তাহা গড়িতে হইবে।

বাংলা ভাষায় অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে; কালে আরও হইবে; হউক. ইহাই প্রার্থনা করি। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। 'সীতার বনবাসে' প্রথম বাক্য—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন,"—ইহা বাংলা বাক্য, সংস্কৃতশব্দবহুল বাংলা বাক্য। কেহ বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই উহা অপকৃষ্ট বাংলা; আমি বলিব, তথাস্তু। কেহ বা বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বাংলা; আমি বলিব, তথাস্তু। কেহ বা বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বাংলা; আমি বলিব, তথাস্তু। উৎকৃষ্টই হউক বা অপকৃষ্টই হউক, উহা বাংলা। উহার মধ্যে কতক পদ খাঁটি বাংলা; কতক খাঁটি সংস্কৃত; কিন্তু বাংলা বাক্য রচনার নিয়মানুসারে ওইরূপ দ্বিবিধ পদ একত্র গাঁথিয়া বাক্যটি রচিত হইয়াছে। ওই বাক্যটি ইংরেজি নহে, ফরাসি বা আরবি নহে, সংস্কৃতও নহে, প্রাচীন প্রাকৃতও নহে; উহা বাংলা। এই বাক্যটির অন্তর্গত সমুদয় পদের ব্যাকরণ অর্থাৎ ইটিমলোজি না জানিলে এই বাক্যের ভাষাগত জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। এই জন্য তদন্তর্গত সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠিত পদের ব্যুৎপত্তি প্রতি+স্থা+ত; উহা না জানিলে প্রতিষ্ঠিত পদটি কীরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উহার অর্থ ওইরূপ হইল, তাহা বুঝা যাইবে না। প্রতিষ্ঠিত পদটিকে তজ্জন্য ভাঙিয়া উহার ধাতুপ্রত্যয় বাহির করা আবশ্যক। এইরূপে বিশ্লেষণ-কার্য সমাধানের পর ওই পদটির অর্থ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণের আচার্যেরা এই বিশ্লেষণ-কর্মের সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য তাঁহারা কিছুই রাখেন নাই। আমাদের তজ্জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নের কোনও অবকাশ নাই। কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণের পাতা উলটাইলেই দেখিতে পাইবে যে, প্রতিষ্ঠিত শব্দের ব্যুৎপত্তি কী। বাংলা ভাষা এই শব্দটি সংস্কৃতের নিকট গ্রহণ করিয়াছে; যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারাও সংস্কৃত ব্যাকরণের সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া আপন গ্রন্থমধ্যে বসাইয়া দেন ও তাহার নাম দেন বাংলা ব্যাকরণ। কিন্তু উহা বাংলা ব্যাকরণ নহে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ।

এইরূপ অনুবাদকারের সবিশেষ কৃতিত্ব নাই; সবিশেষ অপরাধ আছে, তাহাও বলিব না। তবে যদি তাঁহারা স্পর্ধার সহিত বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছি বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহা হইলে অবজ্ঞাই তাহার পুরস্কার। যে সকল ছাত্রকে 'সীতার বনবাস' পড়িতে হয়, অথচ যাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ জানে না, তাহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিলে সংস্কৃত পদগুলির ব্যুৎপত্তি তাহারা বুঝিতে পারিবে। এই কারণে এই সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থের উপকারিতা আছে।

এইরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব ও অপত্যনির্বিশেষ শব্দ দুইটি কীরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা

সংস্কৃত ব্যাকরণে বহু দিন হইল স্থির হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা কীরূপ দর্পের সহিত পঞ্চাশটা শব্দকে একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া একটা পদ নির্মাণ করে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে তন্নতন্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে। উহা ছাত্রগণকে তর্জমা দিলে বিশেষ ক্ষতি দেখি না। সুতরাং শিশুবোধের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদ অনুবাদ করিয়া দিলে গর্হিত কাজ হয় না।

কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে অংশের বাংলায় প্রয়োগ হয় না, বাংলা ব্যাকরণে তাহারও যেন অনুবাদ করা না হয়। তাহা হইলে বালকদের মতিভ্রম জন্মাইতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

কিন্তু 'সীতার বনবাসে'-র ওই বাক্যমধ্যে সংস্কৃত পদগুলি ছাড়া কয়েকটি বাংলা পদ আছে; যথা, হইয়া এবং করিতে লাগিলেন। এই কয়টি পদ না থাকিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইত না। বরং সংস্কৃত পদগুলির স্থানে খাঁটি বাংলা পদ বসাইলে উৎকৃষ্ট না হউক, চলনসই বাংলা হইতে পারিত; কিন্তু এই খাঁটি বাংলা পদগুলির স্থান লইতে পারে, এমন কোনও সংস্কৃত পদই নাই। ইহাদিগকে বর্জন করিলে বাক্যটা বাংলাই হইত না। এই পদগুলির সন্নিবেশই বাংলার বিশিষ্টতা।

কিন্তু এই পদগুলি কীরূপে সাধিতে হইবে, তাহা কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থে নাই। কেন না, এই পদগুলি সংস্কৃতমূলক হইলেও সংস্কৃত নহে। ইহারা খাঁটি বাংলার নিজস্ব। ইহাদিগের উপর অন্য কোনও ভাষার কোনও স্বত্ব নাই। ইহাদিগের গঠনপ্রণালীর বিচার যে শাস্ত্রে করিবে, তাহাই বাংলা ব্যাকরণ। কিন্তু সেই বাংলা ব্যাকরণ এখন কোথায়?

প্রচলিত শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণগুলি খুলিয়া দেখিলে ওই শ্রেণির পদের ব্যুৎপত্তির কোনও তথ্য পাওয়া যাইবে না। কোনও ব্যাকরণকার যদি বাংলা শব্দের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উহাদিগকে সাধিবার কোনও চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাঁহার চেষ্টা কত দূর সফল হইয়াছে, জানি না। কেন না, এই পদকয়টির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বাংলা দেশের সপ্তকোটি অধিবাসীর মধ্যে কেহ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি না।

যদি বলেন, ওই সকল শব্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, উহাদিগকে লইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধিত হয় না, তাহা হইলে অবশ্য নিরুত্তর হইতে হইবে। উহারাই বাংলা ভাষার দেহ গড়িয়াছে; উহাদিগকে বর্জন করিলে বাংলা ভাষা বাংলা হইবে না।

'হইয়া' পদ সংস্কৃত ভূত্বাপদ হইতে আসিয়া থাকিবে; খুব সম্ভবই তাহাই। কিন্তু এই পরিণতি কখনই সহসা সাধিত হয় নাই। ভূত্বা পদ নানা রূপপরিবর্তের পর অবশেষে 'হইয়া'-তে দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল মধ্যবর্তী রূপ কী? কোনও বাংলা ব্যাকরণে তাহার উত্তর নাই; অথচ তাহার উত্তর দেওয়াই বাংলা ব্যাকরণের কার্য। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যে-যে ভাষার সাহায্য লইতে হয়, লও। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যেখানে যাহা বর্তমান আছে, তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দ্যাখো। বঙ্গদেশের দূর-দূরান্তের প্রাদেশিক ভাষায় কোন-কোন রূপ বর্তমান আছে, খুঁজিয়া দ্যাখো। তাহর পর উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়ো। তৎপূর্বে একটা আনুমানিক উত্তর দিলে তাহা গ্রহণ করিব না;—কিছুতেই না। হর্নলি সাহেব বলিয়াছেন, কর্তব্য হইতে করিব উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, করিষ্যামি হইতে করিব

হইয়াছে। 'করিষ্যামি' কীরূপে 'করিব'-তে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের জন্য সমস্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা আবশ্যক; প্রাদেশিক ভাষা সমস্ত খুজিয়া দেখা আবশ্যক। সহজে প্রমাণ হইবে না। অর্থসাদৃশ্য প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে। সে প্রমাণ কোথায়?

হইয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সমর্থ হইলে তখন যাইয়া, করিয়া, খাইয়া প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের পথ সুগম হইবে। তখন বাংলা ব্যাকরণের একটা সূত্র আবিষ্কৃত হইবে। সেই সূত্র একটা নবাবিষ্কৃত তথ্য; এইরূপ তথ্যসমষ্টি লইয়া নূতন বাংলা ব্যাকরণের দেহ রচিত হইবে। সে বহু দূরের কথা; এখন মজুরি করো।

বাংলা ভাষার সমুদ্র আলোড়ন করো। ডুবুরির মতো সাগরবক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক, ঝিনুক, কঙ্কাল, কঙ্কর, মুক্তা, প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আনো। কাহাকেও বর্জন করিও না; কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। কী জানি, কোন অবজ্ঞাত জঞ্জাল হইতে কী নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে! কী জানি, কোন অগ্রাহ্য কঙ্কর মাজিয়া ঘষিয়া দেখিলে কোন রত্নে পরিণত হইবে! ডুবুরির মতো যাহা পাও, কুড়াইয়া আনো। সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত করো। জহুরি কোন উপলখণ্ড হইতে কী জহর বাহির করিবেন, কে জানে? যতদিন বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, ততদিন জাতীয় মিউজিয়ামে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখো। সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে পারো, উত্তম; তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের সহায় হইবে। সাজাইতে না পারো, রাখিয়া দাও। কিন্তু অবহেলা করিয়ো না। অবহেলায় তোমার অধিকার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্য ভাষা' বলিয়া অবজ্ঞায় অধিকার তোমার নাই।

আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত নিয়ম বর্তমান আছে; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সকল ভাষাতেই নিয়ম আছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, লাতিনে, গ্রিকে, ধাংড়ের ভাষায় ও সাঁওতালের ভাষায় সর্বত্র নিয়ম আছে। কেন না, নিয়মহীন ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না। নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতে আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্তার ভাষা অনেকটা বন্ধনশূন্য বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা নিয়মবর্জিত? অসম্ভব। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষার মধ্যেও নিয়ম আছে। অন্বেষণ করো, বাহির হইবে।

ব্যাকরণ কখনও নিয়ম বাঁধে না; উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র। ব্যাকরণ ভাষার উন্নতির প্রতিরোধ কীরূপে করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্তিত হইবে; ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে; তাহাতে ভয় কী?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও তো তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি প্রাচীন বসুন্ধরার মূর্তি যুগ ব্যাপিয়া বিকৃত হইতেছে। এই বিকৃতির নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কার্য, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। কোটি বর্ষ পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে সময়ে পার্থিব ঘটনা যে-যে নিয়মে সংঘটিত হইত, এখন সে-সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্যের তাপ মন্দ হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন চন্দ্রের আকর্ষণ মন্দ হইবে. তখন আর ঠিক বর্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে

না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিণতির রোধহয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার বিকৃতি রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোনও বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকারের রোধ করিতে পারেন নাই।

নিয়ম বাঁধা যখন ব্যাকরণকারের উদ্দেশ্য নহে, নিয়ম আবিষ্কারই তাঁহার যখন উদ্দেশ্য, তখন এ আপত্তি টিকিতেই পারে না। বাংলা ভাষাতে যদি নিয়ম থাকে, সেই নিয়মগুলি জানা আবশ্যক। কেবল সাহিত্যের ভাষা কেন, লৌকিক ভাষা এবং প্রাদেশিক ভাষাও অনিয়ত নহে। ওই সকল ভাষারও ব্যাকরণ আলোচনা চলিতে পারে। সাহিত্যেরা ভাষা যত সুশৃঙ্খল ও যত সুনিয়ত, লৌকিক ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা ততটা সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ত নহে; উহার ব্যাকরণও তদনুরূপ হইবে। হউক, তাহাতে ক্ষতি কী? ভাষাবিজ্ঞান যদি আলোচ্য হয়, তবে ভাষার কোনও অবস্থাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

ভাষাবিজ্ঞানের Etymology অংশ লইয়া এত কথা বলা গেল। Syntax অংশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই-সেই কথা প্রযোজ্য। বাংলা ভাষার বাক্যরচনা রীতি সংস্কৃত বাক্যরচনা-রীতির সহিত সর্বাংশে সমান নহে। কাজেই বাংলা ব্যাকরণের এই অংশেও সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত পার্থক্য থাকিবেই। সাদৃশ্যও থাকিবে, পার্থক্যও থাকিবে। বাংলা ব্যাকরণে সেই সাদৃশ্য ও সেই পার্থক্য উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। নতুবা ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে না।

বাংলা ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে; কিন্তু ইহা তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষা নহে। বহু কোটি মনুষ্যে বাংলা ভাষায় কথা নহে; বহু শত লোকে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে। কিন্তু ইহাদের সকলে সংস্কৃত বুঝে না। সংস্কৃত ভাষা ইহাদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়। কিন্তু বাংলা ভাষা ইহারা মাতৃস্তন্য পানের সহকারে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিখিয়া থাকে। অন্য ভাষাতে যেমন নিয়ম আছে, বাংলা ভাষাতেও সেইরূপ নিয়ম আছে। নিয়ম না থাকিলে ইহা মনুষ্যের ভাষা হইত না; মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিত না।

কিন্তু সেই সকল নিয়মের এখনো কেহ আলোচনা করেন নাই। বাংলা ভাষাকে বিশ্লেষণ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় সেই-সেই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে সুধী জনকে এই কার্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।

বালকগণের জন্য বাংলা ব্যাকরণ-রচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এখনও গঠিত হয় নাই। বাংলা ভাষার নিয়মসকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। এই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে, তখন বাংলার পাণিনি নিজ প্রতিভাদ্বারা পূর্বাচার্যগণের আবিষ্কার-সকলের সমন্বয় করিয়া বাংলা ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র সম্পূর্ণ করিবেন। তার পরে সেই ব্যাকরণ বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইবে। সেই পাণিনির জন্মের এখনও অনেক বিলম্ব। এখনো

জন্মের সময় হয় নাই। আমাদিগকে তাঁহার আবির্ভাবের জন্য আয়োজন করিতে হইবে। আমরা ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে বহু দিনে যদি সোপান গড়িয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন সেই সোপানের দ্বারা উচ্চ আরোহণ করিবেন। অথবা তিনি যে মন্দির গড়িবেন, আমাদিগকে তাহার জন্য খড়, খুঁটি, চুন, কাঠ, ইষ্টক প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি কাহারও সাধ্য থাকে, অট্টালিকার নকশাটাও তৈয়ার করিয়া রাখিবেন; কাহারও সাধ্য থাকে, দুই-একটা ভিত্তিপত্তন করিয়া রাখিবেন মাত্র।

মান্যবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ। ব্যাকরণ শাস্ত্র নির্মাণের এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু উপাদান-সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ এখনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ রচনা করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না; সাহিত্য-পরিষদের কোনও বর্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নকশাটা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার কোনও ভগ্নাংশ গড়িয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। উপাদান-সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষদের সাধ্য। কেন না, উপাদান-সংগ্রহ মজুরের কাজ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে যে বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি ব্যাকরণ-রচনা-কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং এই মজুরের কাজে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্মকে হেয় কার্য জ্ঞান করেন, সেই আশঙ্কায় স্বয়ং মজুরের কাজ গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনি-স্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই; তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন, তাহার কোনও ক্ষুদ্র অংশের নকশার আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার না দিলে চলিবে কেন?

সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিদ্বয়ের উদ্দেশ্য আমি এইরূপ বুঝিয়াছি; এবং পরিষদের সম্পাদক-স্বরূপে উপাদান-সংগ্রহের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছি। ইন্দ্রনাথবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম এই যে, যথোচিত উপাদান-সংগ্রহ না হইলে ব্যাকরণ রচিত হইবে না। সেই উপাদান-সংগ্রহই পরিষৎ-পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া আমি গ্রহণ করিয়াছি। যতদিন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি পরিষদের অনুগ্রহভার বহনে বাধ্য থাকিবে, তত দিন ইহাই পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কিন্তু এই যে বাংলা ব্যাকরণ, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বহীন, এবং যাহা ভবিষ্যতে রচিত হইবে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে রচিত হইবে কি না? এই প্রশ্ন লইয়াও অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। অথচ ইহার অধিকাংশই বাগজালমাত্র।

বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃতের আদর্শে রচিত হইবে কি না, এ প্রশ্নে এত গণ্ডগোল কেন হয়, বুঝিলাম না। এক অর্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ কেবল বাংলায় কেন, সকল ভাষাতেই গ্রহণ করা চলিতে পারে। বস্তুত ভাষাবিজ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের হাতে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও করে নাই। শত বৎসর পূর্বে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের

অবস্থা উন্নত ছিল না। সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভাষাবিজ্ঞান কীরূপে অনুশীলন করিতে হয়, তাহা শিখিয়াছেন। তৎপরে বিবিধ ভাষার তুলনায় আলোচনা দ্বারা ভাষাবিজ্ঞান তাঁহাদের হাতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তখন বাংলা ব্যাকরণে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কী?

কিন্তু এই আদর্শ হইবে প্রণালীগত আদর্শ। বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্বত্রই একরূপ। ভাষাবিজ্ঞানেও যে পদ্ধতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে, সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নহে; জ্যোতিষও রসায়ন নহে। সেইরূপ নানা ভাষার আলোচনাতে একই আদর্শ গৃহীত হইলেও সেই নানা ভাষা এক হইয়া যায় না।

বাংলা ব্যাকরণের রচনাতেও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ অবলম্বিত হউক, ইহা প্রার্থনা করি। এমন উৎকৃষ্ট আদর্শ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সামান্য বা সাদৃশ্য প্রচুর পরিমাণে আছে। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই সামান্যের আবিষ্কার করিতে হইবে। আবার উভয় ভাষায় প্রকৃতিগত বৈষম্যও প্রচুর আছে। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই বৈষম্যের নিয়মগুলি আবিষ্কার করিতে হইবে। সম্পূর্ণ ব্যাকরণে এই সামান্য ও বৈষম্য উভয় পক্ষেরই যথাযথ আলোচনা থাকিবে। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণে সূত্রগুলি তর্জমা করিয়া দিলে উহা বাংলা ব্যাকরণ হইবে না।

বর্তমান শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণে এই সকল বৈষম্য দেখাইবার চেষ্টা যে একেবারে হয় না, এমন নহে। কিন্তু সে চেষ্টার বিশেষ কোনও মূল্য নাই। যে পরিমাণ পরিশ্রমের ও চিন্তার পর এই কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কখনও কেহ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ সেই চেষ্টার জন্য সুধীগণকে আহ্বান করিতেছেন। সুধীগণ কার্যে অগ্রণী হইয়া কার্যের গৌরবানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই প্রার্থনা করি। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা তাঁহাদের কার্য; বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য-সহকারে তাঁহাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনর্থক বাদ-বিসংবাদে সময় নাশের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সেই বিবাদে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা অবান্তর কথা আসিয়াছে, সেটারও একটু আলোচনা আবশ্যক। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ওই সকল শব্দ ব্যবহারকালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কি না? এ প্রশ্নও যে কেন উঠে, তাহা জানি না। অথচ ইহা উঠিয়াছে। এক দল পণ্ডিত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝি বা সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে স্বেচ্ছাচার অবলম্বিত হয়। কিন্তু হরপ্রসাদ বা রবীন্দ্রনাথ কোনও স্থানে এরূপ কোনও কথা বলিয়াছেন কি যে, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিব না? আমি তো কোথাও সেরূপ উক্তি দেখি নাই। এই আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু আশঙ্কার অবশ্য একটা ভিত্তি আছে। আজকাল অনেকে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগকালে ব্যাকরণ ভুল করিয়া ফেলেন। কেবল যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকেই ভুল করেন এমন নহে; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ভুল

করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতার ফল অথবা অনবধানের ফল। 'কেশ-বিনাশিনী তৈল' অথবা 'কৃতান্তাকর্ষণী মহৌষধ' কেবল যে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেই দেখা যায়, এমন নহে; এ-কালের সাহিত্যেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে সকল লেখক অনবধান বা অনভিজ্ঞতা বশে এইরূপ ব্যাকরণ ভুল করেন, তাঁহাদিগের যথাযোগ্য শাস্তি দাও। তাঁহাদিগকে ছেদন ভেদন কৃন্তন করো; তাঁহাদিগকে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া ফেলো; অথবা তাঁহাদের জন্য ডালকুত্তার ব্যবস্থা করো। কেহ আপত্তি করিবে না। এই অধম লেখক আপত্তি করিবে না। রবীন্দ্রনাথ ও শাস্ত্রী মহাশয়ও আপত্তি করিবেন না। কেন না, ইহা অতি সহজ কথা। সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আমাদের গবেষণা নিরর্থক। কিন্তু বাংলা শব্দের প্রয়োগে বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য।

বোধহয় এ বিষয়েও মতদ্বৈধ বর্তমান নাই। বিবাদ উঠে প্রয়োগের বেলায়। দু-একটা দৃষ্টান্ত লইব। অপ্সরাগণ লিখিব, কি অপ্সরোগণ লিখিব? সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অপ্সরাগণ ভুল হয়। বাংলা সাহিত্যে স্থানবিশেষে, যেখানে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল-সমাসঘটালংকৃত পদাবলির ব্যবহার হইতেছে, সেখানে অপ্সরোগণ লিখিতেই হইবে। কিন্তু অপ্সরা একটি বাংলা শব্দ; উহা সংস্কৃতমূলক; সংস্কৃত অ প্স র স্ শব্দ ভাঙিয়া বাংলা আকারান্ত অ প্স রা এবং ঈকারান্ত অপ্সরী শব্দ বহু দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত চক্ষুস্, ধনুস্ প্রভৃতি সকারান্ত শব্দের অন্ত্যবর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বাংলায় উকারান্ত চ ক্ষু, ধ নু প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 'চ ক্ষু ষ্মা ন্' 'ধ নু র্বা ণ' প্রভৃতি স্থলে খাঁটি সংস্কৃতের অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ আছে; কিন্তু 'চক্ষু দ্বারা' 'ধনু ধরিয়া' প্রভৃতি স্থলে বাংলা শব্দেরই ব্যবহার আছে। সাহিত্যের ভাষায় দুই রকম প্রয়োগই চলিতে পারে। সেইরূপ, অপ্সরা এই বাংলা শব্দের প্রয়োগে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দেওয়া আবশ্যক। সংস্কৃত নিয়মানুসারে অপ্সরাগণ হয় না; কিন্তু বাংলার নিয়মে হয়। মনে হইতেছে, ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরাগণের বাস'। তিনি বাংলা প্রয়োগ-বিধির অনুসরণ করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালোই করিয়াছেন; অপ্সরোগণ এখানে ভালো শুনাইত না। বাংলায় যখন অপ্সরা শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তখন বাংলা সমাসেই বা আপত্তি কি?

'সৃজন' ও 'সর্জন' একটা পুরাতন আপত্তির ক্ষেত্র। সর্জন শব্দ ব্যাকরণসঙ্গত সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু উহা বাংলায় এ পর্যন্ত চলে নাই। বিসর্জন চলিয়াছে, সর্জন চলে নাই; চলা হয়তো প্রার্থনীয়ও নহে। সংস্কৃত শব্দ এমন অনেক আছে, যাহা বাংলায় চলে নাই; জোর করিয়া চালাইলেও সাধারণ গ্রহণ করিবে না। মাইকেল তাহার প্রমাণ। শুনিতে পাই 'সৃজন' শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে। তথাপি উহা বাংলা শব্দ; উহা বহু কাল হইতে প্রচলিত বাংলা শব্দ; বৈষ্ণব লেখকরা না কি উহা চালাইয়া গিয়াছেন। মৎস্য স্থলে মাছ লিখিলে যদি ভুল না হয়, তৈল স্থলে তেল লিখিলে যদি ভুল না হয়, সর্জন স্থলে বহু কালের প্রচলিত সৃজন লিখিলেই বা ভুল হইবে কেন? তবে সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি সৃষ্টি লিখুন; অনুগ্রহপূর্বক সর্জন লিখিবেন না।

কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাদানুবাদে কোনও ফল নাই। মূল বিষয়টা ইহাতে

লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। বাংলা নামে একটা ভাষা আছে। ইহা সম্ভবত সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া পরিণত হইয়াছে। কেহ বা বলেন, কোনও অনার্যভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিচ্ছদ পরিয়া, সংস্কৃতের ও প্রাকৃতের অলঙ্কারে সর্বাঙ্গে ভূষিত করিয়া বাংলা রূপ ধারণ করিয়াছে। হয়তো এ সিদ্ধান্তের সম্যক ভিত্তি নাই, হয়তো ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ আবশ্যক। বাংলা ভাষা কীরূপে উৎপন্ন হইল, বিনা অনুসন্ধানে তাহা মিলিবে না। বিনা পরিশ্রমে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। ঘরে বসিয়া কাগজ-কলমের সাহায্যে ইহার উত্তর মিলিবে না। আনুমানিক উত্তর অগ্রাহ্য।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, বাংলা ভাষাকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া, বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন শবদেহ ছিন্ন করেন, সেইরূপে ভাষার দেহ ছিন্ন করিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন অণুবীক্ষণ-যোগে প্রত্যেক কোশকে পরীক্ষা করেন, সেইরূপ যুক্তির অণুবীক্ষণ যোগে প্রত্যক শব্দকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোনও শব্দকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শরীরতত্ত্ববিৎ কোনও অঙ্গ পরিহার করেন না। সেইরূপ এ শব্দটা slang, এটা প্রাদেশিক, এটা অকিঞ্চিৎকর, এই বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বলে না। তত্ত্বান্বেষীর নিকট কিছুই অবহেলার বিষয় নহে; কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। ধূলিকণার যে তত্ত্ব নিহিত আছে, সৌরজগতের তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর না হইতেও পারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতির সহিত বাংলার তুলনা করিতে হইবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা-সমুদয় পরস্পর তুলনা করিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের প্রচলন পরীক্ষা করিতে হইবে। ধাঙড়ের ভাষা, সাঁওতালের ভাষা, কোল, দ্রাবিড়, ভুটিয়ার ভাষা খুঁজিতে হইবে; কে বলিতে পারে, ওই সকল ভাষার সহিত বাংলার সম্বন্ধ কী; কে জানে, উহাদের কাছে বাংলার কতটা ঋণ আছে।

কার্য অতি বৃহৎ। দশ জনের বা দশ বৎসরের চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইবে না। কোনও দেশে হয় নাই; কোনও কালে হয় নাই। বিজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই কর্ম কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

অমঙ্গলের উৎপত্তি

একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাংলাদেশের জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; সেই জন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া, কাহারও বা হাড়গোড় ভাঙিয়া যথোচিত শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষে গরিব লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহু লোকের ঘরবাড়ির নির্মাণ উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

কিন্তু কূটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত অনেক নির্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক বড় লোক প্রজাপীড়ক ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাঁহার হাড় ভাঙিয়াছে, ইহা সুদৃশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তি, যাহার সুশীলতায় এ পর্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপটা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল?

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি না হয় নির্দোষ ও নিষ্কলংক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল; অথবা এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল? ব্যাঘ্র মেষশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার কোনও উপায় নাই, তখন জুবিলির বৎসরে উত্তর বাংলায় দুষ্কৃতকারীর যে বিশেষ জটলা হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

ইহুদি জাতির বাইবেল নামক প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধেয় ঈশ্বর সময়ে-সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থূল ঘটাইয়া দিতেন এবং তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের শাস্তি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের উপর অপক্ষপাতে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অনেকে বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের পরম-কারুণিকতা ও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে ওইরূপ যুক্তি অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়।

জগতের যে সকল ঘটনা স্থূলদর্শীর চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরমকারুণিক বিধাতৃপুরুষের যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী লোকের কোনও সংশয় নাই।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধানের পূর্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা

হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি চেতন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও, কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখদুঃখ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক দল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীবমধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহাই অমঙ্গল। ইঁহাদের ভাবটা এই;—এই প্রকাণ্ড জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া মানুষের ভোগের জন্যই বর্তমান রহিয়াছে: মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক; মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। সৃষ্টিকর্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যাহা মানুষের সুখবিধানে যত সাহায্য করে, তাহার অস্তিত্ব তত দূর সার্থক এবং সৃষ্টিকর্তার চেষ্টা তত দূর সফল এবং তাঁহার নৈপুণ্য তত দূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে তিনি আমাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিগর, কেন না, এত কৌশল সহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে মানুষের অসুবিধা হইবে, তখন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন, স্তুতিভাজন ও প্রীতিভাজন; কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্তি সহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম ইত্যাদি।

সূর্য কেমন অদ্ভুত পদার্থ! সূর্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞানবিদ্যা শত মুখে সূর্যের সৃষ্টিকর্তার গুণগান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়েছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না; পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁহার কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমনকী, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শস্যে ও আমাদের শীত নিবারণের জন্য কার্পাসের ফলকে তুলায় পরিণত করিয়া কী অপূর্ব মানবহিতৈষার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল দেখো, কী সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান;—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও ধর্মবক্তা সকলেরই মুখে এই একই কথা চিরকাল শুনা যাইতেছে।

সমস্ত জগৎটাই যখন মনুষ্য জাতির উপকারের জন্য ও সুবিধের জন্য নির্মিত, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোনও পদার্থ থাকে, যাহা মানুষের কোনও কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্তার কার্য-প্রণালীতে দোষারোপ ঘটে। সেই জন্য এক দলের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল। যদি সহজ চোখে কোনওরূপ প্রমাণ

না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতি সহকাবে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়ে তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কয়েক বৎসর পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন না। বিশ্বজগতের কিন্তু সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন কাল হইতে জগৎ বিদ্যমান আছে, এবং কত কাল ধরিয়া জগৎ বিদ্যমান রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র, সাদি ও সান্ত মনুষ্যের জন্যই এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্তু বর্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরে অসীম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমনকী, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রে জীব বর্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধহয়। কাজেই জগৎটা কেবল মানুষের জন্য নির্মিত, মানুষেরই একমাত্র ভোগ্য বস্তু, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চেতন সুখ-দুঃখভোগী জীব মাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চেতনা আছে, যাহার সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারই সুবিধার জন্য, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য ও আরামে রাখিবার জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই। যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়। কেন না. সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল?

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কী, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়ালের ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দেশে তর্কশাস্ত্র কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক. মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রযোজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ

উত্তর অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর মঙ্গলার্থেই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন; তবে কী কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে-সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্বদা প্রায়স; কাজেই ইহার মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

মনুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হটিবার নহে। মনুষ্য তর্কের খাতিরে মঙ্গলময় দেবতার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলময় আর এক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এক দেবতা মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন; আর এক দেবতা অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের নাম জেহোবা, অন্যের নাম শয়তান; একের নাম অহুরমজদ, অন্যের নাম আহ্রিমান। উভয়ের চিরন্তন বিরোধ; একে অন্যকে পরাভবের চেষ্টায় রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী। শয়তান জেহোবার কার্য পণ্ড করিবার জন্য, তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে চিরকাল হাঙ্গামা চলিতেছে। ঈশ্বর শয়তানকে জব্দ করিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত; কিন্তু শয়তান শয়তানিতে অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের সাধ্য নহে যে, তাহাকে সহজে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে। সেদিন কবে আসিবে, তাহা কেহ গণিয়া বলেন না।

শয়তানে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে বিশ্বাস যাঁহার যত দৃঢ়, তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে সেই পরিমাণে বাধ্য। গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে-চুলে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময়। ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ; বাড়িগুলা ভূমিসাৎ করা, মানুষগুলাকে মারিয়া ফেলা শয়তানের কাজ। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে সেই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, তাহাতে বিস্ময় কী? কিন্তু শয়তানের অত্যাচারে যে সকল জননী পুত্রহীনা ও নারী পতিহীনা হইয়াছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দয়া প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা আদায় করিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই।

কাজেই শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ পড়ে। কল্পনা করিলে আবার তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের শক্তির অপরিসীমত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি সর্বশক্তিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

কাজেই অন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। মনুষ্যের জন্য ভালো মন্দ দুইটা পথ আছে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে কোন পথে চলিতে পারে। যে ভালো পথে চলে, ঈশ্বর তাহার ভালো করেন। যে মন্দ পথে চলে, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করেন অথবা তাহার হিতার্থ তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন; সে সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ। মনুষ্যের দোষে মনুষ্যকে শাস্তি দিবার জন্য, মনুষ্যকে সাবধান করিবা জন্য, মনুষ্যের পাপ ক্ষালনের জন্য অমঙ্গলের উৎপত্তি।

উত্তরটা সুন্দর, কিন্তু বিচারের বিষয়। অনেকে বলিলেন, মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহার চিত্তের গঠনও তাহার ইচ্ছামতো সে প্রাপ্ত হয় নাই। পিতৃ-পিতামহাদি সহস্র পূর্বতন পুরুষ তাহার শারীর-প্রকৃতির ও তাহার চিত্ত-প্রকৃতির জন্মদাতা; সে সেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্মভোগ করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার চিত্ত-প্রকৃতির একটা অঙ্গ মাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি তাহার পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, সে তাহারই প্রয়োগ করিতেছে; তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিয়ো না।

কথাটা তর্কের বিষয়। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, তাহা লইয়া যতক্ষণ তর্ক চলিতে পারে। বস্তুতই এখন ইহার মীমাংসা হয় নাই। স্বীকার করা গেল, ইচ্ছা স্বাধীন। কিন্তু মানুষের দুর্বলতার জন্য দায়ী কে? সংসারের প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে সে কি সর্বত্র সর্বদা আপনার ইচ্ছামতো চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার যথেচ্ছ পথে চলিবার শক্তি আছে? সহস্র শত্রু তাহাকে গন্তব্যপথে চলিতে দিতেছে না; সহস্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। সে সর্বদা অক্ষম ও দুর্বল; সৎপথে চলিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও সে চলিতে পায় না। ভাগ্যবান সে, যে এই শত্রুকুলকে অতিক্রম করিয়া, প্রলোভনসমূহ এড়াইয়া, যথেচ্ছ পথে চলিতে সমর্থ হয়।

আবার মনুষ্যের পাপে না হয় মনুষ্যের অমঙ্গল উৎপন্ন হইল। কিন্তু অমঙ্গল মনুষ্যমধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্নস্থ জীবমধ্যে নিদারুণ নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? জীবসমাজে যে দুঃখের, যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা, এইরূপ অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের মাংসশোণিত ব্যতীত অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তির যখন উপায়ান্তর তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই, তখন আহারদাতৃত্বে ও রক্ষাকর্তৃত্বে সমন্বয়সাধন অসাধ্য হইয়া পড়ে।

চারিদিকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা বলিলে তাঁহার দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গল-সৃষ্টির ভারটা শয়তানের উপর চাপাইলে তাঁহার সর্বশক্তিমত্তায় দোষ পড়ে। নিরীহ মনুষ্যকে দায়ী করিলে দুর্বলের উপর অনুচিত অত্যাচার করা হয়। দায়িত্বশূন্য ইতব জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্য তো একেবারে পাওয়াই যায় না। অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক; অগত্যা বলিতে হয়. মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ। বলিতে হয়, অল্পবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি লোকে দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে অসমর্থ; স্থূলদৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল।

কথাটা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীব-সমাজেই দেখা যায়, দারুণ জীবন-সংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; তাহার ফলে জীব-সমাজেই অযোগ্যের বিনাশ, যোগ্যের অভ্যুদয়। জীবের উন্নতির এই মুখ্যতম উপায়। অভিব্যক্তির এই প্রধান পথ। এই পথে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, জগতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্যের, বিবিধ রূপের ক্রমশ বিকাশ। সমস্তই একই

সূত্র অবলম্বন করিয়া। ভালোর জয়, মন্দের ক্ষয়, সবলের জয়, দুর্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, সর্বত্র এই একই সূত্র। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য প্রকৃতির এই কারখানা চলিতেছে না। ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি নহে; জাতির জন্য সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে সুখের আশা না থাকিতে পারে; কিন্তু জাতির জীবনে সুখের আশা আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষীস্বরূপে দণ্ডায়মান। জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুর ভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ভূপঞ্জরের স্তরমালা উদঘাটন করিয়া দ্যাখো। কত লুপ্ত জীবের কংকাল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুম্ভীর, কত বিশাল বিহঙ্গম এক কালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। এখন তাহারা কোথায়? এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে, তাহাদের শিলীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্তমান। তাহারা গিয়াছে; তাহারা জীবনদ্বন্দ্বে পরাভূত হইয়াছে; অন্যে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজ্যে নূতন রাজপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিয়াছে, নূতনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম আজিও চলিতেছে। এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন মৃত্যু। কিন্তু ভারী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র্য, ভাবী ফল সৌন্দর্য, ভাবী ফল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব। অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহস্য, বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

ঠিক কথা, দুঃখের পর সুখ এবং দুঃখ হইতেই সুখ। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নহে। বিধাতার বিধানই এইরূপ। কিন্তু হায়, বিধান কি অন্যরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপাদন কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্য, অভিব্যক্তির জন্য, মৃত্যুর পথ বিধাতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, মৃত্যুর পথের পরিবর্তে জীবনের পথ নির্দেশ করিলে কি বিধাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করিতে না? উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ না করিলে কি তাঁহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত পড়িত? জীবের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্য উপায় অমিত বুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই? এক বলো, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন? অথবা বলো, তিনি দয়াময়; তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র উত্তর আছে। মনুষ্যের বুদ্ধি দিগ্বিজয়ী। ইহার অনধিগম্য দেশ নাই, ইহার অসাধ্য কাজ নাই। ইঙ্গিত মাত্রে মনুষ্যবুদ্ধি না-কে হাঁ ও হাঁ-কে না-তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন আর ভয় কী? নীতিকার ও শাস্ত্রকার, ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিক একবাক্যে একস্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কোথায়? অমঙ্গল একেবারে অস্তিত্বহীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছ; বৃথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছে ও পরকে মজাইতেছে। মিথ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের আবরণ ও ভ্রান্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিয়া দ্যাখো;

পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ তুমি; তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ,—জ্যোতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ। অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না। আনন্দের কোলাহলে আমার শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে আমার নয়ন ঝলসিতেছে। জ্যোতির্ময় প্রভা-তরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর উথলিতেছে; জ্যোতির তরঙ্গ, আলোকের হিল্লোল, তরঙ্গে-তরঙ্গে আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। কাহাকে তুমি দুঃখ বলিতেছ? দুঃখই সুখ, দুঃখই আনন্দ। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের সহচর, মৃত্যু জীবনের সোপান।

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ, প্রেমিকের কথা এইরূপ। যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্বতোভাবে সুখী; তাঁহার জীবন সুখের জীবন; কেন-না, অমঙ্গল তাঁহার নিকট মঙ্গল, অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোক। তিনি পিতা; পুত্রের অকালমৃত্যুতে বিধাতার মঙ্গলহস্তের আহ্বান দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়া থাকেন। তিনি ক্ষুৎপীড়িতের মরণযাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি সুখী; তিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন না; তাঁহার সৌভাগ্যে আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তাঁহার ক্ষমতায় আমরা বিস্মিত হই। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধ্য সাধনে পটীয়ান, তাঁহার চরণে প্রণাম।

তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতে আমরা অসমর্থ। তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি, কিন্তু ভালোবাসিতে পারি না। তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন; স্বয়ং তিনি সুখী; তিনি ভাগ্যবান। আমার সে শক্তি নাই; আমি তাঁহার সুখে সুখী হইব কীরূপে? তিনি চক্ষুষ্মান; তিনি আলোকে থাকিয়া আনন্দে পূর্ণ। আমি অন্ধ; অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার আনন্দে যোগ দিতে আমি অসমর্থ। কিন্তু ইহা সত্য, তাঁহার জগৎ যেমন মঙ্গলময়, আমার জগৎ তেমন নহে। তিনি সৌভাগ্যশালী, ক্ষমতাশালী, বিশ্ববিধানের পরম ভক্ত। আমি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত, সে ক্ষমতায় হীন, আমার ভক্তিরস তেমন উথলিয়া উঠে না। তিনি আমার মতো হতভাগ্যকে কৃপা করুন; কিন্তু সংসার বিষে জর্জরিত আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহার সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না।

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলো নাই, সাদা ছাড়িয়া কালো নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে-সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে-সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন, তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আর আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই; আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয়

করি। অমঙ্গলকে লোপ করো; মঙ্গলকে ধরিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, মঙ্গল সঙ্গে-সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশূন্য বাতুলের প্রলাপ।

কবিকল্পিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে। সেখানে মলয় পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রজনী নিরন্তর জ্যোৎস্নাময়ী, সেখানে যৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ। সেখানে বিরহ নাই, মিলনের আনন্দ সেখানে সর্বদা বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বটে; কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিত্য জ্যোৎস্নায় কবি-কল্পনা নিত্য সুখের অস্তিত্ব দেখিতে পায়; কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা এই নিত্য জ্যোৎস্নায় ও নিত্য বসন্তে সুখ দেখিতে সর্বতোভাবে অক্ষম। অথবা এই প্রাকৃত দেশে জ্যোৎস্নার ও বসন্তের ও আরামের ও মিলনের নিতান্ত অসদ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবি-কল্পনা এই অতিপ্রাকৃত সুখাবতীর নির্মাণে সমর্থ হইয়াছে। অন্ধকারের পার্শ্বেই জ্যোৎস্না সম্ভবপর। বিরহ-দুঃখের পরেই মিলনসুখ উপভোগ্য। যে বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আস্বাদনে অধিকারী নহে। যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন।

অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না; তাহা হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেইভাবে গ্রহণ করো। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পারো, কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া অকূলে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই। যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণে একই নির্ঝর-ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে। একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলিব? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এ-পার হইতে বলি সুখ, ও-পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ। দক্ষিণ পারে সুখ, বাম পারে দুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই। যেখানে এ-পার নাই, সেখানে ও-পারও নাই। সেখানে স্রোতস্বতীও কল্পনার অগোচর। জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির কালনির্দেশ মহাসমস্যা; কিন্তু সেই দিনে তাহার সহচর অমঙ্গলেরও উৎপত্তি। মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের নিয়ম এই; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কীরূপ? অভিব্যক্তির নাম উন্নতি বলো ক্ষতি নাই, কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও না। উন্নতি সহকারে সুখের বৃদ্ধি, উন্নতি সহকারে দুঃখেরও বৃদ্ধি। যখন সুখ ছিল না, তখন দুঃখও ছিল না; যখন সুখের আধিক্য ঘটে, তখন দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়। অচেতন জগতে, জড় জগতে অনুভব-শক্তি নাই;

অর্থাৎ সুখও নাই, দুঃখও নাই। চেতনাসহ সুখ দুঃখ উভয়েরই পার্থক্যবিকাশ। যে যত সুখ বোঝে, যে যত দুঃখ বোঝে, সে তত চেতন; তাহার চেতনা সেই পরিমাণে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। জীবপর্যায়ে যত উন্নতি, যত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই সুখ-দুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ। জীবসমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্য-সমাজেও তাহাই। সভ্যতা উন্নতির অর্থ কী? সুখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বলে, সভ্যতার সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে; কেহ বলে, দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা, উভয়েরই মাত্রা বাড়িতেছে; কেন না, একেকে ছাড়িয়া অন্যের স্বতন্ত্র অস্তিতা থাকিতে পারে না। জীবনেব সহিত সুখদুঃখের সম্বন্ধ। যাহার জীবন নাই, তাহার দুঃখও নাহ, সুখও নাই। জীবনের অর্থ জড় হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা। জড়জগৎ জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানিতেছে। জীবন জড় হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াসী। জীবনের জড়ত্বে পরিণতির নাম অমঙ্গল। জীবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সফলতার নাম মঙ্গল। জীব অমঙ্গল পরিহার করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায়। কেন না, উহাতেই জীবের জীবত্ব; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য; উহা ছাড়িয়া জীবনের সার্থকতা নাই। অমঙ্গল কেন হইল, মঙ্গল কেন হইল, ইহার উত্তর চাও, তবে জীবনের উৎপত্তি কেন হইল, ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। কেন না, জীবনের সহিত মঙ্গলামঙ্গলের নিত্য সম্পর্ক; জীবনকে ছাড়িয়া সম্পর্ক। অন্তত জীবনের অভিব্যক্তি সহকারে চেতনার স্ফূর্তি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্শ্বে মঙ্গলকে বুঝে, সুখ-দুঃখে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে চাও। মঙ্গলের জন্মস্থান অনুসন্ধান করো। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব মঙ্গলই বা কেন? এক প্রশ্নের উত্তর মিলিলেই অন্যেরও উত্তর মিলিবে। অথবা পূর্বে চেতনার উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করো; চেতনার উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চেতনা কী? না, সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধই চেতনা। যেখানে সুখ ও দুঃখ উভয়ে পার্থক্য বোধ নাই, সেখানে চেতনাও ফুটে নাই। আবার যাহাতে সুখ, তাহা মঙ্গল; যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যে দিন চেতনার সৃষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের সৃষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্তমান, জগতে দুঃখ অবর্তমান, চেতন জীব কেবল একই শান্তি একই আরাম একই আনন্দ উপভোগে নিরত রহিয়াছে,—ইহা চিন্তার অগোচর, ইহা অলীক কল্পনা।

অতএব এসো বন্ধু, অকারণে আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না; অমঙ্গলের সম্মুখে দেখিয়াও অস্বীকারের চেষ্টা পাইও না। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না, অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমারা চেতনার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। যত দিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমানভাবে তোমাকে জড়াইয়া থাকিবে। যত দিন তোমার জাগ্রদবস্থা স্ফূর্তি পাইবে, ততদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার ব্যক্তিগত বিলোপ। যত দিন জাগিয়া আছ, তত দিন তোমার ব্যক্তি; তত দিন মঙ্গল তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবনের পথে লইয়া চলিবে।

একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ; উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পথ! জীবনের পথ তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করো, তোমার গন্তব্য দেশ তোমার সম্মুখে প্রসারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি তোমাকে মন্দ্র ধ্বনিতে সেই গন্তব্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান করো, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। এককে আলিঙ্গন করো, অপরকে নমস্কার করো। গন্তব্য পথে তোমার গতি হউক; মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমায় প্রেরণা করিতে রহুক। ধীরপদে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করো, তোমার নিরূপিত স্বধর্ম আচরণ করো। কর্মেই তোমার অধিকার; ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি বা অমঙ্গলের প্রতি তুমি দৃকপাত করিও না। শ্রুতি স্মৃতি সদাচার তোমার পথপ্রদর্শক হউক। সকলের উপর আত্মতৃপ্তি তোমার পথপ্রদর্শক হউক। যিনি তোমার অভ্যন্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, তাঁহার তৃপ্তিবিধানে তোমার মতি থাকুক। তৎপ্রদর্শিত মার্গে তুমি নির্ভয়ে অগ্রসর হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক; উভয়ের জয়েই তোমার জয়।

ভীত মানব বহু কাল ধরিয়া মঙ্গলের জয় গান করিয়া আসিতেছে; অমঙ্গলের জয়বার্তা কি কখনও গীত হইবে না? অমঙ্গলের জয়বার্তা গীত হইয়াছে। রামায়ণের আদি কবি সেই গীত গাহিয়াছেন; ভারতের ইতিহাস সেই গীতের প্রতিধ্বনি।

গ্রাম দেবতা

এই প্রবন্ধে জেমোকান্দি নামক গ্রামের প্রধান গ্রাম্য দেবতার বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তৎপূর্বে জেমোকান্দির সম্বন্ধে একটু বিবরণ আবশ্যক। মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ—ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে বীরভূমির সীমানা পর্যন্ত কান্দি মহকুমা। কান্দি মহকুমার উত্তরাংশে দ্বারকা ও মধ্যভাগে ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূম জেলা হইতে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদয় নদী মিলিত হইয়া বাবলা নাম ধরিয়া ভাগীরথীর সমান্তর প্রবাহে কিছু দূর গিয়া কাটোয়ার উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে।

গত সেনসাস তালিকার মতে কান্দি মহকুমার বিবরণ এইরূপ—কান্দি সাবডিভিশন—আয়তন ৫১২ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা—৮৮৪; গৃহসংখ্যা—৭১১৯৮; লোকসংখ্যা—৩,৩৪,০৫৩; থানা অনুসারে লোকসংখ্যা—(১) কান্দি—৩১৯২৪; বরোঁয়া—৬৯,৮০৬; খড়গাঁ—৬৩, ৭৭২; ভরতপুর—১,২১,৯৪৭; গোকর্ণ—৪৬,৬০৪। মহকুমায় হিন্দু—২,১৯,৯৭৩; মুসলমান—১,১২,১১৪; প্রেতোপাসক (animist)—১৯১৬।

ময়ূরাক্ষী নদীর পূর্বতীরে কান্দি বা জেমোকান্দি, মিউনিসিপ্যালিটির অধীন নগর—লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০; পাঁচ ওয়ার্ডে বিভক্ত—কান্দি, জেমো, বাঘডাঙা, রসোড়া, ছাতিনাকান্দি।

কান্দি ও ভরতপুর থানার সমুদয় ও বরোঁয়া ও গোকর্ণের কিয়দংশ লইয়া ফতেসিংহ পরগণা। স্থানীয় কিংবদন্তি যে, আকবর বাদশাহের আমলে ফতেসিংহ নামক হাড়ি রাজার অধিকারে থাকায় পরগণার ওই নাম হয়। রাজা মানসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠান দমনে আসেন, সেই সময়ে তাঁহার জনৈক কর্মচারী বুন্দেলখণ্ডবাসী জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ সবিতাচাঁদ দীক্ষিত হাড়ি রাজাকে পরাস্ত করিয়া ওই পরগনা দিল্লির অধীন করেন ও মানসিংহের কৃপায় ফতেসিংহের জমিদারি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। সবিতার বংশধরেরা তদবধি ফতেসিংহের অধিকারী আছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলে জমিদারি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এক খণ্ডের অধিকারীরা বর্তমান জেমোর রাজা ও অন্য খণ্ডের অধিকারীরা বাঘডাঙার রাজা নামে ফতেসিংহে পরিচিত। বাঘডাঙার অধিকৃত ফতেসিংহের অর্ধাংশ সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। কান্দির উত্তরে খড়গ্রাম থানার অন্তঃপাতী সেরপুর আতাই গ্রামে মানসিংহ ওসমানের অধীন পাঠানসেনা ধ্বংস করেন।

কান্দি মহকুমা উত্তররাঢ় প্রদেশের উত্তরাংশ—কান্দি গ্রাম উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের কেন্দ্র। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে বাংলার উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্বপুরুষেরা কান্দি ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামে বাস করিতেন; সেখান হইতে তাঁহাদের বংশীয়েরা বাংলা ও বিহারে বিস্তৃতি লাভ করেন।

বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জন্মস্থান কান্দি—ওই অঞ্চলে তাঁহার বংশধরেরা কান্দির রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ—কলিকাতায় তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজপরিবার

নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমান কালে কান্দির এন্ট্রান্স স্কুল, চিকিৎসালয় ইত্যাদি যাহা কিছু সৌষ্ঠব, সমস্তই লালাবাবুর বংশের প্রসাদে অনুষ্ঠিত।

বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে উত্তররাঢ় একটু বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছে বলিয়া বোধহয়। ফতেসিংহ পরগনার উত্তর প্রান্তে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে রাঙামাটি গ্রাম—যাহাকে অনেক পণ্ডিতে হুয়েংচ্যাং বর্ণিত কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের রাজধানীর অবশেষ বলিয়া অনুমান করেন। ওই স্থান বহরমপুরের নিকটবর্তী, কান্দি বহরমপুর হইতে অষ্টক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ত মহাপীঠের মধ্যে অন্যূন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫।১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের অবস্থিতি এইরূপ দেওয়া আছে—

১। অট্টহাস—দেবী ফুল্লরা—লুপলাইন আমেদপুর স্টেশনের নিকট।

২। কিরীট—দেবী বিমলা—বহরমপুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত।

৩। নলহাটি—দেবী কালিকা—লুপলাইনে নলহাটি স্টেশন।

৪। বহুলা—দেবী বহুলা—কাটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রাম।

৫। ক্ষীরগ্রাম—দেবী যুগাদ্যা—কাটোয়ার সন্নিহিত।

৬। বক্রেশ্বর—দেবী মহিষমর্দ্দিনী—বীরভূম সিউড়ির নিকট।

৭। নন্দিপুর—দেবী নন্দিনী—লুপলাইন সাঁইথা স্টেশন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রসিদ্ধ কতিপয় ব্যক্তির বাসহেতু কান্দির সমীপবর্তী কতকগুলি স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে। যথা—(১) ভরতপুর—গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতা হৃদয়ানন্দের বাসস্থান। তাঁহার বংশধরদের গৃহে চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষর চিহ্নিত যে গীতাগ্রন্থ বর্তমান আছে, তাহার ফটোগ্রাফ ভারত-শিল্পপ্রদর্শনীতে সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল। (২) মালিহাটি—শ্রীনিবাসাচার্যের বংশীয় রাধামোহন ঠাকুরের বাসস্থান। (৩) টেঁয়া—দ্বিজ হরিদাস এবং বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধারদাসের বাসভূমি। (৪) ঝামটপুর—কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাসভূমি। (৫) উদ্ধারণপুর—উদ্ধারণ দত্তের নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

এই প্রবন্ধে কান্দির প্রধান গ্রামদেবতার বিবরণ দেওয়া হইতেছে। দেবতার নাম রুদ্রদেব—কান্দি ও পার্শ্বস্থ বহু গ্রামের অধিবাসী ইহার ভক্ত উপাসক। রুদ্রদেবের বর্তমান মন্দির কান্দির অন্তর্গত জেমো গ্রামে অবস্থিত; ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদার জেমো ও বাঘডাঙার রাজারা তাঁহার সেবাইত। Journal of the Asiatic Society, Part III (Anthropological Part), No I, 1898, গ্রন্থে এই দেবতার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল; প্রবন্ধের নাম "On a Rain Ceremony from the District of Murshidabad," লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র এমএ, বিএল। কোনও বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিলে মন্দিরস্থ দেববিগ্রহকে কলশি-কলশি জল তুলিয়া একবারে জলমগ্ন করিতে পারিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন; মন্দিরের দ্বার ও ছিদ্রাদ্রি বন্ধ করিতে আপত্তি নাই; নতুবা ঘরের ভিতর জল দাঁড়াইতে পারিবে না। রুদ্রদেবের মানস করিয়া লোকে শূল প্রভৃতি ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করে। রুদ্রদেবের পাণ্ডারা কুকুরদংশনের ও সর্পদংশনের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

দেবতার ইতিহাস এই,—সিংহোপাধিক উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের মূলপুরুষ অনাদিবর

সিংহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। তাঁহার বংশধর বনমালী সিংহ ময়ূরাক্ষীতীরে বন কাটিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন ও তদবধি কান্দি গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। বনমালীর বংশধর রুদ্রকণ্ঠের সময়ে কামদেব ব্রহ্মচারী নামক সিদ্ধ সন্ন্যাসী বৃক্ষারোহণে আকাশপথে কামরূপ হইতে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, তিনি ময়ূরাক্ষীতীরে অবতীর্ণ হইয়া কান্দিতে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার নিকট দুইটি দেববিগ্রহ ছিল; উভয়কেই তিনি কালাগ্নিরুদ্রমূর্তি বোধে উপাসনা করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য আদি গোঁসাই; রুদ্রকণ্ঠ সিংহও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রুদ্রকণ্ঠকে বিগ্রহদ্বয় অর্পণ করিয়া পূজার ভার দিয়া যান। পরবর্তীকালে ফতেসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদারেরা রুদ্রকণ্ঠের বংশধরের নিকট বিগ্রহদ্বয় কাড়িয়া লন। তদবধি বিগ্রহদ্বয় ফতেসিংহের জমিদারের নিকট গৃহদেবতা ও সর্বসাধারণের নিকট গ্রামদেবতারূপে পূজিত হইতে থাকেন।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বে "দাদুরঘাটা" উপলক্ষ্যে বিগ্রহদ্বয় সমারোহে গঙ্গাতীরে স্নানার্থ নীত হইত। গঙ্গা কান্দির চারি ক্রোশ পূর্বে। একবার স্নানের সময় বিগ্রহদ্বয়ের মধ্যে অন্যতর বিগ্রহ অন্তর্হিত হন ও গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুর গ্রামে প্রকাশ হন। তদবধি তিনি উদ্ধারণপুর গ্রামে অবস্থান করিয়া তত্রত্য জনসাধারণের পূজা পাইতেছেন; এবং জেমোর দেবতার গঙ্গাস্নান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জেমো ও উদ্ধারণপুর, উভয়স্থলেই পূজা ও অনুষ্ঠানের প্রণালী একরূপ; চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বে গাজনের পূজা উদ্ধারণপুরে একদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়, ইহার কারণ পরে বুঝানো যাইবে।

উক্ত কিংবদন্তি হইতে কামদেব ব্রহ্মচারীর আনুমানিক কালনির্ণয় হইতে পারে। ফতেসিংহের বর্তমান জমিদারেরা সবিতাচাঁদ দীক্ষিতের অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ; আর পাইকপাড়ার শ্রীযুক্ত কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুর রুদ্রকণ্ঠ সিংহ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ। সবিতাচাঁদ খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা মানসিংহের সহিত এ দেশে আসিয়াছিলেন, অতএব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কামদেব ও গোস্বামী ও রুদ্রকণ্ঠ সিংহ বর্তমান ছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত।

চৈত্র মাসের শেষভাগে রুদ্রদেবের গাজন বা বার্ষিক উৎসব। ১৯ চৈত্র উৎসবের আরম্ভ; তদবধি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দেবতা বেশভূষা করিয়া "বার" বা 'দরবারে' বসেন। পরিচারক ভক্ত ও দর্শকেরা ঢাকের বাদ্য সহ মন্দিরে উপস্থিত হন। বেতনভোগী পূজক ও পরিচারক ব্যতীত অবৈতনিক কর্মচারী ও পরিচারক অনেকগুলি আছেন; সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ লোকে পুরুষানুক্রমে এই কর্ম গ্রহণ করিয়া সম্মান বোধ করেন। কর্মচারীদের শ্রেণিবিভাগ যথা—

১। পূজক ও পরিচারক ব্রাহ্মণ — ইহারা ভূমিসম্পত্তি বা বেতন ভোগ করেন।

২। দেয়াশীল
৩। বিষয়া
৪। মড়ানা
৫। মলমতি
৬। স্বর্ণমতি



ইহারা নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্মে নির্দিষ্ট পরিচর্যায় নিযুক্ত; দেবতার শয্যা, অলংকার, পরিচ্ছদাদি ইহাদের জিম্মা।

৭। কোতোয়াল
৮। থানাদার
৯। চৌকিদার
১০। নকিবদার



ইহারা শান্তিরক্ষাদি কর্মে নিযুক্ত।

১১। ছড়িদার
১২। আশাবরদার
১৩। শোটাবরদার
১৪। আড়ানিবরদার
১৫। নিশানবরদার
১৬। চামরবরদার



ইহারা বারের সময় দেবতার পার্শ্বে সসজ্জ হইয়া উপস্থিত থাকেন ও মিছিলের সময় সঙ্গে যান।

১৭। মের্দ্ধা



সংখ্যায় চল্লিশজন, ইহারা পার্শ্ববর্তী চল্লিশখানি গ্রামের প্রতিনিধি। গ্রামস্থ লোক রুদ্রদেবের প্রজা; মের্দ্ধাগণ প্রজামধ্যে মণ্ডলস্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন যাহারা গাজনের সময় ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তাহাদের নাম 'ভক্ত'। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল বাউড়ি পর্যন্ত সকলেই ব্রতগ্রহণে অধিকারী; শ্রেণিভেদে তিনদিন হইতে পনের দিন পর্যন্ত ব্রতগ্রহণের নিয়ম। ব্রতধারীর পক্ষে দিনের ব্যবস্থা উপবাস, সন্ধ্যার পর ফলমূল ভোজন। ব্রতধারীর চিহ্ন—স্কন্ধে "উত্তরী" ও হস্তে "বেত্রদণ্ড"; উত্তরী রেশমে বা কার্পাসসূত্রে নির্মিত। ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামের ভক্তেরা অপরাহ্নে গ্রামস্থ নির্দিষ্ট পুষ্করিণীতে একসঙ্গে স্নান করেন ও পরস্পরের গলায় "উত্তরীয়" পরাইয়া ব্রত গ্রহণ করেন। এইরূপে সহস্রাধিক লোকে ব্রতগ্রহণ করেন; নিম্নশ্রেণির লোকই অধিক।

সন্ন্যাসীদের শ্রেণিভেদে উপাধিভেদে ও কর্মভেদ আছে। যথা—

১। কালিকার পাতা—ইহারা পিশাচবেশে মৃত নরদেহ লইয়া নৃত্য করে, অনুষ্ঠানের নাম "মড়া খেলা"।

২। মায়ের পাতা—ইহারা ডাকিনী সাজিয়া নাচিয়া বেড়ায়। পরিচ্ছদ রাঙা কাপড়, গলায় ফুলের মালা, গায়ে রূপার গহনা, মাথায় লম্বা চুল, মুখে আবিরের প্রলেপ, হাতে বেত্রদণ্ড, মুখে চিৎকার ইহাদের লক্ষণ।

৩। চামুণ্ডার পাতা—ইহাদের সাজসজ্জাও ওইরূপ বিকট; উপরন্তু মুখে মুখোশ পরিয়া ইহারা নাচে, অনুষ্ঠান "মুখোশ খেলা" বা "মোশ খেলা।"

৪। লাউসেনের পাতা—ইহারা লাউ, কুমড়া প্রভৃতি হাতে লইয়া নাচে।

৫। ধুলসেনের পাতা—ইহারা ধূলি ছড়ায়।

৬। ব্রহ্মার পাতা—ইহারা হোমাগ্নি বহন করে।

৭। জলকুমরির পাতা—ইহারা খিচুরি ভোগ জলে ডুবায়।

ওই সকল সন্ন্যাসীর সংখ্যা নির্দিষ্ট; তদ্ব্যতীত সাধারণ ভক্তের সংখ্যার কোন নির্দেশ নাই; এবং সাধারণ ভক্তের সংখ্যাই অধিক।

১৯ চৈত্র বার বা উৎসবের আরম্ভ। ওই প্রথম দিনের সায়ংকালে অনুষ্ঠান "কাঁটা ভাঙা,"—এ দিন সন্ন্যাসীরা কাঁটাগাছের ডালে শয্যা রচনা করিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দেয়। তৃতীয় দিন পুনরায় কাঁটা ভাঙা। ষষ্ঠ দিনে সন্ধ্যার পর "সিদ্ধি ভাঙা"—সেদিন সকলে সিদ্ধি খায়। নবম রাত্রিতে "চোরা জাগরণ,"—সে দিনও কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠান আছে। দশম রাত্রি "জাগরণ"—এই দিন সমারোহ-ঘটনা। সহস্র সন্ন্যাসী ও সহস্রাধিক দর্শকে মন্দির ও পার্শ্বস্থ স্থান পূর্ণ হয়; সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাদ্য ও জনকোলাহল; প্রত্যেক গ্রাম হইতে ভক্তের দল মের্দ্ধার অধীনতায় ঢাকের সহিত মন্দিরে উপস্থিত হয়। মায়ের পাতা, চামুণ্ডার পাতা প্রভৃতি সকলে আসিয়া নাচিতে থাকে। গভীর রাত্রে "শাঁখ চুরি"—পূজার দ্রব্যমধ্য হইতে একটা শঙ্খ হঠাৎ অদৃশ্য হয়, কোতোয়াল, চৌকিদার প্রভৃতি চোর ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করে, শেষে দর্শকমধ্য হইতে চোর ধরা পড়ে, তাহার বিচারশেষে দণ্ড হয় এক মুদ্রা। বলা উচিত, একই ব্যক্তি প্রতি বৎসর শাঁখ চুরির জন্য ধরা পড়িতেছে, এবং সে পুরুষানুক্রমে শাঁখচোর। শেষ রাত্রির অনুষ্ঠান "মড়া খেলা"—বীভৎস ব্যাপার। "কালিকার পাতা"-রা আস্ত মড়া—মনুষ্যের শবদেহ,—অনেক সময় গলিত শব আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধুঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা মাথা। শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্রমূর্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই। কান্দি মহকুমায় গ্রামে-গ্রামে ধর্মপূজা উপলক্ষ্যেও এই বীভৎস অনুষ্ঠান চলিত আছে; ১২৮৮ সাল হইতে ম্যাজিস্ট্রেট স্বাস্থ্যরক্ষার অছিলায় কান্দির মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তদবধি মড়াখেলা বন্ধ হইয়াছে, এখন কালিকার পাতারা কেবল নাচে, কখনও বা নারিকেলফলে নরমুণ্ডের অনুকল্প করে।

ওয়াডেল সাহেব তাঁহার Lamaism or Buddhism in Tibet নামক গ্রন্থে লামাদের অনুষ্ঠিত যে সকল পৈশাচিক অভিনয়ের সচিত্র বিবরণ দিয়াছেন, তাহা পড়িলে বোধহয়, তিব্বত, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত অনুষ্ঠানের সহিত এই "মড়াখেলা" অনুষ্ঠানের কোন ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকিতে পারে।

সূর্যোদয়ের পর দেবতাকে পালকিতে চাপাইয়া ময়ূরাক্ষীতীরে, যেখানে কামদেব ব্রহ্মচারীর সমাধি আছে, সেইখানে লইয়া যাওয়া হয়। গ্রামের ভদ্রলোক পালকি বহন করেন; আপামর সাধারণ সমারোহে কোলাহল করিয়া সঙ্গে-সঙ্গে যায়। নদীতীরে উপস্থিতির পর অহোরাত্রের অনুষ্ঠান যথা ঃ—

১। অভিষেক—অর্থাৎ যথাবিধি স্নান।

২। পূজা, হোম, বলিদান;—পূজান্তে পায়সান্ন ভোগ।

৩। "দাদুরঘাটা"—রুদ্রকণ্ঠ সিংহের কোন বংশধরের আনীত তেল মাখাইয়া দেবতাকে নদীর জলে স্নান করানো হয়। পূর্বে এই দাদুরঘাটার জন্য দেবতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। দ্বিতীয় বিগ্রহের অন্তর্ধানাবধি উহা বন্ধ হইয়াছে।

৪। সমাগত উপাসক ও দর্শকদিগের প্রদত্ত পূজা, ভোগ, প্রণামি।

৫। রাত্রিকৃত্য,—উদ্ধারণপুরে দাদুরঘাটা পূর্বদিনে সম্পাদিত হয় এবং এই দিন সেখানকার মন্দির বন্ধ থাকে। সেখানকার দেবতা অদ্যাপি কামদেব ব্রহ্মচারীকে ভুলেন নাই। অন্য রাত্রিতে তিনি ময়ূরাক্ষীতীরে ব্রহ্মচারীর সমাধির উপর বসিবার জন্য অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হন। পূজক ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত পদ্ধতিক্রমে উভয় দেবতার একসঙ্গে পূজা করেন। নিদাঘকালে তান্ত্রিক আচারে পূজা হয়। পূজার নিয়ম, সাধারণের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। পূজার পর মৎস্যসহ খিচুড়ি ভোগ। ভোগের যাবতীয় উপকরণ ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়। জমিদারের পক্ষের গোমস্তা ভিক্ষার দ্রব্য লইয়া আগে হইতে উপস্থিত থাকেন। ভোগের পর জলকুমরির পাতা সেই অন্ননদীজলে অর্পণ করে। ইহাতে নানা বিঘ্নের আশঙ্কা থাকে—কোমরে কাছি বাঁধিয়া জলকুমরিকে নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; নদীতীরে লোকে দড়ি ধরিয়া দাঁড়ায়। তিনি অন্নের হাঁড়ি মাথায় লইয়া জলে ডুব দেন ও তখনই অচেতন হইয়া পড়েন। অচেতন হইতেই হইবে। তীরবর্তী লোকে দড়ি টানিয়া তাঁহাকে উপরে তোলে ও চৈতন্য সম্পাদন করে।

পরদিন পুনরায় পালকি চাপিয়া সমারোহ সহকারে মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। এই দিন চৈত্রসংক্রান্তি। মন্দিরে আসিয়া পুনরায় স্নান পূজা হয়; সাধারণে পূজা দেয় ও বহু ছাগশিশুর বলিদান হয়। সন্ধ্যার পূর্বে ব্রতধারী সন্ন্যাসীরা আপন গ্রামের নির্দিষ্ট জলাশয়ে স্নান করিয়া উত্তরী ত্যাগ করিয়া ব্রত সমাপন করেন। পূর্বে এই দিন চড়ক হইত; এখন তাহা নিষিদ্ধ।

অপর পৃষ্ঠায় [আর্ট প্লেটে] জেমো ও উদ্ধারণপুর, উভয় স্থানের দেবমূর্তির প্রতিকৃতি দেওয়া হইল। গত অগ্রহায়ণ মাসে [১৩১৩] সাহিত্য-পরিষদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ মহাশয়কে ফটোগ্রাফার সমেত ওই প্রদেশের স্থানীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহারাই এই ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উভয় প্রতিকৃতি দেখানো হইয়াছিল। তিনি নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"জেমোর রুদ্রদেবের মূর্তি বস্তুত শাক্যমুনি বুদ্ধদেবের মূর্তি। শাক্যমুনি পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট ঃ পার্শ্বে বোধিসত্ত্বগণ ও দেবগণ বর্তমান—পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা অবস্থিত। উপরে পালঙ্কের উপরে মহাপরিনির্বাণোন্মুখ বুদ্ধদেব শয্যাশায়ী। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মূর্তি বুদ্ধমূর্তি। গলদেশে যজ্ঞসূত্র ব্যতীত নাগোপবীতের চিহ্ন রহিয়াছে—সমাধিমগ্ন বুদ্ধদেবও নাগবেষ্টিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তি আছে। ললাটে তৃতীয় লোচনের চিহ্ন আছে। এই তৃতীয় লোচনও সম্ভবত নাগোপবীতবৎ উত্তরকালে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। বুদ্ধমূর্তি বহু স্থানে মহাদেবের মূর্তিকে এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন।

উদ্ধারণপুরের বিগ্রহ ভৈরবমূর্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহার নাম বজ্রভৈরব, হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রচূড় বা রুদ্রভৈরব। তাঁহার চারি হাত; তিন চক্ষু, গলে নরমুণ্ডমালা; এক হাতে বজ্র ধরিয়া ডাকিনী পিশাচী প্রভৃতিকে শাসন করিতেছেন। অন্য হাতে পদ্মদল; ঊর্ধ্বে সর্পফণা। উভয় পার্শ্বে ভৈরবের শক্তি নারীমূর্তি। ভৈরবকে বেষ্টন করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে; পদ্মাসনের নীচে উপাসকেরা কম্পিতকলেবরে অবস্থিত।"

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত রুদ্রদেব সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

"জেমোর রুদ্রদেবের মূর্তির ফটোগ্রাফ দেখিয়াছিলাম; সেই সময় আমার সন্দেহ হয় যে, ইহা বুদ্ধমূর্তি। আমি, এই মূর্তি যে বুদ্ধমূর্তি, তাহা প্রমাণ করিয়াছি। এই প্রমাণ কলিকাতা মিউজিয়ামের মূর্তিগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মূর্তিটি একটি বৃহৎ পদ্মের উপরিস্থিত সিংহাসনে আসীন। প্রকাশিত চিত্র দেখিলে বোধ হইবে যে, নিম্নলিখিত সাধনা এই মূর্তিরই ধ্যান। মূর্তির মস্তকের উপর একটি বৃক্ষের দুই একটি শাখা দেখা যায়, ইহা মহাবোধিদ্রুম। বৃক্ষশাখার উপরে পর্য্যঙ্কে শয়ান অপর একটি মূর্তি আছে। ইহা মৃত্যু বা মহাপরিনির্বাণের চিত্র। মূর্তির মস্তকের দুই পার্শ্বে পদ্মের উপর উপবিষ্ট ধর্মচক্র মুদ্রাস্থিত দুইটি বুদ্ধমূর্তি আছে। স্কন্ধের দুই পার্শ্বে পদ্মোপরি দণ্ডায়মান অপর দুইটি মূর্তি আছে। দক্ষিণে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ও বামে লোকেশ্বর বোধিসত্ত্ব অবস্থান করিতেছেন। ইহা বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধদেবের সম্বোধিলাভকালের মূর্তি। এই সময়ে তিনি বোধিদ্রুমতলে বজ্রাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ফরাসি পণ্ডিত Auguste Foucher (অগস্ত ফুসে) নেপাল হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে বজ্রাসনস্থ বুদ্ধের সাধনা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা এই—

অথ বজ্রাসনসাধনা।

"শ্রীমদ্‌বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারকম্ আত্মানং ঝট্ ইতি নিষ্পাদয়েৎ। দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্ম্মারসংঘটিতমহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গ স্থিতবামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধুকরাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং (সেবনকবিগ্রহং) বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্মধাতুস্বভাবাত্মকোহহং ইত্যদ্বয়াহঙ্কারং কুর্য্যাৎ।

তদনু ভগবতো দক্ষিণে মৈত্রেয়বোধিসত্ত্বং সুবর্ণগৌরং দ্বিভুজং জটামুকুটধারিণং গৃহীতচামরদক্ষিণকরং নাগকেশরপল্লবধরবামকরং। তথা বামে লোকেশ্বরং বোধিসত্ত্বং শুক্লং জটামুকুটিনং চামরধারিদক্ষিণভুজং কমলধারিবামকরং এতদ্‌দ্বয়ং ভগবন্মুখং অভিবীক্ষ্যমানং পশ্যেৎ।"*

জেমোর রুদ্রদেবের মন্দিরের উঠানে বাঁধানো বেদির নীচে এক চণ্ডালীর মুণ্ড সমাহিত আছে। এককালে ওই মুণ্ডের ভয়ে গ্রামের লোকে বিব্রত হইয়াছিল। রাস্তায় পথিক দেখিলেই ওই মুণ্ড লাফ দিয়া কামড়াইতে যাইত। কিছুতেই উহা শাসন মানে নাই। অবশেষে কালিকার পাতরা উহাকে ধরিয়া রুদ্রদেবের নিকট খেলাইলে উহা শান্ত হয়। তৎপরে উহাকে সমাহিত করা হইয়াছে, উহার চতুপার্শ্বে আরও কতকগুলি নরমুণ্ড সমাহিত আছে।

এই প্রদেশে প্রচলিত ধর্মপূজা সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কান্দি মহকুমার গ্রামে-গ্রামে ধর্মপূজা প্রচলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায়, ক্বচিৎ বা জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্মের মন্দির কোথাও মাটির কুটির, কোথাও বা তাহারও অভাব;—অশ্বত্থাদি বৃক্ষের নীচে মন্দিরের স্থান। গ্রামের লোকে চাঁদা তুলিয়া বৎসরান্তে পূজা

* সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে মৈত্রেয়ের নিম্নে তারার ও বাম পার্শ্বে লোকেশ্বরের নিম্নে সুধনকুমারের মূর্ত্তি আছে।—Foucher, Etude sur L'iconographie Bouddhique De L' Inde, Denxieme Partie p. 16 and fig.1.

দেয়—গ্রামের লোকেই উদ্যোগকারী—জমিদারের নামে পূজার সংকল্প হয়—জমিদার কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি বা অর্থ দিয়া পূজার সাহায্য করেন। প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম গ্রামদেবতা; গ্রামের যাবতীয় লোকে সেই পূজার নির্বাহের জন্য দায়ী। ধর্মের মন্দির অনেক স্থানে জমিদারের খাজনা আদায়কারীর কাছারিতে, কোথাও বা গ্রামের টাউন হলে পরিণত।

পূর্ণিমার গাজনে নিম্নশ্রেণির লোকেই ব্রত গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হয়। ঢাকের বাদ্য ও কিঞ্চিৎ তণ্ডুলাদি পূজার প্রধান উপকরণ। কোথাও বা হোমের ও বলিদানের ঘটা আছে।

পূর্ণিমার পূর্বরাত্রি 'জাগরণ'; তৎপূর্বরাত্রি চোরা জাগরণ, জাগরণের দিন 'বাণ গোঁসাই' গ্রাম্য বালকের মাথায় চাপিয়া ঢাকের সহিত ভিক্ষায় বাহির হন। বাণ গোঁসাই দীর্ঘাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড—কাষ্ঠের এক প্রান্তে মানুষের মুখের অবয়ব খোদাই করা থাকে। গৃহস্থ স্ত্রীরা বাণ গোঁসাইকে তেল সিঁদুর মাখাইয়া চাউল ভিক্ষা দেন। ভিক্ষার সংগৃহীত তণ্ডুলে ধর্মরাজের পূজা হয়। জাগরণের রাত্রি মণ্ডপে জনকোলাহল ও ঢাকের বাজনা। মাঝে-মাঝে "বোলান" গীত। শেষ রাত্রিতে "মুখোশ" খেলা; বিকট মুখোশ পরিয়া ভক্তেরা নৃত্য করে। রাত্রিশেষে "মড়াখেলা"—রুদ্রদেবের মড়াখেলার অনুরূপ।

মড়াখেলার সময় কালিকার পাতারা ডাকিনীর বেশে শবের চারি দিকে উপবেশন করে—শবের গায়ে আবির মাখায়—শবকে লইয়া নানাবিধ সোহাগ করে—মন্ত্র তন্ত্র পড়ে—চারি দিকে বেষ্টন করিয়া গান গায় ও ঢাকের বাদ্যেব তালে-তালে নৃত্য করে। গানের দুই চারিটা নমুনা দেওয়া যাইতেছে ঃ—

১। ওরে সাজ্‌লে—
ধূল ধূল ধূল, সাজলে, ধূল ধূল ধূল।
প'ড়েছে মায়ের পাতা উদম করে চুল।। [উদম = মুক্ত]

২। ওরে সাজ্‌লে—
শ্মশানে গিয়েছিলাম মশানে গিয়েছিলেম, সঙ্গে গিয়েছিল কে?
কার্ত্তিক গণেশ দুটি ভাই সঙ্গে সেজেছেঁ।।

৩। ওরে সাজ্‌লে—
কাল বাছা খেয়েছিলে টুকুইভরা মুড়ি।
আজ বাছার মুণ্ড যায় ধূলায় গড়াগড়ি।।
[টুকুই = তালপাতায় নির্মিত মুড়ি খাইবার ক্ষুদ্র পাত্র]

৪। ওরে সাজ্‌লে—
সোনার আঁচির সোনার পাঁচির সোনার সিংহাসন।
তার উপর বসে আছেন ধর্ম নিরঞ্জন।। [পাঁচির = প্রাচীর]

৫। ওরে সাজ্‌লে—
কার গাছেতে কেটেছিলেম খণ্ড কলার বাল।
আজ, পুত্রশোকে আকুল হলেম, কেবা দিলে গাল।।
[বাল = বাইল = শাখা; গাল = গালি]

৬। ওরে সাজ্‌লে—

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ তামার বাটি।
আড়াই হাত মৃত্তিকা শুদ্ধ শুদ্ধ ঢাকের কাঠি।।

৭। ওরে সাজ্‌লে—

তুই ত মেরা ভাই, সাজ্‌লে, তুই ত মেরা ভাই।
তোর সঙ্গে গেলে, সাজ্‌লে, শিব দরশন্ পাই।।
[মেরা = আমার]

৮। ওরে সাজ্‌লে—

ভালো বাজালি ঢেকো ভেয়ে তোর মা আমার মাসি।
এনোদ্ করে বাজা সাজ্‌লে বেনোদ্ করে নাচি।।
[ঢেকো = ঢাকবাদক; ভেয়ে = ভাইয়া = ভাই; এনোদ্ = আনন্দ; বেনোদ্ = বিনোদ]

মধ্যাহ্নে ভক্তেরা দূরের কোনও জলাশয় হইতে কলসি ভরিয়া জল তোলে ও মাথায় লইয়া ঢাকের বাজনার সহিত নাচিতে-নাচিতে মন্দিরে উপস্থিত হয়। নাচিবার সময় মূর্ছার অভিনয় হয়—দেবতা মূর্ছা গ্রস্তে "ভর" দেন ও তাহার মুখ হইতে নানা গুপ্তকথা নানা ব্যাধির চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া ফেলেন। বৈশাখের মধ্যাহ্নের রৌদ্রে নাচ—তাহাতে সর্বত্র মূর্ছা—অভিনয় না হইতেও পারে। তৎপরে পূজা, হোম, বলিদান। সন্ধ্যার সময় 'দাদুরঘাটা'; ধর্মঠাকুর—এক বা একাধিক সিন্দরমণ্ডিত শিলা খণ্ড পূজারির মাথায় চাপিয়া স্নান করিতে যান ও স্নানান্তে মণ্ডপে মিছিল সহ ফিরিয়া আসেন। মিছিলের প্রধান অঙ্গ, "বাণ ফোঁড়া"; একদল লোক জেটির দুই পার্শ্বে লোহার কাঁটা বিদ্ধাইয়া কাঁটার দুই অগ্রভাগ একত্র করিয়া তাহাতে নেকড়া জড়ায়; নেকড়ায় তেল দিয়া আগুন জ্বালে ও আগুনের উপর ধুনো ছিটাইলে দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। ইহাই বাস ফোঁড়া। ইহার সহিত "শক্ত" থাকে ও বাদ্যভাণ্ডের অনুষ্ঠান থাকে। রাত্রিকালে যাত্রা প্রভৃতি কবিগানের অনুষ্ঠানে উৎসবসমাপন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৪ সাল

—সমাপ্ত—